'সর্বদলীয় বিপ্লবী সংকলন'—কথাটি ভাবতে বড় ভাল লাগছে। অতীতেও সবগুলি বিপ্লবীদল এক হয়ে মিলে যাবার প্রস্তাব হয়েছিল, কিন্তু কার্যত তা আর হয়ে ওঠেনি। শৈলেশ দে সম্পাদিত 'অগ্নিযুগ' সংকলন গ্রন্থে এতদিন পরে তা সম্ভব হয়েছে, এটা খুবই আনন্দের কথা। কামনা করি, এ মিলন চিরস্থায়ী হোক।

শ্রীরসময় শূর

সেদিন সমিতির প্রতিটি সদস্যকে এই মর্মে শপথবাক্য পাঠ করিতে হইত যে,—'চরিত্রটি নির্মল ও পবিত্র রাখিব'। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া একথার তাৎপর্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। এতবড় সম্পদ মানুষের জীবনে সত্যই কিছু নাই।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে অগ্নিযুগের গৌরবময় স্মৃতিকে জাগ্রত রাখার এই আন্তরিক প্রয়াস সার্থক হউক, সফল হউক। 'অগ্নিযুগ' পাঠ করিয়া একালের যুবক যুবতীরা অগ্নিযুগের ছেলেমেয়েদের মতই চরিত্র বলে বলীয়ান হইয়া উঠুক।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা

সম্পাদক, অনুশীলন ভবন

শৈলেশ দে সুলেখক। বিশেষ করে বাংলার বিপ্লববাদের কাহিনী সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। এবার তিনি নিজেকে আড়ালে রেখে বিপ্লবীদের রচনাসম্ভার পরপর সাজিয়ে 'অগ্নিযুগ' নামে একখানি সংকলন ইতিহাস প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর অগ্নিযুগের আহ্বানে সেদিনের বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলি একই মঞ্চে এসে মিলিত হয়েছেন, এটাই তো একটা ইতিহাস।

আমি এ গ্রন্থের সাফল্য কামনা করি। আজকের দিনের ছেলে মেয়েরা এটুকু অন্ততঃ জানুক যে, তাদের পূর্বসূরীরা ভীরু-কাপুরুষ ছিলেন না। ফাঁসির দড়ি গলায় তুলে নিতে বা স্বদেশ থেকে বহুদূরে আন্দামানদ্বীপে নির্বাসনদণ্ড মেনে নিতে তারা কোনদিনও পিছিয়ে ছিলেন না।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু গুহ

যুগ্ম সম্পাদক, বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতিসংস্থা।

দেশের জন্য বাংলার বিপ্লবীদের আত্মদানের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল। এই গ্রন্থে সেই ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও কর্মসাধনার কথা—তাঁদেরই রচনা সংগ্রহ করে সংকলিত হয়েছে। আমরা সদ্য প্রকাশিত 'অগ্নিযুগ' পুস্তকের সংকলক শ্রীশৈলেশ দে ও পূর্ণ

প্রকাশনের প্রকাশককে সকৃতজ্ঞ চিত্তে অভিনন্দন জানাই। এ রকম একটি পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
সম্পাদক, প্রবর্তক ট্রাষ্ট।

শৈলেশবাবুকে আমরা চিনি। 'অগ্নিযুগ' সংকলন গ্রন্থ যে তার হাতে আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে—এ বিশ্বাস আমরা সবসময়েই রাখি। কামনা করি, তার সম্পাদিত অগ্নিযুগ ঘরে ঘরে সমাদৃত হোক।

শ্রীভক্তকুমার ঘোষ
আহ্বায়ক, ফ্রীডম ফাইটার্স এসোসিয়েশন।

আপনি 'অগ্নিযুগ' সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন জেনে আনন্দিত হলাম। এটি নিশ্চয়ই সৎ কাজ এবং দেশহিতৈষীর ব্রতও বটে এবং আপনি যে এর উপযুক্ত ব্যক্তি সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

'অগ্নিযুগ' প্রকাশিত হল।

এ ইচ্ছা আমার অনেক দিনেরই। একদিন যাঁরা মহাপরাক্রমশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভীত, সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আর বেঁচে নেই। যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও কেউ অমর নন। কিন্তু তারপর! দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে, বুকের পাঁজরে পূজার হোমানল জ্বেলে যাঁরা একদিন গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কি সে ইতিহাস লুপ্ত হয়ে যাবে? তাঁদের মহামূল্যবান দুষ্প্রাপ্য রচনাসম্ভার কি অজানাই থেকে যাবে আজকের দিনের তরুণ-তরুণীদের কাছে?

গত ৮ই জানুয়ারী 'সতীর্থ সংহতি'র অনুষ্ঠানে এই আন্তরিক ইচ্ছার কথাই আমি ব্যক্ত করেছিলাম অগ্নিযুগের বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় ভক্তকুমার ঘোষ এবং নয়নাঞ্জন দাশগুপ্তের কাছে। বলেছিলাম—আপনারা সবাই মিলে আমাকে অনুমতি দিন। এর সঙ্গে আমার আর্থিক কোন সম্পর্ক থাকবে না, গ্রন্থ সত্ব হবে—বিপ্লবী নিকেতনের।

আনন্দের কথা,— অনুশীলন, যুগান্তর, চট্টগ্রাম, বি. ভি, শ্রীসংঘ, প্রবর্ত্তক, রিভোল্ট গ্রুপ, আত্মোন্নতি সমিতি, মাদারীপুর গ্রুপ—সবার অনুমতি পেয়ে গেলাম এ ব্যাপারে। বলাই বাহুল্য যে, তাদের সহৃদয় অনুমতি এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে এই স্মরণীয় সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা কোনদিনই সম্ভব হতো না।

রচনাসমূহ ভাগ করা হয়েছে মোট তিনটি বিভাগে। ক। ১৯০৫ সাল থেকে শুরু করে ধারাবাহিক বৈপ্লবিক ঘটনাবলী। (খ) সমীক্ষা ও স্মৃতিচারণ। (গ) কবি-সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কদের দৃষ্টিতে অগ্নিযুগ। কয়েকটি লেখা হাতে এসেছে অনেক দেরিতে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য বাধ্য হয়েই তাদের রাখতে হয়েছে শেষোক্ত বিভাগে। পরবর্তী সংস্করণে ওগুলো আবার নিয়ে আসা হবে যথাযোগ্য স্থানে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রন্থটির সম্পাদনার পেছনে কোন বোর্ড, কমিটি, উপদেষ্টা বা সম্পাদকমণ্ডলী বলতে কিছুই ছিল না। নিজের বিচার বুদ্ধিমত সিদ্ধান্ত যা কিছু নেবার আমি একাই নিয়েছি। তাই ভুল ভ্রান্তির দায়িত্বও আমার একারই, প্রকাশক বা আর কারো নয়।

এ কাজে সব চাইতে বড় সহায়ক ছিলেন সাহিত্যিক বন্ধু সত্যেন চৌধুরী, যিনি আমার মতই দলবহির্ভূত লোক। নিঃস্বার্থভাবে বহু লেখা কপি করে দিয়েছেন শৈশব সঙ্গিনী রাণীদেবী ও স্নেহাস্পদ শ্রীতমাল রায়। পরিতোষ চক্রবর্তী, সুকমল ঘোষ, তপনকিরণ রায়, পার্থসারথি বসু, চিত্তপ্রিয় মিত্র — এরাও সাহায্য করেছে নানাভাবে। এদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই তরুণ প্রকাশক রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে। বইটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার জন্য যে ভাবে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে।

বইখানি দ্রুত প্রকাশনার জন্য শ্রীরঞ্জন বেরা, মুরারিমোহন দাস এবং শ্রীমতী প্রীতি বিশ্বাসের আগ্রহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

বিনয়াবনত —

শৈলেশ দে

প্রথম খণ্ড (বৈপ্লবিক ঘটনাবলী)

দ্বিতীয় খণ্ড (সমীক্ষা ও স্মৃতিচারণ)

কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কদের দৃষ্টিতে অগ্নিযুগ

বীজ-মন্ত্র

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ

[বৈপ্লবিক সংস্থা বি ভি-র প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বাধিনায়ক। স্বামীজী থেকে শুরু করে শ্রীঅরবিন্দ, বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘাযতীন), নেতাজী প্রমুখ সবার সান্নিধ্য লাভ করেছেন ব্যক্তিগত জীবনে। বর্তমান বয়েস ৯১ বৎসর।]

বন্দেমাতরম্ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত—জাতীয়মন্ত্র এবং অন্যভাবে বলা যায় আমাদের জাতির মন্ত্র। "মন্ত্র" এই শব্দটির তত্ত্ব বা মর্ম সাধনার দ্বারা উপলব্ধির বিষয়—এর ভাষান্তর, ভাবানুবাদ বা তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য—যদিও চেষ্টা যে না হয় এমন নয়। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রটির উদ্‌গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র।

আমাদের আদি গ্রন্থ "বেদ"-এর প্রতিটি মন্ত্রের উদ্‌গাতা কোন না কোন ঋষি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা পরিষ্কার স্মরণ রাখতে হবে, তা হ'ল এই যে, ঋষিগণ মন্ত্রের রচয়িতা নন; মন্ত্র শাশ্বত। মন্ত্র নিজে স্বয়ং ঋষি বিশেষের নিকট উদ্‌ভাসিত হয়েছেন, বিশেষ রূপে দর্শন দিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট ঋষিবর তা বাঙ্‌ময় রূপে প্রকাশ করে দিয়েছেন। মন্ত্র আমাদের আত্মাকে অনন্তের পথ দিয়ে অমৃত লোকে পরম-এর দিকে নিয়ে যায়।

আমাদের ভারতবর্ষের আবহমান কালের ইতিহাসে দেখি যে, গুরু প্রদত্ত মন্ত্রে বা গুরুর দ্বারা দীক্ষিত মন্ত্রে সাধকগণ সাধারণত জগৎ সংসার পরিত্যাগ করে হিমালয়ের দুর্গম গিরি গুহায় অথবা গভীর গহন অরণ্যভূমিতে গিয়ে সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন। আত্ম-সাধনা "বনে বা কোণে" করতে হবে।

"বন্দেমাতরম" মন্ত্রটি কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এই "মন্ত্র"টির সাধকগণ জগত সংসার পরিত্যাগ করে নয়, সর্ববিধ কাম্য পরিত্যাগ করেই, দুর্গম গিরিগুহা বা গহন অরণ্যাভ্যন্তরে নয়—বনে বা কোণে নয়—জগতের মধ্যে থেকেই সংসার-সীমান্তে তাঁদের সাধনার পীঠস্থান করেছেন। আর মন্ত্রটির সাধনাও সমবেত ভাবে বহুজন সহ সাধ্য, তবেই সিদ্ধিলাভ হবে। মন্ত্রটি জাতিগত। ব্যক্তিগত নয়, ব্যক্তি বিশেষের জন্য মাত্র নয়। অন্য সকল মন্ত্র মূলতঃ Individual, আর বন্দেমাতরম্ মন্ত্রটি National.

স্বয়ং ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—'Earlier Bankim was a novelist only, later Bankim is a Rishi' ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই বাণীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগের ঋষি।

আজ থেকে পঁচাত্তর (৭৫) বৎসর পূর্বে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজির দর্শন লাভ এবং বাক্যালাপের পরম সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেই দুর্লভ দর্শনের সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন—'Read Bankim Chandra—Bankim Chandra—and Bankim Chandra only.'

আদি কবি বাল্মিকী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মুখ দিয়ে বলেছেন—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—মাতৃভূমি স্বর্গ থেকে গরীয়সী।

এ যুগে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভূমিকে অধিকতর মহিমায় মণ্ডিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মাতৃভূমি সেই 'চরম'-এর, পরম সত্তার—পরমাত্মার রূপবিশেষ মাত্র—ভিন্নতর অন্য কিছু নয়। একই সত্ত্বার প্রকাশ। দেশমাতা জগন্মাতার অভিন্ন সত্ত্বা। চিন্ময়ীর মৃন্ময়ীর রূপ। দেশমাতাই বাহুতে শক্তিস্বরূপে অবস্থানরতা, তিনিই মুক্তি প্রদায়িনী। আবার তিনিই প্রাণস্বরূপা। তিনি শ্রী ধী হ্রী ঋদ্ধি। তিনিই ভক্তি। দেশমাতা সর্বরূপহরা সর্বস্বরূপা। "রূপম্ রূপং প্রতিরূপো বভূব"।

আজ আমি প্রায় শতবৎসরের বৃদ্ধ। দেশ মাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে

সোঽহং স্বামীর (ব্যাঘ্রবীর শ্যামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) নিকট প্রথম দীক্ষা—বীজমন্ত্র 'বন্দেমাতরম'। 'মন্ত্রচৈতন্য' হল বিশ্বপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের স্নেহ প্রভাবে। বৃহত্তর ভারতবর্ষের যত যত মহাজন —তাঁদেরই একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কে এ জীবন ধন্য—যেমন ভগিনী নিবেদিতা, ঋষি অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মহামতি তিলক, বিপিন পাল, লাজপত রায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীর সাভারকার, রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সর্বোপরি নেতাজী সুভাষ; অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অবনীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সবাই একবাক্যে আমাকে বলেছেন জাতির জীবনমন্ত্র "বন্দেমাতরম্"। সেই মহা নাদধ্বনি শুনেছি কানে—শুনেছি প্রাণভরে সঙ্গীতে রবীন্দ্র কণ্ঠে, ব্রজেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কণ্ঠে, হেমচন্দ্র সেন ও তারাপদ চক্রবর্তীর কণ্ঠে।

মায়ের অনন্তরূপ। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। সেই অপরূপ রূপের ধ্যানই আমার জীবন সাধনা, তাঁরই নিত্য আরতি আমার সবকর্ম। মন্ত্র [illegible] "বন্দেমাতরম্"। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র-এর ঋত্বিক বীর ভিক্ষুগণ অমৃতলোক পথযাত্রী নন—মৃত্যুলোকে প্রবেশে ব্যগ্র। তাঁরা কোনরূপ মোক্ষ-মুক্তির জন্য ইচ্ছুক নন—অজস্র বন্ধন মাঝে দেশকে, জাতিকে, মানুষকে পরিপূর্ণ সজ্জায় সাজাতে ব্যস্ত। ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বা ভগবৎ দর্শনও কাম্য নয়—ফাঁসি কাষ্ঠ বা অগ্নিনালিক হল পরম কাম্য।

[বিপ্লবী রঞ্জন : বন্দেমাতরম সংখ্যা থেকে সংগৃহীত।]

'শক্তি চাই, নইলে সব বৃথা। আমি চাই এমন কয়েকটি যুবক—যাদের পেশীসমূহ লোহের ন্যায় দৃঢ় ও ইস্পাত নির্মিত। আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ'।

—স্বামী বিবেকানন্দ

বীরাঙ্গনা সরলা দেবী

অমলেন্দু ঘোষ

[বি. ভি-র সদস্য। রাজনৈতিক পটভূমিকায় গ্রন্থ রচনায় সিদ্ধহস্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-'মার্কসবাদই শেষ কথা নয়' ও 'বিপ্লব ও বিপ্লবী'।]

বিপ্লবী বাঙলার পটভূমি গড়ে তোলা ও পরে সেই পথে বাঙালী যুবশক্তিকে চালনা করার দায়িত্ব যে দু'জন প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন বীরাঙ্গনা সরলা দেবী ও ভগিনী নিবেদিতা।

সরলা দেবীর অবশ্য ভগিনী নিবেদিতার মতো বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কার্যাদির সঙ্গে তেমন যোগাযোগ ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙলার যুবশক্তির উদ্বোধনে ও বিপ্লবী ভাবধারার পরিপোষকতায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

সরলা দেবীর জন্ম ১৮৭৩ সালে। তাঁর পিতা শ্রীযুক্ত জানকী নাথ ঘোষাল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করলেও ঠাকুর-বাড়ির রীতি অনুযায়ী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন নি অথবা 'ঘর জামাই' হতেও রাজী হন নি। সরলা দেবীর জন্ম মাতুলালয়ে হলেও তাঁর জীবন তাই সুরু হয়েছিল পিত্রালয়েই। তবু তাঁর পিতার বিলাত যাত্রা উপলক্ষে পাঁচ বছর বয়স থেকেই মা-র সঙ্গে তিনি ঠাকুরবাড়িতেই ছিলেন এবং ওখানকার পরিবেশেই বড় হয়ে উঠেছিলেন। ফলে নিরাকারবাদী ব্রাহ্মধর্ম ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর জীবনে একান্ত স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছিল।

সঙ্গীত ও সাহিত্যের সেতুপথে রবীন্দ্রনাথ ও সরলা দেবীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সত্যি ঐতিহাসিক। অনেকেরই হয়তো জানা আছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গানে রবীন্দ্রনাথ যে সুর সংযোগ করেছিলেন, তার প্রথম অংশটি তাঁর নিজস্ব, কিন্তু শেষের অংশটির সুর সরলা দেবীর দেওয়া। গোখলের সভাপতিত্বে 'বেনারস'-এ যে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল, সেখানে সরলা দেবী ঐ সুরে নিজে এ গান গেয়েছিলেন।

কিন্তু সে যাই হোক, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার রাজ্যে, আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে, সে-যুগের নিরাকার ও সাকারের দ্বন্দ্বে সরলা দেবী যে কি করে তাঁর ব্রাহ্ম পরিবেশ এবং বিশেষ করে তাঁর মাতুল স্বয় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়িয়ে গেলেন তা সত্যি এক বিস্ময়। তিনি বুঝলেন যে, জীবনে নিরাকার ব্রহ্মই সব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সাধনায় নিরাকারের সঙ্গে সাকারের যে যুক্তিপূর্ণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল, তার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হল। সর্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দের তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্ব তাঁকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গেল।

সরলা দেবীর নিজের ভাষায়—"তারপর এলেন এক dynamic personality—স্বামী বিবেকানন্দ। Dynamic সে-ই—যার ভিতরে বারুদের ধর্ম আছে, প্রচণ্ড তেজ, প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়ার শক্তি। সেই বারুদের আগুন থেকে একটি স্ফুলিঙ্গ আমার ভিতরে এসে পড়েছিল—আমায় ভেঙে গড়েছিল।"

('জীবনের ঝরাপাতা' : সরলা দেবী)

সেই স্ফুলিঙ্গ যে সরলা দেবীর ভিতরে সত্যি এসে পড়েছিল তা স্বামীজীর চোখ এড়ায় নি। তিনি সকলের সামনেই বলেছিলেন যে, সরলার 'education' হল 'perfect'। শুধু তাই নয়, শাড়ি পরিহিতা ভারতীয়া নারীর মুখে পাশ্চাত্যের কাছে হিন্দুধর্মের সত্যিকারের রূপ তুলে ধরবার জন্যে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে

তিনি ইংলণ্ডেও যেতে চেয়েছিলেন। অবশ্য নানা কারণে সরলা দেবীর শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় নি। কিন্তু তাঁর জন্য এ যে কত বড় সৌভাগ্যের বার্তা বয়ে এনেছিল সরলা দেবী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা' নামক গ্রন্থে পরম শ্রদ্ধায় তা স্বীকার করেছেন।

এবারে সরলা দেবীর কর্মজীবনে প্রবেশের কাহিনী। সোলাপুরে তাঁর মেজো মামা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে একবার বেড়াতে গিয়ে তিনি সেখানকার মারাঠি ক্লাবের দুর্গাপূজার 'দশেরা' উৎসব দেখেছিলেন। দেখে একেবারে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের দেশের মতো শুধু বাইনাচ, গান ও মদ্যপান নয়—খালি লাঠি, তলোয়ার খেলা ও নানাবিধ ব্যায়ামের প্রদর্শনী, আর বীরত্বমূলক বক্তৃতার ধারা। দ্বিতীয় ঘটনা পুণা শহরে 'পেশোয়া'দের একটি বীরত্ব-স্তম্ভের সন্দর্শন। এ থেকেই 'বীরাষ্টমী' উৎসবের কল্পনা এলো তাঁর মনে।

এ কল্পনারই বাস্তব রূপায়ণে 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে সরলা দেবীর লেখনী প্রথমে বাঙালীকে 'মৃত্যুচর্চা'য় আহ্বান জানাল।

তিনি লিখলেন: "মৃত্যুকে যেচে বরণ করতে শেখ, অগত্যা তার কবলিত হয়ো না। তাকে স্পর্ধা কর, তার সম্মুখীন হও—খেলায়-ধূলোয়, আমোদে-প্রমোদে, শিকারে-বিহারে, বিজ্ঞানে-সজ্ঞানে, প্লেগে জনসেবায়, আগুনে লোক উদ্ধারে, জলেতে আত্ম-প্রাণ পণে পর-প্রাণ রক্ষায়। ভূগোল শেখ ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণে—মানচিত্রে অঙ্গুলি সঞ্চারণে নয়, পাড়ি দাও সমুদ্রে, চলে যাও সাহারার মরুতে, চড় তুঙ্গ এভারেস্টের শৃঙ্গে। ...সঙ্গে করে নিয়ে যাও সুস্থ সবল শরীর। মানুষের সব চেয়ে বড় পুঁজি সেইটি। সেজন্য চাই ভারতের অন্যান্য জাতির মতো বাঙালীরও নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চা।"

কিন্তু শুধু শরীরগত দৌর্বল্য হটালেই হবে না। বাঙালীর মন থেকে ভীরুতাও যে অপসারিত করতে হবে। দেখা যায়

পশ্চিম ও পাঞ্জাবের বড় বড় পালোয়ানরাও সাহেব-ভীতিতে ভরা—এই সাদা চামড়ার ভয় সরাতে হবে। কিন্তু কি করে? বেশী ভাবতে হল না। 'ভারতী'তে সরলা দেবীর নতুন প্রবন্ধ বেরুল 'বিলিতি ঘুষি বনাম দেশী কিল'। আগুন ভরা লেখা। সরলা দেবীর ভাষায়—"ভারতী-র পৃষ্ঠায় আমন্ত্রণ করলুম রেলে স্টীমারে, পথে ঘাটে, যেখানে সেখানে গোরা সৈনিক ব সিভিলিয়ানদের হাতে স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা বা নিজের অপমানে মুহ্যমান হয়ে আদালতে নালিশের আশ্রয় না নিয়ে—অপমানিত ক্ষুব্ধ মানী ব্যক্তি স্বহস্তে তখনি তখনি অপমানের প্রতিকার নিয়েছে, সেই সকল ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বর্ণনা পাঠাতে।

"তাঁরা পাঠালেনও—তাঁদের ইতিবৃত্ত 'ভারতী'তে বেরুতে থাকল। পাঠকমণ্ডলীর মনে লুকান আগুন ধিকিয়ে ধিকিয়ে জ্বলে উঠল প্রবল তেজে। দলে দলে স্কুল-কলেজের ছেলেরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আরম্ভ করলে। বয়স্করাও পিছিয়ে রইলেন না।

"আমি তাদের থেকে বেছে বেছে একটি অন্তরঙ্গ দল গঠন : ভারতবর্ষের একখানা মানচিত্র তাদের সামনে রেখে সেটিকে প্রণাম করিয়ে শপথ করাতুম, তনু মন দিয়ে এই ভারতের সেবা করবে। শেষে তাদের হাতে একটি রাখী বেঁধে দিতুম—তাদের আত্ম নিবেদনের সাক্ষী বা badge। আমার রাখীবাঁধা দলটি একটি গুপ্ত সমিতি নয়, তবু মনে মনে সঙ্কল্প রাখলেই উদ্‌যাপনের দৃঢ়তা হয় বলে মুখে মুখে রটান বারণ ছিল।

"বছর কয়েক বাদে বঙ্গভঙ্গের দিনে এই লাল সুতায় রাখী বন্ধনই দেশময় ছড়াল,···যার নেতৃত্ব নিতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এগিয়ে এসেছিলেন।"

এরপর হল 'প্রতাপাদিত্য উৎসব'। সরলা দেবীরই পরামর্শে ভবানীপুরস্থ সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালী বীর প্রতাপাদিত্যের স্মরণে বাঙালী ছেলেদের একত্র

হয়ে শুধু কুস্তি, লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলা, বক্সিং ইত্যাদির ব্যবস্থা। দেখে সবাই খুশি হলেন। এর নতুনত্বে চমৎকৃত হয়ে তৎকালীন 'বঙ্গবাসী' লিখলেন—'মরিমরি কি দেখিলাম! এ কি সভা! বক্তিমে নয়, টেবিল চাপড়া চাপড়ি নয়, শুধু বঙ্গবীরের স্মৃতি আহ্বান, বঙ্গ যুবকদের কঠিন হস্তে অস্ত্র ধারণ ও তাদের নেত্রী এক বঙ্গ-ললনার হস্তে পুরস্কার বিতরণ। দেবী দশভূজা কি আজ সশরীরে অবতীর্ণ হইলেন!"

কেউ কেউ অবশ্য এ নিয়ে ঠাট্টা-তামাশাও করলেন এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত হলেন তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এ অঙ্কিত প্রতাপাদিত্যের মায়ামমতাহীন দানব চরিত্রের পূজা প্রাপ্তিতে।

সরলা দেবী এতে দমে গেলেন না। তিনি বললেন যে, আমি তো প্রতাপাদিত্যকে moral মানুষের আদর্শ বলে খাড়া করতে চাই নি, তাঁর পিতৃব্য হনন প্রভৃতির সমর্থন করি নি। তিনি যে politically great ছিলেন, বাঙলার শিবাজী ছিলেন, মোগল বাদশার বিরুদ্ধে একলা এক হিন্দু জমিদার খাড়া হয়ে বাঙালার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, নিজের নামে শিক্কা চালিয়েছিলেন, সেই পৌরুষ, সেই সাহসিকতার হিসেবে তিনি যে গৌরবার্হ, তাই প্রতিষ্ঠা করেছি।

এরপর হল 'উদয়াদিত্য উৎসব'। রাজপুত বীর বালক 'বাদল'-এর মতো বাঙালীর ঘরের ছেলে প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্যও যে মোগলদের বিরুদ্ধে বাঙালীর স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টায় সম্মুখ-সমরে দেহপাত করেছেন, তার স্মৃতিও যে বাঙালী যুবকের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত করে দেওয়া দরকার। উদয়াদিত্যের কোন প্রতিকৃতি না থাকায় সভায় ঐ বীরের আত্মার প্রতিরূপ একটি তরবারী রেখে তাতেই পুষ্পার্ঘ্য দেওয়া হল। এই নূতনত্ব বাঙালী যুবকদের মন কেড়ে নিল।

সরলা দেবী তখন আছেন ২৬ নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। ওখানে একটা ব্যায়ামের ক্লাশ খুললেন তিনি। তলোয়ার

ইত্যাদি খেলা শেখাবার জন্য প্রফেসর মার্তাজা নামে একজন ওস্তাদকেও রাখা হল। ক্লাবের সব খরচ, মার্তাজার মাইনে, বক্সিং-এর দস্তানা, গৎকা, ঢাল, ছোরা, তলোয়ার, বড় লাঠি, ছোট লাঠি প্রভৃতির সব খরচই তিনি যোগাতেন আর নিজে ছেলেদের হাজিরা লিখতেন। ক্রমে ক্রমে এ ক্লাবের খবর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় এ রকম ক্লাব খুলে গেল। সরলা দেবীর ভাষায়—"পুলিন দাসও এলেন ঢাকা থেকে 'অনুশীলন সমিতি'র সর্দার হয়ে।" এ সমস্ত ক্লাবই, এমন কি 'অনুশীলন সমিতি'ও ওঁর কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ ছাড়াও আর্থিক বা জিনিসপত্রের ব্যাপারেও সাহায্য পেত।

ফিরিঙ্গির মার খেয়ে তাঁরই ক্লাবের বাঙালী ছেলেরা একদিন মাঠ থেকে পালিয়ে এলে তিনি তাদের এই কাপুরুষতার জন্য প্রচুর ধিক্কার দিয়েছিলেন। ফলে এরপর তাঁর ছেলেরা বিলিতি ঘুষির পাল্টা দেশী কিলের কল্যাণে মাঠ থেকে মাথা উঁচু করেই ফিরেছে, বরং ফিরিঙ্গিরাই পালিয়েছে।

সরলা দেবী লক্ষ্য করলেন যে, দুর্গাপূজার অষ্টমীর আর একটি নাম 'বীরাষ্টমী' এবং সেদিন বীরাষ্টমী ব্রত পালন করা ও ব্রত-কথা শোনাবার বিধান। এ নামটি তাঁর খুবই মনে ধরল। তিনি ভাবলেন যে, বহু কাল ধরে বাঙালীর সংস্কারে যা রয়েছে কিন্তু বাঙালীর ব্যবহার থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, তারই পুনরুদ্ধার অনেক সহজ হবে এবং দেশের তৎকালীন অবস্থায় তা একান্ত কর্তব্যও বটে। ভীরু বাঙালী মায়েদের হাত দিয়েই ছেলের রাখীবন্ধন করিয়ে মায়ের নিজ মুখে 'বীরোভব' বলে ছেলেকে বীরোচিত খেলাধূলা ও কাজকর্মে প্রবৃত্তি দেওয়াতে হবে।

সেই থেকেই আধুনিক বীরাষ্টমী উৎসবের সূচনা হল। মহাষ্টমীর দিন ২৬নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের মাঠে ছেলেদের অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনী ঘোষণা করা হল। কলকাতার প্রায় সব ক্লাবই এতে যোগ দিল। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার

বিতরণ করা হল, কেউ পেল মুষ্টিযুদ্ধের দস্তানা, কেউ ছোরা, কেউ লাঠি, এবং প্রত্যেকেই একটি করে বীরাষ্টমী পদক—তার এক পিঠে লেখা 'বীরোভব' আর এক পিঠে 'দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ'। বীরাষ্টমী উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল একটি ফুলের মালায় সজ্জিত তলোয়ারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেশের পূর্ব পূর্ব বীরগণের বন্দনা স্তোত্র ও তাঁদের নাম উচ্চারণ করে তরবারীতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান।

এ ভাবেই বীরাষ্টমী উৎসব সারা বাঙলায় ছড়িয়ে পড়ল। বছরে বছরে এ দিনে মায়ের হাত থেকে রাখী নিয়ে ছেলেরা যথার্থ শারীরিক বলবীর্যের অনুষ্ঠানে মেতে উঠল। আর এখানেই হল বিপ্লবী বাঙলার গোড়া-পত্তন। ভয় জয় করার দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে উঠল বাঙলার যুবকগণ।

বাঙলার সেই উর্বর জমিতেই প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের দূত হয়ে এলেন যতীন বন্দোপাধ্যায় (স্বামী নিরালম্ব) ও বারীন ঘোষ এবং শেষটায় শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং। তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন ভগিনী নিবেদিতা। বাঙলার বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিগুলি চারদিকে ডালপালা প্রসারিত করে সুরু করে দিল কাজ।

সরলা দেবীর অবশ্য এই পরের অধ্যায়ের সঙ্গে আর তেমন যোগ ছিল না। ১৯০৫ সালে ৩১ বছর বয়সে পাঞ্জাবের আর্যসমাজী জাতীয়তাবাদী নেতা শ্রীরামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের পর তাঁর কর্মকেন্দ্র কলকাতা থেকে পাঞ্জাবে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। সেখানে ১৯০৫ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত—এই ১৮ বছর তিনি সাহিত্য সেবা, তাঁর স্বামীর জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিন্দুস্থান' পরিচালনা ও আরো নানাবিধ সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯২৩ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কলকাতায় ফিরে এসে আবার 'ভারতী' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁরই স্থাপিত 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' চালনারও দায়িত্ব নেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালে বিবেকানন্দের

আশীর্বাদ-ধন্যা সরলা দেবীর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। সরলা দেবী নিজেই লিখেছেন—"বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করলেন। বিবেকানন্দের কাজ চলতে থাকল। আমারও ভিতর বিবেকানন্দের কাজ চলতে থাকল। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পথে চলার আকাঙ্ক্ষা আমার জীবনে অলক্ষ্যে সুড়ঙ্গ কাটতে থাকল।"

(জীবনের ঝরাপাতা)

তাই তো একদিন সব ছেড়ে অধ্যাত্ম জীবনের দিকেই সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়েন তিনি। শেষটায় ১৯৪৫ সালে ৭১ বছর বয়সে এই মহাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সরলা দেবীর শেষ বয়সের আধ্যাত্মিক জীবন—যাকে তিনি 'গোত্রান্তর' বলেছেন—নিশ্চয়ই তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু পরাধীন জাতির ক্লীবত্ব ঘোচাতে গিয়ে দেশে সত্যিকারের বীর্যবান সাহসী মানুষ গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি যে একদিন 'বিলিতি ঘুষির' বদলে 'দেশী কিলের' আবাহন-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, ক্ষুদিরাম থেকে সুরু করে নেতাজীর 'ব্রিটিশ কো ইণ্ডিয়াসে মার ভাগা দেও' যে তারই সফল পরিণতি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সরলা দেবীর এ অবদান সত্যি অবিস্মরণীয়।

[লেখকের 'বিপ্লব ও বিপ্লবী' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।]

'In Ireland we have a saying which history has verified. England yields nothing without bombs. Every step forward, every reform has always been wrested from the Government, and paid for by a handful of men. But Ireland is proud of its heroes. Where are the heroes produced by your generation?'

– Sister Nivedita.

হাসি হাসি পরব ফাঁসি

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদসমূহ।

ওয়াইনী ষ্টেশন থেকে বন্দী ক্ষুদিরামকে মজঃফরপুর নিয়ে আসার বিবরণ :

"The Railway station was crowded to see the boy. A mere boy of 18 or 19 years old, who looked quite determined.

He came out of a first class compartment and walked all the way to phaeton, kept for him outside, like a cheerful boy who knows no anxiety · on taking his seat the boy lustily cried Bandemataram."

[The Statesman : 2-5-1908]

"মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞার পর ক্ষুদিরামকে সম্পূর্ণ অবিচলিত দেখিয়া এবং তাহার নির্বিকার ভাব লক্ষ্য করিয়া বিদেশী রাজার স্বজাতীয় বিচারকের মনে সম্ভবতঃ এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, আসামীর প্রতি যে চরমদণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই।

এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ফাঁসির হুকুমের পর জজ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার প্রতি যে দণ্ডের আদেশ হইল তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ?

ক্ষুদিরাম হাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল—'বুঝিয়াছি'।

[সঞ্জীবনী : ১৮ই জুন : ১৯০৮ সাল]

'মজঃফরপুর, ১১ই আগস্ট—অদ্য ভোর ছয় ঘটিকার সময় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদিরাম দৃঢ় পদক্ষেপে প্রফুল্ল চিত্তে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়। এমন কি যখন তাহার মাথার উপর টুপিটা টানিয়া দেওয়া হইল, তখনও সে হাসিতেছিল।'

(অমৃতবাজার পত্রিকা : ১২ই আগষ্ট : ১৯০৮ সাল)

'Khudiram Bose was exιcuted this morning. It is alleged that he mounted the scaffold with his body erect He was cheerfull and smiling.'

(The Empire 12 8-1908)

* সংবাদ সংকলন - [illegible]

বিশ্বাসঘাতক নন্দলাল হত্যা

রণেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[ক্ষুদিরামের সঙ্গী প্রফুল্ল চাকী আত্মবিসর্জন করলেন মোকামাঘাট স্টেশনে। কিন্তু বন্ধুত্বের মুখোশপরা সেই ছদ্মবেশী সাব্‌ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জীর কি হল? দীর্ঘদিন বাদে তার উত্তর মিলেছে আত্মোন্নতি সমিতির বিশ্বস্ত সদস্য রণেন গাঙ্গুলীর লেখনীর মাধ্যমে। ১৯৭৪ সালে তিনি দেহরক্ষা করেছেন রিষড়া সেবাসদন হাসপাতালে।]

মনে পড়ল আজ হইতে প্রায় ৬১ বৎসর পূর্বের কথা। হুবহু মনের পটে আসিয়া সকল কথা, সকল কাহিনী ভিড় করিতে লাগিল। ভূমিকায় সেই কথাই কিছুটা বলিয়া রাখিব কারণ, ইহার পর শুরু হইবে রোগাতুর দেহে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই মৃত্যু আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে

১৯০৮ সনের ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরে কুখ্যাত কিংসফোর্ডকে

হত্যার প্রচেষ্টায় ভ্রমবশতঃ ক্ষুদিরামবসু ও প্রফুল্ল চাকি কেনেডি সাহেবের পত্নী ও কন্যাকে বোমার আঘাতে হত্যা করিলেন। কিন্তু অতবড় ব্যর্থতার মধ্যে যে কতবড় সার্থকতা পরিব্যাপ্ত ছিল, তাহা সংগ্রামী ভারতবর্ষ জানিত, এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজও বুঝিয়াছিল। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লের জন্ম না লইলে নেতাজীর যে আবির্ভাব ঘটিতনা ইহা আজ ইতিহাসও স্বীকার করিতেছে।

ঘটনার পরদিনই পয়লা মে তারিখে মোকামা ঘাটে পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর ধূর্ত নন্দলাল বানার্জীর অতিরিক্ত উৎসাহে প্রফুল্লচাকি পুলিশ কর্তৃক ঘেরাও হইয়া নিজের আগ্নেয়াস্ত্রের বুলেটেই আত্ম-বিসর্জন করিলেন।

নন্দলাল আনন্দে ডগমগ। বিদেশী শাসকদের কৃপায় তাহার উপরি অর্থপ্রাপ্তি হইল, চাকুরিতেও প্রমোশন হইল।

কিন্তু বিপ্লবীদের শাসন-দণ্ডও তো অচল নয়। দুষ্কর্ম যে করিল, তাহাকে ন্যায্য শাস্তি বিপ্লবীরা তো দিবেনই। প্রফুল্লের আত্ম-বিলয়নের পর মাত্র ছ'মাস এবং দিনকয়েক বাঁচিয়াছিল ইংরাজের এই নন্দদুলাল।

আমার পরিচয় তখন ছিল বিপিনদাদের 'আত্মোন্নতি সমিতি' নামক গুপ্ত বিপ্লবী দলের একজন অখ্যাত অথচ বিশ্বস্ত কর্মীরূপে। কর্মের পরিকল্পনা ও দায়িত্বভার প্রথমটায় বহন করতে দেখেছিলাম আমাদের সমিতির হরিশ সিকদার মহাশয়কে। তিনিই আমাকে গোপন নির্দেশ দিয়েছিলেন নন্দলালের উপর নজর রাখতে, তাকে হত্যা করার প্রয়োজনে। আমি দিনের পর দিন নজর রাখি এবং যথাস্থানে সংবাদ দিতে থাকি।

এদিকে এও জানলাম যে, ঢাকার বিপ্লবী মুক্তি সংঘের (পরবর্তী কালে বি. ভি.) নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আত্মোন্নতি সমিতির সঙ্গে বৈপ্লবিক সংযোগ রাখছেন। ক্রমশ আমাকে জানানো হল যে, ঐ সংস্থার শ্রীশচন্দ্র পাল ও আমি একসঙ্গে যাব নন্দলালকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে।

এল ৯ই নভেম্বর। আমাদের প্রাপ্ত সংবাদ মত নন্দলালকে পাওয়া গেল সার্পেণ্টাইন লেনে। সশস্ত্র শ্রীশ পালের সঙ্গে আমিও নন্দলালকে অনুসরণ করছি। বর্তমান সেণ্ট জেমস স্কোয়ারের পাশে সুবিধামত অবস্থায় শ্রীশ পাল সর্বপ্রথম নন্দলালকে গুলি করলেন।

নন্দলালের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল। তখন সন্ধ্যা সাতটা। দেশদ্রোহী নন্দলাল মরে গিয়েও যাতে আবার বেঁচে না ওঠে, এই আশঙ্কায় আমিও ছুটে গিয়ে আমার রিভলবার দিয়ে ওর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করলাম। কাজ সমাপ্ত হতেই আমরা রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। শ্রীশ পাল বা আমার এ কাহিনী পুলিশ তো দূরের কথা, দলের কর্মীরাও জানতে পারেননি!

বস্তুত নন্দলাল হত্যার ঘটনাটি এতই গোপনে ঘটিয়াছিল এবং শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষের 'মুক্তি সংঘ' এবং আমাদের 'আত্মোন্নতি সমিতি'র পারস্পরিক Political understanding তৎকালে এতই চমৎকার ছিল যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইংরাজ চলিয়া যাইবার দিন পর্যন্ত জানিতে পারে নাই যে, উহা কাহাদের বা কোন ব্যক্তি বিশেষের কাজ। এই গোপনীয়তা হেমবাবুর দল শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ১৯৩০ সাল হইতে প্রচণ্ড আঘাতের পর আঘাত করিয়া তাঁহারা ব্রিটিশ শাসনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। সূর্য সেনের অসাধারণ নেতৃত্বে ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে যে বিপ্লব রচিত হইয়াছিল, তাহার পশ্চাতেও ছিল নিয়মানুগ এই মন্ত্রগুপ্তির মাধ্যমে নিখুঁত প্রস্তুতি।"

রিষড়া সেবাসদন স্বাঃ রণেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১০.১১.৭০

[শৈলেশ দের 'রক্তের অক্ষরে' পুস্তক থেকে সংগৃহীত। মহাজাতি সদনের অছি পরিষদ কর্তৃক গৃহীত টেপরেকর্ডেও তাঁর এই বক্তব্য রয়েছে।

আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী

মতিলাল রায়

[শ্রীঅরবিন্দ ও বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারীর বিশ্বস্ত সহকর্মী। বিশেষ করে তাদের আত্মগোপনের ব্যাপারে প্রবর্তক সংঘ গুরু মতিলাল রায়ের ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। আলিপুর জেলে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার অপরাধে কানাইলাল দত্ত ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দেন ১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর। বর্ত্তমান নিবন্ধে সেদিনের ইতিহাস তিনি ব্যক্ত করেছেন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে।]

জেলের ফটকের দিকে আমাদের গাড়ীখানি অগ্রসর হইতেই, সমবেত জনমণ্ডলী বুঝিয়া লইল—আমরাই কানাইলালের আত্মীয়, চন্দননগর হইতে আসিতেছি। বিশাল সমুদ্রের উত্তাল জনতরঙ্গ আমাদের পথ করিয়া দিল। জলদ-গর্জ্জন ধ্বনি উঠিল—"বন্দেমাতরম্"।

চতুর্দ্দিকে পুলিস-প্রহরী মোতায়েন ছিল। শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কায় রেগুলেশন লাঠি লইয়া শান্তিরক্ষকের দল এবং ফোর্ট উইলিয়াম হইতে একদল সশস্ত্র বৃটিশ সৈনিক ঘটনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। আমরা ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত তদানীন্তন পুলিস কমিশনার হ্যালিডে সাহেব, আলিপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অন্যান্য পুলিস কর্ত্তৃপক্ষগণ রুক্ষভাষায় আমাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। হ্যালিডে সাহেব এক বাঙ্গালী গোয়েন্দা পুলিসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাঃ আশুতোষ দত্ত কোন্ ব্যক্তি?" আশুবাবুর পরিচয় তিনি সহজেই পাইলেন।

তারপর আশুবাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাদের সহিত সম্বন্ধ কি?" আশুবাবু আমাদের সকলকেই নিকটাত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিলে, আমাদের জেল-ফটকের ভিতর প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে, হ্যালিডে সাহেব উদ্ধত কণ্ঠে বলিলেন—"আমরা মাত্র দুইজনকে জেলের ভিতর প্রবেশ করিতে দিব। আপনারা কে-কে জেলের ভিতর প্রবেশ করিবেন?"

আশুবাবু আমাকে লইয়া জেলের অন্তঃপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। ওয়ার্ডারদের সঙ্কেতে আমরা এক সেলের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কি দেখিলাম? অপ্রশস্ত কক্ষে মেঝের উপর আপাদ-মস্তক কম্বলে মোড়া কানাইলালের মৃতদেহ রক্ষা করা হইয়াছে। আশুবাবু অশ্রু সংবরণে অসমর্থ হইলেন। আমার চক্ষে অশ্রু নির্গত হইল না। জ্বালাময় অগ্নিশিখায় নয়ন দুটি জ্বলিয়া উঠিল। ইতস্ততঃ চাহিতেই দেখিলাম—কয়েক জন দেশীয় ওয়ার্ডারের সঙ্গে একজন শ্বেতাঙ্গ ওয়ার্ডার। এই ব্যক্তি কানাইলালের সেলে পাহারা দিত। ফাঁসির হুকুম হওয়ার পর কানাইলালকে উৎফুল্ল দেখিয়া এবং তাহার দিন-দিন ওজন বৃদ্ধি হওয়ায় এই আইরিশ ওয়ার্ডারই কানাইলালকে বলিয়াছিল—"ফাঁসী কাষ্ঠে আরোহণ করার কালে তোমার এই স্ফূর্তি কি আকার গ্রহণ করিবে, তাহা দেখিব।"

দেখিলাম সেই আইরিশ ওয়ার্ডারের চক্ষে জল ঝরিতেছে। আশুবাবুর করমর্দ্দন করিয়া সে বলিল, "মিঃ দত্ত, আপনি কাঁদিবেন না। আপনার ভাই একজন খাঁটি বীর এবং এত বড় নির্ভীক দেশপ্রেমিক আয়ার্ল্যাণ্ডেও অধিক মিলিবে না।"

এই আইরিশ ওয়ার্ডার চক্ষের জল মুছিতে-মুছিতে আমাদের কানাইলালের অন্তিম কাহিনী বর্ণনা করিল। তাহারই মুখে শুনিলাম—"নরেন গোঁসাইয়ের হত্যার পর কানাইলালের ১০৫° ডিগ্রী জ্বর উঠিয়াছিল। তারপর জ্বরের বিরাম হইলে, তাঁহাকে ডাক্তার কুইনাইন দিতে চাহিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। সেই ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি সিংহের মত সর্বদাই পদচারণা করিতেন। আর তাঁহার

মৃত্যুর পর আমরা ইচ্ছামত তাহার শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাইব—ইহাতে আপত্তি করা সঙ্গত নহে।"

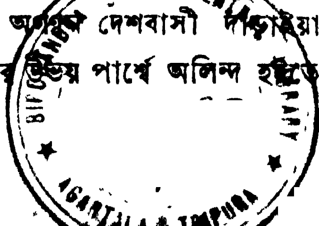
সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার বাড়ী কোথায়?" আমি বলিলাম "চন্দননগর"।

তিনি রূঢ় ভাষায় বলিলেন "ইহা চন্দননগর নহে, আলিপুর মনে রাখিবেন। আমার আদেশ অমান্য করিলে, এইখানেই শবদেহ রাখিয়া আপনাকে বন্দী হইতে হইবে।"

যৌবনের শোণিতপ্রবাহ উজানে বহিল। কি বলিতে যাইতেছিলাম—আশুবাবু অনুরোধ জানাইলেন "বিবাদে প্রয়োজন নাই—সাহেব যাহা বলিতেছেন, তাহাই পালন করুন।"

অবস্থা বুঝিয়া নীরব রহিলাম। কানাইলালের উল্লসিত মুখমণ্ডলে বস্ত্রাবরণ দিয়া জেলের পশ্চাৎপথে পা বাড়াইতে হইল। কিছুদূর গিয়া দেখি—সারি-সারি পায়খানার বিষ্ঠাহ্রদ সৃষ্ট হইয়াছে। ইংরেজের অনুগ্রহ স্মরণে নাকে কাপড় দিয়া—বামে আদিগঙ্গা, দক্ষিণে পায়খানা-শ্রেণী রাখিয়া, অতি অপ্রশস্ত পথ দিয়া আমরা জেলের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিশাল জনসমুদ্র সদর-ফটক দিয়া শবদেহ লইয়া যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা শুনিয়া, জেলের পশ্চাৎ প্রশস্ত রাজপথে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা জেল সীমা অতিক্রম করিতেই তুমুল ধ্বনি উঠিল "বন্দেমাতরম্"। লক্ষ-লক্ষ লোকের শোভাযাত্রা। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য যাঁহারা সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সেই স্মৃতি কোন দিন মন হইতে মুছিতে পারিবেন না। কয়েকজন ইংরাজ পুলিস শবযাত্রার অনুগমন করিতেছিলেন। জনগণের উৎসাহ-দর্শনে সম্ভবতঃ তাঁহাদের মধ্যে একজন আত্মবিস্মৃত হইয়াই বলিলেন "শবের মুখ হইতে বস্ত্রাবরণ দূর করিয়া দিন।"

আমি তাহাই করিলাম। চতুর্দ্দিক্ হইতে পুষ্পমাল্য ও পুষ্পগুচ্ছ শবাধারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তরুণের দল আসিয়া শবাধার বহন করিতে চাহিল। পথের দুই ধারে অগণিত দেশবাসী দাঁড়াইয়া জয়-রবে দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত করিল। পথের উভয় পার্শ্বে অলিন্দ হইতে



কুলকামিনীগণ উলুধ্বনির সঙ্গে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। বিপুল উত্তেজনার মধ্যে আমরা কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইলাম। এমন জনসমাগম জীবনে লক্ষ্য করি নাই। জাতীয়তাবোধে উন্মত্ত আবালবৃদ্ধ-বনিতা কানাইলালের চরণ-স্পর্শের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায়, আমরা শ্রেণীবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক দাঁড় করাইয়া প্রশস্ত পথ রচনা করিলাম। গীতা উপহার কানাইলালের শবদেহ আচ্ছন্ন করিল। পুষ্পমাল্যের স্তূপ-রচনা হইল। কানাইলালের চরণ চুম্বন করিয়া কত নারীপুরুষ যে এমন বীর পুত্রের পিতামাতা হওয়ার সৌভাগ্য-কামনা উচ্চারণ করিল তাহা বর্ণনা করার নহে।

আমরা শবদেহ শ্মশানে আনিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিলাম। কাহারা যে প্রশস্ত চুল্লী কাটিল, ভারে-ভারে চন্দনকাষ্ঠ আনিল—তাহার সন্ধান কে রাখে! শবদেহ চিতার উপর রক্ষা করিয়া জনগণের অনুরোধে সেই দিন আমায় শহীদ কানাইলালের জীবনবৃত্তান্ত উদাত্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতে হয়। একখানি উন্নত টুলের উপর দাঁড়াইয়া সেই দিন দেখিয়াছি—অসংখ্য নরনারী স্বাধীনতার অগ্রপুরোহিত কানাইলালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। আমার কণ্ঠে এত অগ্নি ছিল, এত ভাষা ছিল—সেইদিন তাহার প্রমাণ পাইলাম! লক্ষ-লক্ষ নরনারী নীরবে আমার কণ্ঠধ্বনি শুনিল। তারপর উচ্চারণ করিল তুমুল রবে "বন্দেমাতরম্"।

কানাইলালের চিতা জ্বলিল। চন্দনকাষ্ঠ ভারে-ভারে আসিয়া চুল্লীকে নিভিতে দিল না। হেমন্তের মধ্যাহ্ন মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল। অপরাহ্ন আসিয়া দেখা দিল। কানাইলালের চুল্লী নিভিতে চাহে না, ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। মাঝে-মাঝে হরিধ্বনির সহিত কণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" শব্দ উঠিতেছে। লক্ষ-লক্ষ নরনারী নীরবে প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সূর্য্য অস্তগামী হয়—আশুবাবু বিদায় প্রার্থনা জানাইলেন। চুল্লী নিভিল, কিন্তু কানাইলালের অস্থি খুঁজিয়া পাইলাম না। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র হাড়ের টুকুরা খুঁজিয়া বাহির করিতে সমবেত জনতা প্রবৃত্ত হইল। আমরা

কানাইলালের চিতাভস্ম আদি-গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া কানাইলালের শেষকৃত্য সমাপ্ত করিলাম।

[সংঘ কর্তৃপক্ষের সহৃদয় অনুমতি ক্রমে লেখকের 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। উল্লেখযোগ্য যে, একই কারণে ক্ষুদিরামের গুরু মেদিনীপুরের সত্যেন বসুর ফাঁসি হয়েছিল ঐ সালেরই ২১শে নভেম্বর তারিখে।]

ভবিষ্যদ্‌ বাণী

"আপনারা মনে করবেন না যে, এই আদালতেই আজকের এই মামলা শেষ হয়ে যাবে। মানব ইতিহাসের বিরাট বিচারালয়েও এই মামলার শুনানী চলবে চিরকাল। একদিন যখন এই আদালতের সমস্ত বিচার বিতর্ক শেষ হয়ে যাবে, যখন আজকের এই আন্দোলন ও উত্তেজনার চিহ্ন মাত্রও থাকবেনা,—আজ যিনি আসামী হয়ে আদালতের সামনে দাড়িয়েছেন, তিনিও এই পৃথিবী থেকে চলে যাবেন, সেদিন কিন্তু সেই অনাগত যুগের মানুষ আজকের এই আসামী অরবিন্দকেই স্মরণ রাখবে দেশপ্রেমের কবি বলে, জাতীয়তাবাদের ঋষি বলে। মানবতার উপাসক বলে সমগ্র পৃথিবী তাঁকেই দেবে পুষ্পাঞ্জলী। আজ যে বাণী প্রচারের জন্য তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন, সেদিন সেই বাণীর তরঙ্গ দেশ-দেশান্তরে মানুষের অন্তরে মহাভাবের প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলবে।"

* আলিপুর বোমার মামলার প্রধান আসামী শ্রীঅরবিন্দর পক্ষ সমর্থনকারী দেশবন্ধুর ঐতিহাসিক উক্তি।

আশ্চর্য মানুষ উল্লাসকর

মনোরঞ্জন ঘোষ

[রিভোল্ট গ্রুপের দক্ষিণ কলকাতা শাখার সদস্য। মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ যতীনদাসের দলভুক্ত। বর্তমানে সাহিত্যিক হিসাবে সুপরিচিত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম, পরিবর্তন ও চট্টগ্রাম বিপ্লব।]

১৭ই মে ১৯৬৫ খৃঃ শেষ নিশ্বাস ফেললেন শিলচরে উল্লাসকর দত্ত। তিনি 'অজস্র মৃত্যুরে পার হয়ে আসা' এক আশ্চর্য মানুষ। অদ্ভুত তাঁর জীবন, অদ্ভুত তাঁর কাজকর্ম, অদ্ভুত তাঁর কথাবার্তা।

তিনি ল্যাবরেটরিতে বারুদের আগুনে দগ্ধ হয়েছেন, ডিগরি পাহাড়ে বোমা বিস্ফোরণে মুমূর্ষু হয়েছেন, আলিপুর কোর্ট থেকে মৃত্যুদণ্ড পেয়েছেন, হাইকোর্ট থেকে দ্বীপান্তরের দণ্ড, আন্দামানের সেলুলার জেলের অত্যাচারে তাঁর সদা-উল্লসিত মনের মৃত্যু হয়েছে, ফাঁসির দড়ি এড়িয়ে প্রেমের ফাঁসে মরণ হয়েছে। দীর্ঘ জীবন বেঁচে থেকেও মৃত মানুষের মতই ছিলেন। দেশপ্রেমে পাগল, পত্নীপ্রেমে পাগল, অত্যাচারে পাগল, দুর্বার প্রাণশক্তিতে পাগল। প্রলয়-নাচন নাচা পাগলা ভোলার চেলা তিনি।

'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন' উল্লাসকরের মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে হাস্য-পরিহাস রঙ্গরসিকতার কাহিনী সর্বজন-বিদিত। মৃত্যুকে বন্ধুর মত হেসে তিনি বরাবর অভ্যর্থনা করেছেন।

আলিপুর বোমার মামলার রায় বেরোবার দিন। সারা দেশ নিশ্বাসরুদ্ধ করে প্রতীক্ষা করছে। বিপ্লবীদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের রাতের ঘুম ঘুচে গেছে। কী আছে বন্দীদের বরাতে?

কারাবাস? দ্বীপান্তর? ফাঁসি? যাদের ভাগ্য সম্বন্ধে সকলের এই অধীর আগ্রহ, তাঁরা কিন্তু নিশ্চিন্ত নির্বিকার। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উল্লাসকর সেদিন আর এক বিচার শুরু করেন এক সহবন্দীর সঙ্গে—কোর্ট ইন্সপেক্টরের ভুঁড়িটা কত ফুট কত ইঞ্চি তারই চুলচেরা বিচার। নিজের সম্বন্ধে জজের রায়ের চিন্তা না করে তিনি পুলিসের পেটের পরিধি সম্বন্ধে রায় দেন।

মামলার রায় বের হয়। আইনের বিভিন্ন ধারার অপরাধ অনুসারে উল্লাসকরের সাত বছর কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ড।

বিচারকের হুকুম শুনে উল্লাসকর হো হো করে হেসে উঠে সরকার পক্ষের ব্যারিস্টার নর্টনকে বললেন, সাত বছরের জেল ফাঁকি দিলাম। নথিপত্তর ঘেঁটে অনেক আইনের ধারায় আমায় বাঁধার চেষ্টায় ছিলে। সব পরিশ্রম পণ্ড হল। দুর্গা বলে ঝুলে পড়লে আর জেলে পুরবে কাকে?

এমনি পরিহাসপ্রিয় ছিলেন উল্লাসকর।

মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস আপীল করেন হাইকোর্টে। আপীলের রায় যেদিন বের হয়, সেদিন উল্লাসকর আদালত মুখরিত করে তোলেন গানে—'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।' হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে গান গাওয়া যে রীতিমত ঔদ্ধত্য, আদালত অবমাননার অপরাধ—একথা কারও মনে আসে না। মাতৃভূমির বন্দনা সঙ্গীতরত নির্বাসনযাত্রী বিপ্লবী বীর গায়ককে নীরব করতে কারও প্রাণ চায় না। উল্লাসকরের উদাত্ত কণ্ঠের প্রাণঢালা সঙ্গীত সেদিন ইংরাজ জজ-ব্যারিস্টাররা শ্রদ্ধাভরে শ্রবণ করেন। সে গান শুনে কবি ব্যারিষ্টার দেশবন্ধুর চোখে অশ্রুধারা বয়ে যায়।

জীবনের চরম মুহূর্তে উল্লাসকরের উল্লাসভরা কণ্ঠ হতে নির্ঝরিত স্রোতে জীবনের সর্বোত্তম বাণী ঝরে পড়ত। বিধাতা তাঁর রক্তে রুদ্রবীণ বাজাতেন।

মৃত্যুর সঙ্গে করমর্দন করা মানুষ যেদিন মৃত্যুকে আলিঙ্গন

করলেন সেদিনও শয্যাপার্শ্বের শোকাচ্ছন্ন শুভানুধ্যায়ীদের শান্তকণ্ঠে বলেন, তোমরা ভীড় করছ কেন? আমার কী হয়েছে? আমাকে ঘুমোতে দাও।

রণক্লান্ত বিদ্রোহীর কাছে মৃত্যু মানে বিশ্রাম

শিবপুর থেকে শিলচর...বিপ্লবী জীবনের শুরু ও শেষ। এই প্রাণ-উচ্ছল পাগল প্রেমিক পুরুষ বহু দীর্ঘ পথ পরিক্রম করেছেন। তাঁর প্রতি পদক্ষেপ আশ্চর্যকর, অদ্ভুত। এ যুগের রূপকথার রোমান্টিক নায়ক তিনি—অত্যাচারী দৈত্যের সঙ্গে আধুনিক অস্ত্র নিয়ে লড়াই করেছেন, পাষাণ-পুরীতে বন্দী হয়ে দিন কাটিয়েছেন, যৌবন-স্বপ্নের রাজকন্যাকে বৈধব্যের বন্দীত্ব হতে উদ্ধার করে বিবাহ করেছেন, পঙ্গু প্রিয়াকে নবজীবনের সঞ্জীবনী সিঞ্চনের আপ্রাণ প্রয়াস করেছেন, রাজ্যহারা রাজকুমারের মত দূরদেশের বিজন কুটিরে চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়েছেন।

উল্লাসকর দত্ত যৌবনে শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের কাছে বাস করতেন। পিতা দ্বিজদাস দত্ত ছিলেন শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক। উল্লাসকর পড়তেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও বিপ্লবী উল্লাসকরের ছাত্রজীবনে একই ধরনের একটি ঘটনা ঘটে। সুভাষচন্দ্র ঐই কলেজ থেকে বিতাড়িত হন প্রফেসর ওটেনকে প্রহারের অভিযোগে। উল্লাসকরও বিতাড়িত হন ঐ ধরনের অপরাধে।

বঙ্গভঙ্গের ফলে তখন দেশে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। সেই সময় ইংরাজ অধ্যাপক র‍্যাটল বাঙালী ছাত্রদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেন। উল্লাসকর গুরু-মারা শিষ্য হন। কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে র‍্যাটলকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে উত্তম আচরণের শিক্ষা দেন। তারপর বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে উত্তেজিত ছাত্রদলের সঙ্গে কলেজ ত্যাগ করেন। সরকারী গোলাম তৈয়ারির কারখানায় উল্লাসকর আর ফিরে যান না। এরপর

প্রেসিডেন্সী কলেজের গায়ে এক বড় পোস্টার দেখা গেল—'হাউস টু-লেট। অ্যাপ্লাই টু লর্ড কার্জন।'

মনে হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ ভাড়া দেবার বিজ্ঞপ্তি পরিহাসপ্রিয় উল্লাসকরেরই কাণ্ড।

তারপর বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে এসে তিনি শিবপুরের বাড়িতে গোপনে এক ল্যাবরেটরি করে বোমা নির্মাণ শুরু করেন। বিস্ফোরক সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। নাইট্রো-গ্লিসারিন ও ফ্যালমিনেট অব মার্কারী তাঁর পরীক্ষাগারে করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জেলিগনাইট ও পিক্রিক অ্যাসিডের বোমা করে সহযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তাঁরই নির্মিত বোমা চন্দননগরের মেয়র তার্দিভেলের গৃহে নিক্ষিপ্ত হয়। নারায়ণগড়ে ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেন ওড়াবার জন্য তাঁর প্রস্তুত মাইন ব্যবহৃত হয়। তিনি এমন শক্তিশালী পারকাসন পাউডার প্রস্তুত করেছিলেন যে, বাতাসের সামান্য সংঘর্ষে (ফ্রিকসানে) বিস্ফোরণ হত, ফুঁ দিলে জ্বলে উঠত। যশিডির ডিগরি পাহাড়ে তাঁরই বানানো বোমা পরীক্ষাকালে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। উল্লাসকর নিজেও মারাত্মক আহত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে গোপনে যশিডি থেকে কলকাতায় এনে ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের দ্বারা চিকিৎসা করানো হয়। মৃত্যুমুখ থেকে তিনি সেবারে ফিরে আসেন।

বিপ্লবীরা প্রস্তাব করেন হেমচন্দ্র দাসের মত বিস্ফোরক প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষার জন্য তাঁকেও বিদেশে পাঠানো হোক। তাঁর সহজাত প্রতিভা উপযুক্ত শিক্ষা পেলে অত্যাশ্চর্য কিছু আবিষ্কার করবে। কিন্তু উল্লাসকর বিদেশে যেতে আপত্তি জানান। তিনি বললেন যে, দেশে থেকে নিজেকে আরও প্রস্তুত করে নিতে চান। প্রকৃত বিপ্লবী হতে হলে মৃত্যুভয় জয় করতে হবে এবং সাধন-ভজন না করলে দেহের নশ্বরতা ও আত্মার অবিনশ্বরতা উপলব্ধি করা যায়

না। মৃত্যুজয়ী সাধনায় সফলতা অর্জনের পর উপযুক্ত হয়ে তিনি বিদেশে যাবেন।

বিপ্লবীদলের কয়েকজনের ধারণা হয়েছিল যে, দেশপ্রেম ও নারীপ্রেমের দোটানায় পড়েই উল্লাসকর বিদেশ যেতে দ্বিধা করছেন। সেই সময় বিপিন পালের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ আসন্ন। অভিভাবকরা এই বিবাহ স্থির করেছেন এবং পাত্র-পাত্রী পরস্পরের পরিচিত। উল্লাসকর ও লীলাদেবীর মধ্যে তখন পূর্বরাগের পালা চলছে। যুবক উল্লাসকরের সামনে হয়তো সেদিন এসেছিল এক মহা সমস্যা—জীবনের পথ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে দুদিকে চলে গেছে। কোন্ পথে তিনি যাবেন? একদিকে হত্যা—বোমা—বিপ্লব—মৃত্যু। অন্যদিকে সংসার—সঙ্গিনী—সঙ্গীত—শান্তি। ঘর ছাড়বেন, না ঘর বাঁধবেন? দেশপ্রেম, না পত্নীপ্রেম?

আর এক ভাবুক শিল্পী বিবাহিত বিপ্লবী হেমচন্দ্র বোধহয় এই ভাবপ্রবণ প্রেমিক উল্লাসকরের মানসিক দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। উল্লাসকরের প্রতি সহানুভূতি ভরা মনে তিনি বলেছিলেন, 'এমন সরল স্বভাবের যুবককে বিপ্লবীদলে গ্রহণ করা নিষ্ঠুরতার কাজ হয়েছে।'

সাধন-ভজন করার কথা উল্লাসকর যা বলেছিলেন, জীবনে তিনি তা সত্যিই করেছিলেন। ব্রাহ্ম হয়েও বোমার বাগানে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি মূর্তিপূজা ও গৈরিক ধারণ করেছিলেন। নিরামিষ ভোজন করতেন। নিজেকে সর্বতোভাবে বৈপ্লবিক কর্মের উপযুক্ত করেছিলেন।

মুরারীপুকুরের কেন্দ্রে পুলিস যখন হানা দেয়, সকলকে গ্রেপ্তার শুরু করে, তখন উল্লাসকর অনেকগুলি বোমা নিয়ে হ্যারিসন রোডে 'স্বাস্থ্য সহায় ঔষধালয়ে' কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে রেখে আসেন

পুলিস উল্লাসকরের কার্যকলাপ অবগত হয়। তিনি নির্বাসনদণ্ড লাভ করলেন। তখনকার বিপ্লবীরা রাজবন্দীর মর্যাদা পেতেন না। সাধারণ খুনী-ডাকাতের মতই তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করা হত।

আন্দামানে তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। দৈহিক নির্যাতনের ফলে তাঁর মস্তিস্ক-বিকৃতি ঘটে।

নির্বাসনের মেয়াদ শেষে অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁকেও দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। অন্য বিপ্লবীদের মুক্তি দিলেও গভর্নমেন্ট তাঁকে সহজে ছাড়তে চায় না। সেই সাত বছর জেল খাটাবার চেষ্টা করে। শেষে স্যার সুরেন্দ্রনাথের প্রয়াসে উল্লাসকর মুক্তি পান। কিছুকাল কুমিল্লায় অন্তরীণ থাকেন।

ইতিমধ্যে তাঁর মনোনীত পাত্রী পাঞ্জাবের এক যুবককে বিবাহ করে ঘর-সংসার পেতেছিলেন। উল্লাসকর যখন দেশে ফিরলেন, তখন লীলাদেবী বিধবা। উল্লাসকর কিন্তু ভুলতে পারেননি তাঁর প্রথম যৌবনের প্রিয়াকে, ভুলতে পারেন নি তাঁরা একদিন পরস্পরকে ভালবেসেছিলেন, ভুলতে পারেন নি তাঁর নির্বাসনের কথা শুনে লীলা জলে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। যদিও তারপর বহু জল গঙ্গায় বয়ে গেছে। ধাবমান কাল উল্লাসকরকেও জালে জড়িয়ে পরিবর্তনের স্রোতে ভাসিয়ে দিলেও তিনি মনে মনে নিশ্চয় বলেছিলেন,···'আমার প্রেম, তারে আমি রাখিয়া এলেম অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশ্যে···'

তাই তিনি সেই মানসীকে আবার বিবাহের প্রস্তাব করেন। কিন্তু পরাধীন দেশে প্রেম চির-অভিশপ্ত। দুজনের মধ্যে সেদিন ব্যবধান রচেছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবার বাধা হল সামাজিক প্রথা। সেদিন ছিল দ্বীপান্তর, এবার বৈধব্য। উন্মাদ উল্লাসকর। ব্যর্থপ্রেমিক উল্লাসকর।

দ্বীপান্তর থেকে দেশে এসে উল্লাসকর নতুন করে ঘর বাঁধতে পারলেন না। এদিকে যাঁর জন্য ঘর ছেড়েছিলেন, তাঁকেও পাশে পান না, অরবিন্দ চলে গেছেন পণ্ডিচেরীতে।

উল্লাসকর অরবিন্দকে আবার সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার জন্য কলকাতা থেকে পণ্ডিচেরী সোজা সাইকেলে চলে যান। আশ্রমে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের যে সব বিধি-নিষেধ

আছে তা মানেন না। সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বলেন, অরবিন্দ এখানে বসে থাকবেন কেন?

সব কিছু এড়িয়ে সটান অরবিন্দের সামনে হাজির হন। তারপরই এক আশ্চর্য আচরণ। যে লোক যুক্তি-তর্কের জালে জড়িয়ে অরবিন্দকে আবার বাংলায় টেনে আনবেন মনস্থ করে গেছেন, তিনি অরবিন্দের মুখোমুখি হয়ে কোন কথা না বলে ফিরে চলে এলেন।

উল্লাসকর এবার হলেন, না ঘরের, না পরের। সংসারে নয়, সংগ্রামেও নয়। ছন্নছাড়া ঝঞ্ঝাহত বজ্রদগ্ধ তালবৃক্ষের মত। উল্লাসকর তাই উন্মাদ না হয়ে আর কি হবেন?

অত্যন্ত দুঃখের জীবন শুরু হয় উল্লাসকরের। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সিঁড়ির নীচে মাথা গোঁজার একটু স্থান পান। আহার কখনো জোটে, কখনো জোটে না। মড়ার খাটিয়ায় শুয়ে রাত কাটান, টিনের কৌটায় জল খান। চঞ্চল ঝর্ণাধারার মত উচ্ছল জীবনস্রোত মরুতে প্রাণ হারায়।

তাঁর 'জীবন যখন শুকায়ে যায়', তখন ভাগ্যবিধাতা সামান্য করুণাধারা ঢাললেন অমঙ্গলের মধ্য দিয়ে। লীলাদেবী বাতব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। উল্লাসকর তাঁকে সেবা করার সুযোগ পান। দুটি নিঃসহায়, নিঃসম্বল, নিঃসঙ্গ নরনারী বহুদিন পরে পরস্পরের কাছাকাছি আবার আসেন। যৌবনে যাঁদের মিলন হয়নি, প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে প্রজাপতি তাঁদের মেলালেন। বাসনা-কামনা-মোহ-রূপ সব যেদিন নিঃশেষিত হয়েছে, সেদিন হল দুটি আত্মার মিলন। ব্রাহ্মসমাজে উল্লাসকর-লীলাদেবীর বিবাহ হয়। উল্লাসকরের কাছে বিবাহ মানে সেবা। যে ভাবে তিনি অসুস্থ স্ত্রীর সেবা করেন, তা বিস্ময়কর। কাব্য-উপন্যাসের কল্পজগতে প্রেমিকার জন্য প্রেমিকের যে ত্যাগ-দুঃখবরণের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাকে বাস্তব-জীবনে উল্লাসকর হার মানালেন। যেখানে যা কিছু সামান্য সাহায্য বা সামগ্রী—এমন কি দু-একটি ফলমূল—পেলেই রুগ্না

স্ত্রীকে দিয়ে আসতেন। এর জন্য কত দিন যে তাঁকে পায়ে হেঁটে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ব্রাহ্মসমাজ থেকে ভবানীপুরের হাসপাতালে যেতে হয়েছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। অনেকে এটা পাগলের কাণ্ড বলে উপহাস করেছে। কিন্তু এত নিছক পাগলামি নয়, এ যে 'নিকষিত হেম' প্রেম।

হাসপাতাল লীলাদেবীর আরোগ্যের আশা না দেখে ডিসচার্জ করে দেয়। পঙ্গু স্ত্রীকে নিয়ে উল্লাসকর অকূল সংসার-সমুদ্রে ভাসলেন। এতদিন একা ব্রাহ্মসমাজে কোন রকমে দিন কাটাতেন, কিন্তু দুজনের স্থান সেখানে হয় না। উপাসনার স্থানে সংসার পাতা চলে না।

স্রোতের শেওলার মত এখানে-ওখানে ভেসে বেড়িয়ে কোথাও স্থায়ী ভাবে স্থান না পেয়ে শেষে শ্রীহট্টে দেশে চলে যান।

কয়েকজন বন্ধু চেষ্টা করেন যাতে তিনি সরকারী সাহায্য পান। কিন্তু উল্লাসকর জীবন্মৃত হলেও সম্পূর্ণ মৃত নন। স্বাধীনচেতা তিনি সরকারী সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কুসুমের মত মৃদু মানুষ বজ্রের মত কঠোর হয়ে বলেন, 'এমন কি আমার স্ত্রী সাহায্য গ্রহণ করলে তাকে ডিভোর্স করব।'

শেষে উল্লাসকরের অজ্ঞাতে, বারীন্দ্র ও ডাঃ নলিনাক্ষকুমার রায়চৌধুরী সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। বারীন্দ্র সই করে অর্থ আগমনের উৎস গোপন করে তাঁকে টাকা দিতেন।

স্ত্রীর পরলোক-গমনের পরেও উল্লাসকর বিশ্বাস করেন না যে স্ত্রীর-মৃত্যু হয়েছে। ভাবেন সে অন্যত্র কোথাও গেছে, আবার ফিরে আসবে। ঘরের দরজা কখনো বন্ধ করতেন না, পাছে স্ত্রী ফিরে আসতে বাধা পায়। রোজই খাবারের ভাগ স্ত্রীর জন্য রেখে দিতেন।

আমরা জানি না উল্লাসকরের এই কাজ মোহ, না প্রেম। জানি না, তিনি দেশকে বেশী ভালবেসেছিলেন, না স্ত্রীকে বেশী ভালবেসেছিলেন। আমরা জানি, শত্রুকে ঘৃণা না করলে সৈনিক হওয়া যায় না, আর মানুষকে ভাল না বাসলে বিপ্লবী হওয়া যায় না।

বুকভরা ভালবাসা নিয়েই উল্লাসকর বিপ্লবের পথে এসেছিলেন। তাই তিনি আদর্শ বিপ্লবী।

তীক্ষ্ণ মেধা, দুরন্ত সাহস, নিবিড় প্রেম, গভীর রসজ্ঞান এই সবের অপূর্ব মিলন হয়েছিল ভাঙা বাংলার রাঙা যুগের এই বিপ্লবীর মাঝে।

অগ্নিযুগের এক আশ্চর্য মানুষ হচ্ছেন উল্লাসকর দত্ত।

মহানায়ক

—সাগ্নিক

[লেখক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। এমন কি কোন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাও তিনি প্রকাশ করতে রাজী নন। তাই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী 'সাগ্নিক' নামেই লেখাটি প্রকাশ করা হল বর্তমান গ্রন্থে।]

তাঁকে ধরতেই হবে!

কেন? কী তাঁর অপরাধ?

সে বড় সাংঘাতিক। লোকটি রাজদ্রোহী। তাঁর অপরাধ যে তিনি দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করতে চান। মহামান্য বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে তিনি দিল্লীর রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে অগণিত জনসাধারণের সামনে বোমা মেরে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। লাটসাহেবের হাতির মাহুত মারা যায়, কিন্তু তিনি প্রাণে বেঁচে যান।

বঙ্গভঙ্গের ফলে প্রবল গণপ্রতিরোধ দেখেও বাংলার বিপ্লবীদের বোমার ভয়ে ইংরাজ শাসকরা স্থির করল ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হতে দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এই রাজধানী

পরিবর্তনের দিন ধার্য করা হলো। ২৩'শে ডিসেম্বর ১৯১২। সেদিন ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ আনুষ্ঠানিক ভাবে মোগল সম্রাটদের অনুকরণে দিল্লীর দরবারে বসবেন।

এদিকে পশ্চিম ভারতবাসী বাঙালী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু স্থির করলেন, ঠিক সেই দিনটিতেই লর্ড হার্ডিঞ্জের সম্রাটসুলভ দম্ভ চূর্ণ করবেন। ইংরেজ শাসকদের বুঝিয়ে দেবেন, ইংরেজ রাজা-মহারাজা ও সরকারী কর্মচারীরাই দেশের সব নয়। দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা-কামী মানুষও দেশে আছে।

শুধু বড়লাট নয়, পাঞ্জাবের এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার গর্ডনের উপরও বোমা নিক্ষিপ্ত হলো ১৯১৩ সালের ১৭ই মে। রাসবিহারী বসুর নির্দেশে বসন্ত বিশ্বাস ও অবোধবিহারী লাহোরে গর্ডনকে বধ করার চেষ্টা করেন।

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় বসন্ত বিশ্বাস, অবোধবিহারী, আমীরচাঁদ বালমুকুন্দ প্রভৃতির ফাঁসী হয়। বিচারক হ্যারিসন সাক্ষ্য-প্রমাণের বিচার করে রায় দিলেন, এই সব কর্মকাণ্ডের নায়ক প্রকৃত অপরাধী হচ্ছে—রাসবিহারী বসু।

তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল তাঁর সন্ধান। সারা ভারতবর্ষের পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগ হন্যে হয়ে উঠল তাঁকে ধরার জন্য। বিশ্ববিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ট্রেনিং প্রাপ্ত বাঘা বাঘা ইংরাজ অফিসারদের তৎপরতার সীমা রইল না। মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করা হলো।

কিন্তু সব বৃথা! সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদকে তিনি যেন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন,—'আমারে বাঁধবি তোরা সে বাঁধন কি তোদের আছে?'

শিকারকে থাবার মধ্যে না পাওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ব্রিটিশসিংহ। আসমুদ্র হিমাচল কাঁপিয়ে তুলল ক্রুদ্ধ গর্জনে। সিংহের লাফের অনুপাতে পুরস্কারের অর্থের অঙ্ক ধাপে ধাপে বেড়ে ওঠে। মহামান্য

ইংরাজ সরকারের সঙ্গে যোগ দিয়ে নগন্য দেশীয় রাজ্যের বশংবদ রাজা-মহারাজার দলও তাঁকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করল। সাহেব ও মোসাহেবদের মিলিত পুরস্কারের পরিমাণ হলো প্রায় লক্ষ টাকা। লোকটির মাথার দামের এই বিজ্ঞপ্তি গভর্নমেন্টের গেজেটে, সংবাদপত্রের পাতায়, হাটে-বাজারে, স্টেশনে-পোস্টাফিসে সর্বত্র ঘোষিত হলো।

বিপ্লবী নেতার চোখে পড়ে সেই সব বিজ্ঞপ্তি, কানে আসে ঘোষণার কথা। মনে মনে তিনি হাসেন। বাঙালী বিপ্লবী ও দুর্দান্ত শাসকের মধ্যে শুরু হলো 'চোর-পুলিস' খেলা। এক দিকে সরকারী প্রশাসন যন্ত্র, অন্যদিকে অদ্বিতীয় অভিনেতা। একদিকে গ্রেপ্তারের জন্য বহু rupee-র লোভ, অন্যদিকে গ্রেপ্তার এড়াতে বহুরূপীর ভোল।

তাই সাহারানপুরে বিপ্লবী ব্যারিস্টার জে. এম. চ্যাটার্জীর বাড়িতে দেখা যায় কাবুলীওয়ালা পাঠানবেশী রাসবিহারী বসুকে,—পরনে সালোয়ার, কোর্তা, কুল্লাওয়ালা পাগড়ি, জরির কাজ করা ওয়েস্ট-কোট। লাহোরে তাঁকে দেখা যায় নিরীহ পাঞ্জাবী গৃহস্থ,—ইয়া বড় পাগড়ি মাথায়, ঢোলা পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা। আবার এক [illegible] করছে,—[illegible] বিপ্লবী সহকর্মী [illegible] শান্তি [illegible] ভাড়া নিয়ে [illegible] তাঁকে দেখা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের বড় অফিসার [illegible] মাথায় [illegible] [illegible]

বাংলা দেশের [illegible] অসংখ্য সম্ভাব্য রেল-স্টেশনে পুলিস-গোয়েন্দারা এমন সতর্ক দৃষ্টি রাখে যে একটি মাছি পর্যন্ত তাদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। [illegible] তাদের চোখের সামনে দিয়েই চলে [illegible] হাতে [illegible] ইণ্ডিয়ান সেজে। কলকাতার বিপ্লবীদের [illegible] নবদ্বীপের ন্যায়রত্নমশাই রূপে তিনি উপস্থিত হন,—অর্ধমুণ্ডিত মস্তকে বৃহৎ শিখা, কপালে তিলক, অঙ্গে নামাবলী, মুখে সংস্কৃত ভাষা।

একবার গোয়েন্দারা সুনির্দিষ্ট সংবাদ পেল, রাসবিহারী চন্দনগরে তাঁর গৃহে আত্মগোপন করে আছেন। ১৯১৪ সালের ৮'ই মার্চ কলকাতার কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার ডেনহ্যাম এবং টেগার্ট সদলে গিয়েও রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হলেন।

কী ভাবে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সবাইকে বোকা বানিয়ে মজা করলেন জানেন? পুলিস-বেষ্টনি ভেদ করলেন ভোররাতে খাটা-পায়খানা সাফ করা মেথর সেজে, ময়লার বালতি ও ঝাড়ু হাতে নিয়ে সকলের চোখের সামনে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে আমবাগানে চলে গেলেন রূপদক্ষ মহানায়ক।

পৃথিবীর কোন দেশে কোন বিপ্লবী জীবনে একবারও গ্রেপ্তার না হয়ে শাসকদের বিরুদ্ধে এত বিরাট কর্মকাণ্ডের হোতা হতে পারেন নি। বিশ্বের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে রাসবিহারী হচ্ছেন একমেবাদ্বিতীয়।

সারা ভারতবর্ষে তুরন্ত-ঘূর্ণিঝড়ের মতো মানুষটি ঘুরে বেড়িয়েছেন। তুরন্ত ঘূর্ণিকে কি মুঠোর মধ্যে ধরা যায়?

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম—সিপাই-বিদ্রোহের ব্যর্থতার বিপ্লবী মহানায়ক মেতে উঠলেন দ্বিতীয়বার সিপাই-বিদ্রোহ সংগঠনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুযোগ এনে দিল তাঁর স্বপ্নকে সফল করে তোলার। ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর পরিকল্পনা মতো লাহোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে শুরু করে সুদূর প্রাচ্যের সিঙ্গাপুরে অবস্থিত ভারতীয় সৈনিকরা প্রস্তুত হয় ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের জন্য। লাহোর, আম্বালা, জব্বলপুর, মীরাট, কানপুর, দিল্লী, বেনারস, দানাপুর, কলকাতা, ঢাকা, ব্রহ্ম ও মালয়ের ভারতীয় সৈন্য ও বিপ্লবীরা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে প্রতীক্ষা করে মহানায়কের নির্দিষ্ট মহালগ্নের।

কিন্তু এত বড় বিরাট আয়োজন বিফল হয়ে যায় এক বিশ্বাসঘাতকের জন্য। এই সম্ভাব্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা সে ইংরাজ সরকারকে জানিয়েছিল। ক্যান্টনমেন্টে ক্যান্টনমেন্টে, শহরে

শহরে শুরু হয় গ্রেপ্তার, বিচার, কোর্ট-মার্শাল, ফাঁসি, দীপান্তর। বহু সামরিক ও বেসামরিক দেশপ্রেমিক প্রাণ দিলেন।

প্রথম সিপাই বিদ্রোহের নায়ক নানাসাহেবকে ইংরাজ ধরতে পারে নি। এবারও মহানায়ককে ধরতে পারল না। যদিও উনবিংশ শতাব্দীর চেয়ে বিংশ শতাব্দীর ইংরাজ শাসন অনেক বেশি সুসংগঠিত। তখন ছিল কোম্পানীর রাজত্ব, এখন খোদ ব্রিটিশ সম্রাটের শাসন। তখন ইংরেজের সহায় ছিল কিছু স্বার্থান্বেষী সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর লোক। আর এখন সুদূরতম পল্লীতেও সক্রিয় রয়েছে ইংরাজের প্রশাসন যন্ত্র, সারা দেশজুড়ে তার শাসনের জাল ফেলা হয়েছে।

তবু সেই জালে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারীকে ধরা যায় না।

'সে মানুষ আগুনভরা পড়লে ধরা সে কি বাঁচে?
কেবলি এড়িয়ে চলার ছন্দে তাহার রক্ত নাচে।'

নানাসাহেব আত্মগোপন করে নাকি পালিয়েছিলেন স্বাধীন প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে। আর রাসবিহারী আত্মগোপন করে পালালেন প্রাচ্যে তৎকালীন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্র জাপানে।

১৯১৫ সালের ১২ই মে খিদিরপুরের ডক থেকে 'সানুকি মারু' জাহাজে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় ও একান্ত সচিব রাজা পি. এন. ঠাকুর ছদ্মপরিচয়ে পাসপোর্ট নিয়ে রাসবিহারী বসু জাপান যাত্রা করেন। পরবর্তীকালে তিনিই যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে সমস্ত দায়িত্ব নেতাজীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সে ইতিহাস তো সকলেরই জানা।

দিল্লীর বোমা

মণীন্দ্রনাথ নায়েক

[বড় লাটের উপর নিক্ষিপ্ত সেই বিধ্বংসী বোমাটি কার তৈরী ? ইতিহাস নীরব। দীর্ঘদিন বাদে রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছেন অগ্নিযুগের বিনম্র সাধক চন্দননগর প্রবর্তক সংঘের মণীন্দ্রনাথ নায়েক। বর্তমানে তিনি পরলোকগত।]

ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন কর্তৃক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইলে তাহার প্রতিবাদস্বরূপ স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন আরম্ভ হয়, এবং ঐ বিভাগকে নাকচ করিবার জন্য আবেদন জানান হয়, তাহাতে গভর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে বলা হয়, উহা settled fact এবং উহা unsettled করা হইবে না। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে বঙ্গদেশের আন্দোলন ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে, শেষে, গভর্ণমেন্ট ইহাতে নতিস্বীকার করিয়া প্রকাশ্যে জানান যে, ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হইবে

তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ রাজকীয় সম্মানে দিল্লী প্রবেশ করিতেছিলেন। সেই সময়ে, অর্থাৎ ২৩শে ডিসেম্বর ১৯১২, দিল্লীর চাঁদনী চক থেকে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, এবং উহার ফলে লর্ড হার্ডিঞ্জের পরিবর্তে হাতির মাহুত নিহত হন এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ আহত হন। এই বোমাটি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল রাসবিহারী বসুর নির্দেশ মত বসন্ত কুমার বিশ্বাস দ্বারা। কিন্তু তখন উহা কাহারও অবগতির মধ্যে ছিল না।

এই যে বোমাটি লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা আমার দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু রাসবিহারী বসু এই বোমা নিক্ষেপের ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও পরিচালনার জন্য এবং বোমা প্রস্তুতির কারণে—আমাদের দুইজনের কাহাকেও বিধাতার বিধানে কোন বাস্তব রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই।

এইবার আমরা চন্দননগরে কিভাবে বোমা প্রস্তুতের ইন্ধন পাইয়াছিলাম এবং কিভাবে আমরা তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলাম তাহার কিছু ইতিবৃত্ত এইখানে দিব।

চন্দননগরের সেই সময়ের মেয়র তার্দিভ্যাল কিভাবে প্রথমে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সহায়তা করিয়া গোপালবাগে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর তিনি ইংরাজ কর্মচারীদের এবং পুলিসের প্ররোচনায় কিভাবে বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ভাব গ্রহণ করেন।

সেই সময় শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তার্দিভ্যালের বাড়ীতে তাঁহার উপর একটি বোমা নিক্ষেপ করেন। কিন্তু সেই বোমাটি বিস্ফোরিত না হওয়ায় তার্দিভ্যাল সাহেব রক্ষা পান।

তারপর নারায়নগড় ও মানকুণ্ডু রেল স্টেশনের নিকট বোমা বিস্ফোরণ হয়, তাহাতে আমি বোমা তৈরী করার অনুপ্রেরণা পাই এবং আমার দুইজন বন্ধুর সাহায্যে নারিকেলের খোলে বন্দুকের বারুদ দিয়া বোমা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি। উহা সেরূপ শক্তিশালী ছিল না। তবুও আমি তাহাতে অগ্রসর হইতে থাকি।

তাহার পর এই বোমার সম্বন্ধে মতিলাল রায়কে জানাই। তিনি আমাকে বর্তমান প্রবর্তক আশ্রমের এক অংশে তাঁহাদের পারিবারিক চেয়ারের কারখানায় মেসার্স ডি. এন. রায় এণ্ড ব্রাদার্স-এ ডাকিয়া আমাকে ঐরূপ বোমা প্রস্তুতির কার্যে নিষেধ করেন। কেননা,

যে বন্ধুদের সহিত আমি ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম, তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। আমি তখন ঐ কার্য্য ছাড়িয়া দিই।

তারপর মুরারিপুকুর বাগানে খানাতল্লাসী হওয়ার পর সেখানে যে বোমার কারখানা ছিল, তাহার প্রায় সব কার্য্যই চন্দননগরে চলিয়া আসে। কলিকাতার মানিকতলা অঞ্চলে যে খানাতল্লাসী হয়, আমি এইখানে তাহারও একটুকু ইতিহাস দিতেছি।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংস্‌ফোর্ড মজফঃরপুরে ছিলেন। সেই সময় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গাড়ীতে একটি বোমা ফেলা হইয়াছিল—ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর দ্বারা কিন্তু সেই গাড়ীতে তখন মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের পরিবর্তে মিসেস কেনেডি ও মিস্ কেনেডি থাকায় তাঁহারা নিহত হন।

অল্প পরেই ক্ষুদিরাম বসু গ্রেপ্তার হন এবং পরে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহার ফাঁসী হয়। কিন্তু তাঁহার সহকর্মী প্রফুল্ল চাকী ঘটনাস্থল হইতে মোকামা রেল স্টেশনে চলিয়া আসেন. সেখানে পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে যাইলে তিনি রিভলবারের সাহায্যে আত্মহত্যা করেন।

এই ঘটনার পরই ২রা মে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার মুরারীপুকুর বাগানে খানা তল্লাসী হয় এবং সেখানে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন। তাহার ফলে বিরাট বোমার কারখানা সেখানে আবিষ্কৃত হয়।

সেদিন বারীন্দ্র প্রভৃতি গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার গ্রে ষ্ট্রীটে অরবিন্দ ঘোষ ও কলিকাতার বাগবাজারে গোপীমোহন দত্ত লেনে চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত গ্রেপ্তার হন। আলিপুর বোমার মামলায় ইঁহাদের বিচার হয়।

শ্রীঅরবিন্দ বিচারে মুক্তি পান কিন্তু কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু জেল হাসপাতালের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোস্বামীকে হত্যা করিয়া ফাঁসীতে প্রাণ দেন।

এই সকল ঘটনার পর হইতে চন্দননগরে বোমা প্রস্তুতির আয়োজন হয় এবং আমাকেই তাহার প্রধান কর্ম্মী স্থির করা হইয়াছিল। সঙ্ঘগুরু মতিলাল রায় এবং ডাঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এই কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

প্রথম আমাকে চন্দননগর হাটখোলায় ডাঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। তিনি কলিকাতার তদানীন্তন রিপন কলেজের (বর্ত্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র দত্তের নিকট হইতে বোমা প্রস্তুতি সম্বন্ধে যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহাই আমাকে শিক্ষা দেন, কিন্তু কিছুদিন পর তিনি এ বিষয়ে অগ্রসর না হইতে চাওয়ায় কলিকাতার পার্সীবাগানে সুরেশচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে শ্রীশচন্দ্র ঘোষ আমাকে লইয়া যান এবং সেখানে তিনি বোমা প্রস্তুতির বিষয়ে মৌখিক শিক্ষা দেন। পরে তিনি চন্দননগরে আমার বাড়ীতে আসিয়া ইহার কার্য্যকরী শিক্ষাও দিয়া যাইতেন।

সেই সময় সঙ্ঘগুরু মতিলাল রায়ের ব্যবস্থামত বেড়াইচণ্ডীতলায় অরুণচন্দ্র সোমের ভাঙ্গা বাড়ীতে এই বোমা প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় নানা উপাদান ও সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত হইতে থাকে।

এই কার্য্যে চন্দননগর হাটখোলা নিবাসী আশুতোষ নিয়োগী ও বেড়াইচণ্ডীতলার সত্যচরণ কর্ম্মকার ও সাগরকালী ঘোষ নানারূপ দ্রব্যাদি তাঁহাদের কর্ম্মস্থল জুটমিল হইতে সংগ্রহ করিয়া সাহায্য করেন। আশুতোষ নিয়োগী মহাশয় অর্থ দিয়াও সাহায্য করিতেন।

এতদ্ব্যতীত আমি কলিকাতা হইতে নিজে কিছু কিছু মালমসলা বড়বাজারের বটকৃষ্ণ পালের দোকান হইতে ক্রয় করিয়া আনিতাম। আমি সেই সময়ে কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের বি. এস্. সি-র ছাত্র, এবং বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলাম।

চন্দননগরের অরুণচন্দ্র সোমের বাড়ীতে বোমা তৈয়ারীর প্রধান কেন্দ্র থাকিলেও নানা স্থানে ইহার মালমসলা রাখা হইত এবং কিছু কিছু অংশ তৈয়ারী হইত। যথা—মতিলাল রায়ের বাড়ী, আমার নিজ বাড়ী, সাগরকালি ঘোষের বাড়ী এতদ্ভিন্ন চন্দননগরের

ঘোড়াপুকুরের ধারে ক্ষেত্রমোহন বসুর পুরাতন ভগ্ন বাড়ীতে ও অন্যান্য স্থানে রিভলবার, কার্টিজ এবং বোমা তৈয়ারীর মালমসলা ও সাজসরঞ্জামাদি রক্ষিত হইত।

তাছাড়া রূপলাল নন্দী মহাশয়ের গালাকুটীতে পলাতক ও আশ্রয়প্রার্থী বিপ্লবীগণ আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং যোগেনবাবুর ভাগিনেয় রাধাবিনোদ শেঠ ও নলিনরঞ্জন শেঠ এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। হাসপাতালের জনৈক কেরলবাসী ডাঃ মাঁসয়ে গোভিনাার বিপ্লবীদের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার বিষয়ে নানারূপ সাহায্য দিতেন।

চন্দননগরে যে বোমা তৈয়ারী হইতেছিল তদনুরূপ খুব একটা ছোট বোমা লইয়া ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কালীপূজার দিন পরীক্ষা করা হয়। মতিবাবুর দালানের ছাদ হইতে এই বোমাটি ফেলে। কিন্তু ফেলিবার পন্থা ঠিক না হওয়ায় উহার বিস্ফোরণ হয় না।

মতিবাবু উহা উঠাইয়া লইয়া আবার আছাড় দেন এবং তখন উহা খুব ছোট হইলেও প্রচণ্ড শব্দের সহিত ফাটিয়া যায়। তাহার পর এইসব সরঞ্জামের সাহায্যে বড় রকমের বোমা তৈয়ারী হইতে থাকে এবং তাহারই মধ্যে একটি বড় বোমা ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর রাসবিহারী বসু, জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ এবং শ্রীশচন্দ্র ঘোষের উপস্থিতিতে রাসবিহারী বসুর বাটীর অনতিদূরে একটি বাঁশবাগানে বিস্ফোরণ করা হয়। ইহার অতি প্রচণ্ড শব্দ প্রায় দুই মাইল দূর হইতে শোনা গিয়াছিল, কিন্তু কালীপূজার দিন বলিয়া উহা কাহারও কোন সন্দেহের মধ্যে আসে নাই।

রাসবিহারী ইহাতে খুব সন্তুষ্ট হন। এইরূপ আরেকটি বোমা লর্ড হার্ডিঞ্জের রাজকীয় সম্মানের সহিত ২৩শে ডিসেম্বর ১৯১২ এ দিল্লীর চাঁদনীচকে প্রবেশকালে রাসবিহারীর নির্দেশমত বসন্তকুমার বিশ্বাস কর্তৃক লর্ড হার্ডিঞ্জের হাতির উপর ফেলা হইয়াছিল। উহাতে লর্ড হার্ডিঞ্জ আহত হইলেও, মাহুত সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হয়। এই ঘটনার পর নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তাহাতে রাসবিহারী ও

বসন্তকুমার ঘটনাস্থল হইতে পলাইয়া যাইবার সুযোগ পান। এই বোমাটি দিল্লী পাঠাইবার পূর্বে তৈয়ারীর শিক্ষাদাতা সুরেশচন্দ্র দত্তের নিকট পাঠাইয়া পরীক্ষা করান হয়।

বোমা প্রস্তুতির বিষয়ে অরুণচন্দ্র সেনের বাটীতে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিতেন, তাঁহারা হইতেছেন নলিনচন্দ্র দত্ত, চারুচন্দ্র রক্ষিত, মানিকলাল রক্ষিত, হারাধন বক্সী প্রভৃতি।

এই সাথে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ৩৪ বৎসর পূর্বে কলিকাতার গড়ের মাঠে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে নানারূপ বিপ্লবীদের ব্যবহৃত অস্ত্রাদি প্রদর্শনী করা হয় এবং সেই প্রদর্শনীতেই দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর যে বোমা নিক্ষেপ হইয়াছিল তাহার কিছু টুকরাও প্রদর্শনীতে দেখানো হয়।

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও আমি এই প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। যখন তিনি শুনিলেন কর্তৃপক্ষ এই বোমার টুকরাগুলো সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতেছেন, শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত সেই সময়ে পুলিস-কর্তৃপক্ষকে বলেন যে: তিনি আর একটি দ্রষ্টব্য দেখাইবেন এবং তাঁহাদের সকলকে জানাইয়া দিলেন— যে ব্যক্তি এই বোমা প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই মণীন্দ্রনাথ নায়েক আজ সশরীরে এখানে উপস্থিত। তাহাতে পুলিস-কর্তৃপক্ষ সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া ঐ বোমা নির্মাণ বিষয়ে অনেক প্রশ্ন আমাকে করেন এবং আমিও তাঁহাদের যথাযথ উত্তর দিয়াছিলাম। তাহাতে সকলেই স্পষ্ট বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, আমিই ঐ বোমার প্রকৃত প্রস্তুতকারক।

এই প্রসঙ্গে আরও বলিবার আছে যে, চন্দননগরে প্রস্তুত দশটি বোমা লইয়া [illegible] দিল্লীর বাড়ীতে গ্রেপ্তার হবার পরে কয়েকটি বোমা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে লাহোরে পাওয়া যায়। যাঁহারা এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন, তাঁহাদের বিচারে শাস্তি হয়।

এই স্থানে আমি আরও উল্লেখ করিতে চাই যে, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯১২তে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর দিল্লী চাঁদনীচকে চন্দননগরে আমার দ্বারা প্রস্তুত বোমা নিক্ষিপ্ত হইবার পর আমি কলিকাতার রাজাবাজার

অঞ্চলে অমৃতলাল হাজরার সাহায্যে আরও উন্নত ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বোমা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করি, এবং আমি সেখানে নিয়মিত যাইয়া অমৃতলাল হাজরাকে সাহায্য করিতাম। তিনি নিজেই লোহার খোল ঢালাই করিতেন এবং তাহার মধ্যে মালমসলা দিয়া আমি তাঁহাকে বোমা তৈয়ারীর বিষয়ে সাহায্য করিতাম।

এইরূপ নিয়মিত তাঁহার বাসায় যাইবার সময়ে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের সন্ধ্যায় সেখানে যাইতে যাইতে কলিকাতায় তাঁহার বাসার নিকটবর্তী আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পৌঁছিয়া ভিতর হইতে নির্দেশ পাইলাম যে, আজ সেখানে না যাইয়া আমাকে চন্দননগরে চলিয়া যাইতে হইবে। আমি তাহাই করিলাম।

তাহার পরদিন সকালেই সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, অমৃতলাল হাজরার বাসায় খানাতল্লাসী হইয়াছে এবং সেখান হইতে বোমা তৈয়ারীর মালমশলা পাওয়া গিয়াছে। অমৃতলালকেও সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পরে বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়।

(প্রবর্ত্তক পত্রিকার সৌজন্যে)

রডা কোম্পানির অস্ত্রহরণের তাৎপর্য

হরিদাস দত্ত

[বিপ্লবী নেতা হরিদাস দত্ত রডা-অস্ত্র-লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক। বি. ভি-র বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের শেষ দিন পর্যন্ত হরিদাসবাবুর অবদান সংশ্লিষ্ট। বর্তমানে পরলোকগত।]

১৯১৪ সালের ২৬শে আগস্ট রডা-কোম্পানির অস্ত্র দিন-দুপুরে রাজপথ হইতে লুণ্ঠিত হয়।

'রডা অস্ত্র-লুণ্ঠন' ঘটনাটি সম্পর্কে নানারূপ গল্প শোনা যায়। কোন্ গল্প ঠিক এবং কোন্‌টি বেঠিক, তাহা সাধারণ পাঠকের বোঝা মুশকিল। পুলিশ রিপোর্ট বা ষড়যন্ত্র-মামলার রিপোর্ট হইতে ঘটনার কিছু খবর পাওয়া যায়, আর বাকিটা পাওয়া যায় শোনা গল্প হতে!

সরকারী রিপোর্টে সন-তারিখ বা সরকারের জানা (তাহা ভুলও হতে পারে) তথ্যাদি পাওয়া যাবে, কিন্তু শোনা গল্প নানা মুখে নানারকম হতে বাধ্য। যাঁরা হাতে-নাতে এই কাজটি করেছিলেন, তাঁদের কেহ কোন কথা বহুকাল বলার সুযোগ পান নি বলেই এই বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্য দেশবাসী এতদিন জানেন না।

রডা-ষড়যন্ত্রের কথা পুলিস যাহা জানে, তা থেকে তারা যা জানতে পারে নি তার গুরুত্ব অধিক।

দেশ স্বাধীন হবার পর আমি অনেক সময় ভেবেছি যে, 'রডা'

সম্পর্কে সঠিক সংবাদ দেশবাসীকে জানালে ভাল হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কার্যত আমরা কেউই কিছু করি নি। একে একে যাঁরা রডা-অ্যাকশনে বা উহার ষড়যন্ত্র রচনায় সরাসরি যুক্ত ছিলেন তাঁরা দেহরক্ষা করলেন। একমাত্র আমি আজও বেঁচে আছি।

বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত অ্যাকশনের রাজনীতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করব।

সে যুগের দুর্ধর্ষ পুলিশ-কর্তা টেগার্ট সাহেব তাঁর নোট-এ লিখেছিলেন যে, আমাদের অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, হেম ঘোষের দল আত্মোন্নতি সমিতির ভগ্নাবশেষের সঙ্গে কলকাতায় মিলিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য আই. বি. রেকর্ড এফ. এন. ১০৩০।১৯১৪)

তারপর লিখেছিলেন,—যে দলটি রডা-অস্ত্র অপহরণ ঘটনাটি সংঘটিত করেছিল, তারা ঢাকার হেম ঘোষের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। (দ্রষ্টব্য আই. বি. রেকর্ড ১০৩০।১৯১৪)

'ডাকাতির (রডার অস্ত্র) ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে। এই সময় বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে হেম ঘোষের দলের দু'জন নাম-করা সদস্য হরিদাস দত্ত এবং খগেন দাসকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে বিপ্লবী দলের পক্ষ থেকে গুপ্ত-হত্যা সংঘটিত করবার জন্যে।'

এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ তাঁর বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি 'মুক্তি সঙ্ঘে'র (উত্তরকালের 'বি-ভি') তরফ থেকে খগেন দাস (স্বর্গত) ও আমাকে তাঁর দলের কলকাতা শাখার কাজ করবার জন্য পাঠান।

ওই গুপ্ত কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক ছিলেন শ্রীশচন্দ্র পাল (স্বর্গত)। আমরা শ্রীশদার কাছে হাজির হবার পর শুনলাম যে 'যুগান্তর' ও 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সঙ্গে একযোগে কাজ করার নির্দেশ নাকি হেমদা ঢাকা থেকে পাঠিয়েছেন। এবং সেই জন্যই শ্রীশদা স্বয়ং বিপিন গাঙ্গুলী মশাইয়ের 'আত্মোন্নতি' দলের সঙ্গে এবং তাঁরই নির্দেশে হরি ঘোষ (গুপেন ঘোষ) তাঁর সহকারী রূপে

মুনসেফ অবিনাশ চক্রবর্তী মশাইয়ের মাধ্যমে যতীনদার (মুখার্জী) সঙ্গে সংযোগ-রক্ষা করছেন।

আমরা কলকাতায় আসার পর ১৯১২ সালে জগদ্দল অঞ্চলে (২৪ পরগণা) আলেকজাণ্ডার জুট মিলের সাহেব এঞ্জিনীয়ার ওব্রায়েনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়। শ্রীশদা এবং 'আত্মোন্নতি'র অনুকূলবাবু পরামর্শ করে খগেনবাবু ও আমাকে ওব্রায়েনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য জগদ্দলে পাঠান। খগেনবাবু ও আমি পুরো তিনটি মাস দিনের পর দিন সাধারণ কুলি সেজে ঐ চটকলে কুলির কাজ করেছি। কিন্তু এত করেও আসল কাজ হল না। ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল। ওব্রায়েন রক্ষা পেলেন।

আমি পলাতক হলাম এক সমুদ্রগামী জাহাজের এক স্টোর-কীপার হয়ে। খগেন দাসও শ্রীশদার নির্দেশেই দেশেই পলাতকের জীবন গ্রহণ করলেন। কিন্তু টেগার্ট সাহেবের উল্লিখিত রিপোর্ট থেকে জানতে পারি যে, আমাদের কার্যকলাপ তৎকালে পুলিশ জ্ঞাত হয়েছিল। আমরা অধিক অগ্রসর না হয়ে তখন ভালই করেছিলাম।

তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এসে গেল — ১৯১৪ সাল। মহানায়কদ্বয় যতীন মুখার্জী ও রাসবিহারী বসু সমগ্র বিপ্লবী দলগুলি নিয়ে সারা ভারতবর্ষে একটি সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করবার আগে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করছেন।

বিদেশে নির্বাসিত বিপ্লবী নেতারা জার্মানীর সঙ্গে যোগসাজসে ভারতে বিপ্লব সংঘটিত করতে ক্রমশ বদ্ধ হলেন। ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত হলে জাহাজ বোঝাই অস্ত্র আসতে পারে, প্রচুর অর্থও পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু তার আগে তো কিছুটা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকা চাই। স্মাগ্‌ল্ করা রিভলবার-পিস্তলে প্রকৃত লড়াই চলে না।

সুতরাং নেতারা অস্ত্র-সংগ্রহের নতুন পন্থা উদ্ভাবনে তৎপর। এমন সময় বিপিনবাবুদের তরুণ বন্ধু হাবু মিত্র একটি সংবাদ দিলেন যে, রডা.কোম্পানী ২৬শে আগস্ট (১৯১৪) তারিখে বহু অস্ত্র-শস্ত্র

কাস্টম-অফিস থেকে খালাস করে নিচ্ছে। তার মধ্যে থাকবে দলাই লামার অর্ডার মত ৫০টি মাউজার পিস্তল ও পঞ্চাশ হাজার রাউণ্ড কার্তুজ। রাস্তা থেকে গাড়িবোঝাই মাল কি করে আত্মসাৎ করা যায় সেটা ভেবে দেখতে পারেন। হাবুভাই শুধু খবর দেওয়া নয়, তাঁকে যা করতে বলা হবে তিনি তাই করতে রাজী। হাবু ছিলেন আর. বি. রডা কোম্পানির একজন কেরানী।

এই খবরটি পাবার পর যুগান্তর-আত্মোন্নতি-মুক্তিসঙ্ঘ-বরিশাল পার্টি ইত্যাদি সর্বদলের নেতাদের বৈঠক, এবং পরিশেষে শ্রীশ পালের নেতৃত্বে 'মুক্তি সঙ্ঘ' ও 'আত্মোন্নতি'র কর্মীদের দ্বারা দিনে দুপুরে সংঘটিত ঐ অ্যাকশন ইত্যাদি আমি নতুন করে এখানে লিখব না। কারণ, এ কাহিনী সবারই জানা।

কার্য সমাধা হবার পর ব্রিটিশ সরকার যেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, বিপ্লবীরাও তেমনি আনন্দে ও আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অতি যত্নে ও সঙ্গোপনে মাউজার পিস্তলগুলি (উহা রাইফেলের মত ব্যবহার করা যেত) বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হল। তখন কিন্তু কোন দলাদলি থাকল না। কে অনুশীলন, কে যুগান্তর, কে কোন ছোটবড় দলের লোক, তাহা কাহারো ভাবিবার অবসর ছিল না।

মহাযুদ্ধ সমাগত। সেই যুদ্ধের সৈনিক হবার পূর্বে অস্ত্রের প্রয়োজন। সেই অস্ত্র এসেছে এখন ইণ্ডো-জার্মান-ষড়যন্ত্র সফল হোক। আসুক জাহাজ-বোঝাই আগ্নেয়াস্ত্র, আসুক ভাণ্ডার বোঝাই অর্থ।

১৯১৪ সাল হইতে অনুষ্ঠিত বিপ্লবীদের যুদ্ধকালীন যত ভয়াল অ্যাকশন, তার মূলে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রডার অস্ত্রাগার হইতে লুণ্ঠিত 'মাউজার'-এর শক্তি। এবং, এই কারণেই আমি বলব যে, 'রডা অ্যাকশন' শুধু দুঃসাহসী ও চমকপ্রদ নহে—ইহার পলিটিক্যাল গুরুত্ব প্রচুর।

উপসংহারে আমি এই অ্যাকশনের অন্যতম হোতা স্বর্গীয় হাবুভাইয়ের উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই, এবং উহার প্রখ্যাত নেতা স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র পালের উদ্দেশ্যে বিনম্র প্রণাম নিবেদন করি। জয়হিন্দ্।

বুড়িবালামের তীরে

শান্তি রায়

[বিভিন্ন [illegible] যাঁরা একসঙ্গে পা বাড়িয়েছিলেন, সতীর্থ [illegible] শান্তি রায় ছিলেন তাঁদেরই একজন। বিপ্লবী নায়ক পূর্ণ দাসের দলের [illegible] সদস্য। [illegible]]

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘাযতীন)।

কথা ছিল, দু'জন দুই প্রান্তে কাজ করবেন সমানভাবে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে। একজন উত্তর-পশ্চিম ভারতে সেনা বিদ্রোহ ঘটাবেন, অন্যজন পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানবেন বিপ্লবী সতীর্থদের সাহায্যে।

কৃপালসিং এর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সেনা বিদ্রোহ ব্যর্থ হল।

বৃহত্তর কর্ম প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে রাসবিহারী চলে গেলেন জাপানে। বাঘা যতীনের মাথায় তখন এক চিন্তা—অস্ত্র চাই। অবশ্য রডা অস্ত্র-লুণ্ঠনের ফলে কিছু মাউজার পিস্তল পাওয়া গেছে। কিন্তু উপযুক্ত ভাবে লড়াই চালাতে হলে ঐ অস্ত্রই যথেষ্ট নয়। আরো উন্নত ধরনের আধুনিক অস্ত্র চাই।

এমনি এক সময় একটি বহু প্রত্যাশিত সংবাদ বিপ্লবীদের কেন্দ্রে এসে পৌছলো। সংবাদটি বহন করে আনলেন সদ্য জার্মান-প্রত্যাগত ভারতীয় বিপ্লবী শ্রীরামপুরের (হুগলী) জিতেন লাহিড়ী। তখন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। খবরটি হলো যে, জার্মান প্রবাসী ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত "বার্লিন-কমিটি" জার্মান সরকারের সাহায্যে ভারতে টাকা ও অস্ত্র পাঠাতে পারবেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তখন নেতা যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে ২৪ পরগণা জেলার কোদালিয়া গ্রাম নিবাসী নরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে সেই দুরূহ কাজের ভার দেওয়া হল। চতুর নরেন্দ্রনাথ, সি. এ. মার্টিনের ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে সুদূর "বাটাভিয়া" অভিমুখে যাত্রা করলেন।

তখন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস।

সেখানে পৌছে তিনি জার্মান কনসাল থিয়োডর হেলফেরিকের সঙ্গে দেখা করার পর ঠিক হলো, জার্মান জাহাজ "এস. এস. মাভারিক" করাচী বন্দরে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলা-বারুদ ও প্রচুর ভারতীয় মুদ্রা পৌছে দেবে। কিন্তু করাচী বন্দর বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে বলে সেখান থেকে জার্মানীর দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র গোপনে বহন করে আনা বিপদজনক বলে মনে হল। তাই দেখে শেষটায় মাল খালাসের জায়গা বদল করা হলো।

স্থান, নির্দিষ্ট হল পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম জেলার "হাতীয়া-সন্দীপ" জলাভূমি অবিভক্ত বাংলার সুন্দরবন এলাকার "রায়মঙ্গল" ও উড়িষ্যার "বালেশ্বর" উপকূল অঞ্চল।

ইতিমধ্যে জার্মান সরকারের সঙ্গে যুক্তি করে যতীন্দ্রনাথ ও তার বিপ্লবীগোষ্ঠী তাদের সতীর্থ হরিকুমার চক্রবর্তীকে দিয়ে এক

বোম্বাইয়ের একজন পুলিস কর্মচারীর নিকট পরে শুনা গিয়েছিল যে, সে এক সময় ভোলানাথকে যখন থানার একঘর হইতে অপর এক ঘরে নীত হইতে দেখিয়াছিল, তখন ভোলানাথ চলিতে পারেন না, টলিতে টলিতে যাইতেছিলেন, আর তাহার মুখ দিয়া রক্তধারা বহিতেছিল।

পুলিস কর্মচারীটি অনুমান করে যে, ভোলানাথের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল এবং পাছে অত্যাচারে ভাঙিয়া পড়ার ফলে দেশের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন তাঁহার দ্বারা হয়, ইহাই ভাবিয়া তিনি পরিধেয় বস্ত্র গলায় লাগাইয়া আত্মহত্যা করেন। যাহা হউক, সে গবেষণা করিয়া আজ আর লাভ নাই। বিপ্লবীর এই জীবন, বিপ্লবীর এই মৃত্যু।

দেশগতপ্রাণ ভোলানাথ, পরাধীন দেশের রাষ্ট্রবিপ্লবী ভোলানাথ স্বাধীনতার সাধনা করিতে করিতে এক তীব্র অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা লইয়া ইহজগত ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। • জানি না, কবে তাহার অশরীরী আত্মার শান্তিবিধান হইবে, তাহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে।

অগ্নিযুগ সংখ্যা উদ্বোধন পত্রিকার সৌজন্যে।

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

—রবীন্দ্রনাথ

জালিয়ানওয়ালাবাগ

[বড়লাটকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ লিপির কিছুটা অংশ]

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা, ৩০শে মে, ১৯১৯ সাল।

'কয়েকটি স্থানীয় 'হাঙ্গামা শান্ত করিবার উপলক্ষ্যে পাঞ্জাবের গভর্নমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রচণ্ডতায় আজ আমার মন কঠিন আঘাত পাইয়া ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছে। হতভাগা পাঞ্জাবীদিগকে যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহার অপরিমিত কঠোরতা ও সেই দণ্ড প্রয়োগবিধির বিশেষত্ব আমাদের মতে কয়েকটি আধুনিক ও পূর্বতন দৃষ্টান্ত বাদে সকল সভ্য শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে অতুলনীয়।......

যখন জানিলাম যে, আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হইল, যখন দেখা গেল, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিতে আমাদের গভর্নমেণ্টের রাজধর্ম দৃষ্টি অন্ধ করিয়াছে, অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্ম নিয়মের অনুযায়িক সদাশয়তা অবলম্বন করা এই গভর্নমেণ্টের পক্ষে কত সহজ কার্য ছিল, তখন স্বদেশের কল্যাণ কামনায় আমি এইটুকুমাত্র করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি যে, আমাদের বহু কোটি যে ভারতীয় প্রজা অদ্য আকস্মিক আতঙ্কে নির্বাক

হইয়াছে, তাহাদের আপত্তিকে বাণীদান করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে আমি নিজে গ্রহণ করিব।

অদ্যকার দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলি চতুর্দিকবর্তী জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে। অন্তত আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, আমার যে সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান-চিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি'।

পাঞ্জাব ১৯১৯

সরোজিনী নাইডু

আমাদের ভালবাসা দেবে কি সান্ত্বনা
কেমনে ঘুচাবে তোর দুঃসহ বেদনা!
আমাদের ব্যথা কি গো দেবে প্রতিদানে—
যে হৃদয় তোমার বুকে হানে
তিক্ত রোষে যেই হাত
তোমার সৌন্দর্যকে করে ধূলিসাৎ?
আমাদের দুঃখ হোক তোমার যুদ্ধের হাতিয়ার
ভেঙে দিক অত্যাচারীর সন্ত্রাসী-অহঙ্কার,
তোমার যন্ত্রণা দেখে হাসে যে পাপিষ্ঠ
কলঙ্কিত করে যে উজ্জ্বল ঐতিহ্য—
আশাহতা প্রতারিতা দুঃখময়ী

মৃতা রাণী দ্রৌপদী সুন্দরী,
তবু তুমি সহ্য করো,
অজেয়া কভু না ডরো।
তোমার শোণিত স্রোতে যে নদী পূণ্যা
পঞ্চধারে বয়ে আনে মুক্তির বন্যা
স্বাধীন দুর্গকে করে সেই যে রক্ষা।

* যুগান্তর পত্রিকার সৌজন্যে।

তোমার পতাকা যারে দাও

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

[সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সহকর্মী। বর্তমানে পরলোকগত। ইতিহাসের প্রয়োজনে তাঁর 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থ থেকে এই অংশটি কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করা হল।]

"বেলা ১০টা ১১টা নাগাদ আমি ফরওয়ার্ড অফিসে যেতাম—সুভাষবাবুও ঐ সময় আসতেন। বেলা ৮টার সময় ফরওয়ার্ড-এর সাইকেল পিয়ন এসে খবর দিলে—সুভাষবাবু অফিসে এসেছেন—আমাকে ডাকছেন।

দশ পনের মিনিটের মধ্যে ধর্মতলার অফিসে এসে দেখি—তাঁর অফিস ঘরে দেওয়ালে টাঙান একখানা ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে চেয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আর গুন গুন করে গান গাইছেন—'তোমার পতাকা যারে দাও—তারে বহিবার দাও শকতি'।

সুভাষবাবুকে গান গাইতে আমি ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি, ভারি মজা লাগল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম—এসেছি।

জানতে দিলাম না। তিনিও এত তন্ময় হয়েছিলেন যে আমার আসাটা সত্যই জানতে পারেননি।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে যখন আমার দিকে চাইলেন, তখন সে মূর্তি দেখে আমি চমকে উঠলাম। সারামুখে যেন কে সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে গুমরে গুমরে কাঁদলে যেমন মুখের চেহারা হয়—ঠিক তেমনি। দু-চোখের কোণে জল।

বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলাম। সুভাষবাবুর চোখে জল! এযে ভাবতেও পারি না। সুভাষবাবুই নিজে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। আবেগ কম্পিত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—'গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হয়ে গেল—জেলের গেট থেকেই বরাবর এখানে আসছি'।

আর কোনও কথা তিনি বললেন না;—আমার মনে হতে লাগল আরও কিছু তিনি বলুন—আরো—আরো কিছু। সুভাষবাবুকে এমন বিচলিত, এমন ব্যথাতুর, এমন ক্লান্ত যেন আমি আগে কখনো দেখিনি। দেখলাম তিনি স্নান সমাধা করেছেন—পরিধানে শুভ্র খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর—যেন তিনি বিশেষ কোন উৎসব অনুষ্ঠান থেকে ফিরছেন।

সুভাষবাবু ইতিমধ্যে চেয়ারে বসে পড়েছিলেন, আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত সামনের চেয়ারে বসেছি। সুভাষবাবু ভারী গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন—'একটা ওয়ার্ডার বাইরে এলো—লোকটার সঙ্গে জেলে থাকতে পরিচয় হয়েছিল—জাতে সে আইরিশ: সে কি বললে জানেন'?

'He played like a fawn
And at the dawn
Was slain on the lawn.'

মান্দালয় জেলে

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী (মহারাজ)

[অনুশীলন সমিতির সবজন শ্রদ্ধেয় কর্মযোগী নায়ক। 'মহারাজ' নামেই পরিচিত। বলতে গেলে গোটা জীবনটাই কাটিয়েছিলেন বিভিন্ন কারাগারে। বর্তমানে পরলোকগত]

দশ বৎসর জেল খাটার পর দশ মাসও বাহিরে থাকিতে পারিলাম না। ১৯২৪ সনের শেষ ভাগেই আবার ধৃত হইলাম। ময়মনসিংহ হইতে আমাকে কলিকাতায় 'ইলিশিয়াম রো'তে (এখন লর্ড সিংহ রোড) লইয়া যাওয়া হইল।

ইহার কিছুদিন পর ১৯২৫ সনের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মান্দালয় জেলে স্থানান্তরিত হই। মেদিনীপুর জেল হইতে আমি হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছি এবং তথা হইতে আমাকে লালবাজার লইয়া যায়। সেখানে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও মদনমোহন ভৌমিক প্রভৃতির সহিত মিলিত হই। তারপর আমরা সকলে একসঙ্গে রেঙ্গুনগামী জাহাজে গিয়া উঠি। আমাদের সঙ্গে গেলেন স্বয়ং লোম্যান সাহেব।

জাহাজে আমরা তিনদিন ছিলাম এবং খুব আনন্দে কাটাইয়াছি। আন্দামান যাওয়া ও আসার সময়ে সমুদ্রে খুব ঢেউ ছিল, কিন্তু এবার আর ঢেউ নাই। সমুদ্রবক্ষ হইতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত খুব ভাল দেখা গেল।

জাহাজে আমরা সকালে ও বিকালে বেড়াইতাম। আই. বি-র দারোগাবাবুরা আমাদিগকে চোখে চোখে রাখিতেন, বন্দুকধারী প্রহরীও ছিল।

একদিন বিকালে আমি ও সত্যেনবাবু বেশ দ্রুতগতিতে বেড়াইতেছি, দারোগাবাবু একটু দূরে বসিয়াছিলেন—এমন সময় লোম্যানসাহেব উপরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দারোগাবাবুর খুব ভয় হইল। তিনি যে দূরে আছেন, লোম্যান সাহেব বুঝি তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার চাকুরী যাইবে!

পরে তিনি অপর দারোগাবাবুদিগকে বলিতেছিলেন, 'মহারাজের (আমি) সহিত সত্যেনবাবুর দেখা হইলে তাঁহাদের ভ্রমণের গতি এত দ্রুত হয় যে, তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতে ঘোড়ার প্রয়োজন হয়।' তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, আমাদের জন্য তিনি মারা যাবেন।

আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলিলাম, 'আপনি কোন চিন্তা করিবেন না,—লোম্যান সাহেবের সহিত আমার খাতির আছে,—যদি তিনি আপনাকে কিছু বলেন, তবে আমি আপনার জন্য সুপারিশ করিব।' উত্তরে তিনি বলিলেন, 'বেশ পরামর্শ দিলেন, আপনি যদি সুপারিশ করেন তবে এখুনিই আমার চাকুরী যাইবে—আর বিলম্ব হইবে না।'

রেঙ্গুন হইতে আমরা মান্দালয় জেলে যাই। মান্দালয় জেল মান্দালয় ফোর্টের ভিতর এবং রাজা থিবোর প্রাসাদের নিকট। মান্দালয় জেলে আমরা তেরজন একত্র ছিলাম। সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র স্বদেশী আন্দোলনের সময় ঢাকায় থাকিয়া পড়িতেন এবং অনুশীলন সমিতির একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

মান্দালয় জেলে পৌঁছানর পরই সুভাষবাবু বলিয়াছিলেন, মহারাজের সিট আমার পাশে থাকিবে এবং সুভাষবাবুর পাশে আমার থাকার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সুভাষবাবুর জন্ম বড় ঘরে, শৈশব হইতে তিনি সুখে লালিত পালিত হইয়াছেন। কিন্তু দেশের

জন্য দুঃখ কষ্ট বরণ করিতে তিনি কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তিনি অম্লানবদনে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তিনি সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন।

খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে কোন আপত্তি নাই তাঁহার—যাহা পান তাহাই খান। চাকর-বাকরদের উপরও তাঁহার ব্যবহার খুব সদয়, কখনও কটু কথা বলেন না। কাহারও অসুখ হইলে তিনি নিজে সারারাত্রি জাগিয়া সেবা করিতেন।

একবার টেনিস খেলিতে যাইয়া আমি পড়িয়া যাই।—তাহাতে হাঁটুর চামড়া উঠিয়া যায় ও ঘা হয়। সুভাষবাবু প্রত্যহ নিজহাতে আমার ঘা নিমপাতা সিদ্ধ জলদ্বারা ধোয়াইয়া দিতেন। খেলা, হৈ-চৈ, আমোদ প্রমোদ সবটাতেই তাঁহার বেশ উৎসাহ ছিল। কয়েদীরা খালাসের সময় সুভাষবাবুর কাছে কাপড় জামা চাহিত। তিনি কাহাকেও 'না' বলিতে পারিতেন না। সুভাষবাবুর মত লোককে জেলখানায় সঙ্গী হিসাবে পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের বিষয়।

মান্দালয় জেলে আমরা পূজার টাকার জন্য অনশন করি। অনশনব্রতে সকলেরই খুব উৎসাহ ছিল। চৌদ্দদিন অনশন করার পর সরকার আমাদের দাবী স্বীকার করিলেন এবং আমরা অনশন ভঙ্গ করিলাম।

মান্দালয় জেল হইতে আমাকে ইনসিন জেলে পাঠান হয়,—ইনসিন জেল হইতে পুনরায় মান্দালয় জেল ও পরে মিঞ্জান জেলে যাই।

মিঞ্জান জেলে আমরা দুই জন ছিলাম। ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত দস্যুনেতা সামফে সেই জেলে ছিল। আমাদের কাজকর্ম ব্রহ্মদেশীয় কয়েদীরাই করিত, সুতরাং কাজ চালাইবার উপযুক্ত কিছু কিছু ব্রহ্মভাষা শিখিয়াছিলাম।

আমরা মাঝে মাঝে গোপনে সামফের সহিত দেখা করিয়া ব্রহ্মভাষায় গল্প করিতাম। সে আমাদের খুব বাধ্য হইয়া পড়িল।

কিছুদিনপর সামফের ফাঁসী হইয়া গেল। আমরা তখন ইনসিন জেলে চলিয়া গিয়াছি।

দ্বিতীয়বার যখন আমি মান্দালয় জেলে যাই, লোম্যান সাহেব তখন আমাদের মন পরীক্ষার জন্য সেখানে যান। তিনি একে একে সকলকে অফিসে ডাকাইয়া আলাপ করিলেন। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, আমাকে কেন আটক রাখা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, "পাছে তোমরা হিংসা-মূলক কার্য আরম্ভ কর।" আমি বলিলাম, "আমি বা আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ হিংসা-মূলক কার্য করে নাই।" লোম্যান বলিলেন, "আমি এইরূপ রিপোর্ট পাইয়াছি যে, তোমরা হিংসা-মূলক কার্য করার জন্য পরামর্শ করিতেছিলে।"

আমি বলিলাম, "হিংসামূলক কার্য করা এমন কোন কঠিন কাজ নয়, যাহার জন্য আবার পরামর্শ করিতে হইবে;—আপনি কি মনে করেন যে, আমরা ইচ্ছা করিলে দু-চার-দশটা ডাকাতি বা খুন করিতে পারিতাম না?"

তিনি বলিলেন, তোমার অতীতের যেরূপ ইতিহাস আছে, তাহাতে বিশ্বাস করি, ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পারিতে;—পাছে তোমরা দেশে অশান্তির সৃষ্টি কর এজন্য তোমাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে। ইহা সাবধানতা-মূলক (Precautionary) ব্যবস্থা।

তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, দেশে যে যুবকদের মধ্যে হিংসা-মূলক কার্য করার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, তাহা দমন করা যায় কি করিয়া, এবং এ সম্বন্ধে তোমার মত কি?

আমি বলিলাম, ইহা হিংসামূলক কার্য করার প্রবৃত্তি নয়—দেশকে স্বাধীন করার প্রবৃত্তি। আপনারা ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীনতা দেন, তবেই ইহারা দমন হইতে পারে—শুধু দমননীতি দ্বারা ইহা বন্ধ হইবে না।

তিনি বলিলেন, 'আমরা যদি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যাই, তবে তোমরা কি দেশ রক্ষা করিতে পারিবে? তোমরা নিজেরা নিজেরা মারামারি, কাটাকাটি করিয়া ধ্বংস হইবে।' তিনি,

ইংরেজগণ ভারতবর্ষের কি কি উপকার করিয়াছেন, ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষ কতটা উন্নত হইয়াছে এবং কিভাবে আমাদিগকে আস্তে আস্তে উন্নত করিয়া স্বরাজ দেওয়া হইতেছে, ইত্যাদি মামুলি গদ বলিলেন।

ইহার কয়েকমাস পর,—সম্ভবতঃ ১৯২৭ সনে ইন্সপেকটার দত্ত কতকগুলি সর্ত লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, আমরা যদি ঐ সর্তগুলি মানিয়া চলিতে রাজি হই, তবে গভর্নমেণ্ট আমাদিগকে মুক্তি দেওয়ার কথা বিবেচনা করিবেন।

আমাকে যখন তিনি ডাকাইলেন, আমি বলিলাম, আমার তিনটি সর্ত আছে—গভর্নমেণ্ট যদি এই সর্ত তিনটি পালন করিতে রাজী হয়, তবে আমি গভর্নমেণ্টের সর্তগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিব।

তিনি আমার সর্ত তিনটি জানিতে চাহিলেন। আমি জানাইলাম —(১) আমাকে যে বিনা বিচারে আটক করা হইয়াছে এজন্য গভর্নমেণ্টকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। (২) আমাকে যে অবৈধ ভাবে আটক করা হইয়াছে সেজন্য গভর্নমেণ্টকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে; এবং (৩) গভর্নমেণ্টের এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে ভবিষ্যতে আমাকে আর বিরক্ত করিতে পারিবে না।

ইন্সপেকটারবাবু আমার কথা শুনিয়া খুবই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। সম্ভবতঃ উনি ভাবিলেন, আমার মাথা খারাপ হইয়াছে। আমার বক্তব্য লিখিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। আমি বলিলাম, আমার বক্তব্য আপনি নোট করিয়া যান, নতুবা লোম্যান সাহেবের সাথে আমার যখন দেখা হইবে, আমি তখন ইহা বলিয়া দিব।

তিনি আমার তিন সর্ত লিখিয়া লইয়া গেলেন। ইহার পর সত্যেনবাবু জেল হইতে মুক্ত হইয়া আমার তিন সর্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

* অনুশীলন ভবনের সৌজন্যে লেখকের 'জেলে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থ থেকে এ অধ্যায়টি ধন্যবাদ সহকারে প্রকাশ করা হল।

শহীদ আসফাকউল্লা

উজ্জ্বলা রক্ষিতরায়

[বি. ভি.-র বিশ্বস্ত সদস্য। দার্জিলিং লেবং-এর রেসকোর্সে বাংলার কুখ্যাত গভর্নর অ্যাণ্ডারসনকে গুলি করার মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।]

বাংলাদেশে বিপ্লবের প্রথম যুগে বিপ্লবীরা রাজপুতনা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র থেকে নানা বীরত্ব-কাহিনী পড়ে প্রচুর প্রেরণা লাভ করেছিলেন। আরও পড়তেন তাঁরা বিদেশের বিভিন্ন স্বাধীনতা-যুদ্ধের শৌর্যপূর্ণ ইতিহাস। বাংলার স্বাধীনতার স্বপ্নে বৈশিষ্ট্য ছিল। সে সাধনা রঙে ও বর্ণে এক অপূর্ব বস্তু হয়ে উঠেছিল। ভাবপ্রবণ বাঙালী ভাবের গভীরে যা গ্রহণ করেছিল, যা আত্মস্থ করেছিল—তারই ফলে দেখি কত শহীদ কেমন অনায়াসে জীবন দিয়ে নব-জীবনের সূচনা করে গেলেন।

ক্রমে ক্রমে প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন বসু থেকে শুরু করে গোপীনাথ, অনন্তহরি, যতীন দাস প্রমুখ অজস্র শহীদ এই বাংলা তথা ভারতে শৌর্যের এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেলেন—যা অতুলনীয়।

দ্বিতীয় যুগের বিপ্লবীরা অন্য ইতিহাসের সাথে সাথে নিজেদের ঘরের ইতিহাসকেও সসম্ভ্রমে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। ধন্য হয়েছেন তাঁরা কানাই, ক্ষুদিরাম, যতীন দাস প্রমুখ পূর্বগামী শহীদদের পথিকৃৎরূপে পেয়ে।

আমাদের কৈশোরে তারুণ্যের জীবনস্রোত এত জটিল ও বিভিন্নমুখী ছিল না। প্রত্যেক কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর

একমাত্র ধ্যান ছিল ইংরেজের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের যুদ্ধে সাধ্যমত সংগ্রাম করা বা সেই সংগ্রামে সাহায্য করা।

তখন স্কুলের নীচের ক্লাসে পড়ি। বিশেষ কিছু বোঝবার বা চিন্তা করবার বয়স মোটেই হয়নি। তবে বাবা গুপ্ত সমিতির সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত থাকায়, এবং বাড়ীতে 'স্বদেশী' লোকদের আনাগোনায় ও তাঁদের আভাসে-ইঙ্গিতে এটা বুঝেছিলাম যে, স্বাধীনতা-যুদ্ধে ছোট-বড় সকলকেই যোগ দিতে হবে।

এমনি সময়ে একদিন হঠাৎ শুনলাম উত্তর ভারতের কোন এক কাকোরি স্টেশনে মস্ত এক স্বদেশী-ডাকাতি হয়ে গেছে। চলন্ত ট্রেন থামিয়ে 'স্বদেশী'রা নাকি সরকারের প্রচুর টাকা লুট করে নিয়েছেন!

রোমাঞ্চিত হবার মত সংবাদ। আমরা বড় বড় চোখ করে সাগ্রহে সে সংবাদ শুনেছি এবং তা লালন করেছি মনে মনে। সেটা ছিল ১৯২৫ সালের ৯ই আগস্ট।

তারপর বড় হয়ে কত রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা শুনেছি, কত দুঃসাহসী বিপ্লবীদের চোখে দেখেছি—তবু কাকোরির কথা কোনদিনই ভুলিনি।

সেই ছোটবেলাকার মনে 'কাকোরি' গ্রাম একটা ছাপ রেখে গেছে। কাকোরি ডাকাতি ষড়যন্ত্র-মামলা ও দণ্ডিত শহীদবৃন্দ—এ সবকিছু মিলিয়ে যেন এক রূপকথা সে যুগে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিত!

এই মামলায় রাজেন লাহিড়ী, রামপ্রসাদ, আসফাকউল্লা, রোশন সিং প্রভৃতি বীরবৃন্দের মৃত্যুদণ্ড হয়। বাংলার বিপ্লবীদের নেতৃত্বে বাংলা ও উত্তরপ্রদেশের বিপ্লবীদের এ ছিল এক সম্মিলিত অভিযান, যা সকল দিক দিয়েই তাৎপর্যপূর্ণ। তখনই শুনেছিলাম, এ অভিযানের অনেকখানি কৃতিত্ব বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির সভ্যদের।

বিপ্লবের ইতিহাস ও ধারা নিয়ে চিন্তা করলে মনে হয় যে, যে-সব শহীদবৃন্দ ধীর মস্তিষ্কে, ভেবে-চিন্তে শহীদের মৃত্যুকে বরণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে জাতি, ধর্ম, কুল বা শ্রেণীগত কোনই পার্থক্য নেই।

তাঁরা সবাই একজাতের ও কুলের। তবু পলিটিক্যাল সিগনিফিক্যান্স সকল অ্যাকশনে সমান নয় বলেই কোন কোন শহীদের নাম বারে বারে শুনি।

এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে শহীদ আসফাকউল্লার অ্যাকশনে। তাই তাঁকে লোকচক্ষুর সামনে বারে বারে তুলে ধরতে ইচ্ছা হয়।

১৯২৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ফৈজাবাদ জেলে 'কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা'য় দণ্ডিত আসফাকউল্লা হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে মৃত্যুঞ্জয়ী হন।

তাঁর মৃত্যুবরণ সম্পর্কে রিপোর্ট হল: স্বদেশের জন্য তিনি অসাধারণ আত্মসমাহিত সাহস ও ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন। সেই সময় তাঁর সেই আচার-আচরণ, তাঁর চেহারা এবং যৌবন স্ফূর্তি তাঁর আত্মার শক্তির পরিচয়। অপরিম্লান জ্যোতি-বিভূষিত শহীদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন তিনি।

আসফাকউল্লা ও তাঁর সতীর্থদল অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বাধীনতার রূপ দিতে গিয়েই তাঁরা আত্মদানের মাধ্যমে অমর হয়ে আছেন।

তাঁরা চেয়েছিলেন এমন একদল বীরবৃন্দ সৃষ্টি করতে, যাঁদের শৌর্যে ও বীর্যে একদিন ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা আসবে। সে স্বাধীনতায় হিন্দু-মুসলমান, অর্থাৎ এক কথায় প্রত্যেকটি ভারতবাসী মুক্তির স্বাদ অনুভব করবে এবং জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাবে।

তাই তো শহীদ আসফাকউল্লার একমাত্র পরিচয়—তিনি ভারতবাসী। অথচ ধর্মকে তিনি বর্জন করেন নি, ছোট করেন নি। ইতিহাস তাঁকে খাঁটি ভারতীয়, খাঁটি মুসলমানরূপেই চিহ্নিত করে রাখবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের শ্রেষ্ঠতম সৈনিকদের একজন হিসাবে তাঁর স্থান ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

ফৈজাবাদ জেল।

ফাঁসির পূর্বক্ষণে আসফাকউল্লার আত্মীয়রা এসেছেন দেখা করতে। জেলের কন্‌ডেম্‌ড্‌ সেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হল।

আসফাকউল্লা সহজ, সুন্দর ও খুশিতে ভরপুর। আত্মীয়দের চোখে কিন্তু জলের আভাস। মরণজয়ী সে-তাপস তখন শান্তকণ্ঠে বলছেন: মানব-জীবনের এই শুভ মুহূর্তটিকে তোমরা চোখের জলে ম্লান করে দিও না।

অদ্ভুত আত্মোপলব্ধি—এ যেন এক মহান তপস্বীর বাণী।

তিনি আরও বললেন যে: স্বদেশের মুক্তি-যুদ্ধের একজন সৈনিকরূপে তিনি নিজেকে সম্মানিত বলে মনে করেন, এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদেরও গর্বিত হওয়া উচিত বলে মনে করেন, কারণ তাদেরই একজন, হয়তো কারোর ভাই, কিংবা কারোর কাকা, দেশের মুক্তির জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিচ্ছেন।

এ জাতীয়তাবোধ সাধনালব্ধ। আসফাকউল্লার হৃদয়ে কি তার অপূর্ব প্রকাশ! কোন ধর্ম সেখানে বড় নয়। প্রকৃত মানুষের ধর্ম সেখানে আপন জ্যোতিতে বিকশিত। তাই আসফাকউল্লার আত্মদানের পলিটিক্যাল সিগ্‌নিফিকান্স প্রচুর। দ্বিখণ্ডিত ভারতের নরনারী, বিশেষতঃ তরুণ সম্প্রদায়কে, আজ এর তাৎপর্য বুঝতে হবে।

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি অখণ্ড ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে দিল, তবু শান্তি কোথায়? পাকিস্তান এই ভেদবুদ্ধিকে দুষ্ট ক্ষতের মত ধারণ ও পোষণ করে বেঁচে থাকতে চাইছে—ভারতেও তার কালো ছায়া জীবনকে কখনো ঘোরালো করে দিতে চায়।

তবে আশার কথা এই যে, আসফাকউল্লার উত্তরসাধকগণ বেঁচে আছেন, এবং ক্রমশ শক্তি-সঞ্চয় করেছেন। প্রমাণ তার পাকিস্তানের জাগ্রত যুব-সম্প্রদায়—পূর্ববঙ্গের 'ছাত্র-আন্দোলন'। সে আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতা নেই, আছে জাতীয়তাবোধের তীক্ষ্ণ অনুভূতি। 'বরকৎ' প্রমুখ ছাত্রবৃন্দ শহীদ হলেন এই ছাত্র-আন্দোলনেই।

বাংলার জন্য, বাংলা ভাষার জন্য এই যে আত্মত্যাগ—এতে কোথায় গেল সাম্প্রদায়িকতা, কোথায় গেল তথাকথিত ধর্মের

বন্ধন। পূর্ব-পাকিস্তানের যুবকবৃন্দ অনায়াসে সত্য ও ন্যায়ের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন।

কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে 'বরকৎ' হঠাৎ জন্ম নেননি...জাতীয়তা-বোধের অদৃশ্য-আলোক পরিব্যপ্ত করে গেছেন আসফাকউল্লার মত শহীদগণই। এই জ্যোতিষ্মান বীরগণই যুগে যুগে এমনি আলোর ধারায় স্নান করিয়ে পূত করে দেন জাতির জীবনধারাকে। দূর করে দেন বিভেদের মূলগুলোকে।

দেশবাসীর জীবনে আজ এক অন্ধকার যুগ নেমে এসেছে। তারা হারিয়ে ফেলেছে আসফাকউল্লাকে। হারিয়ে ফেলেছে অজস্র শহীদ ও শহীদ-বাণীকে। আজ তাই ভারতের উভয়খণ্ডের মানুষেরই আসফাকউল্লার মত শহীদদের কথা বারে বারে স্মরণ করা উচিত। তবেই তো অন্ধকার-অবসানে আলোকের সন্ধান মিলবে।

কলিকাতা কংগ্রেস

মেজর সত্যগুপ্ত

[ঐতিহাসিক [illegible] মেজর সত্যগুপ্ত এক ও অভিন্ন। ভলা-ন্টিয়ার্স [illegible] তাঁর [illegible] ইতিহাসে [illegible]। পরবর্তীকালে তাঁর একটি [illegible] সৃষ্টি হয়েছিল [illegible], [illegible] মৃত্যুর পর [illegible] সুভাষচন্দ্র [illegible] এই মন্তব্যটি একটি কথাই পুনরাবৃত্তি করেছেন বার বার—'I am convinced that I met Netaji in the guise of Srimat Saradanandaji at Shaulmari Ashram.']

একথা স্বীকার্য্য যে ব্রিটিশ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙলা দেশে নিখুঁত সামরিক কায়দায় বৈপ্লবিক আদর্শ মগ্নতায় সংগঠিত স্বেচ্ছা

সৈনিক বাহিনীর প্রথম পত্তন সুভাষচন্দ্রের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' পরিচালনায়।

"আত্ম বিলোপন ও স্বার্থ বুদ্ধির মূল উৎপাটন করে, আপন হৃৎপিণ্ড আপনি উপড়ে ফেলে, আপন মস্তক আপনি ছিন্ন করে—ছিন্ন মস্তারূপে (Selfimmolation) দেশের যুব শক্তি করবে গণ সমষ্টির হিতসাধনা—জাতীয় এই শিক্ষাই বিপ্লবী-বাংলার জাগ্রত যৌবন অভিযানের চরিত্ররূপ।"

সে চরিত্র-চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে ইতিহাসের পটে আত্মোৎসর্গ আন্দোলনে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নিরবিচ্ছিন্ন ভারত সংগ্রামে ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, নেতাজী সুভাষের নেতৃত্বে, নির্দ্দেশে ও অনুপ্রেরণায়। তাই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর মত, পথ ও প্রেরণার নাম সুভাষবাদ। বিপ্লবী বাংলার বিপ্লব সংস্কৃতির নামই সুভাষবাদ। সুভাষবাদ সামগ্রিক জীবনবাদ—বিশ্বের আদর্শানুগ বাস্তবপন্থী মতবাদ।

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বেও বিপ্লবী দলগুলির সহযোগিতা ও সাহচর্যে ১৯২৮ সালে বি. ভি-র পত্তন। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বোর্ড-এ শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ জি-ও-সি সুভাষচন্দ্রের একান্ত সহযোগী সদস্য। বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে তখন 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' প্রধান। যতীনদাস অনুশীলন নেতা ৺শচীন্দ্রনাথ সান্যালের অনুগামী ছিলেন। ৺শচীন্দ্রনাথ তখন কারাবাসে। মুক্ত হয়ে জীবনের শেষাবধি তিনি সুভাষচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন। ৺শচীন্দ্রনাথের নেতা রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ সরকারে নেতাজীর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। বি-ভি-র হেমচন্দ্র, শ্রীশপাল, হরিদাস দত্ত, সত্যরঞ্জন বক্সী প্রমুখ নেতা ও কর্মীগণ সর্ব্বনিষ্ঠায় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সকেই স্বীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তাই তাঁদের আদি কথাই বিশেষ ভাবে বি-ভি-র আদি গাথা।

১৯২৮ সাল। অক্টোবর মাসে যতীনদাস স্বগৃহে ফিরে এলেন। আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশন। পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ নিয়ে যুব-ভারত

চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক স্বরাজ ও পূর্ণ স্বরাজ এই দুই আদর্শের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব চলেছে। সুভাষচন্দ্র বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এক বিরাট সুদক্ষ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আত্মত্যাগের আদর্শে গঠন করতে চাইলেন। তাই কলিকাতা অধিবেশনে বাংলার বিপ্লবী দলগুলির সহযোগিতায় 'Bengal Volunteers' সংগঠন করলেন। কলকাতার পার্কে পার্কে কুচকাওয়াজ চলছে। যতীনদাস সুভাষচন্দ্রের এই প্রচেষ্টায় অগ্রণীদের একজন। নিরলস মেজর যতীন দাস যুব সমিতিগুলিকে আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছেন। বীর সাজে সজ্জিত হয়ে সেনা-বাহিনী গড়ে তুলেছেন। স্বেচ্ছা সৈনিকদের সামরিক কায়দায় শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শেখাচ্ছেন।

বিরাট বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনী সংগঠিত হল। শত শত তাঁবুর ছাউনি পড়ে গেছে বিরাট অঞ্চল জুড়ে পার্ক সার্কাস ময়দান ঘিরে—চারিদিকে শান্ত্রী পাহারা। পূর্ণ সামরিক আবহের ভেতর অনুষ্ঠিত হল কলকাতা অধিবেশন ও জাতীয় প্রদর্শনী। গান্ধীজী ব্যঙ্গ করলেন বাহিনীকে Childrens Pantomime বলে, আর প্রদর্শনীকে বললেন, Philips Circus, কিন্তু গান্ধীজীর ব্যঙ্গোক্তি এই উভয়বিধ প্রচেষ্টাকে সারা ভারতবর্ষে জাগিয়ে তোলাকেও দমন করতে পারেনি।

বি. ভি. mass parade, march past, ও route march, সে দিন সারা ভারতে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। পার্ক সার্কাস ময়দানে স্বেচ্ছা-সৈনিকের শিবির-জীবন তখন এমনই কঠোরতাপূর্ণ ছিল যে, কর্মঠ ব্রতী-সৈনিক অনিল রায়চৌধুরী কিছুদিনের মধ্যে sunstroke-এ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই সময় ভারতের প্রতি প্রদেশে গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনের বর্শাফলকরূপে বি. ভি-র অনুরূপ Punjab volunteers, Delhi volunteers, Bombay people's Battalion, N. W. Frontier Red shirts প্রভৃতি স্বেচ্ছা-সৈনিক সংস্থা সমূহ গঠিত হয়।

বাংলার বি. ভি-র প্রধান পরিচালকদের বিরুদ্ধে আলিপুর স্পেশাল কোর্টে পরবর্তী কালে পর পর রাজদ্রোহের মামলা চলছিল। অভিযুক্ত হওয়ার কারণ ছিল--"ভগৎ সিং—যতীনদাস দিবস" উদযাপন, "নিখিল ভারত রাজনৈতিক বন্দীদিবস" পালন এবং অস্ত্র আইন অমান্য করে বি. ভি-র কলকাতা-কোদালিয়া (নেতাজীর পৈত্রিক ভবন) রুট মার্চ।

১৯৭৩ সালে শারদীয়া 'শৌলমারী' পত্রিকায় প্রকাশিত সুবৃহৎ নিবন্ধ থেকে কিছুটা অংশ ধন্যবাদ সহকারে প্রকাশ করা হল।

মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন দাস

লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

['জীবনের ফল কিছুই যাবে না ফেলা'। অন্ধ-কারার সেই দিনগুলিও ব্যর্থ হয় নি। সেই জ্বালা-ভরা স্মৃতিকেই তিনি প্রবন্ধ ও নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন বারবার।]

১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট, ভারত শতাব্দীর রক্ত ঝরা সংগ্রামের পর পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ স্বতঃই শ্বাপদসংকুল ও কণ্টকে আকীর্ণ।

ভুক্তভোগী বিপ্লবীগণ বেশ ভাল জানেন যে, আধুনিক সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত শহর ও লোকালয় হতে বিচ্ছিন্ন, সুদূর সমুদ্র-সৈকতে অবস্থিত, আন্দামান-দ্বীপের নির্জন কারাবাসে, দণ্ডভোগী রাজনৈতিক কর্মীগণের মধ্যে অনেকেই ইংরেজ রাজপুরুষদের ইঙ্গিতপূর্ণ

প্রত্যক্ষ আদেশের ফলে যে সকল অভাবনীয় অত্যাচারের সম্মুখীন হতেন, তার পরিণামে দুরন্ত 'উন্মাদ-রোগের' কবলে পড়তে হত তাদের। কেউবা আত্মহত্যা করে ঐ সকল অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য চেষ্টা করতেন।

সুদীর্ঘকালের অভাব-অভিযোগগুলির প্রতিকারের নিমিত্ত, যেমন—বন্দী-দশায় দৈনিক পত্রিকা ও পুস্তক পাঠ করবার অধিকার, লেখবার সরঞ্জামাদি পাবার ব্যবস্থা, দেশী ও সাহেব কয়েদীদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণের পরিবর্তন, অখাদ্য আহার্যের উন্নতিকরণ এবং সকল রাজনৈতিক বন্দীদিগকে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করবার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বোমা নিক্ষেপের মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী-বীর ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোগী বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত ১৯২৯ সালের ১৫ই জুন তারিখে অনশন ধর্মঘট অরম্ভ করেন।

এই অনশনের সংবাদ কারা-প্রাচীরের বাহিরে প্রকাশিত হওয়া মাত্র, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বন্দীদের অনশনের পক্ষে জনসাধারণ ও জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ সমগ্র দেশে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে তৎপর হলেন।

কর্তৃপক্ষও বিপ্লবীদের এই স্পর্ধিত উক্তরে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে তাঁদের কঠোর শাস্তি দিতে মনস্থ করলেন। এমনি এক সঙ্কটজনক মুহূর্তে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের আমৃত্যু অনশন-সংগ্রামকে আরও বলিষ্ঠ ও কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে ১৩ই জুলাই ১৯২৯ তারিখে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাপর বন্দীগণসহ বিপ্লবী যতীন দাস অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করলেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীগণ একযোগে অনশন ধর্মঘটে যোগদান করলে শাসকশ্রেণী বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং সরকারী মত পরিবর্তনের আভাস দেন।

এই মর্মে এক সপ্তাহের মধ্যে একটি সরকারী ইস্তাহার প্রচার করে তাঁরা জানালেন যে, স্বাস্থ্যের কারণে, অনশন ও ধর্মঘটীদের দাবি-দাওয়া মেনে নিতে সরকার রাজী হয়েছে।

এই সরকারী ভাষ্যের চাতুরিটুকু বুঝতে পেরে অনশন ধর্মঘটীগণ ঐ শর্তাধীন সরকারী স্বীকৃতি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং জানালেন যে, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের শর্তহীনভাবে একটি বিশেষ শ্রেণীতে ভুক্ত না-করা পর্যন্ত তাঁরা অনশন-ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন।

যতীন দাসের অনশন-ধর্মঘটের সাতদিন অতিবাহিত না হতেই লাহোর কারাগারের চিকিৎসক অনশনী যতীন দাসকে বলপূর্বক তরল আহার্য গলাধঃকরণে বাধ্য করে তাঁর অনশন-ধর্মঘট ভঙ্গ করতে আদিষ্ট হয়েছিল। সেই সূত্রে সাত-আট জন পাঠান রক্ষীসহ তিনি যতীন দাসের সামনে উপস্থিত হলেন। ইঙ্গিতমাত্র পুলিশ বাহিনী অনশনব্রতীর ওপর হিংস্র পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী, কুস্তীগীর যতীন দাস একাকী সেই সাত আট জন শক্তিশালী পাঠান শাস্ত্রীর সঙ্গে লড়ে গেলেন। কিন্তু এই অসম-যুদ্ধ কতক্ষণ চলতে পারে? তাই কিছুক্ষণ পর রণক্লান্ত যতীন দাস ভুতলশায়ী হতে বাধ্য হলেন।

এই সুযোগে চিকিৎসক কালবিলম্ব না করে যতীন দাসের নাকের মধ্যে রবারের নল ঢুকিয়ে দিয়ে নলটাকে তাঁর পাকস্থলীর দিকে ঠেলে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঐ নলের মধ্যে দুধ ঢেলে যতীন দাসকে পান করাবার চেষ্টা করলেন।

ইতিপূর্বে রাজবন্দী হিসেবে পূর্ব-বাংলার ঢাকা জেলের কারাগারে যতীন দাসের আরেকবার অনশন-ধর্মঘট করার অভিজ্ঞতা ছিল। সেই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রথমেই ভয়ানকভাবে কেশে উঠলেন এবং নাকের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট নলের প্রান্তভাগকে শ্বাস-নালীতে পাঠাতে সক্ষম হলেন।

ওদিকে চিকিৎসকও বসে নেই। নলের ভেতর তিনি যখন দুধ চলাচলের বাধা হচ্ছে বুঝতে পারলেন, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও অধৈর্য্য হয়ে আর একটি মোটা ও শক্ত রবারের নল বলপূর্বক যতীন দাসের মুখের ভেতর সহসা ঢুকিয়ে দিলেন। যুগপৎ নাক ও

মুখের ভেতর বলপূর্বক রবারের নল প্রবিষ্ট হওয়ায় যতীন দাসের দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বীর-বিপ্লবী যতীন দাস অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রইলেন।

জল্লাদ ডাক্তার ও যমদূত সদৃশ পাঠান রক্ষীদল বেরিয়ে গেলে যতীন দাসের সহযোগী বিপ্লবীগণ উদ্বিগ্নচিত্তে তার দেহ বেষ্টন করে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে আবার একদল ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন এবং যতীন দাসকে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষান্তে চিকিৎসকদের গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখে যতীন দাসের বন্ধুগণ প্রমাদ গণলেন। তারপর একধারে সরে এসে চিকিৎসকগণ জানাল যে, অনশনীর ফুসফুস বিদ্ধ হয়েছে। তাঁর জীবনের আশা অতিশয় ক্ষীণ। আরও প্রকাশ করলেন যে, অনশনব্রতীর এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় তাঁকে দ্বিতীয়বার বলপূর্বক খাদ্য গলাধঃকরণের প্রচেষ্টার ঝুঁকি নেওয়া বিশেষ বিপদজনক। এক কথায় অসম্ভব।

এইভাবে যতীন দাসের অন্তিম মুহূর্ত ক্রমশঃ নিকটবর্তী হতে দেখে ভীত শঙ্কিত চিকিৎসকগণ তাঁকে অন্ততপক্ষে একটু ঔষধ সেবন করবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন।

মৃত্যুপথযাত্রী অনশনীকে শেষ মুহূর্তে ঔষধ সেবন করাবার সনির্বন্ধ অনুরোধ-উপরোধ প্রত্যাখ্যাত হল। তারপর দেহে ও মনে সর্বশক্তি সঞ্চয় করে তিনি চিকিৎসকগণকে জানালেন যে, তিনি অনশন-ধর্মঘট ব্রত গ্রহণ করেছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও আদর্শকে সম্মুখে রেখে। সেই ব্রত উদযাপিত না হওয়া পর্যন্ত তার পবিত্রতা নষ্ট করতে পারবেন না।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রথম দিকে যতীন দাসের দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে হতে সহসা লুপ্ত হয়ে গেল। যে ওষ্ঠাধর এতক্ষণ দুর্বলভাবে কম্পিত হচ্ছিল, যে কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ জড়িয়ে আসছিল, তাও যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। পদযুগল আড়ষ্ট হতে হতে ক্রমশঃ অসাড় হয়ে এল। এই নিষ্ঠুর অসাড়তা দেহের নিম্নাংশ হতে শুরু করে

নির্দয়ভাবে ধীরে ধীরে দেহের উপরের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। সেই সঙ্গে শরীরের অবশিষ্ট যৎসামান্য মেদ ও মাংস সঙ্কুচিত হয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে যেতে শুরু করল। পড়ে রইল শুধু একটা কঙ্কাল।

এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখা যায় না। সহ্য করা আরও শক্ত। তবু তাঁর সঙ্গীরা নিশিদিন এই অকুতোভয় বীরের পাশে অতন্দ্র প্রহরীর মত বসে ছিলেন। বাঙালী কেমন করে মৃত্যুকে বরণ করে মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারে—তারই সাক্ষী হয়ে রইলেন বীর যতীন দাসের বীর সহকর্মীরা।

ওদিকে দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে অনশনী যতীন দাসের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির সংবাদ দেশবাসী আকুল আগ্রহ ও চরম উদ্বেগের সহিত পাঠ করতে লাগল। অনশন ধর্মঘটের আন্দোলন কারাকক্ষের লৌহবেষ্টনী ও উচ্চপ্রাচীর ডিঙিয়ে ক্রমশঃ ভারতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং উহার তীব্রতা বৃদ্ধি পেল।

ইতিমধ্যে যতীন দাসের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। জীবন-প্রদীপ অস্থিরভাবে কাঁপছে। ওদিকে, কারাভ্যন্তরে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ইংরেজ রাজপুরুষদের এই বর্বরোচিত হিংস্র ব্যবহারে সারা দেশময় ধিক্কারধ্বনি ও প্রতিবাদের ঝড় উঠল। সরকার এই প্রবল জনমতকে আর অগ্রাহ্য করতে সাহস করলেন না। রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বিশেষ মর্যাদা দেবার প্রশ্ন বিচার-বিবেচনা করে দেখতে রাজী হলেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে কারাগারের বিষয় পরীক্ষা করে দেখবার জন্য 'তদন্ত কমিটি' গঠনের সংবাদ ঘোষিত হল।

অনতিবিলম্বে 'পাঞ্জাব-কারাগার-তদন্ত কমিটি' অনশনরত বন্দীদের সহিত কারাগারের ভিতরে সাক্ষাৎ করলেন। আলোচনা করলেন। এই আলোচনার-পরিপ্রেক্ষিতে অনশনব্রতী বিপ্লবীগণ অনশনভঙ্গে স্বীকৃত হলেন। অনশনকাতর মৃতপ্রায় বীর যতীন দাস সম্পর্কে কমিটি স্থির করলেন যে, তাঁকে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হবে।

কিন্তু একটু পরেই ইংরেজ সরকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। জানালেন যে, এই মুক্তি 'জামিন সাপেক্ষ' হবে। বিপ্লবী যতীন দাস সরকারের এই কাপুরুষোচিত ব্যবহারে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। শর্তাধীন মুক্তিতে তিনি আগ্রহী নন। মৃত্যুই শ্রেয়।

কর্তৃপক্ষ তখন আর একটি কূটকৌশলের আশ্রয় নিলেন। তাঁরা প্রথমে যতীন দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণ দাসকে গিয়ে ধরলেন। শ্রীকিরণ দাস সরকারী প্রস্তাবের মর্মানুধাবন করে তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর সরকার এই দুরভিসন্ধির জালে বিপ্লবী যতীন দাসের পিতাকে জড়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনিও সরকারী ধূর্ততার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন না।

তথাপি ইংরাজ সরকার তার স্বভাবসিদ্ধ ঘৃণ্য চক্রান্ত থেকে নিবৃত্ত হল না। একজন অনুগত রাজভক্ত প্রজাকে দিয়ে যতীন দাসের মুক্তির অনুকূলে জামিন নামায় সাক্ষর করিয়ে যতীন দাসের শর্তাধীন মুক্তির ব্যবস্থা করলেন। সেই সূত্রে যতীন দাসকে কারাগার হতে মুক্তি দিতে অতিসত্বর এক সশস্ত্র শক্তিশালী পুলিশ-বাহিনীর সহিত একটি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি নিরীহভাবে জেল হাসপাতালে উপস্থিত হল।

অনশনরত যতীন দাসের সহযোগীগণের নিকট যখন এই তথ্য প্রকাশিত হল, তখন তাঁরা সরকারের এই সীমাহীন নীচতায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর যতীন দাসের পবিত্র সম্মান রক্ষার জন্য তাঁরা সমবেতভাবে যতীন দাসের ওয়ার্ড এর দরজার সম্মুখে লোহার খাটের ফ্রেম জড় করে প্রবেশমুখ এমনভাবে রুদ্ধ করে দিতে মনস্থ করলেন, যেন কিছুতেই যতীন দাসকে সেখান থেকে সরানো না যায়। তারপর উপস্থিত পুলিশ-বাহিনী ও হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে তাঁরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, তাঁদের মৃতদেহ অতিক্রম না করে তাঁদের একান্ত প্রিয়বন্ধু যতীন দাসকে সেখান থেকে নড়াতে পারবে না।

পুলিশ-বাহিনীর একজন পদস্থ কর্মচারী যতীন দাসের সামনে

এলেন। যতীন দাস তখন তাঁকে আকার ইঙ্গিতে এই কথা বোঝাতে সমর্থ হলেন যে, তাঁর দেহ কেউ স্পর্শ করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলে তিনি তার প্রতিরোধ করবেন। মুমূর্ষু ব্যক্তির এই অকল্পনীয় সিদ্ধান্তের কথা শুনে চিকিৎসকরা শিউরে উঠলেন। তাঁরা জানালেন যে, এই অবস্থায় তাঁকে সরাবার চেষ্টার অর্থ তাঁকে হত্যা করার সামিল। চিকিৎসকদের অভিমত শুনে কেউ আর এগোতে সাহস করলেন না।

সেই অবিস্মরণীয় দিনটি হল, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ সাল। এই ঘটনার সাতদিন পর মরণজয়ী বিপ্লবী বীরের জীবন-প্রদীপ যখন অকস্মাৎ নিভে গেল, তখন যতীন দাসের অনশনের ৬৩ দিন অতিবাহিত হয়েছে। সময়, দুপুর একটা। তারিখ, ১৩ই সেপ্টেম্বর, স্থান, লাহোর জেল-হাসপাতাল।

একটি মহান সংগ্রাম শেষ হল। কিন্তু সে সংগ্রাম অমৃত তরঙ্গে ভৈরব কল্লোলে ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে—কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত, পূর্বঘাট থেকে পশ্চিমঘাট পর্যন্ত। যতীন দাস মৃত্যু দিয়ে যে জীবন্ত সেতু সেদিন নির্মাণ করে গেলেন, পরবর্তীকালের দেশপ্রেমিক মুক্তি সেনানীরা সেই সেতু অতিক্রম করে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট নিয়ে এলেন বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

'বাংলা দেশের যুব সমাজের ভেতর থেকে সহস্র সহস্র যতীনদাস আমরা চাই, যারা তাঁর আত্মোৎসর্গের ভাবকে রূপায়িত করবে। তাঁর জাতীয় চেতনাসম্পন্ন নতুন একদল যুবক আমাদের অবশ্যই চাই, যারা তাদের ভাবী ভারতবর্ষকে নির্মাণ করবে, যে ভারতবর্ষে কৃষক, শ্রমিক নির্বিশেষে সকল নরনারী স্বাধীনতার আশীর্বাদ উপভোগ করবে।'

—সুভাষচন্দ্র

রিভোল্ট গ্রুপ

জগদীশ চট্টোপাধ্যায়

[প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা 'বিপ্লবী বাংলা' পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি। বিপ্লবী বাংলার সৌজন্যে লেখাটি আবার প্রকাশ করা হল বর্তমান গ্রন্থে]

বিপ্লবী কোনও দিনই ক্লান্ত হয়ে পড়ে না—হতাশ হয়ে পড়ে না। শত্রুর বিরুদ্ধে বিরাম বিহীন সংগ্রামেই সে বিশ্বাসী।

পরাধীনতার শৃঙ্খলকে ভেঙ্গে চুরমার করে মাতৃভূমির মুক্তি সাধনায় সে মাতোয়ারা। তাই প্রবীণেরা যে ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সংগ্রামের পদ্ধতি ও কর্মকৌশল নির্ধারণ প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্থ, সে ক্ষেত্রে নবীন বিপ্লবীরা এই সংগ্রামী কর্মসূচী নিয়েই সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করলো বিংশ শতকের বিশ দশকের শেষ প্রান্তে ১৯২৮-২৯ সালে। তারই ফলশ্রুতিতে নবীন বিপ্লবীদের উদ্যোগে বাংলার বুকে গড়ে উঠলো রিভলটিং বা অ্যাডভান্স গ্রুপ। এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম।

এর গোড়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—বিংশ শতাব্দীর বিশ দশকের গোড়ায় বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীর নেতারা সহবন্দী হয়ে মেদিনীপুর সেনট্রাল জেলে একত্র হবার সুযোগ পেয়েছেন। অনুশীলন সমিতির—ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ) নরেন্দ্র সেন, রবি সেন, প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে একই জেলে সহবন্দী হয়ে রয়েছেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী, মনোরঞ্জন গুপ্ত এবং ভূপতি মজুমদার প্রভৃতি। কারান্তরালের নিভৃতে থেকে তাঁরা

অতীতের বৈপ্লবিক কর্ম্মধারার বিচার ও বিশ্লেষণে আলোচনার মাধ্যমে স্থির করলেন, জেল থেকে মুক্তিলাভের পর যৌথ উদ্যোগে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবার থেকে নতুন উদ্যমে বৈপ্লবিক অভিযান পরিচালনা করবেন। সর্বভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার মাঝে পূর্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা যে শিক্ষা তাঁরা অর্জন করেছেন, সেই শিক্ষাকে এবার যৌথভাবে কাজে লাগাতে হবে।

১৯২৭ সনের শেষের দিকে বিপ্লবীরা মুক্তি পেলেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্মিলিত উদ্যোগে কাজ সুরু হল। জেলায় জেলায় কর্মীদের সম্মিলিত করা হল। নির্দেশ দেওয়া হল যৌথ উদ্যোগে বৈপ্লবিক কর্ম্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার। যুক্ত আলোচনা বৈঠকও বসল জেলায় জেলায়। এই কর্ম্মসূচী অনুযায়ী বিপ্লবী নেতা মনোরঞ্জন গুপ্তকে দেওয়া হল ছাত্র আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্ব। কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সারা বাংলার সম্মিলিত ছাত্রদের এক কনফারেন্স-এর আয়োজন করা হল। গঠিত হল অল বেঙ্গল ষ্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন। সভাপতিত্ব করলেন কংগ্রেসের তৎকালীন তরুণ নেতা, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু— প্রধান উদ্যোক্তা সুভাষচন্দ্র বসু। ছাত্রদের মাঝে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিতে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হল। নতুন প্রেরণায় সংগঠন এগিয়ে চলল।

১৯২৮ সাল।

কলিকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে মহাসমারোহে চলেছে প্রস্তুতি। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এবং বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীর সহযোগিতায় গড়ে উঠলো বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনী। সর্বাধিনায়ক—তথা জি, ও, সি, হলেন সুভাষচন্দ্র বসু আর বিপ্লবী সহকর্মীরা হলেন উক্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মেজর, লেফটেন্যান্ট, অ্যাড্জুটেন্ট।

কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলার সময়েই আবার দেখা দিল প্রবল মতানৈক্য। এই মতানৈক্য ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন

গণ সংগঠনের মাঝে, ছড়িয়ে পড়ল ছাত্র সংগঠনেও।

কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর রচিত খসড়া প্রস্তাবে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস বা স্বায়ত্ব শাসনের দাবী এই অধিবেশনে পেশ করা হল। এর সমর্থনে নেতৃত্বের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন মহাত্মা গান্ধী। ওই প্রস্তাবের বিরোধীতায় এগিয়ে এলেন সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবের দাবী নিয়ে। শেষ পর্য্যন্ত ভোটাধিক্যে পাশ হয়ে গেল স্বায়ত্ব শাসনের মূল প্রস্তাবটি।

জনগণের মনে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বৈপ্লবিক চেতনা, এই চেতনার প্রতি প্রবীণ নেতৃবৃন্দের অনিহা আর সেই সংগে বিপ্লবী নেতাদের মাঝে যে মতানৈক্য সুরু হল, তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল নিদারুণভাবে তরুণ বিপ্লবীদের মনে। বিকল্প নেতৃত্বের প্রয়োজন উপলব্ধিতে গড়ে উঠলো অ্যাডভান্স বা রিভলটিং গ্রুপ। অনুশীলন দলের কর্মী সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন, যতীন দাসের প্রচেষ্টায় সামিল হলেন যুগান্তর গোষ্ঠীর বরিশাল শাখা, চট্টগ্রাম দলের সূর্য সেন, বিভিন্ন জেলার বিপ্লবী গোষ্ঠীর কিছু কর্মী, মাদারিপুরের পঞ্চানন চক্রবর্তী, ঢাকার বি. ভি., শ্রী সংঘ গ্রুপ প্রভৃতিও এই সম্মিলিত উদ্যোগে এগিয়ে এল।

রংপুর প্রাদেশিক সম্মেলনের সময় যতীন দাস, সতীশ পাকড়াশী, অম্বিকা চক্রবর্তী, নিরঞ্জন সেন প্রভৃতি একত্রে মিলিত হলেন। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের একটা পরিকল্পনাও স্থির হল। স্থির হল যে, একই সময়ে, একই দিনে তিনটি জেলার অস্ত্রাগার আক্রমণ করা হবে। আন্তরিকতার সঙ্গে যদি এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, তাহলে প্রবীণ বিপ্লবীরা এবং অন্যান্য বিপ্লবী গোষ্ঠীর কর্মীরা তাঁদের এই কর্মোদ্যোগে সাড়া না দিয়ে পারবে না।

১৯২৯-এর ১৮ই ডিসেম্বর—গভীর রাত। তুষারবহন কুয়াশাচ্ছন্ন মহানগরী কলিকাতা। রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে হঠাৎ পুলিশ ভ্যানের ঘর্ঘর শব্দ আর লালমুখো সার্জেন্ট পুলিশের বুটের পদধ্বনি

রাজপথ প্রকম্পিত করে মেছুয়া বাজারে অবস্থিত বিপ্লবীদের গোপন ঘাঁটির দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত। স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের হায়েনার দল বিপ্লবীদের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রেখে চলছিল অতি সংগোপনে। ঘেরাও করলো তারা রাতের অন্ধকারে মেছুয়া বাজারে অবস্থিত বিপ্লবীদের গোপন ঘাঁটিটি। গ্রেপ্তার করল তারা সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন, রমেন বিশ্বাসকে। খানা-তল্লাসী চালিয়ে আবিষ্কার করলো লাল বৈপ্লবিক ইস্তাহার বিপ্লবীদের নাম ও ঠিকানার তালিকা। বোমা তৈরীর ফরমূলার কাগজপত্রও তারা পেয়ে গেল। রাতের অন্ধকারেই ওদের নিয়ে গেল পুলিশ হাজতে। আরও কিছু বিপ্লবীকে পুলিশী ফাঁদে ধরার প্রত্যাশায় তারা গোপনে ওৎ পেতে রইলো ওই ঘাঁটির চারপাশে।

পরের দিন অতি প্রত্যূষেই ওই ঘাঁটিতে এসে উপস্থিত হল শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত। বিপ্লবীদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে পাঠানো হয়েছিল চট্টগ্রামে কিছু বোমার সেল আর পিস্তল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। বোমার সেল আর পিস্তল বোঝাই একটা সুটকেশ নিয়ে সে চট্টগ্রাম থেকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে সোজা চলে আসে মেছুয়া বাজারে অবস্থিত গোপন ঘাঁটিতে। চারিদিক থেকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ওই হায়েনার দল ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর গ্রেপ্তার হয়ে সেও চলে গেল পুলিশ হাজতে।

তারপর এল খুলনার নির্ম্মল দাস, সেও একই ভাবে গ্রেপ্তার হল। তারপর ওই অঞ্চলে এবং গোপন ঘাঁটি থেকে উদ্ধার করা বিপ্লবীদের নাম ঠিকানা সম্বলিত তালিকা পেয়ে বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী চালিয়ে গ্রেপ্তার করল আরও অনেক বিপ্লবীকে।

আমার গ্রেপ্তারের কাহিনীটি এবার বলি। কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এবং বিপ্লবী সহকর্মীদের দ্বারা যে বাহিনী গঠিত হয়েছিল উক্ত ভলান্টিয়ার্স বাহিনীকে স্থায়ীভাবে প্রতিটি জেলায় সংগঠিত করার এক কর্ম্মসূচী গৃহীত হয়। এই কর্ম্মসূচীর দায়িত্ব দিয়ে সুভাষচন্দ্র আমায় বরিশালে যাবার নির্দেশ দেন।

কলিকাতা কংগ্রেসে গঠিত ভলান্টিয়ার্স বাহিনীর আমিও ছিলাম একজন মেজর। মেজর ছিলেন বীর বিপ্লবী সতীন দাস, সত্য গুপ্ত, হেমন্ত বসু, পঞ্চানন চক্রবর্তী। বরিশালে উপনীত হয়ে আমি জেলা ভিত্তিক স্থায়ী ভলান্টিয়ার্স বাহিনীর কাজে মনোনিবেশ করি।

এমন সময়ে সুভাষচন্দ্রের নির্দেশ এল, অবিলম্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে রওনা হতে হবে। সেখানে অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে ছাত্র আন্দোলনকে বৈপ্লবিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। সেই নির্দেশ পেয়ে আমি লাহোর অভিমুখে রওনা হই এবং লাহোর থেকে কলিকাতায় ফিরে এসে একদিন হঠাৎ বালিগঞ্জের ট্রাম ডিপোর কাছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার হই। মেছুয়া বাজার বোমা ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হল। এই মামলায় ৩২ জন বিপ্লবী যুবক হলেন অভিযুক্ত। বিচারে সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেনের হল সাত বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড, শচীন করগুপ্ত ও মুকুল সেনের ছয় বৎসর, সুধাংশু দাসগুপ্ত, রমেন বিশ্বাস, নিশাকান্ত রায় চৌধুরী প্রমুখের হল পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

মাষ্টারদা পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। মেছুয়া বাজার-এর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃতদের গ্রেপ্তারের চার মাস পর ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে হল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। এই সময় বক্সা জেলে চলছিল রাজনৈতিক বন্দী সম্মেলন। চারজন সভাপতি ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), প্রতুল গাঙ্গুলী, বিপিন গাঙ্গুলী এবং রমেশ মুখার্জী গ্রেপ্তার হলেন। গ্রেপ্তার হলেন আন্ডারগ্রাউন্ড (বি ভি) গ্রুপের বহু নেতা ও কর্মী। বাংলার বিভিন্ন স্থানে বোমার ষড়যন্ত্র সুরু হয়ে গেল। সারা বাংলায় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের জন্য চারিদিকে [illegible]।

এই সব বিপ্লবী রাজবন্দীদের জন্য বিভিন্ন স্থানে নতুনভাবে নির্মিত হল ডেটেনশান ক্যাম্প। বহরমপুর, হিজলী, ভুটানের সীমান্ত বরাবর পাহাড়ী এলাকায় স্থাপিত হল বক্সা ডেটেনশন ক্যাম্প।

আবার রাজপুতনার ধূসর মরু অঞ্চলে স্থাপিত হল দেউলী ক্যাম্প। প্রথম সারির নেতারা গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হলেও মেছুয়া বাজারকে কেন্দ্র করে সর্ব প্রথম যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল, সে পরিকল্পনা দেশের বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তারের পরও বিভ্রান্ত করতে পারেনি। আত্মগোপন অবস্থায় থেকে সেটাকে নতুন উদ্যমে সুরু করার প্রস্তুতি চললো পুরোদমে। তারাই ফলশ্রুতি দেশব্যাপী বৈপ্লবিক কর্মোদ্যম ও আন্তঃ প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র এবং টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা।

মেছুয়া বাজারে অবস্থিত গোপন বৈপ্লবিক ঘাঁটি থেকে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের যে বহ্নিশিখা একদা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, সেই বহ্নিশিখাই পরবর্তীকালে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে লেলিহান শিখার মত ছড়িয়ে পড়ল। কত ত্যাগ, কত আত্ম-বলিদান স্বাধীনতা সংগ্রামের বেদীতলে সমর্পিত হল তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। শত শত শহীদের রক্তরাঙ্গা ইতিহাসে রচিত হল নব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর গাথা।

'শোন বীর, শোন আকাশে জাগাবে ঝড়
তোমার কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলি-বন্দুক বোমার আগুনে
আজো রোমাঞ্চকর।

—কবি সুকান্ত

সূর্য সেন (মাষ্টারদা)

গণেশ ঘোষ

[চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নায়ক। জীবনের শ্রেষ্ঠভাগ কেটেছে সুদূর আন্দামানে এবং স্বদেশের বিভিন্ন কারাগারে। বিধান সভা ও লোকসভার প্রাক্তন সদস্য। বর্তমানে মার্কসবাদী নেতা হিসেবে সুপরিচিত।]

চট্টগ্রাম পাহাড়ের দেশ এবং সমুদ্রের দেশ। তাই সেখানকার মানুষও খুব কর্মঠ ও সাহসী, মনোভাবে উদার ও সহনশীল। ভূখণ্ডের সাথে সঙ্গতি রেখেই যেন সেখানকার মানুষও ঠিক সেই ভাবেই গড়ে উঠেছে।

চট্টগ্রাম মুসলমান প্রধান জেলা। তারা বংশ-পরম্পরায় জাহাজে কাজ করে, সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে। তাদের মাধ্যমেই দেশ বিদেশের উদার ভাবধারা চট্টগ্রামের মানুষের মনে সংক্রামিত হয়।

মনোভাবে উদার ও সহনশীল বলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি আজও ক্ষুণ্ণ হয়নি। সাম্প্রতিককালের আবর্তের ছোঁয়াচ লাগলেও ঐ প্রীতিতে আজও উল্লেখযোগ্য ফাটল ধরেনি। কর্মঠ, সাহসী, উদার ও সহনশীল মানুষের দেশ চট্টগ্রাম।

এই চট্টগ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন সূর্যসেন ১৮৯৪ সালে, ২২শে মার্চ এক দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে। বাবার নাম ছিল রাজমণি সেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁকে যেতে হ'য়েছিল দূর জেলা মুর্শিদাবাদে। এইখানেই পাঠকালে তিনি সেই যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। ঐ আন্দোলনের ভাবধারা সহজেই সূর্য সেনের মনকে প্রগাঢ়রূপে প্রভাবান্বিত ক'রে ফেলে।

ভারতে সেই যুগের বিপ্লবী আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তির আন্দোলন; মুখ্যতঃ সশস্ত্র সংগ্রামের পন্থায়।

সূর্য সেন পাঠ্যাবস্থাতেই স্থির সিদ্ধান্ত নেন, স্বাধীনতার সংগ্রাম শক্তিশালী করবার জন্য অচিরে একটি যথার্থ বিপ্লবীদল সংগঠিত করা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয়।

পাঠ শেষ করেই তিনি চট্টগ্রামে ফিরে আসেন এবং জীবিকার জন্য একটি হাই স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তাঁর জীবিকার পন্থা তাঁর আদর্শ অর্জনের পথে যথার্থই সহযোগী হয়েছিল।

ছেলেদের পড়াবার সময় তিনি বিদ্যালয়ের পাঠের সাথে তাদের রাজনীতির পাঠও দিতেন; বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের বিস্তারিত কাহিনীর সাথে তাদের বিপ্লবের পক্ষে অনুপ্রাণিত করতেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি স্কুলের ছাত্রদের কাছে খুবই প্রিয় ও আপন হয়ে ওঠেন। এই সময়েই সূর্য সেন ছাত্রদের এবং অন্যান্য প্রায় সকলের কাছেই "মাষ্টারদা" বলে পরিচিতি লাভ করেন।

ঐ কালে চট্টগ্রামে একটি ক্ষুদ্র গোপন বিপ্লবী দল ছিল। চট্টগ্রামে ফিরে এসেই সূর্য সেন ঐ দলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন, ঐ বিপ্লবী দল বিপ্লবী কর্মপন্থা ও বিপ্লবী সংগ্রামের অনুপযোগী। তাই তিনি নতুন এবং যথার্থ একটি বিপ্লবী দল গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেন এবং পুরাতন দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

তখন ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন চলছে। মাষ্টারদাও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং উমাতারা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে চলে আসেন। স্কুলের জন্য আর সময় দিতে হয় না বলে মাষ্টারদা দিনের সবটা সময়ই পার্টি গঠনের কাজে নিয়োগ করলেন। ফলে এক বছরের মধ্যেই চট্টগ্রামে অতি গোপনে একটি সত্যিকার বিপ্লবীদল গড়ে ওঠে।

স্কুল পরিত্যাগ করবার পরবর্তীকালে মাষ্টারদা শহরের মধ্যস্থলে দেওয়ান বাজার অঞ্চলে "সাম্যাশ্রম" বলে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা

চির উন্নত শির

ভগৎ সিং

[সাইমন কমিশন বর্জন উপলক্ষে পুলিশের নির্মম লাঠি চার্জের ফলে পাঞ্জাবের অবিসংবাদী নেতা লালা লাজপত রায় মৃত্যুবরণ করেন। ভগৎ সিং, শুকদেব, ও রাজগুরু প্রমুখ তার প্রত্যুত্তর দেন স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করে। বিচারে তিনজনকেই দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। ফাঁসির পূর্বে ভগৎ সিং এই দাবী পত্রটি পাঠিয়েছিলেন পাঞ্জাবের গভর্নরের কাছে। বিশেষ করে আগামী দিনের বিপ্লবীদের জন্য ভগৎ সিং-এর সেই দাবী পত্রটি প্রকাশ করা হল বর্তমান গ্রন্থে।]

'আমরা (ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরু) এই স্মারকলিপি আপনার অবগতি ও বিবেচনার জন্য পাঠাচ্ছি। ১৯৩০ সালের ৭ই অক্টোবর ব্রিটিশ বিচারালয়ের ট্রাইবুন্যাল আমাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। আমাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ—আমরা ইংল্যাণ্ডের অধীশ্বর জর্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম।

বিচারকরা আমাদের শাস্তি দেবার সময় দু'টি জিনিষ স্থির-নিশ্চয় করে নিয়েছিলেন। এক—তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, ব্রিটিশ এবং ভারত পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। দুই—এ যুদ্ধে আমরা ভারতের পক্ষে লড়াই করেছি এবং যুদ্ধবন্দী (Pows)।

দ্বিতীয়টি মেনে নিতে আমাদের দিক থেকে আপত্তির কোন কারণ নেই, তবে প্রথমটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলার আছে। যে যুদ্ধ চলছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে, তা কার্যতঃ কোথাও দেখা

না গেলেও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য স্বীকার করে নিয়ে আমরা মেনে নিচ্ছি যে, যুদ্ধ ঘোষণা করাই হয়েছে।

এ যুদ্ধ সম্বন্ধে আমরা আমাদের ধারণা স্পষ্ট করে বলছি। আমরা ঘোষণা করছি যে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যতদিন মেহনতী সমাজের ওপর এবং দেশের সম্পদের ওপর মুষ্টিমেয় পরভোজীদের শোষণ ও শাসন বিদ্যমান থাকবে, ততদিন এ যুদ্ধ চলবেই।

এই পরভোজীদের শ্রেণী ব্রিটিশ পুঁজিপতি বা ব্রিটিশ ও ভারতীয় পুঁজিপতির মিশ্রণ বা কেবল ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীও হতে পারে। হতে পারে ঐ শ্রেণী ভারতীয় বা মিশ্রিত আমলাতন্ত্রের সহায়তায় তাদের শোষণ অব্যাহত রাখবে। পরিণামের দিক থেকে তাতে কোন পার্থক্য নেই।

আপনার সরকার খেতাব, ধনদৌলত বা সম্মান বিতরণ করে ভারতীয় সমাজের উচ্চবর্গের কিছু লোককে এ পক্ষে টেনে নিতে সক্ষম হতে পারেন। তাদের আমরা তৃণবৎ মনে করি। আপনারা প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের নৈতিক শক্তি খর্ব করার যতই চেষ্টা করুন না কেন, আমরা অকম্পিত চিত্তে এগিয়ে যাবই।

প্রবীণ নেতৃবৃন্দ আপস মনোভাব প্রদর্শন করার ফলে স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরোধা বিপ্লবীদল সাময়িকভাবে সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন হলেও আমরা বিরত হব না।

যে-সব নেতৃবৃন্দ আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল, ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা ভুলতে পারিনে সে-সব নেতাদের, যাঁরা চরম তাচ্ছিল্যভরে তাঁদের শান্তি-আলোচনায় আমাদের যে সমস্ত মহিলাকর্মী অগ্রণী বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে নিজেদের প্রিয় ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজন হারাতে বাধ্য হয়েছেন—তাঁদের কথা উল্লেখ পর্যন্ত করেননি।

আমরা ভালভাবেই জানি, ঐ সব নেতৃবৃন্দ আমাদের অগ্রগামী বিপ্লবী-বাহিনীকে তাদের দীর্ঘকালের বস্তাপচা কাল্পনিক অহিংস

মতবাদের চরম শত্রু বলেই মনে করেন। আমাদের সেনা বাহিনীর ঐ বীরাঙ্গনারা দেশের জন্য অসাধ্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নি। তাঁরা চরম স্বার্থত্যাগ করেছেন। স্বাধীনতার বেদীমূলে তাঁরা স্বামী, ভ্রাতা, এমনকি নিজেকেও কোরবাণী করতে বদ্ধপরিকর।

সুতরাং, আপনার দালালরা চরম হীনবৃত্তিবশত ঐ সিংহিনীদের চরিত্রে কালিমা লেপন করে তাঁদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়ন করাতে আমরা মোটেই চিন্তিত নই। আমাদের যুদ্ধ চলতেই থাকবে। আমাদের এ সংগ্রাম ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করবে। হয়তো কোন এক মুহূর্তে এ সংগ্রামে আপনার সরকারের সঙ্গে অস্ত্র-বিনিময় হবে, পর মুহূর্তে আবার হয়তো এ সংগ্রাম গেরিলা-কৌশল অবলম্বন করবে।

কখনো এ যুদ্ধ দেখা দেবে জাতীয় আন্দোলন রূপে, আবার কখনো হয়তো 'শত্রুকে হত্যা করে মৃত্যুবরণ কর'—এই মনোভাব নিয়ে খণ্ডযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করবে।

আমাদের সংগ্রাম রক্তস্নাত হবে বা শান্তিপূর্ণ হবে, তা নির্ভর করে আমাদের সম্পর্কে আপনাদের পলিসি কি হবে তার উপরে। আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন্ ধরণের সংগ্রাম আপনারা আমাদের সঙ্গে করতে চান।

কিন্তু মনে রাখবেন, এ যুদ্ধ অবিরাম চলতে থাকবে; সঞ্চারিত হবে নতুন প্রাণ, নতুন শক্তি। এরপরে এ যুদ্ধ আপনাদের বিশাল শক্তি উপেক্ষা করেই পরিচালিত হবে অর্থহীন জাতিতত্ব প্রচার সত্ত্বেও। এ যুদ্ধ চলবে নতুন উদ্দীপনা, সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

এ যুদ্ধ থামবে না, যতদিন না সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যতদিন না আজকের প্রচলিত সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটিয়ে কল্যাণভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। যতদিন না বিশ্বের সমগ্র মানবসমাজে শান্তির যুগের সূচনা হয়। অতি শিগগীরই এ সমস্যা সমাধানের জন্য শেষ সংগ্রাম শুরু হবে।

পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের দিন শেষ হয়েছে। আমাদের এই সংগ্রামে যোগ দেবার আগে থেকেই এ যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমাদের মৃত্যুর পরেও এ সংগ্রাম স্তিমিত করতে পারবেন না।

ঐতিহাসিক ও বর্তমান অবস্থার অনিবার্য ও যুক্তিসঙ্গত পরিণতি এই যুদ্ধ। অতুলনীয় আত্মোৎসর্গের যে মহতী দৃষ্টান্ত যতীনদাস রেখে গেছেন, কমরেড ভগবতীচরণের করুণ কিন্তু মহান আত্মোৎসর্গের ঘটনা এবং আমাদের মহান নেতা চন্দ্রশেখর আজাদের বীরোচিত মৃত্যুবরণের যে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য—আমাদের ফাঁসির ঘটনা সেই ঐতিহ্যকে কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধ করবে মাত্র।

আমরা সুনিশ্চিত, আপনি আমাদের ফাঁসি দেবার সিদ্ধান্তকে নিশ্চয়ই কার্যকর করবেন। কারণ, শোষকশ্রেণীর এটাই একমাত্র শক্তি। দৈহিক শক্তিই যে একমাত্র ন্যায্য পন্থা—এটাই হ'ল আপনাদের আদর্শ। আমাদের বিচার-কাহিনীই আপনাদের আদর্শের প্রমাণ।

কিন্তু আমরা প্রাণভিক্ষা চাইনে। আপনার কাছে দয়াভিক্ষাও করিনে। আমরা কেবল একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আপমাদের বিচারালয়ের রায়—আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছি সুতরাং আমরা যুদ্ধবন্দী। আমরা অনুরূপ ব্যবহার পাবার অধিকারী।

তাই আমরা জানাতে চাই যে, আমাদের আপনারা ফায়ারিং স্কোয়াড দিয়ে হত্যা করুন। অন্যায় ফাঁসিকাঠে ঝুলাবেন না। অবশ্য আপনাদের বিচারকের রায় আপনি মানবেন, কি না মানবেন, সেটা দুনিয়াকে জানাবার দায়-দায়িত্ব আপনার।

আমরা আশা করি এবং আপনাকে অনুরোধ করি—আপনার সামরিক বাহিনীকে আদেশ দিন, তারা যেন ফায়ারিং স্কোয়াড পাঠিয়ে আমাদের গুলি করে হত্যা করে।—

ইতি ভগৎ সিং।'

শৈলেশ দে-র 'গান্ধীজী ও নেতাজী' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

ইতিহাস কই?

নিকুঞ্জ সেন

[বি. ভি-র এ্যাকশন স্কোয়াডের সদস্য। রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের বীর বাদল এরই হাতে গড়া শিষ্য। সুলেখক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বক্সার পরে দেউলি'।]

স্বাধীনতা-সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সংগ্রামের ইতিহাস আজও রচিত হল না। বহু বর্ষব্যাপী এই মহাসংগ্রামে কত কিশোর যে প্রাণবলি দিয়েছে, 'কত মাতা দিল প্রাণ উপড়ি, কত বোন দিল সেবা, তার হিসাব কে রাখে।

এ-কথা আজ কে না জানে যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে দুটি কর্মধারা ভারতবর্ষে পাশাপাশি চলেছে—একটি অহিংস, আর একটি সহিংস। অহিংস আন্দোলনের জনক ও নেতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, আর সহিংস সংগ্রামের নেতা সুভাষচন্দ্র। মহাত্মাজীর সঙ্গে ছিলেন অহিংসায় একান্ত বিশ্বাসী কংগ্রেসের বহু নেতা ও কর্মীবৃন্দ, আর সুভাষচন্দ্রের পেছনে ছিলেন বাংলা, তথা সারা ভারতের বিপ্লবপন্থীরা। এই দুটি কর্মধারা গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপূর্ণ রূপ।

এই সত্যকে অস্বীকার করে যাঁরা সে ইতিহাস রচনা করতে চান, তাঁরা অন্ধ। তাঁদের রচিত ইতিহাস আর যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়। \স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা জীবন পণ করেছিলেন, অনায়াসে যাঁরা মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন,

দুঃখকে জয় করে দুঃখাতীতের মুক্তির সন্ধানে অভিযাত্রী হয়েছিলেন, তাঁদের নিয়েই তো ভারতবর্ষ। তাঁদের বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস তা ইতিহাসের ভগ্নাংশ মাত্র, ইতিহাস নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যদি ভারতবর্ষই না রইল তবে সে কিসের ইতিহাস, কার ইতিহাস ?

শহীদ-তীর্থ এই বাংলাদেশ। বাংলার মাটি, বাংলার জল অগণিত শহীদের কল্যাণস্পর্শে পবিত্র। উত্তরে দার্জিলিং থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূল ভাগ পর্যন্ত, পশ্চিমে মেদিনীপুর থেকে পূর্বে সুদূর চট্টগ্রাম পর্যন্ত, শহীদদের রক্তে পূত হয়ে আছে বাংলার প্রাচীর ও প্রান্তর, রঞ্জিত হয়ে আছে বাঙালীর জয়যাত্রার পথ। মৃত্যু-চিহ্নিত এই পথেই বাংলার যুগান্তের তপস্যা, মানুষের মুক্তি-তীর্থে বাঙালীর দুঃসহ অভিযান।

সেই মুক্তি-তীর্থ আজও পড়ে আছে অনেক দূরে, সে অভিযাত্রা আজও অসম্পূর্ণ। তাকে সম্পূর্ণ করবার দুস্তর তপস্যায় আর একবার তাকে ধ্যানমগ্ন হতে হবে, আর একবার বাঙালীকে 'বাঙালী' হতে হবে। তবেই মুক্তি-তীর্থের দুয়ার খুলবে, শুধু বাংলার মুক্তি নয়, শুধু ভারতবর্ষেরও নয়, সমগ্র মানুষের মুক্তিই সেই মুক্তি-তীর্থের আরতি। বাংলার শহীদদের জীবন-কাহিনী সেই মুক্তি-তীর্থেরই নিশানা। এই কথা মনে রেখেই আমরা কয়েকটি তরুণ জীবনের অনির্বাণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করছি।

যাঁদের বিপ্লবী জীবন-কথা নিয়ে এই স্মৃতিচারণ, তাঁরা 'মুক্তি-সঙ্ঘ' তথা উত্তরকালের 'বি. ভি.' দলের সদস্য। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা হেমচন্দ্র ঘোষ। ১৯০৫ সালে মাত্র কয়েকটি সভ্যকে নিয়ে তিনি মুক্তি-সঙ্ঘের গোড়াপত্তন করেন। এঁদের মধ্যে মুক্তি-সঙ্ঘের কলকাতা শাখার দায়িত্ব ছিল শ্রীশ পালের ওপর।

রডা ষড়যন্ত্র

১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত হেমচন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের দল গঠনে তৎপর হয়ে ওঠেন।

এই ক'বছরের চেষ্টায় অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলির সঙ্গেও মুক্তি-সঙ্ঘের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

১৯১৪ সালে রডা-অস্ত্র অপসারণ ষড়যন্ত্রে এই সহযোগিতার পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা দেখতে পাই। সে বছর যতীন মুখার্জী, বিপিন গাঙ্গুলী, হরিশ শিকদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রেরণায়, মুক্তি-সঙ্ঘের শ্রীশ পালের প্রস্তাবনা ও পরিকল্পনায় যে অসম্ভব সম্ভব হল, তার তুলনা কোথায়?

*** নন্দলাল হত্যা।**

শুধু রডা অস্ত্র অপসারণ নয়, ১৯০৮ সালে নন্দলাল হত্যাও শ্রীশ পালের এক দুঃসাহসিক কীর্তি। সেদিন নন্দলাল হত্যার ব্যাপারেও শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গী ছিলেন আত্মোন্নতি দলের রণেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

এইভাবে দুঃসহ অভিযানে নিশ্চিন্ত পদক্ষেপ করে মুক্তি-সঙ্ঘ বিপ্লবী ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হেমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এই মুক্তি-সঙ্ঘই উত্তরকালে 'বি-ভি' নামে বিপ্লবী ভারতে পরিচিত। এই নামের সঙ্গে ১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নামটির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই কারণেই পুলিশ ১৯৩০-৩৪ সালের বিপ্লব আন্দোলনের সময় এই দলের কর্মীবৃন্দকে 'বি.ভি' নামে চিহ্নিত করেছে।

*** বি. ভি'র শহীদ**

এই 'বি. ভি'র শহীদদের মধ্যে আছেন নৃপেন দত্ত, বীরেন রায়চৌধুরী, বিনয়কৃষ্ণ বসু, বাদল (সুধীর) গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, অনাথ পাণ্ডা, মৃগেন দত্ত, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ, নবজীবন ঘোষ, মতি মল্লিক, সন্তোষ বেরা, ভবানী ভট্টাচার্য, হৃষিকেশ সাহা, অসিত ভট্টাচার্য, প্রবোধ মজুমদার, জ্যোতির্ময় ভৌমিক, শচীন কর, গোপাল সেন (ছোট) ও অমলেন্দু ঘোষ (খোকন)।

• নৃপেন দত্ত ও বীরেন রায়চৌধুরী

নৃপেন দত্ত ও বীরেন রায়চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন শত্রুকে আঘাত হানতে গিয়ে নয়, দলের নির্দেশে একটি দুরূহ সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করতে গিয়ে।

১৯৩০ সালের মে-মাস। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট যেদিন প্রকাশ হবার কথা, সেদিন সারা ভারতবর্ষে প্রতিবাদের ঝড়। তারই ভূমিকা স্বরূপ একই সময়ে, একই দিনে সমগ্র দেশের টেলিগ্রাফের তারগুলি কেটে ফেলা হবে। অবশ্য এই অনুরোধ বিপ্লবীদের কাছে আসে কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোন বিশিষ্ট নেতার কাছ থেকে। বিপ্লবীরা এ অনুরোধ পালন করতে রাজী হন, কারণ তাঁদের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে এই কর্মপ্রচেষ্টায় কিছুমাত্র অসঙ্গতি ছিল না।

এই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করিবার দায়িত্ব কিছুটা 'বি. ভি'-কেও গ্রহণ করতে হল। স্থির হল যে বিক্রমপুর অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় এ কাজ করবে বি. ভি.। উত্তরবঙ্গে কোন কোন অঞ্চলের দায়িত্বও বি. ভি.-কেই গ্রহণ করতে হয়েছিল। উত্তরবঙ্গে এই কাজের জন্যে নির্বাচিত হলেন নৃপেন্দ্র দত্ত ও বীরেন রায়চৌধুরী। তাঁরা যথাসময়ে ঢাকা থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও যন্ত্রপাতি নিয়ে রওনা হলেন, কিন্তু গৃহে আর তাঁদের ফেরা হল না।

পরিকল্পনানুযায়ী কয়েক স্থানে তার কাটা শেষ করে গভীর রাত্রিতে তাঁরা রেলপথ ধরে আস্তানায় ফিরছিলেন।

এমন সময় অকস্মাৎ পিছন থেকে একটি মালগাড়ি এসে পড়ল। সরে দাঁড়াবার মত অবসরও পেলেন না তাঁরা। সেই মুহূর্তে চলন্ত ট্রেনের চাকার নীচে দুটি তরুণের প্রাণ সহসা নির্বাপিত হয়ে গেল, যে প্রাণের কোন তুলনা নেই। কর্তব্যের আহ্বানে এমনি কত মৃত্যু যে সংঘটিত হয়েছে আয়োজনকে সার্থক করবার জন্যে, তা কে জানে?

* বিনয়-বাদল-দীনেশ

বিনয়-বাদল-দীনেশ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনটি অবিস্মরণীয় নাম। ১৯৩০ সালে ব্রিটিশসিংহ যখন পাশবিক শক্তির দম্ভে বাংলা, তথা সমগ্র ভারতের আত্মশক্তিকে পঙ্গু করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করল, তখন এই তরুণ সেনানীত্রয় কলকাতার বুকে, প্রকাশ্য দিবালোকে, সম্মুখ সমরে আহ্বান জানিয়েছিল নির্লজ্জ সে পশু-শক্তিকে। ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর সেই দুঃসাহসিক অলিন্দ-যুদ্ধ ব্রিটিশ-শক্তির মনে যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল তা বোধহয় তারা কোনদিন ভুলতে পারেনি।

* লোম্যান নিধন

অলিন্দ-যুদ্ধের অধিনায়ক বিনয়কৃষ্ণ বসুর বৈপ্লবিক-জীবনের সঙ্গে আরো একটি দিনের স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সে দিনটি ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট। এই দিন বিপ্লবীর বেশে প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে বিনয়কৃষ্ণ বসুর প্রথম আবির্ভাব। মেডিকেল স্কুলের ছাত্র বিনয় সুদক্ষ ও জনপ্রিয় টেনিস খেলোয়াড়। শান্ত, স্বল্পভাষী। এই ছিল এতদিন তার পরিচয়। কিন্তু ২৯শে আগস্ট মানুষের সে ভুল ভেঙে গেল। সেদিন বিনয়ের হাতে টেনিস-র‍্যাকেটের বদলে ছিল রিভলবার, টেনিস-বলের বদলে বুলেট।

২৯শে আগস্ট রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিনয় শুনল যে, সকাল ন'টায় লোম্যান সাহেব আসবে হাসপাতালে অসুস্থ বার্ড সাহেবকে দেখতে। ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মিঃ লোম্যানের ঢাকায় আগমনের সংবাদ বি. ভি-র নেতৃবৃন্দ আগেই পেয়েছিলেন। বিনয়ের ওপর আদেশ—লোম্যান যেন অক্ষতদেহে ঢাকা শহর থেকে ফিরে যেতে না পারে। দলের আদেশ পালনের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত—বিনয় কিছুতেই এই সুযোগ হাতছাড়া করবে না, এই তার সঙ্কল্প। যথাসময়ে প্রস্তুত হয়ে বিনয় উপস্থিত হল মিটফোর্ড হাসপাতালে।

তার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। বিনয়ের গুলির আঘাতে মিটফোর্ড হাসপাতালের বারান্দায় পুলিশ ইন্‌সপেক্টর জেনারেল লোম্যান ও ঢাকার কুখ্যাত পুলিশ সুপার হড্‌সন হল ধরাশায়ী। সকাল ন'টায় কঠোর পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করে সমবেত জনতাকে সচকিত করে এই দুঃসাহসিক কার্য অনায়াসে সম্পন্ন করার পর বিনয় বেরিয়ে এল হাসপাতাল-প্রাঙ্গণ থেকে শান্ত পদক্ষেপে, একান্ত নীরবে। চক্ষের নিমেষে কেউ কিছু বোঝবার আগেই কার্য সমাধা। সকলের সংবিৎ যখন ফিরে এল, তখন এই রোমাঞ্চকর নাটকের দুর্ধর্ষ নায়ক আর রঙ্গমঞ্চে নেই। সে তখন অনেক দূরে, নিশ্চিত, নিরাপদ আশ্রয়ে।

আর একটি চরিত্রের কথা এখানে উল্লেখ না-করলে এ কাহিনী থাকবে অসম্পূর্ণ—তিনি সুপতি রায়। তাঁর উপরই ভার ছিল এ অভিযানকে পরিপূর্ণ সার্থকতার পথে নিয়ে যাবার। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও হল, কিন্তু তারপর? বিনয়কে অবিলম্বে ঢাকা শহর থেকে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে না পারলে স্বস্তি নেই। অথচ ঢাকা শহরের সর্বত্র পুলিশের বেষ্টনী।

সুপতি রায় স্থিতধী। কোন প্রতিকূল অবস্থাতেই তাঁকে কেউ বিচলিত হতে দেখে নি। কলকাতা হতে দলের নেতৃপক্ষ নির্দেশ দিলেন—নাটক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অধিনায়ক বিনয়কে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। অন্যের উপর এ গুরুদায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তাই সুপতি নিজেই এগিয়ে এলেন। তারপর দরিদ্র মুসলমানের বেশে কখনো ওরা নৌকাপথে, কখনও বা স্টীমারে, আর কখনোও ট্রেনে বিনয়কে তিনি যেভাবে কলকাতায় নিয়ে আসেন, সে কাহিনী শুনলে মনে হবে 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফ্রিকশন!'

দমদম স্টেশনে নেমে সুপতি রায় প্রথমে আসেন ৭নং ওয়ালিউল্লা লেনে। সেখানে হরিদাস দত্ত বিনয়কে নিয়ে কিছুদিনের জন্য গেলেন কলকাতার বাইরে। কিছুদিন পরে আবার তাঁরা ফিরে

এলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে বিনয় দুমাস বেলেঘাটায় ছিল। তারপর রাজেন গুহ মহাশয়ের বাড়িতে মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে। এই আস্তানাতেই বিনয়কে শেষপর্যন্ত রাখা হয়।

* রাইটার্স বিল্ডিংস্ অভিযান

এদিকে রাইটার্স বিল্ডিংস্ অভিযানের পরিকল্পনা ও আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। স্থির হল, বিনয়ই এই অভিযানে নেতৃত্ব করবে, আর তার সংগ্রাম সাথীরূপে একদিকে থাকবে দীনেশ গুপ্ত, অন্যদিকে বাদল। তারিখ ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩০। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী বিনয় এল মেটিয়াবুরুজ থেকে খিদিরপুরের পাইপ রোডের মোড়ে, শ্রীরসময় শূরের সঙ্গে। সেখানে অপেক্ষা করছিল দীনেশ গুপ্ত ও বাদল (সুধীর) গুপ্ত। কিছুক্ষণ আগেই ওরা এসেছে পার্ক সার্কাস আস্তানা থেকে।

রাস্তার ওপরেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। সেই ট্যাক্সিতে তারা যখন রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ পৌঁছলেন, তখন বেলা প্রায় বারোটা। ট্যাক্সি বিদায় করে তারা সটান চলে এল দোতলায়। কারাগারের সর্বাধিকর্তা কর্ণেল সিম্পসনের ঘরের কাছে এসে বেয়ারার হাতে বাদল একটি ভিজিটিং কার্ড দিল। কার্ড নিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢোকামাত্র তার পেছনে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল বিনয়, বাদল ও দীনেশ। সঙ্গে সঙ্গে বিনয় আদেশ দিল—'হ্যাণ্ডস আপ!' এবং পরের আদেশ—'ফায়ার!'

মুহূর্তের মধ্যে অগ্নিনালিকা গর্জন করে উঠল। দেখতে দেখতে চিৎকারে, আর্তনাদে, কোলাহলে সমস্ত রাইটার্স বিল্ডিংস্ যেন ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠল। কে ঘর থেকে বেরুবে, আর কে বেরুবে না, কে দরজা খুলবে, আর কে খুলবে না, কে কোথায় লুকাবে, প্রাণভয়ে কে কোথায় পালাবে, এই নিয়ে সমস্ত রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ এক তুমুল কাণ্ড বেঁধে গেল। গুলির আঘাতে অস্ফুট স্বরে 'ওঃ মাই গড্!' বলে কর্ণেল সিম্পসন সেই যে ধরাশায়ী হলেন আর উঠলেন না।

বিনয়-বাদল-দীনেশ তখন কর্নেল সিম্পসনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দা-সংলগ্ন প্রায় সবগুলি ঘরেই হানা দেয়। জুডিশিয়াল সেক্রেটারী মিঃ নেলসন তো উপায়ান্তর না দেখে টেবিলের নীচে ঢুকে ওয়েস্ট পেপার বাসকেটের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিলেন। উঃ, আত্মরক্ষার সে কি আকুল চেষ্টা! কিন্তু এত করেও আহত হলেন নেলসন, আহত হলেন পলায়নপর টয়নাম প্রভৃতি ইংরেজ আই-সি-এস দল। ইতিমধ্যে সশস্ত্র বিরাট পুলিশবাহিনী রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ এসে পড়েছে। বিনয়-বাদল-দীনেশ ততক্ষণে পাসপোর্ট অফিস আক্রমণ করেছে। নবাগত বিরাট পুলিশ-বাহিনীর সঙ্গে বীর যোদ্ধাদের সংগ্রাম বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি, কেন না অস্ত্রবল ওদের সামান্যই ছিল। কিন্তু, মনোবলে তারা অপরাজেয়।

তাই তো দেখি, বুলেট যখন প্রায় নিঃশেষিত, তখন বিনয়ের আদেশে তিনজনই গিয়ে ঢুকে পড়ে একটি ঘরে। সংগ্রাম শেষ। এসেছে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করবার মহালগ্ন। শত্রুর হাতে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী হবে না—এই ছিল তাদের সঙ্কল্প। তাই পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী স্ব স্ব স্থান দখল করে পটাসিয়াম সায়ানাইড খাওয়ার জন্যে তারা প্রস্তুত হল। বিষের এ্যামপুল মুখে দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাদলের মৃত্যু হল। কিন্তু দীনেশ ও বিনয় তখনও জীবিত। সায়ানাইড মুখে দিয়েও তারা মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি, তাই মুখের মধ্যে রিভলবারের নল ঢুকিয়ে দিয়ে তারা নিজের হাতেই ট্রিগার টিপে দিল। সমস্ত রাইটার্স বিল্ডিংস্ কেঁপে উঠল। বিপ্লবীদের অস্ত্র আর একবার গর্জন করে উঠল, তারপরেই সব নিস্তব্ধ।

এত করেও কিন্তু শেষপর্যন্ত মৃত্যুর সান্নিধ্য লাভ করতে পারল না ওরা। জীবনদীপ নিভতে নিভতেও নিভল না।

হয়তো এরও একটা প্রয়োজন ছিল। তাই বিনয় বেঁচে রইল আরও পাঁচদিন। দীনেশ সাত মাস। সেই পাঁচটি দিনে বিনয়ের বিপ্লবী জীবনের যে-চিত্র জনসমক্ষে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তা যেমন

একদিকে মর্মান্তিক, অপরদিকে তেমনি প্রোজ্জ্বল। নির্যাতনে নির্যাতনে মুমূর্ষু সৈনিকের বিপ্লবী প্রতিরোধকে পঙ্গু করে দেবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে বিনয় ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়েছে। বিনয়ের মুখ দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করবার জন্যে সেদিন তার উপর যে পাশবিক আচরণ ইংরেজ সরকার করেছিল, তা দেখে বিশ্বের সমগ্র পশুশক্তিরও সেদিন লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেদিনের সে নিষ্ঠুরতা আপন অহমিকায় যত উদগ্র হয়ে উঠেছে, মৃত্যুপথযাত্রী বিনয়ের সঙ্কল্পও সেই সঙ্গে দুর্জয় হয়ে ওঠে। বিনয়ের দুর্নিবার প্রাণশক্তির কাছে হার মানতে হল ইংরেজের পশুশক্তিকে।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩০। রাত্রি শেষপ্রহরে বিনয়ের জীবন-দীপ নিভে গেল। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়—'দি ডার্কেস্ট আওয়ার বিফোর ডন।' অন্ধকারের ওপারেই তো আলোকের মহাতীর্থ।

দীনেশ শেষপর্যন্ত বেঁচে উঠল। মহাসমারোহে বিচারও হল। বিচারকর্তা সরকার গঠিত একটি স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল, আলিপুরের সেসন জজ তার সভাপতি। বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হল দীনেশ।

এই দণ্ডাদেশের পর তিনমাস দীনেশ বেঁচে ছিল আলিপুর জেলের কনডেম্‌ড্‌ সেলে। সে সেল আজ ভারতবর্ষের প্রাণতীর্থ। এই পাষাণ-প্রাচীরের অন্তরালে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে দীনেশের যে গভীর উপলব্ধি, তা আজ সমগ্র জাতির বিপ্লবী দর্শন। সেল থেকে লেখা দীনেশের চিঠিগুলো যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। মৃত্যুকে এমন সহজভাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলেই মৃত্যু তাঁর কণ্ঠে জীবনের জয়মালা পরিয়ে দিয়ে তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। অমৃতের পুত্র মোরা—ভারতবর্ষের এই শাশ্বত বাণী বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে শহীদদের আত্মত্যাগে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

'অমৃতের পুত্র মোরা'—কাহারা শুনাল বিশ্বময়
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।

ভৈরবের আনন্দেরে দুঃখেতে জিনিল কে রে
বন্দীর শৃঙ্খল ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।'

বলতে পারি না রবীন্দ্রনাথের এটা প্রশ্ন, না উত্তর। যদি প্রশ্ন হয়ে থাকে, তবে বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখ ভারতবর্ষের জানা-অজানা, অগণিত শহীদের জীবন ও মৃত্যুই এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর।

১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করল দীনেশ গুপ্ত। সে দৃশ্য ভোলবার নয়। দৃঢ়, নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে দীনেশ মঞ্চের দিকে অগ্রসর হল। এ যেন বহু-প্রতীক্ষিত বন্ধুকে আলিঙ্গনের জন্য বন্ধুর অভিসার। মঞ্চে অবতীর্ণ হল নায়ক। প্রেক্ষাগৃহে আলো নিভে গেল, কিন্তু মুহূর্তের জন্য! পরমুহূর্তেই আলো আবার জ্বলে উঠল অমর জ্যোতির লেখায়। সে আলো জ্বলতে লাগল অনির্বাণ শিখায়! মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন 'আমার জীবনই আমায় বাণী।' আর আমরা বলি, 'দীনেশের মৃত্যুই তাঁর বাণী।'...

* মেদিনীপুর

১৯৩০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন দুর্বার গতিতে ছড়িয়ে পড়ল দিক থেকে দিগন্তরে। ইংরেজ সরকার পাগল হয়ে উঠল। একদিকে আইন-অমান্য আন্দোলন, অপরদিকে বিপ্লবীদের অস্ত্রাঘাত —এই দ্বিমুখী অভিযানের চাপে ইংরেজ যখন দিশাহারা হয়ে পড়ল, তখন সভ্যতার যে সামান্যতম মুখোশটুকু তার ছিল, তাও খুলে ফেলে দানবের বিকট মূর্তিতে সে আবির্ভূত হল। অত্যাচারে, উৎপীড়নে, আঘাতে, অপমানে সে ভারতবর্ষের উদ্বেল যৌবনকে পঙ্গু করতে কৃতসঙ্কল্প হল।

সর্বগ্রাসী এই চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াল এবার মেদিনীপুর। মেদিনীপুরের একটা বৈপ্লবিক ঐতিহ্য আছে। শহীদ ক্ষুদিরাম, ফাঁসীর সত্যেন যে মেদিনীপুরকে জীবনতীর্থে পরিণত করেছেন, সে মেদিনীপুর তো অসত্য ও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে পারে না। তাই অত্যাচার যখন উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে, নির্যাতন

যখন আকাশচুম্বী—তখনই তাকে চরম আঘাত হানতে এগিয়ে এল মেদিনীপুরের বিপ্লবীশক্তি। আইন-অমান্য আন্দোলন যতই তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠেছে, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পেডির অত্যাচার ততই বীভৎস আকারে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। পেডি সদর্পে ঘোষণা করলেন, মেদিনীপুরকে এমন শিক্ষা দেব, যা সে কোনদিনই ভুলতে পারবে না। সত্যিই মেদিনীপুর সে শিক্ষা ভোলে নি—ভোলে নি বলেই একদিন মেদিনীপুরের দুই তরুণের হাতে পেডিকে জীবন দিয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।

* পেডি হত্যা

তারিখটি লেখা রইল স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে: ৭ই এপ্রিল, ১৯৩১। সেদিন পেডি এসেছেন জেলা স্কুলে একটি শিক্ষাপ্রদর্শনীর আমন্ত্রণে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হারিকেনের স্তিমিত আলোকে পেডি নিবিষ্টচিত্তে একের পর এক ছবি দেখে যাচ্ছেন, অকস্মাৎ গর্জন করে উঠল বিপ্লবীর হাতের অস্ত্র। পেডির রক্তাক্ত দেহ পড়ল ধুলায় লুটিয়ে। সকলের সম্মুখে অনায়াসে পেডি-হত্যা নিমেষে সম্পন্ন হয়ে গেল। যাঁরা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী, তাঁরা রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চুপিসারে সে-স্থান ত্যাগ করে তখন অনেক দূরে। পুলিশ ওদের ধরতে পারা তো দূরের কথা, কে তারা, তাও বুঝতে পারল না কেউ। পেডিকে হত্যা করে মেদিনীপুরের দুই তরুণ বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষ। পরিচিত একটি বালকের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যাওয়ায় বিমলের নাম রাষ্ট্র হয়ে গেল, কিন্তু জ্যোতিজীবন যে এই দুঃসাহসিক কর্মে লিপ্ত ছিলেন, তা পুলিশ কোনদিনই জানতে পারে নি।

* কানাই ভট্টাচার্য ও গার্লিক হত্যা

তারপর প্রায় ছয় মাস বিমল দাশগুপ্ত অন্ধকারে গা-ঢাকা দেয়; তার নাম আর একবার প্রচারিত হয় গার্লিক-হত্যাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সে হত্যাকাণ্ডের নায়ক কানাই ভট্টাচার্য, বিমল দাশগুপ্ত নয়।

গার্লিক-হত্যার কথা এখানে না বললে এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকবে। দীনেশ গুপ্তের বিচারের জন্য যে স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়েছিল, তার সভাপতি ছিলেন গার্লিক। তিনিই দীনেশ গুপ্তকে মৃত্যুদণ্ড দেন। সেদিন দীনেশ গুপ্তের বিচার তিনি করেছিলেন। আর ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে কিছুদিন পরে তাঁর বিচার করেছিলেন দীনেশ গুপ্তের বন্ধুর পথের বন্ধুরা। বিচারে তাঁর প্রতিও মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা হল। ১৯৩১ সালের ২৭শে জুলাই, আলিপুর সেসন জজের কোর্টে প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে বিপ্লবী বীর কানাই ভট্টাচার্য। তাঁর পকেটে একটি ছোট কাগজ পাওয়া গেল। লেখা 'ধ্বংস হও, দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসি দেওয়ার পুরস্কার লও। ইতি—বিমল গুপ্ত।'

কার্য সমাধা করে কানাই ভট্টাচার্য সকলের অজ্ঞাতেই বীরের 'ইচ্ছামৃত্যু' বরণ করেন। নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন করে দেশ ও জাতির প্রয়োজনে এমন নিরাসক্ত আত্মবিলুপ্তি সত্যই দুর্লভ।.... কানাই ভট্টাচার্য বিপ্লবী নেতা শ্রদ্ধেয় সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে-গড়া কর্মী। সাতকড়িবাবুই তাঁকে এই কাজে পাঠান।

১৯৩১ সালে ২৯শে অক্টোবর আবার বিমল দাশগুপ্তের দেখা পাওয়া গেল। এবার তাকে দেখলাম ইয়োরোপীয় বণিক-সভার সভাপতি ভিলিয়ার্স-এর আক্রমণে। সেকালে ইয়োরোপীয় বণিক-সভা ছিল একান্ত প্রতিক্রিয়াপন্থী, দেশময় পুলিসী নির্যাতনের ধারক ও বাহক। এই কারণেই ভিলিয়ার্স-এর দণ্ডদানের ব্যবস্থা হয় এবং দণ্ডদানের ভার পড়ে বিমল দাশগুপ্তের উপর। বিমল দাশগুপ্তের গুলির আঘাতে ভিলিয়ার্স আহত হলেন বটে, কিন্তু সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেয়ে গেলেন। বিচারে বিমলের ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

পেডি-নিধন ভারতবর্ষের ইংরেজদের মধ্যে দারুণ বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। তারা এত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে কোন বাঙালী যুবককে পাশে দেখলেই চমকে উঠত। বিপ্লবী দলগুলির প্রতি তাদের সেদিনের মনোভাবকে ঠিক মনুষ্যোচিত বললে ভুল বলা

হবে। স্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান প্রভৃতি পত্রিকা তো খোলাখুলি বলতে শুরু করল, 'না, না, এদের প্রতি কোন সভ্য আচরণ নয়, কোন সদয় ব্যবহার নয়, কোন বিচার-বিবেচনা নয়। সন্দেহ যার প্রতি হবে, তাকেই প্রাচীরের গায়ে দাঁড় করিয়ে গুলির আঘাতে হত্যা করা হোক।'

তা না হয় হবে। কিন্তু তাতেই কি শান্ত হবে মেদিনীপুর? শান্ত হবে বাংলা, তথা সমগ্র ভারতবর্ষ? ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, অস্ত্রবল তাদের অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে অন্যায় সমরে জয়-পরাজয়তো শুধু সংখ্যায় নহে, শুধু অস্ত্রবলের প্রাবল্যে নহে, প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে। এই প্রাণ প্রাচুর্যের অভাব কোনদিন ছিল না বাংলাদেশে, কোনদিন ছিল না মেদিনীপুরে। তাই মেদিনীপুর সঙ্কল্প করল, পেডির মৃত্যুদণ্ডই শুধু শেষ কথা নয়। পেডির মত যে দানব জেলাশাসক মেদিনীপুরে আসবে, পেডির মতই তাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মেদিনীপুরকে যারা ছাড়েনি, মেদিনীপুরও তাদের ছাড়বে না। বাংলাদেশকে যে-শিক্ষা ইংরেজ দিতে চেয়েছিল, বাঙালী তাদের সেই শিক্ষাই কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দেবে—এই ছিল মেদিনীপুরবাসীর সিদ্ধান্ত।

*** ডগলাস নিধন**

এই সিদ্ধান্তের সার্থক রূপায়ণ দেখা গেল ১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল। এবার মেদিনীপুরের দ্বিতীয় জেলাশাসক ডগলাসের পালা। সেদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই মেদিনীপুরবাসী শুনল ডগলাস নিহত, ক্ষুদিরামের মেদিনীপুর তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। জেলাবোর্ডের সভায় সশস্ত্র পাহারার মধ্যে এই হত্যাকাণ্ড নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। তখন অপরাহ্ন। ঘড়িতে ৫-৪৫। এই অভিযানের নায়ক ছিলেন প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও প্রভাংশু পাল। প্রভাংশুকে পুলিশ ধরতে পারেনি, প্রদ্যোৎও তাদের নাগালের প্রায়

বাইরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তার অস্ত্রটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় ধরা দিতে বাধ্য হয়। পকেটে ছিল ছোট্ট একটি কাগজ, তাতে লেখা : 'হিজলী অত্যাচারের ক্ষীণ প্রতিবাদ'।

১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর নিরস্ত্র অসহায় বন্দীদের উপর গুলি বর্ষিত হয়। গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন রাজবন্দী সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত। তা ছাড়া বিশজন রাজবন্দী গুরুতররূপে আহত হন। এই বর্বরতার বিরুদ্ধে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল তা কারও অবিদিত নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ··· ?'

কবির এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি—ভগবান ক্ষমা করিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু বাংলার বিপ্লবীরা তাদের ক্ষমা করেনি। তারা জানত, ক্ষমা করে অসুরকে নিবৃত্ত করা যায় না। অসুরকে শায়েস্তা করতে হলে অসুরের ভাষাতেই জবাব দিতে হয়। এই সত্যকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়েই বিমল দাশগুপ্ত ভিলিয়ার্সকে, এবং প্রদ্যোৎ ডগলাসকে আক্রমণ করেছিল।

ডগলাস হত্যার দায়ে প্রদ্যোতের ফাঁসির হুকুম হল ১৫ই জুন, ১৯৩২। প্রশান্তচিত্তে সে-আদেশ গ্রহণ করেছিল প্রদ্যোৎ। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'মাভৈঃ আগামী দিনের মৃত্যুর মধ্যে আমি অমৃতের বাণী শুনতে পাচ্ছি।'

১৯৩৩ সালের ১২ই জানুয়ারী মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন বিসর্জন দিল প্রদ্যোৎ। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে মাকে সে লিখেছিল, 'মা, তোমার প্রদ্যোৎ কি কখনও মরতে পারে ?' সত্যই প্রদ্যোৎ মরতে পারে না, প্রদ্যোৎ মরেনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ রূপে প্রদ্যোৎ বেঁচে আছে। বেঁচে আছে সত্যের আলোক বর্তিকারূপে।

* বার্জের মৃত্যুদণ্ড

একের পর এক দুটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গেল। প্রথমে পেডি তারপরে ডগলাস। মেদিনীপুরকে যারা উচিত শিক্ষা দিতে এসেছিল, তারাই মেদিনীপুরের হাতে সমুচিত শাস্তি লাভ করেছে। তবে শিক্ষা তাদের হয়েছিল কিনা জানি না। পেডি এবং ডগলাস যেন এক বৃন্তের দুটি ফুল, পাশাপাশি দুটি কবরে চিরদিনের জন্য শুয়ে আছে আজও।

কিন্তু এখানেই কি শেষ? শেষ হত, যদি ইংরেজের জেদ সেদিন এমন উৎকট আকারে দেখা না দিত। পেডি-ডগলাসের হত্যাকাণ্ড সেদিন 'রুল ব্রিটানিয়া'র দেশেও নিদারুণ ভীতি ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল। সমুদ্রকে শাসন করবার স্পর্ধায় একদিন যারা গর্বস্ফীত হয়েছিল, আজ তারা দেখল—সমুদ্রকে শাসন করা বরং সহজ, কিন্তু বাংলাদেশকে, মেদিনীপুরকে, শাসন করা তাদের সাধ্যাতীত …

মেদিনীপুর-ভীতি ইংরেজদের দেশে এত প্রকট হয়েছিল যে, সেখানকার জন্য কোন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়াই দায়। এত ভয়! সর্বনাশ! ইংরেজের জগৎ-জোড়া প্রেস্টিজ যে প্রায় অপগত! এভাবে হার মানলে তো চলবে না। যে করেই হোক, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট একজন সংগ্রহ করতেই হবে। খোঁজাখুঁজি শুরু হল চারিদিকে। অনেক চেষ্টার পরে, অনেক সাধ্য-সাধনার পরে এবার যাকে রাজী করানো গেল, তার নাম বার্জ।

জেলা-শাসক হয়ে বার্জ এল মেদিনীপুরে। ব্রিটিশ-প্রেস্টিজ এবারের মত অন্তত রক্ষা পেল, কিন্তু সে কতদিন? বিপ্লবীদের সঙ্কল্প তখনও অটুট, অস্ত্র তাঁদের প্রস্তুত। শুধু সুযোগের অপেক্ষা। প্রতীক্ষিত সে সুযোগ একদিন সত্যই এল। তারিখ, ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর, স্থান মেদিনীপুরের পুলিশ-গ্রাউণ্ড।

সংবাদ পাওয়া গেল, একটি প্রদর্শনী খেলা উপলক্ষ্যে সেদিন

ঐ খেলার মাঠে উপস্থিত থাকবেন জেলা-শাসক মিঃ বার্জ। একে তো পুলিশ-গ্রাউণ্ড, তার উপর জেলা-শাসক প্রমুখ একাধিক শ্বেতাঙ্গ বীর সেখানে উপস্থিত থাকবেন, তাই মাঠের চারদিকে সতর্ক সশস্ত্র প্রহরী। কার সাধ্য যে, সে প্রহরী-বেষ্টনী ভেদ করে মাঠে প্রবেশ করে। কিন্তু 'অসাধ্য' বলে কোন কথা তো বিপ্লবীর অভিধানে নেই। তাই পুলিশের এই দুর্ভেদ্য বেড়াজাল ভেদ করে কখন যে দুটি কিশোর মাঠে ঢুকে পড়ে ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল—পুলিশ তা বুঝতেই পারে নি।

বার্জের গাড়ি যথাস্থানে এসে থেমেছে—বার্জ তখনও নামে নি, তবে নামব নামব করছে। ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখবার জন্যে ভিড়ের চাপ ততক্ষণে ভীষণ বেড়ে গেছে। সুযোগ বুঝে মৃগেন ও অনাথ গাড়ির একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল। বার্জ সবে মাটিতে পা দিয়েছেন, অমনি পশ্চিম দিক থেকে অনাথের পিস্তল গর্জে উঠল। মৃগেন দাঁড়িয়েছিল উত্তর দিকে, সঙ্গে সঙ্গে তার রিভলবারও দিকবিদিক কাঁপিয়ে গর্জে উঠল। কোথা থেকে কি ঘটে গেল কেউ তা বুঝতে না বুঝতেই দেখা গেল বার্জ পড়ে আছে মাটিতে, আর তার বুকের ওপর চেপে বসেছে অনাথ পাঁজা। শত্রুর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না-হওয়া পর্যন্ত শত্রুকে কিছুতেই ছাড়া হবে না, এই ছিল তাঁদের দুর্জয় সঙ্কল্প।

বার্জ ঘটনাস্থলেই নিহত হলেন, সাথী মিঃ জোন্স গুরুতররূপে আহত হল, আর যারা নিকটে ছিল তারা পালিয়ে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করল। সমস্ত ব্যাপারটা মগজে যেতেই বার্জ-এর দেহরক্ষীরা মৃগেন ও অনাথকে তাক্ করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। মৃগেন ও অনাথের গুলি ততক্ষণে ফুরিয়ে গেছে। আত্মরক্ষার জন্য একটি গুলিও তখন তাদের ছিল না। শত্রুর উপর একের পর এক গুলি চালিয়ে তার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত তারা। তাই আত্মরক্ষার জন্যে একটি গুলিও অবশিষ্ট রাখে নি ওরা।

অভীষ্ট তাদের সিদ্ধ হয়েছে, এবার শুধু পরিপূর্ণ আনন্দে বীরের

মত মৃত্যুবরণ। মুহূর্তের মধ্যে শত্রুর গুলি এসে বুকে লাগল। অনাথ ও মৃগেন, মৃত্যুঞ্জয়ী দুই বীর, শহীদের মৃত্যুবরণ করলেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অনাথ ও মৃগেনের এই অভূতপূর্ব আত্মদান অক্ষয় হয়ে আছে। যে ইতিহাসে তাদের কথা লেখা হল না—সে ইতিহাস ভারতের ইতিহাস নয়।

ব্রিটিশ-শক্তি বিস্ময়ে হতবাক, স্তম্ভিত। তাদের বুঝতে দেরি হল না যে, ভারতে তাদের রাজ্যপাট গুটিয়ে ফেলবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু তবু শেষবারের মত আর একবার মরণ-কামড় দিতে হবে। পরখ করতে হবে—কত শক্তি ধরে মেদিনীপুর, কত প্রাণ আছে বাংলার, কত সাহস আছে ভারতবর্ষের? তাই উন্মাদের বেশে সশস্ত্র পুলিশ প্রকাশ্য রাজপথে বেরিয়ে এল।

মেদিনীপুরের ঘরে ঘরে শুরু হয়ে গেল পৈশাচিক তাণ্ডব। অন্ধ আক্রোশে যা কিছু সামনে পায়, তাই ভেঙে চুরমার করে। নিদ্রিত শিশুকে মাতৃক্রোড় থেকে ছিনিয়ে এনে মাতাপিতার চোখের সামনে তাকে নিক্ষেপ করেছিল পাষাণ প্রাচীরে। অসহায় নারীর উপর করেছিল জঘন্যতম নির্যাতন। নিপীড়নে, নিষ্পেষণে, অত্যাচারে, উৎপীড়নে, দানবিক প্রতিহিংসায় যে বীভৎস তাণ্ডবে সারা মেদিনীপুরের আকাশ-বাতাস সেদিন মথিত হয়েছিল, মধ্যযুগের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছিল তা। কিন্তু তবু মেদিনীপুর মরল না, মরল না বাংলা ও বাঙালী।

একদিকে ইংরেজ সরকারের পাশবিকতা, অন্যদিকে মেদিনীপুরের নির্ভীক দুর্জয় প্রতিরোধ। সেই প্রতিরোধের সামনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল ইংরেজ-দানব। জয় হল মানুষের, মনুষ্যত্বের। সেদিন দেখেছি, মেদিনীপুরের নিঃশঙ্ক অভিযাত্রী সন্তোষ বেরাকে। পুলিশের নির্মম আঘাতে মৃত্যুর কোলে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছিল এই সন্তোষ। তবু একটি কথাও মুখ ফুটে প্রকাশ করেনি। এ আত্মত্যাগ, এ বীরত্ব শুধু দুর্লভ নয়, দেশ ও জাতির স্মৃতিতে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণীয় হবার যোগ্য।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি চরিত্রও উল্লেখযোগ্য। তিনি নবজীবন ঘোষ। গোপালনগর থানায় তিনি অন্তরীণ বন্দী। সেই অন্তরীণ অবস্থাতেই পুলিশের অমানুষিক প্রহারে তাঁর মৃত্যু হয়। সন্তোষ বেরা ও নবজীবনের কথা হয়তো অনেকে জানে না। কিন্তু মৃত্যুর মধ্যে তাঁরা যে জীবন-মন্ত্র দান করে গেলেন তা চিরকাল মানুষের মনে ভাস্বর হয়ে বিরাজ করবে।

বার্জ-হত্যা সংঘটিত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই মেদিনীপুরের বহু তরুণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে নির্মলজীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায় ও ব্রজকিশোর চক্রবর্তী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বার্জ-হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারে এঁদের তিনজনেরই মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়। ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিচারের রায় বার হয়, আর ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা কার্যে পরিণত করা হয়। ২৫শে অক্টোবর বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে অকুতোভয়ে ফাঁসির মঞ্চে জীবন বিসর্জন দেয় ব্রজকিশোর ও রামকৃষ্ণ, আর ২৬শে অক্টোবর নির্মলজীবন। অন্যান্য শহীদদের সঙ্গেই ভারতের শহীদ-তীর্থে অমর হয়ে থাকবে ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ ও নির্মলজীবন—ইতিহাস আর একবার প্রমাণ করল, মেদিনীপুর বিপ্লবী বাংলার প্রাণকেন্দ্র।

• স্যার জন অ্যাণ্ডারসন

বাংলায় বিপ্লব দমনে ব্যর্থকাম হয়ে ইংরেজ সরকার এবার শরণাপন্ন হল স্যার জন অ্যাণ্ডারসনের। কুখ্যাত ব্ল্যাক অ্যাণ্ড ট্যানের জনক অ্যাণ্ডারসন একদিন আয়ারল্যাণ্ডে সিন্‌ফিন্-আন্দোলন দমনে নিযুক্ত ছিলেন। এত যাঁর অপকীর্তি, তিনি যে বাংলার বিপ্লব-আন্দোলন দমনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন, তা মনে করেছিল ব্রিটিশ সরকার। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই ইংরেজ সরকার সেদিন অ্যাণ্ডারসনকে বাংলার গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন।

বাংলায় পদার্পণ করেই অ্যাণ্ডারসন বুঝতে পারে যে, বাংলার যুবশক্তিকে সমূলে উৎখাত না করতে পারলে বাংলাদেশকে বিপ্লবীদের হাত থেকে মুক্ত করা যাবে না। কিন্তু শুধু আঘাত ও নির্যাতনের পথে পা বাড়ালেই চলবে না। উৎপীড়নের সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই সর্বপ্রকারের প্রলোভন। বাংলার তরুণ সম্প্রদায়কে নৈতিক অধঃপতনের পথে আকর্ষণ করবার সকল রকম ব্যবস্থাই রাখতে হবে।

এই উদ্দেশ্যই তিনি গ্রামে গ্রামে ভিলেজ গার্ডস-এর পরিকল্পনা করেন। গাল-ভরা নাম এই ভিলেজ-গার্ডস। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য গ্রামে গ্রামে বিপ্লবীদের উপর লক্ষ্য রাখা। গ্রামের যত কুখ্যাত গুণ্ডা ও সমাজ-বিরোধীরা ছিল ভিলেজ গার্ডস-এর সভ্য। সরকার এদের জন্যে প্রচুর অর্থব্যয় করতে শুরু করল। এই সময়ে বিপ্লবীদের দুটি ফ্রণ্টে সংগ্রাম করতে হত। একদিকে গ্রামে, ঘরের পাশে ভিলেজ-গার্ডস, অন্যদিকে গ্রামের বাইরে পুলিশ তথা সমগ্র শাসক-গোষ্ঠী !

• দেওভোগ শুটিং

এই ভিলেজ গার্ডসদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়েই বি-ভি'র বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ সৈনিক মতি মল্লিককে ফাঁসির মঞ্চে আহুতি দিতে হয়েছিল। ১৯৩৪ সালের এই ঘটনা 'দেওভোগ শুটিং' নামে খ্যাত।

মতি মল্লিকের মৃত্যুর লিখন হয়তো অ্যাণ্ডারসনকে এই বলে সতর্ক করে দিয়ে গেল :

আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড, রুদ্র, দীপ্ত, মূর্তিমান !
সাবধান ! সাবধান !

লেবং

'ব্ল্যাক অ্যাণ্ড ট্যান' নীতির অভিনব একটি সংস্করণ বাংলাদেশে চালাতে অ্যাণ্ডারসন বদ্ধপরিকর। এ সত্য ১৯৩৪ সালের প্রারম্ভেই দিনের আলোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। রুখে দাঁড়াল বাংলার বিপ্লবীরা। স্থির হল, এবার আর. আই. জি, জেলা শাসক, কিংবা পুলিশ সুপার নয়—খোদ কর্তাকে ধরে টান দিতে হবে। এবার লক্ষ্য স্বয়ং স্যার জন অ্যাণ্ডারসন।

১৯৩৪ সালের মে মাস। অ্যাণ্ডারসন তখন দার্জিলিং শহরে গ্রীষ্ম-যাপন করছেন। কথা ছিল কিছুদিন ঐ শৈল-শহরেই থাকবেন তিনি। 'বি-ভি'র নেতারাও সঙ্গে সঙ্গে তাদের কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। সমতলভূমিতে অ্যাণ্ডারসনকে ধরা যাবে না, তাই পাহাড়ে পাহাড়েই তাকে অনুসরণ করতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে দার্জিলিং অভিমুখে ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে যাত্রা করলেন উজ্জলা মজুমদার ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জী। আর জয়দেবপুর (ঢাকা) থেকে সরাসরি দার্জিলিংয়ে এল ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জী। 'জুবিলী স্যানাটোরিয়ামে' উঠল রবি ও ভবানী। উজ্জলা দেবী ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জী 'স্নো-ভিউ' হোটেলে।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, ৮ই মে লেবং-এর মাঠে ঘোড়দৌড়, এবং স্যার জন অ্যাণ্ডারসন মাঠে উপস্থিত থেকে পুরস্কার-বিতরণ করবেন। সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগকে কিছুতেই হাত-ছাড়া করা চলে না।

যথাসময়ে ভবানী ও রবি উপস্থিত হল লেবং-এ। কালবিলম্ব না-করে দুখানা দর্শকের টিকিট কিনে তারা মাঠে ঢুকে পড়ল। পরিধানে ছিল ইয়োরোপীয় পোশাক, তাই ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে বিশেষ কষ্ট হল না। গভর্নরের আসনের ঠিক ডানপাশ ঘেঁষে দর্শকদের স্থান। মাঝখানে মাত্র একটি নীচু দেয়ালের ব্যবধান। রবি ও ভবানী ভিড় ঠেলে লাটসাহেবের সম্মুখে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু যতটা কাছে যাওয়া দরকার ততটা পারল না। ঘোড়দৌড়

শেষ হওয়া মাত্র গভর্নর উঠে দাঁড়ালেন, দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত। এমন সময় বিস্ময়বিমূঢ় মানুষ দেখল একটি কিশোর মাত্র ৮।৯ ফুট দূর থেকে অ্যাণ্ডারসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। আর একদিকে আবার বিকট শব্দ—গুড়ুম—গুড়ুম। গভর্নরের সিঁড়ির কাছ থেকে আর একটি কিশোর নির্মম হাতে গুলি ছুঁড়ছে।

দেশের দুর্ভাগ্য, বিধাতাও বোধ হয় সেদিন অ্যাণ্ডারসনের প্রতি কিছুটা সদয় ছিলেন, তা না হলে বিপ্লবীর লক্ষ্য তো কখনো ভ্রষ্ট হয় না। সেদিন কিন্তু তাই হল। কেবল একটি মাত্র গুলি গভর্নর সাহেবের ওষ্ঠে স্নেহ-চুম্বন দান করে বিদ্যুৎগতিতে ঠিকরে পড়ল অনেক, অনেক দূরে। লাটসাহেবের দেহরক্ষীদের গুলির আঘাতে আহত হল ভবানী। তার অচেতন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

জ্ঞান ফিরে আসতেই সে কি বলেছিল জানেন! মা-র কথা নয়, কোন আত্মীয়-স্বজনের কথা নয়, এমন কি তার নিজের সম্বন্ধে কোন কথাও বলেনি। তার দেশের শত্রু, অত্যাচার-উৎপীড়নের বীভৎস প্রেতমূর্তি স্যার জন অ্যাণ্ডারসনকে সে উচিত শিক্ষা দিতে পেরেছে কিনা এটাই ছিল তার একমাত্র চিন্তা। তাই তার প্রথম প্রশ্ন হল—'ইজ অ্যাণ্ডারসন স্টীল অ্যালাইভ?' উত্তর সীমান্তে লেবং-এর জনহীন প্রান্তরে ভারত-ইতিহাসের আর একটি অধ্যায় রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে গেল কালের পটে।

স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে ভবানী ও রবির মৃত্যুদণ্ড হয়। ভবানীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যে পরিণত করা হয় ১৯৩৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী। রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেলে তার ফাঁসি হয়। অজানার আহ্বানে যে-জীবনের আরম্ভ, বন্ধুর পথে যে-জীবনের পথ-পরিক্রমা, মৃত্যু-বরণের অন্তহীন আনন্দে তার পরিসমাপ্তি।

এই প্রবন্ধ শেষ করবার আগে 'বি-ভি'র আরো কয়েকজন শহীদের নাম বলা প্রয়োজন। তাদের নাম প্রবোধ মজুমদার, অসিত ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় ভৌমিক, হৃষীকেশ সাহা, গোপাল সেন (ছোট) অমলেন্দু ঘোষ, শচীন কর, মোহিনী রায় ও অনিল রায়চৌধুরী।

বিপ্লবী অভিযাত্রায় বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টায় যুক্ত হয়ে এরা জীবনে বহু দুঃখ, বহু কষ্ট সহ্য করেছে। শুধু তাই নয়, আহ্বান যখনই এসেছে, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। বিপ্লবী ভারতে কোন চমকপ্রদ ঘটনার সঙ্গে জড়িত হওয়ার সৌভাগ্য হয়তো এদের হয়নি, কিন্তু তাই বলে তাদের সর্বস্ব ত্যাগের কথা, তাদের নিঃশঙ্ক জীবন-বিসর্জনের কাহিনী অন্য কোন রোমাঞ্চকর আত্মাহুতির কাহিনীর চেয়ে নিষ্প্রভ নয়।

বাংলার বিপ্লবীদের জীবনযাত্রার ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বিপ্লবীরা নাম ও যশের আকাঙ্খাকে সযত্নে পরিহার করে চলতেন। এই জন্যই বিভিন্ন বিপ্লবী প্রচেষ্টার বহু ঘটনার নায়কদের পরিচয় আজও অন্ধকারে বিলীন হয়ে আছে।

বাংলায় বিপ্লবযজ্ঞে বুকের পাঁজরে পূজার হোমানল জ্বেলে রেখেছেন বাংলাদেশেরই কত শহীদ। তাদের কত জনের কথা আমরা জানি? যাদের নাম শুনেছি, তাদের বহু বিচিত্র জীবনের কতটুকুই বা জানি আমরা। আর নাম যাঁদের শুনিনি, তাঁদের সংখ্যা তো নিরূপণ করা অসম্ভব। ইতিহাস সেই আননোন, আনহার্ড, আনসাং হিরোদের কথা হয়তো কোনদিনই লিখে রাখবে না, ইতিবৃত্তে হয়তো কোন কালেই তাঁদের স্থান হবে না। কিন্তু তাই বলে দেশ ও জাতি তাঁদের অস্বীকার করবে?

যাঁদের রাত্রির তপস্যায় অনাগত প্রভাতের জয়ধ্বনি, অন্তহীন পথ-চলায় অন্ধ-আকাশের মেঘ-মুক্তি, এইসব শহীদদের অনন্ত জীবনধারায় ভারতবর্ষের সত্য পরিচয়। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস নেই, তাই 'রাজসিংহ'কে কেউ চেনে না। বঙ্কিমচন্দ্রের সে কথার প্রতিধ্বনি করে আমরাও আজ বলতে পারি, ভারতবর্ষের ইতিহাস নেই, তাই এদের কেউ চেনল না।

'ওরা দুপায়ে দলে গেল মরণ শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে'।

—কাজী নজরুল ইসলাম

সেদিন পেডিকে হত্যা করেছিলাম

বিমল দাশগুপ্ত

[বি. ভি-র মেদিনীপুর শাখার দুর্ধর্ষ বিপ্লবী, যিনি সঙ্গী যতিজীবন ঘোষ সহ শুধু পেডিকেই হত্যা করেননি, ভিলিয়ার্সকেও ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন তিনি—তিনটি গুলি উপহার দিয়ে।]

১৯৩০ সাল সত্যি আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের সর্বাধিক সফল যাত্রার সূচনা চিহ্নিত করে রেখেছে। এই বছরটিকে বলা চলে, 'The Opening of the flood gate of Revolution!' এখান থেকেই শুরু একদিকে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচণ্ডতম অভিযান, অপর দিকে অহিংস-আন্দোলনের কূলপ্লাবী প্রবাহ। ত্রিশ বৎসরের সংগ্রাম এবার তার তরঙ্গশীর্ষে উঠে গেছে।

গান্ধীজী লবণ-আইন ভঙ্গ করার প্রত্যয়ে 'ডাণ্ডি' যাত্রা করলেন ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ॥

ভারতের সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে কঠিন আঘাত হানবার জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেল। হাজার হাজার সংগ্রামী নরনারী কাঁথি ও তমলুকে লবণ-আইন ভঙ্গ করার আগ্রহ জমায়েত হল শহর মেদিনীপুরে। নেতাদের নির্দেশ নিয়ে তারা চলে গেল যে যার নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে।

শাসক-সম্প্রদায় চুপ করে বসে রইল না। নিরস্ত্র যোদ্ধাদের উপর চালাল অকথ্য অত্যাচার। কত লোক যে আহত হল, কত ঘর বাড়ি যে পুড়িয়ে দেওয়া হল, কত মা-বোন যে নিগৃহীতা হলেন, তার সীমা-পরিসীমা রইল না।

এদিকে ১৯৩০ সালেরই ১৮ই এপ্রিল মহান বিপ্লবী-নায়ক সূর্য সেনের নেতৃত্বে শহর চট্টগ্রামে যুব বিদ্রোহের দামামা বেজে উঠেছে।

বাংলাদেশের বিপ্লবী 'বি-ভি' পার্টির পরিচয় আজ কারো অজ্ঞাত নেই। সেই 'বি-ভি-রই একটি শাখা পত্তন করেছিলেন দীনেশ গুপ্ত মেদিনীপুর শহরে, কেন্দ্রের নির্দেশ মত, ১৯২৭ সালে। তখন তিনি মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র; ঢাকা থেকে চলে এসেছেন পড়াশুনায় অধিকতর মন বসানোর বাসনায়।

আমরা দীনেশ গুপ্তের মন্ত্রশিষ্য। তাঁরই ডাইরেক্ট-নেতৃত্বে বিপ্লবের পদধ্বনি শুনছি। মেদিনীপুরে একটি সুগঠিত দল গড়ে দীনেশদা আবার চলে গেলেন ঢাকা। বারে বারে আসতেন তিনি মেদিনীপুর। তবে আমাদের পরিচালনার ভার কলকাতার কেন্দ্রীয় সংস্থা-ই গ্রহণ করেছিল দীনেশদা চলে যাবার পর থেকে। কেন্দ্রের সঙ্গে প্রয়োজনে যোগাযোগ করতেন শুধু পরিমল রায়, ফণী কুণ্ডু ও হরিপদ ভৌমিক। এটা ১৯২৮-৩০ সালের কথা।

দেশে—বিশেষ করে সারা মেদিনীপুরে—অসহযোগ তথা 'আইন অমান্য আন্দোলন' যখন উত্তাল হয়ে উঠেছে, তখন আমাদের নেতা দীনেশ গুপ্ত আমাদের গোপনে ডেকে পাঠালেন।

তিনি বললেন, "তোমরা এ আন্দোলনে অংশ নেবে। তা না করলে সংগ্রামী-জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এই সুযোগে তোমরা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষকে আপন করে নেবে, তাদের দুঃখের ভাগীদার হবে।"

আমাদের মধ্যে থেকে এক অংশকে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে হল। সেখানে ফাঁকি কিছু ছিল না।

স্কুল-কলেজের ধর্মঘটের সময় পেডিসাহেব (জিলা ম্যাজিস্ট্রেট) ছাত্রদের উপর যখন অকথ্য অত্যাচার করে যেতেন, তখন আমরা এগিয়ে গিয়ে নিপীড়িত ছেলেদের সহায়তা করতাম, সাহস দিতাম। ফলে সাধারণ ছেলেদের উপর আমাদের প্রভাব বেড়ে যেত।

দীনেশদা তিনটি বিষয়ে বিশেষ করে অবহিত থাকার নির্দেশ আমাদের দিয়েছিলেন। বিপ্লব-বাহিনীর সৈনিক রূপে আমাদের তাই উক্ত তিনটি বস্তুর প্রতি নজর রাখতে হত।

যথা—(ক) ক্যামোফ্লাজ, (খ) অনারেবল্ রিট্রিট, (গ) চুজিং দ্যা টাইম্ ফর ফাইন্যাল্ স্ট্রাইক।

আমরা তাই তাঁরই আদেশে খদ্দর পরে পুলিশের কাছে গান্ধীপন্থী সেজে থাকতাম। জনসাধারণকে সংগ্রামী-আদর্শে যথাসম্ভব অনুপ্রাণিত করে সংঘবদ্ধ ভাবে সম্মুখ যুদ্ধে পাঠিয়ে দিতাম। আমাদের মধ্যে দু' একজন তাদের সঙ্গী হতেন।

আমরা সাধারণত পেছনে থেকে সংগঠন করতাম, এগিয়ে যেতাম না। এইভাবে পেছনে অবস্থান করেই মাস্-কন্ট্যাক্ট্ আমাদের যতটুকু হত, তার সাহায্যে ভাবী সশস্ত্র-সংগ্রামের পটভূমি রচনায় প্রবৃত্ত ছিলাম। কংগ্রেস-আন্দোলনে আমাদের তরফ থেকে প্রফুল্ল ত্রিপাঠীর অবদান সামান্য নয়।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের ইতিহাসের একটি পরম লগ্ন। চট্টলার তরুণদল সশস্ত্র-যুদ্ধে ব্রিটিশ শাসনকে পর্যুদস্ত করে দু'টি অস্ত্রাগার দখল করে নিয়েছেন। সূর্য সেনের নেতৃত্বে ঘোষিত হয়েছে এক 'স্বাধীন সরকার'।

চার দিন পর (২২শে এপ্রিল) জালালাবাদ পাহাড়শীর্ষে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দিলেন বারজন তরুণ বীর। কালারপোল ও সদরঘাটের সম্মুখ সংঘর্ষে বহু বীরের রক্তে চট্টলার মাটি রঞ্জিত হল। কত বালক-কিশোর-যুবা 'শহীদে'র মুকুট মাথায় পরে ভারতমাতার পদতলে শোণিতার্ঘ্য দান করলেন।

এদিকে 'আইন অমান্য আন্দোলন'ও তৎকালে পূর্ণোদ্যমে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের অত্যাচার রূপ নিচ্ছে ভয়ঙ্কর ও বীভৎস।

বিপ্লবীরা স্থির করলেন যে, শুধু মার খাবার ইতিহাস সৃষ্টি করে জনগণ বেশিদূর এগুতে পারবে না, তাদের কাছে মার দেবার ইতিহাস তুলে ধরতে হবে। পুলিশের নগ্ন রূপ তাতে প্রকটতর হোক, জনগণ

তাতে প্রত্যয় ফিরে পাবে। বাংলাদেশের তরুণদল আপন শৌর্যে প্রতিষ্ঠিত হোক।...

পুলিশের সর্বময়-কর্তা ইন্সপেক্টর-জেনারেল সাহেব। তাই একদিন শুনলাম, আমাদেরই সতীর্থ মেজর বিনয়কৃষ্ণ বসু ঢাকা শহরে মিঃ লোম্যানকে নিধন করেছেন, ঢাকার পুলিশ-সুপার তৎসঙ্গে মারাত্মক ভাবে ঘায়েল হয়েছেন বিনয়দা'রই হাতে।

সেই স্বর্ণ-আক্ষরিত দিনটি ছিল ১৯৩০ সালেরই ২৯শে আগস্ট। জনাকীর্ণ ঢাকা মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে দিনে-দুপুরে একা বিনয় বসু বীর্যবত্তার যে স্বাক্ষর সেদিন লিখে গেলেন, তাতে আমরা উদ্বুদ্ধ হলাম। এই সাফল্য আমাদের অদম্য শক্তি দান করল।

তারপর এল ৮ই ডিসেম্বর। ১৯৩০ সালের এই দিনটি ব্রিটিশ-শাসনকালের এক অবিস্মরণীয় দিন।

সাম্রাজ্যলিপ্সু ইংরেজের রক্তক্ষরা ক্ষত শুকোতে না শুকোতেই আমরা আবার শুনলাম, তিনটি বিপ্লবীর 'রাইটার্স্ বিল্ডিংস্' অলিন্দ যুদ্ধের রোমাঞ্চকর কাহিনী। মেজর বিনয় বসুরই নেতৃত্বে আমাদের দীনেশদা ও বাদলদা শৌর্যের এক অতুল' কীর্তি স্থাপন করেছেন।

আমাদের গর্বের সীমা নেই। আমাদের রক্তে আগুন জ্বলে উঠেছে। 'সর্বনাশের নেশা'য় আমরা মত্ত হয়ে উঠেছি। মনে হচ্ছে, গুরু দীনেশ গুপ্তের যোগ্য শিষ্যত্বের পরিচয় আমরা অনায়াসেই দিতে পারব। আমরা বিশ্ববিজয়ের অধিকারী।...

আমরা আর অপেক্ষা করতে পারি না। দীনেশদার অসমাপ্ত কাজ আমাদের ত্বরায় সম্পন্ন করতে হবে। আমরা অধীর। আমরা ক্রমাগত দাদাদের উপর চাপ দিতে লাগলাম। মেদিনীপুরের সংগঠন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে, এবার আমাদের প্রচণ্ড কোন অ্যাক্‌শানের সুযোগ দেওয়া হোক। আমাদের প্রত্যেকের কণ্ঠে ছিল একটা কথা: 'Death before dishonour. Do and face death'.

১৯৩১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী। নির্জন কাঁসাই নদীর তীরে এক গোপন স্থানে, মেদিনীপুর সংস্থায় দীনেশদার স্থলাভিষিক্ত কর্মনেতা শশাঙ্ক দাশগুপ্ত, ফণী কুণ্ডু, জ্যোতিজীবন ঘোষ এবং আমি আলোচনা করে ঠিক করলাম যে, মেদিনীপুর জেলায় অত্যাচারের প্রতিমূর্তি এবং মাতৃজাতির সম্ভ্রম লুণ্ঠন করার মালিক ঐ জেলা-শাসক পেডিসাহেবকে চরম দণ্ড দান করতে হবে। আই-সি-এস গোষ্ঠীর জাঁদরেল প্রতিনিধি এই ব্যক্তি। এ ব্যক্তির চরম দণ্ড শুধু বিপ্লবীদের নয়, মেদিনীপুরবাসী প্রত্যেকটি নরনারীর কাছেই ছিল একান্ত কামনার বস্তু।

স্থির হল, পরের দিন ফণীদা ও আমি ডাউন পুরুলিয়া ট্রেনে খড়গপুরে যাব, কারণ কলকাতা থেকে মনোরঞ্জন সেন আমাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আপ পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জারে খড়গপুরে আসবেন। তাঁর কাছ থেকে মালপত্র নিয়ে ঐ আপ পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জারেই ফিরে আসব আমরা এবং মনোরঞ্জনদা ডাউন পুরুলিয়াতেই কলকাতা প্রত্যাবর্তন করবেন। কার্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হল। আই-বি'র পিতৃপুরুষও জানতে পারল না যে, কোথা দিয়ে কি হল, এবং এই ঘটনার পরিণতি কতদূর! অবশ্য আমাদের প্রত্যেকটি মুভমেন্টই কলকাতা 'বি ভি' কেন্দ্রের পরিচালনায় সংঘটিত হচ্ছিল। শশাঙ্কদা (কমেটদা) কেন্দ্রীয়সংস্থারই নিযুক্ত কর্মনেতা রূপে মেদিনীপুরে অবস্থান করেছিলেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ সাল। পেডিসাহেব তাঁর অনুগত রাজপুরুষ ও ভক্তদের সহ জেলা-বোর্ডের সভা করবেন বেলা ১ টায়। আমন্ত্রণ পৌঁছে গেছে সবার কাছে। আলোচ্য বিষয়, অহিংস-আন্দোলনকে কি করে বানচাল করা যায়।

শুধু তাই নয়। আরো আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কোন্ উপায়ে বিপ্লবীদের নির্মূল করা যায়। সেজন্য চাই রাজভক্তদের অকৃত্রিম সাহায্য।

কলম, ঘড়ি প্রভৃতি মূল্যবান জিনিস দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে

তাদেরকেই, যারা এই সৎকর্মের সহায়ক হবে। হুজুরের দয়ায় রাজ-ভক্তরা এমনিতেই বিগলিত।

কিন্তু এত প্রাপ্তির সংবাদেও বুকের কাঁপুনি থামে না। সারা বাঙলায় যে তাণ্ডব চলেছে ঐ বিপ্লবীদের, তার মধ্যে আবার ঐ দস্যুদের নিয়ে কথাবার্তা কেন?

কোথা থেকে কি শুনে, কে এসে প্রাণটা কেড়ে নেবে, তার কি কোন স্থিরতা আছে? তাই ভক্তদের অভয় দেবার জন্যই দয়াময় পেডি সাহেব সভার সময়টা গোপনে এগিয়ে আনলেন বেলা ১০ টায়।...

এদিকে জ্যোতিজীবন ও আমি প্রস্তুত হয়ে ১টার পূর্বেই জেলা বোর্ডে উপস্থিত হলাম।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে ততক্ষণে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে পেডিসাহেব তাঁর বাংলোর পথে সশস্ত্র পুলিশের পাহারায় হাঁটা দিয়েছেন। আমরা ফিরে এলাম। পেডি সে যাত্রা বেঁচে গেলেন।

এ ব্যর্থতা কেন্দ্রীয় সংস্থার ভাল লাগে নি, তাই য়্যাক্‌শান স্কোয়াডের অন্যতম সভ্য প্রফুল্ল দত্ত মহাশয় (আমাদের ফুলদা) সরেজমিনে ব্যাপারটা বুঝবার জন্য কলকাতা থেকে মেদিনীপুরে এলেন ২৫শে মার্চ।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ—কাজ মেদিনীপুরে হবেই, তবে নিখুঁত ভাবে সমস্ত খবর নিয়ে এগুতে হবে। কোনক্রমেই ব্যর্থতা 'বি-ভি' বরদাস্ত করতে পারে না। হোক দেরি—কিন্তু সাফল্যে সুন্দর করতে হবে যে কোন য়্যাক্‌শান। কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি রেখে দুঃসাহস দেখানোর নাম হঠকারিতা।...

এদিকে পেডিসাহেবও কিছুটা দু'মুখো নীতি গ্রহণ করেছেন।

একদিকে সত্যাগ্রহীদের—নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে—ঠেঙিয়ে শায়েস্তা করছেন; অপর দিকে ছাত্রদের পিঠ চাপড়িয়ে স্ববশে আনবার ব্যবস্থায় চেষ্টিত হচ্ছেন।

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে তাই একটি ছাত্র-প্রদর্শনী করার

আয়োজন করলেন তিনি ১লা এপ্রিল থেকে। এ-প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে নানাভাবে ছেলেদের পুরস্কৃত করা হবে বলেও ঘোষণা করা হল। কিন্তু সে পুরস্কার স্বহস্তে বিতরণ করার সৌভাগ্য তাঁর আর হল না।...

২৫শে মার্চ। সন্ধ্যা ৭টা। প্রফুল্ল দত্ত (ফুলদা), ফণীদা (কুণ্ডু) জ্যোতিজীবন, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও আমি স্টেশনের কাছে নির্জন মাঠে মিলিত হয়েছি। ফুলদার বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রচুর। তিনি আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিলেন, কেমন মন ও প্রত্যয় নিয়ে, কি ভাবে প্রস্তুতিপর্ব নিখুঁত উপায়ে সম্পন্ন করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। প্রস্তুতিপর্বে বিন্দুমাত্র ত্রুটি থাকলে য়্যাক্‌শানের সাফল্য অনিশ্চিত হয়ে যায়।

তিনি বললেন যে, ইংরেজ হল চতুর শাসক। ওরা দেশীয় লোকের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেরা আড়াল থেকে নেটিভদের মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দেয়। আমরা টেনে-টেনে ঐ রক্তখেকো ইংরেজ-শাসকদের হত্যা করব।...

সেই সন্ধ্যায় স্থির হল যে, ১লা এপ্রিল জ্যোতিজীবন ও আমি যথাসময়ে 'প্রদর্শনী' দেখতে যাব, এবং পেডিসাহেব প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে গুলি করব। আমাদের থাকতে হবে যতটা সম্ভব সাহেবের কাছকাছি।

কিন্তু এবারও নিরাশ হলাম। পেডি এলেন না। প্রদর্শনী উদ্বোধন করলেন একজন এ. ডি. এম্‌।...

১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল। বিপ্লবের ইতিহাসে একটি অগ্নিক্ষরা দিন। রাজনৈতিক দিক থেকে এই দিনটির তাৎপর্য প্রচুর

সকাল থেকেই ছাত্রের দল খুবই কর্মব্যস্ত। কারণ আজই স্কুলের প্রদর্শনী শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা ভাবছি, আজ হয়তো পেডিসাহেব একবার আসতেও বা পারেন।

আমার কাকা হীরালাল দাশগুপ্ত মহাশয় তখন কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সেদিন সকাল থেকেই আমি কাকাবাবুকে

প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছিলাম: "পুরস্কার দেবার কথা ছিল তার কি হল? আমার বোন একটা সেলাইয়ের কাজ দিয়েছিল, সে নিশ্চয়ই পুরস্কার পাবে। আজকে কিছু একটা না পেলে তার কান্না থামান যাবে না।"

এসব সত্য-মিথ্যা নানা কথা চালিয়ে যাচ্ছিলাম যে-মতলবে, তা সিদ্ধ হল। কাকাবাবু হঠাৎ উত্তর দিলেন: 'পেডিসাহেবের তো আজ প্রদর্শনীতে আসবার কথা—দেখি কি হয়।'

আমি আহ্লাদিত হয়ে ছুটে গেলাম আমার সহপাঠী শক্তি সরকারের কাছে। শক্তি তখন কুখ্যাত এস্. ডি. ও. শঙ্কর সেনের পুত্রের গৃহ-শিক্ষক। তাঁর কাছে শুনলাম যে, শঙ্কর সেন আজ শহরে ফিরে আসছেন। ডি. এম্.; এস্. ডি. ও; এ. এস্. পি.—এরা একত্রে শিকারে গিয়েছিলেন। সুতরাং, সবাই একত্রেই ফিরবেন ধরে নেওয়া যায়।

তখন বিকেল পাঁচটা। আমরা প্যারেড নিয়ে ব্যস্ত। প্যারেড করতাম ডি. এম্-এর বাঙলোর বরাবর ডায়মণ্ড-গ্রাউণ্ডে। আমাদের লক্ষ্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাঙলোর পানে।

হঠাৎ দেখলাম, সাহেব স্বয়ং (মিঃ পেডি), হীরালালবাবু, সুবোধবাবু, নারায়ণবাবু, অশ্বিনীবাবু, মৌলভীসাহেব ও অপর একজন সাহেব বাঙলো থেকে বেরিয়ে আসছেন।

আমরা দু'জন—অর্থাৎ আমি ও জ্যোতিজীবন—তৎক্ষণাৎ প্যারেড থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

জ্যোতি চলে গেলে আমিও ঘরে এসে হাত-পা ধুয়ে নিয়ে ভাল করে জামাকাপড় পরে অপেক্ষা করছি, এমন সময় জ্যোতিও ঘর থেকে তৈয়ের হয়ে আমাদের বাড়িতে ফিরে এল। কাজের জন্য অস্ত্রগুলো তোলা ছিল আমারই ঘরে। আমরা তাড়াতাড়ি যে-যার অস্ত্র পেটের খাঁজে গুঁজে নিয়ে স্কুলের দিকে রওনা হলাম।

স্কুলে এসে দেখলাম, পেডিসাহেব নিবিষ্টমনে প্রদর্শনী দেখছেন। আমরা সলক্ষে পেডির নিকটবর্তী হয়ে গুলি চালালাম।

আমাদের চোখে তখন আগুন। দু'চোখ মেলে আমরা দেখলাম, আমাদের সম্ভ্রমহারা লাঞ্ছিতা মা-বোনেদের অভিশাপ আগুনের হল্কা হয়ে যেন আহত পেডিকে দগ্ধে মারছে।—পেডি কেঁপে কেঁপে গা মোড়াচ্ছিলেন। মুহূর্তে পড়ে গেলেন পাশের বেঞ্চের উপর।

আমাদের বুলেট খতম হয়ে গেছে। আমরা তৈয়ের হচ্ছি সায়ানাইড্-ভরা এ্যাম্পুল চিবানোর জন্য। একবার তাকালাম চতুর্দিকে। কি আশ্চর্য? ঘরের মধ্যে জনপ্রাণী নেই—সব ফাঁকা। বীরপুরুষরা যে-যার প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে, আমাদের বাধা দেবার জন্য কেউ নেই!

আমরা নিরাপদে বেরিয়ে এলাম। ঠিক করলাম, সাইকেলে বাঁকুড়া চলে যাব।

এমন সময়ে দেখলাম একটি লোক সাইকেলে আমাদের দিকে আসছে। আমরা মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার উপর। বেচারীর সাইকেলটি আত্মসাৎ করার পর দেখলাম যে, মানুষটি আমাদের খুবই পরিচিত। নাম তাঁর ফণীভূষণ মুখার্জী—ছাত্রদের 'ধক্কিদা'। তিনি মেদিনীপুর হিন্দুস্কুলের ছাত্র ছিলেন। স্কুল ছাড়ার পরও আমাদের মাঠেই খেলতে আসতেন।

আমাদের খুব ভয় ছিল যে, ধক্কিদা না পুলিশকে কিছু জানিয়ে দেন। কারণ, তাঁর তো কোন পলিটিক্যাল ট্রেনিং ছিল না! কিন্তু তাঁর কাছে পেলাম অপূর্ব সহযোগিতা! আমাদের সাইকেলে উঠে চলে যাবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়ে তিনি রাত বারোটার সময় থানায় গিয়ে এক মিথ্যা বিবরণসহ এজাহার দিলেন। আমাদের কথা তিনি বেমালুম চেপে গেলেন। তৎসত্ত্বেও লাঞ্ছনা তাঁকে যথেষ্ট সইতে হয়েছিল। তবু বীরের মত তিনি তাঁর ভূমিকায় অটল ছিলেন।

পরে ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে পেডি-হত্যা মামলায় আমার বিরুদ্ধে বিচার শুরু হতে ধক্কিদাকে আনা হয়েছিল আমাকে সনাক্ত করার জন্য। ধক্কিদা আমাকে খুবই চিনেছিলেন, কিন্তু

আমার দিকে মোটেই তাকাচ্ছিলেন না। তাঁর ভয়, চোখাচোখি হলেই যদি তিনি হেসে ফেলেন!

বিচারক কটাক্ষ করে বললেন: "আপনিতো মশাই চেনার চেয়ে না-চিনতেই বেশি ব্যস্ত! ভাল করে দেখুন।"

কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। ধক্কিদা—শ্রীফণীভূষণ মুখার্জী—আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী না দিতে স্থির সংকল্প। তাঁকে টলাবে কোন পুলিশ বা কোন ম্যাজিস্ট্রেট?

পূর্ব কথায় ফিরে আসি। সাইকেলে চেপেছি। তখন সন্ধ্যা ৭টা। দ্রুত বাঁকুড়ার পথে ছুটে চলেছি।

কিন্তু সাইকেলটা এত জীর্ণ যে দু'জনকে বহন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তা' ছাড়া রাস্তা জুড়ে জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থাকল্পে কাজ হচ্ছিল। সেই জন্য মাঝে মাঝে মাটির স্তূপ। বেশ উঁচুনীচু পথ অতিক্রম করতে গিয়ে বিপদে পড়ছিলাম।

জ্যোতি আমার চেয়ে একটু বেঁটে। তাই আমাকে নিয়ে সাইকেল চালাতে তাঁর অসুবিধে হল। রাত ১০টার মধ্যে আমরা মাত্র ১৪ মাইল এগিয়ে এসেছি! বাঁকুড়া যাওয়ার চেষ্টা অবান্তর।

রাত ১১টায় এসে গেল "আপ পুরুলিয়া ট্রেন" শালবনী স্টেশনে। আমরা ঝোপের মধ্যে সাইকেলটা লুকিয়ে রেখে দু'খানা বিভিন্ন স্টেশনের টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে পড়লাম। পুরুলিয়ায় পৌঁছলাম বেলা ৯টায়। স্টেশনেই আমরা আমাদের পোষাক বদলালাম, কারণ মেদিনীপুরে অনেকেই আমাদের চিনতে পেরেছিল। কিন্তু একটি মানুষও এগিয়ে আসেনি পুলিশকে সাহায্য করতে।

মেদিনীপুরের প্রত্যেকটি মানুষ এই দুর্দান্ত শাসকের অত্যাচারে এতই বিক্ষুব্ধ ছিল যে, তারা মনে করেছিল আমাদের হাত দিয়ে তারাই যেন এই কাজটি সম্পন্ন করেছে।

তখন আমাদের মনে হত দীনেশদার কথা। বলতেন তিনি: "গণ আন্দোলনের শরিক হও, তবেই তোমরা তাঁদের লোক হবে, তোমাদের কাজ তাঁদেরই কাজ হবে।"...

৮ই এপ্রিল রাত আটটায় আমরা কলকাতায় এসে পৌঁছলাম। উঠলাম এসে আমাদেরই সতীর্থ শৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর মিষ্টির দোকানে। দোকানটি অবস্থিত ছিল শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায় সার্কুলার রোড, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের মোড়ে।

শৈলেন কুণ্ডু মেদিনীপুরেরই ছেলে। ঘটনা শুনে আনন্দে তিনি লাফিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে দোকানের কর্মচারীদের তিনি ছুটি দিয়ে দোকানের দরজা ভেজিয়ে দিলেন। তারপর গোগ্রাসে প্রচুর খাবার গিলতে গিলতে তিনটি বন্ধুতে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করে ফেললাম।

ঠিক হল, শৈলেন আমাদের একটি রেসিডেন্সিয়াল হোটেলে তুলে দিয়ে চলে যাবেন মেদিনীপুর—তাঁর কাকার (ফণী কুণ্ডু মহাশয়) কাছে, আমাদের সংবাদ নিয়ে।

কিন্তু শৈলেন মেদিনীপুর পৌঁছে জানলেন ফণীদা আমাদেরই খোঁজে কলকাতায় চলে এসেছেন। পুলিশ আমাদের বন্ধুদের বাড়িঘরে ওয়াচার বসিয়েছে। কাজেই শৈলেন কারো সঙ্গে দেখা করতে না পেরে বাধ্য হয়ে ১০ই তারিখ কলকাতার দিকে রওনা হলেন। স্টেশনে যে গাড়ী ঢুকেছে সেটাই কলকাতায় ফিরে যাবে। শৈলেন গাড়িতে উঠবার কালে দেখলেন যে তাঁর কাকা—আমাদের ফণীদা—ঐ গাড়ি থেকেই নামছেন। ফণীদা কলকাতার একটি ঠিকানা দিলেন। ঐ ঠিকানায় গেলেই কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে।

শৈলেন কলকাতা আসতেই তাঁর সঙ্গে জ্যোতি ও আমি চলে গেলাম ঠিকানা মত মনোরঞ্জন সেনের গৃহে।

তিনি প্রথমে আমাকে চিনতে পারেন নি। পরে খড়্গপুরে অস্ত্র সরবরাহের ঘটনা উল্লেখ করতেই তিনি অস্ত্রগুলো দেখতে চাইলেন। অস্ত্র দেখান হল। মনোরঞ্জনদা অনায়াসে ওগুলো সনাক্ত করলেন।

অনতিবিলম্বে তিনি আমাদের নিয়ে (অস্ত্রাদিসহ) পার্কস্ট্রীট শেল্টারে (যেখানে দীনেশদা ও বাদলদা পলাতক অবস্থায় ছিলেন)

চলে এসে য়্যাকশান্ স্কোয়াডের দাদাদের জানালেন আমাদের আগমন বার্তা।

দাদারা উদ্বেগ চিত্তে অপেক্ষা করছিলেন আমাদের সংবাদের জন্য। আমাদের কাছে পেয়ে কী তাঁদের আনন্দ।

পার্কস্ট্রিট শেল্টারে তখন উপস্থিত ছিলেন য়্যাকশান্ স্কোয়াডের ফুলদা (প্রফুল্ল দা), রসময়দা, নিকুঞ্জদা এবং সুপতিদা। মেজদা (হরিদাস দত্ত) তখন সেখানে ছিলেন না বলেই আমার ধারণা। সবাই অকুণ্ঠ আবেগে আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

অত্যধিক উৎফুল্ল ছিলেন প্রফুল্লদা। কারণ, তিনি ছিলেন বিশেষ করে মেদিনীপুর-সংস্থার ভারপ্রাপ্ত দাদা। তাই এ জয় যেন তাঁরই জয়।

অতঃপর রসময়দা ও নিকুঞ্জদা জ্যোতি ও আমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেলেন। আমাদের কত সিনিয়র এই দাদারা—কিন্তু বয়স ও পজিশনের ব্যবধান কোথাও নেই। এঁরা শুধু 'দাদা' নন, 'নেতা' নন—এঁরা আমাদের বন্ধু, একান্ততম বন্ধু!...সিনেমা দেখা সাঙ্গ হলে জ্যোতিকে নিয়ে গেলেন রসময়দা এক শেল্টারে—তার হদিস আমার জানা নেই, জানবার কথা-ও নয়।

নিকুঞ্জদা আমাকে নিয়ে চলে এলেন মেটিয়াবুরুজে রাজেনদার শেল্টারে। এই সেই শেল্টার, যেখানে শহীদ বিনয় বসু তিন মাস কাল থেকে গেছেন। এই সেই শেল্টার, যেখান থেকে বিনয় বসু 'অলিন্দ যুদ্ধ' পরিচালনার জন্য রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর দিকে যাত্রা করেছিলেন।...বর্ষীয়ান রাজেন্দ্রকুমার গুহ আমার পিতৃতুল্য। অমন নিষ্কাম এবং নির্ভীক বিপ্লবী আমি এই প্রথম দেখলাম। যে সংসার করেনি, সে সন্ন্যাসী হতে পারে। কিন্তু সংসার আবর্তে বসেও যে টলে না, তার তুলনা কোথায়?

রাজেনদার নিঃস্বার্থ কার্যকলাপ ও অনমনীয় চরিত্র এবং অদ্ভুত নিয়মানুবর্তিতা-জ্ঞান আমার জীবনে স্থায়ী রেখাপাত করেছিল। তাই ভিলিয়ার্স আক্রমণের পর বন্দী অবস্থায় লালবাজারে

লক-আপে দিনের পর দিন যে নির্যাতন ভোগ করেছিলাম তা' ভ্রূক্ষেপ না করে কঠিন চিত্তে যে নিজেকে এবং সংস্থাকে বাঁচাতে পেরেছিলাম—তার মূলে ঐ রাজেনদা। সকল নির্যাতনের মধ্যে আমাকে প্রচণ্ড শক্তি দান করত দুইটি লোকের চরিত্র। একটি রাজেনদার, অপরটি আমার পিতার।

পেডি নিহত হলেন। বিপ্লবীরা নিখোঁজ। সাম্রাজ্যবাদীর দম্ভ ধূলায় লুণ্ঠিত। কলকাতা থেকে বড় বড় আই. বি. অফিসারবৃন্দ মেদিনীপুরের দিকে ধাবিত হল। কিন্তু কোন সূত্রই তাদের হস্তগত হল না। তখন তারা আন্দাজে পূর্ববঙ্গীয় মেদিনীপুরবাসীদের বাড়ি সার্চ করা শুরু করল। ফলে আমাকে খোঁজ করল, কারণ আমার আদিনিবাস বরিশাল জিলায়। আমি অনুপস্থিত।

জ্যোতিজীবনের খোঁজ হল না, কারণ সে পশ্চিমবঙ্গের ছেলে। ব্রিটিশের 'Divide and rule'-এর বুদ্ধি। তারা জানে না যে বিপ্লবীর জাত নেই, ধর্ম নেই, পূর্ব নেই, পশ্চিম নেই, প্রদেশে-প্রদেশান্তর নেই। তাদের একমাত্র পরিচয় তারা ভারতীয়, তারা বিপ্লবী, তারা দেশমাতৃকার মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক।

আমাদের নেতারাই জ্যোতির দাদা বিনয়জীবন ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জ্যোতিকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর গৃহে, মেদিনীপুরে। জ্যোতি সুন্দর ভাবে সবার অলক্ষ্যে থেকে গেলেন। জ্যোতির খোঁজ কোনভাবেই পুলিশ করল না। ফলে দাদারা একটু ভুল বুঝলেন। রসময়দা আমাকে বললেন: "পুলিশ দেখছি কিছুই বোঝেনি। তুমি শুধুই পলাতক হয়ে থাকবে কেন? মেদিনীপুর ফিরে গিয়ে সংগঠনের কাজ কর।"

ঠিক হল, আমি আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে মেদিনীপুর ফিরে আসব। ১৬ই এপ্রিল ভোর পাঁচটায় বড়দাদার সঙ্গে আমি মেদিনীপুরের বাড়ীতে এলাম। আমার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেতেই বাবা উঠে এসে আমাকে অন্দরে নিয়ে গেলেন। তাঁর কণ্ঠে

বারেবারে একই প্রশ্ন: "তুই এলি কেন? পুলিশ যে সব আঁচ করেছে।"

বললাম: "কাগজে তো কিছুই বের হয় নি।"

উত্তরে তিনি বললেন: "তুই আসবি আশা করেই ওরা খবর চেপে রেখেছে, ওরা রোজ খবর করে তুই এলি কিনা। এবেলা-ওবেলা রোজ খবর করে। ওদের ফাঁদে তুই অজান্তে পা দিয়েছিস।" পিতাপুত্রে এই কথা হতে না হতেই সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল।

বাবা বেরিয়ে গেলেন। দেখলাম তাঁর নার্ভ কত শক্ত। পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর হাজির। আমার আসার সংবাদ পেয়েই সে এসেছে।

আমাদের বাড়ীর পাশে ছিল এক রায়সাহেবের বাড়ি। খবরা-খবরের অসুবিধা তাই 'আই-বি'দের নেই।

দারোগাবাবু তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করল: "আপনার ছেলেকে একবার ডাকুন তো? আমি দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করে চলে যাব।"

বাবা বড়দাকে ডেকে পাঠালেন। বড়দা ঘরে ঢুকতেই বাবা বললেন: "এই আমার বড় ছেলে। নাম বিজয়। এক্ষুনি কলকাতা থেকে এসেছে। সেখানে ডাক্তারি পড়ে। বিমলের খোঁজ করার জন্যই ওকে খবর দিয়ে আনিয়েছি।

দারোগা হতবাক। অমন সহজ, সরল, অকম্পিত কণ্ঠে কোন ফাঁকির স্পর্শ দারোগা খুঁজে পেল না। বড়দাকে দু'একটি প্রশ্ন করে দারোগা বিদায় হল। আমি ঘরে বসে বাবার সব কথা শুনলাম। অমন সাহস ও উপস্থিতবুদ্ধি বাবাকে কে জোগাল!—

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার বাবা যেন অন্য ধাতুর গড়া মানুষটি হয়ে গেলেন। এ বাবা আমাদের অপরিচিত। রাগ নেই, দুঃখ নেই, ভয় নেই—আছে শুধু কর্তব্যবোধ এবং অগাধ দেশপ্রেম। কি করে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দেশের কল্যাণের জন্য বাঁচান যায়, তারই সংকল্প তাঁর সর্বাঙ্গে।

দারোগা চলে গেলে তিনি অন্দরে ফিরে এলেন। মেজদাকে

আদেশ করলেন, প্রখ্যাত শহীদ সত্যেন বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন বসুর (কেতন বসু) সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তারপর তিনি আমার কাছটি ঘেঁসে বসলেন। বললেন: "তুমি যা করেছ তা বিচারের ঊর্ধে। কতটা সাহস ও সাধনা থাকলে যে একাজ করা যায় তা আমি বুঝি। তুমি যা করেছ তার ফলাফল কি হতে পারে, বা হতে পারত, তা তোমার অজ্ঞাত নয়। তোমাকে বলার মত আমার কিছুই নেই। তবু এইটুকু তোমাকে অনুরোধ করব যে, তুমি যদি জীবিত ধরা পড়, তাহলে এমন কিছু কোরো না, যাতে বন্ধুদের কোন ক্ষতি হয়। আমি আশীর্বাদ করি, এই গুরু দায়িত্ব বহন করার শক্তি যেন ভগবান তোমাকে দেন।

নিঃস্বার্থ পিতার আশীর্বাদ বোধ হয় বজ্রের চেয়েও শক্তিশালী। নইলে নৃশংস, হিংস্র জানোয়ার-স্বরূপ ইংরেজ সার্জেন্টগুলো লালবাজার লক-আপে দিনের পর দিন যখন ক্রমান্বয়ে ছ'সাত ঘণ্টা ধরে বেত্রাঘাতে আমার সর্বদেহ ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল—অথবা তাদের চড়, ঘুষি, লাথি খেতে খেতে এবং তৎসঙ্গে 'আই-বি'র মণি বোসের অশ্লীল গালাগালি শুনতে শুনতে আমি যখন চৈতন্য হারিয়ে ফেলতাম, তখন কোথা থেকে আমার শক্তি আসতো দীনেশদার আদর্শকে পালন করবার? এই শক্তি দিয়েছিলেন আমার পিতা অক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত এবং পিতৃতুল্য আমার বিপ্লবী দাদা রাজেন্দ্রকুমার গুহ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেজদা (বিনয় দাশগুপ্ত) কেতনবাবুর কাছে থেকে ফিরে এলেন। কেতনবাবু, অর্থাৎ ভূপেন বসু তাঁদের পরিবারের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য রক্ষা করে সর্ববিধ সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

পরক্ষণেই আমাদের বাড়ীতে তাঁর কাছ থেকে এল একটি হিন্দুস্থানী গয়লা। নাম তার রঘুনন্দন গোপ। শহীদ সত্যেন বসুর আদর্শে সে বহুদিন থেকেই অনুপ্রাণিত। আমাদের বিপদের বার্তা পেয়েই সে বলল: "আমার জান কবুল, আমি ওকে কলকাতায় নিয়ে যাবো।"

মেজদা তাকে বললেন: "আমাদের বাড়ি যে কোন মুহূর্তে সার্চ হতে পারে। তুমি তোমার ব্যবস্থা কর। আমরা ততক্ষণে ওকে লাইব্রেরী ঘরে সরিয়ে রাখব।"

আমার মেজদা তৎকালে লাইব্রেরী অর্থাৎ 'ঋষি রাজনারায়ণ বসু পাঠাগারে'র লাইব্রেরীয়ান্। আমি তৎক্ষণাৎ খাওয়াদাওয়া সেরে ছদ্মবেশে ঘরের পেছন দিয়ে বেরিয়ে পালালাম। সারাদিন লাইব্রেরী ঘরে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হল।...

ঐ দিনই সন্ধ্যা ৭টা! শহীদ সত্যেন বসুর ঘরে তাঁর ফটোর নীচে কেত্তনবাবু, মেজদা, রঘু এবং আমি বসে আছি। আলোচনা চলছে, কিভাবে ওয়াচার-পরিবেষ্টিত শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

হঠাৎ রঘু বলে উঠল: "পুলিশের লোকেরা তো বাঙালী ছাত্র ও যুবকদের খুঁজছে। যারা বাঙালী নয়, তাদের উপরতো ওদের নজর নেই। আমি বিমলকে মাথায় পাগড়ি বেঁধে গয়লার ছেলে সাজিয়ে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।

আমরা অভিভূত! তথাকথিত অশিক্ষিত এই গয়লার কি নিঃস্বার্থ বুদ্ধি, কি অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক-বিশ্লেষণ-ক্ষমতা।

সবাই একবাক্যে পরম বন্ধু রঘু গয়লার কথায় সায় দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রঘুর সুনিপুণ হস্তবিন্যাসে আমি অন্য এক কিশোরের রূপ গ্রহণ করলাম।...রাত দশটা। একটি নিম্নশ্রেণীর মাতালের ভূমিকায় রঘুনন্দন গোপ ও তার কিশোর পুত্র শহীদ সত্যেন বসুর গৃহ থেকে বেরিয়ে এল। ঐ কিশোর পুত্রের বেশেই চলছি আমি। যাত্রা আমাদের স্টেশনের দিকে।

রঘু স্টেশনে পৌঁছে দু'খানা তৃতীয় শ্রেণীর কলকাতার টিকিট কিনে আনল। আমি নির্জনে একটি গাছের নীচে গয়লার ছেলে হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। ট্রেন ছাড়বার সময় হতেই বেছে বেছে অপেক্ষাকৃত একটি নোংরা কামরায় আমরা উঠে গেলাম।

কিন্তু ট্রেন যে ছাড়ছে না। রঘু তার স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় শুরু করল। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে মাথা দুলিয়ে কথা বলতে লাগলাম জড়ান হিন্দিতে। আমার কথা অবশ্য 'হ্যায়', 'নেহি', 'বহুত-আচ্ছা'র মধ্যেই ঘোরাফেরা করছিল। আমি স্টেশনের দিকে পিঠ রেখে বসেছিলাম। দেখছিলাম চার পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর ওয়াচার-গুলো জানালা দিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে ট্রেনের কামরাগুলো খোঁজাখুঁজি করছে।

কিন্তু রঘুর অভিনয়ের কাছে তাদের হার হল। আমাকে নিরাপদে সে কলকাতায় নিয়ে এল। রঘুভাইকে আলিঙ্গন করে আমি বিদায় হলাম। রাজেনদার আস্তানা আমি চিনি। তাঁর আশ্রয়ে আমার স্থান হল।...

রাজেনদার গৃহে আমাকে বেশিদিন রাখা হল না। কারণ, পুলিশ আমার ফটো সংগ্রহ করে ফেলেছে। অধিকন্তু ইতিমধ্যে কাগজেও একটি ঝি-র ছেলের চাঞ্চল্যকর উক্তি বেরিয়েছিল: "বিমলদা সাহেবকে মেরে পালিয়ে গেছে।"...

একদিন ফুলদা (প্রফুল্লদা) এসে আমাকে নিয়ে গেলেন বাঙলার বাইরে ঝরিয়ার কয়লাখান অঞ্চলের উদ্দেশে। সেখানে ফুলদার দুজন বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার আমাকে আশ্রয় দিলেন। তাঁদের নাম কৃষ্ণকালী বসু এবং পুলিনবিহারী পাইন। কৃষ্ণকালীবাবু আমাকে নিয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। আমাকে বিদেশে পাঠাবার প্ল্যান তাঁর মাথায় আসছিল। পরম যত্নে আমি এঁদের আশ্রয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন কাগজে একটা সংবাদ পড়ে আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। খবরে প্রকাশ:—"গত রাত্রে একটার সময় দুইজন লোক ছোরা হস্তে বিমলের গৃহে যাইয়া তাহার পিসিমাকে খুন করিবে বলিয়া ভয় দেখায়, এবং বিমল কোথায় আছে তাহা জানিতে চায়। বিমলের পিসিমা আতঙ্কে চেঁচাইয়া উঠিতেই বিমলের পিতা ও মেজদাদা ছুটিয়া আসিলে দুর্বৃত্তেরা পালাইয়া যায়।"....

ভাবলাম বিচিত্র এই সংসার। একদিকে দেশপ্রেমী, ভয়ডরহীন রঘুর মত পূজনীয় ব্যক্তি—অপর দিকে ইংরেজের পদলেহী, ঘৃণ্য এই পুলিশী-এজেন্টদের মত অমানুষ!

এসময় আমার চলাফেরায় কোলিয়ারির লোকেদের হয়ত কিছু সন্দেহ হচ্ছিল। পুলিনবাবু সে সংবাদ কলকাতায় পাঠাতেই আমাকে অন্য আস্তানায় আনা হল।

আমাদের দলেরই কর্মী, রসময়দার সহপাঠী বিনোদ দাস তখন আসানসোলে একটি কোলিয়ারির ম্যানেজার। তাঁর স্ত্রীর নাম পুতুল দেবী। পুতুল আমাদের রাজেনদার জ্যেষ্ঠা কন্যা, বয়সে আমার ছোট। আমি তাঁদের কাছেই পুতুলের ভাই রূপে থেকে গেলাম।...

১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই আমাদের দীক্ষাগুরু ও নেতা দেশের গৌরব দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়ে গেল।

এ বিচার-প্রহসনের জন্য গঠিত স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন আলিপুর সেশান্-জজ মিঃ গার্লিক।

দণ্ডদাতা মিঃ গার্লিককেও বিপ্লবীর বিচারে দণ্ড গ্রহণ করতে হবে—সিদ্ধান্ত নিলেন বি-ভি-র 'য়্যাকশান্ স্কোয়াড্'।

১৭ই জুলাই আমাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হল। ১৮ই জুলাই গার্লিককে শাস্তিদানের জন্য আমি প্রস্তুত হয়েছি পার্টির নির্দেশে। কিন্তু তখন জানতে পারিনি, কি কারণে যেন আমাকে আর ঐ য়্যাক্শানে পাঠান হল না।

দুঃখ হল আমার। কিন্তু পার্টির আদেশ যে ভগবানের বিধান থেকেও আমাদের কাছে অলঙ্ঘনীয় ছিল!...নীলমণি দত্ত লেনে নেপালদার (নাগ) হেপাজতে একদিন রেখে আমাকে আবার বাঙলার বাইরে পাঠান হল।

এল ২৭'শে জুলাই। কাগজে পড়লাম, গার্লিক সাহেব তাঁর বিচার কক্ষেই একটি অজ্ঞাত বিপ্লবীর গুলির আঘাতে নিহত হয়েছেন।

দণ্ডদাতা ঐ কিশোরটি কাজ হাসিল করেই সায়ানাইড্ খেয়ে আত্মহত্যা করে শহীদলোকে চলে গেছেন।

প্রণাম করলাম অজানা শহীদকে। কে বা কারা এ কাজ করলেন তার হদিস পেলাম না। পরে অবশ্য শুনেছি যে, আমাদের দাদাদের সঙ্গে ব্যবস্থা করেই এ কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিপ্লবী নেতা সাতকড়ি ব্যানার্জী মহাশয়। তাঁর মন্ত্রশিষ্য কানাই ভট্টাচার্য ছিলেন ঐ অজ্ঞাত দণ্ডদাতা। কানাই ভট্টাচার্যের পকেটে একটি চিরকুট পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল: "ধ্বংস হও; দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসি দেওয়ার পুরস্কার লও—বিমল গুপ্ত।"

গার্লিক হত্যার তিন মাস পর ইউরোপীয়ান্ য়্যাসোসিয়েশানের সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্সকে গুলি করার অপরাধে বন্দী হলাম। তখনো আমি কানাই ভট্টাচার্যের কোন পরিচয় জানি না, তাঁর নামও আমার অজ্ঞাত।

কিন্তু তা হলে কি হবে? লালবাজারে কানাই ভট্টাচার্যের পরিচয় আমার কাছ থেকে আদায় করার জন্য কি নির্যাতনই না আমাকে ভোগ করতে হয়েছে!

পুলিশের বড় কর্তাদের অভিমত—কানাই নাকি মেদিনীপুরের লোক। মৃতের চোখ, ঠোঁট, নাক দেখে তাঁরা নাকি নিশ্চিত যে গার্লিক হত্যাকারী মেদিনীপুরের লোকের ছেলে না হয়ে পারে না।

—কী ক্ষুরধার এঁদের বিচার বিশ্লেষণ! কী সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ...

এবার ভিলিয়ার্স-আক্রমণের ব্যাপারটা বলি।

১৯৩০ সালের পর থেকেই ইউরোপীয় বণিক-সমাজ এবং তাদের মুখপত্র স্টেটস্ম্যান্ ও ইংলিশম্যান্ পত্রিকাগুলো তীব্র ভাষায় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে।

তারা প্রকাশ্যে বলল: এসব 'টেররিস্ট'দের কার্যকলাপের যথার্থ বুদ্ধিদাতারা আইনকে ফাঁকি দিয়ে বিনা বিচারে বন্দী হয়ে জেলে বসে আছে। তারাই সেখান থেকে সর্ববিধ বৈপ্লবিক কার্য পরিচালনা করে। সুতরাং এক-একটি ইংরেজের প্রাণ হরণের বিনিময়ে এক

একটি নামী বিপ্লবীকে জেল থেকে বের করে এনে প্রকাশ্য স্থানে গুলি করে মারতে হবে।

এসব প্ররোচনা থেকেই ১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর হিজলি বন্দীনিবাসে নিরস্ত্র রাজনৈতিক ডেটিনিউদের উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করল। ফলে অসহায় অবস্থায় বুলেটবিদ্ধ হয়ে জীবন দিলেন বিপ্লবী নেতা সন্তোষ মিত্র এবং তারকেশ্বর সেন। আহত হলেন অনেকে।

দুঃসংবাদ ছড়িয়ে গেল ভারতবর্ষময়। এমন ঘটনা ইংরেজের রাজত্বে ইতিপূর্বে ঘটেনি। জেলখানায় অবরুদ্ধ, অসহায় বন্দীদের উপর মাস্ স্কেলে গুলি চালানর ইতিহাস দুর্লভ। তাও আবার সকলেই বিনা বিচারে, রাজনৈতিক কারণে শৃঙ্খলাবদ্ধ!

স্বভাবতই দেশ জুড়ে ক্রোধ ও ঘৃণার ঝড় বয়ে গেল। বিপ্লবীরা এর প্রতিবাদ অগ্নির অক্ষরে স্বাক্ষরিত করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। তাঁদের নেতৃবৃন্দ ভাবছেন, মিঃ ভিলিয়ার্স ও স্টেটস্‌ম্যান্ কাগজের প্রধান সম্পাদক মিঃ ওয়াট্‌সনের (বণিক-সমাজের প্রতীক রূপে) আচরিত এ ঔদ্ধত্যকে স্তব্ধ করে দেবার প্ল্যান।

এই সময় আমি আবার রাজেনদার গৃহে আশ্রিত। কাজের পূর্বদিন দাদারা জানালেন যে, পরের দিন আমাকে ভিলিয়ার্স নিধনে যেতে হবে! আমার আনন্দের সীমা রইল না। আমি এতাবৎ শুধুই ভাবছিলাম, শহীদ বিনয় বসুর মত আমিও ‘Double Action’-এর গৌরব লাভ করব—সফল ও রাজনীতিক-গুরুত্বপূর্ণ ‘ডাবল য়্যাক্‌শান’!···

২৯শে অক্টোবর, ১৯৩১ সাল। খুব ভোরে এসে উপস্থিত হলাম আমাদের পার্কসার্কাস শেল্টারে। নিউ পার্কস্ট্রীটের উপরই সে বাড়ি। প্রত্যূষে খবরের কাগজ পড়েই আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলাম। খবর ছিল: “গতকাল (২৮. ১০. ৩১) সন্ধ্যায় ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নো বিপ্লবীদের গুলিতে ঘায়েল হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার অবস্থা সঙ্কটজনক।”

আমি যথাসময়ে খাওয়া দাওয়া সেরে জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হয়েছি। কথা ছিল ইউরোপীয় পোষাক পরেই আমি কার্যস্থলে যাব। কিন্তু অভিজ্ঞ দাদারা আমাকে পশ্চিমা মুসলমান-ব্যবসায়ীর সাজ পরিয়ে দিয়েছেন।

'সর্বাদা' অর্থাৎ বিনয়দার (স্বর্গত বিনয় সেনগুপ্ত) উপর ভার ছিল তিনি আমাকে সংগে করে নিয়ে যাবেন ভিলিয়ার্স সাহেবের চেম্বার পর্যন্ত।

গিলিণ্ডার্স হাউসের তেতলায় আমি অপেক্ষা করব, বিনয়দা দেখে আসবেন ভিলিয়ার্স তাঁর কামরায় আছেন কিনা। বিনয়দা কামরা দেখিয়ে চলে যাবার ঠিক দশ মিনিট পরে আমি সাহেবকে আক্রমণ করব।

প্রফুল্লদা অবশ্য ইতিপূর্বে গিলিণ্ডার্স হাউস ও ভিলিয়ার্স্-এর কামরা ইত্যাদির নক্সা নিজে উপস্থিত থেকে নিয়ে এসেছিলেন।

দাদারা বিনয়দাকে বলে দিয়েছিলেন যে, কামরায় ভিলিয়ার্স একা থাকলেই তিনি আমাকে 'গ্রীণ সিগন্যাল' দেবেন। নচেৎ আমাকে তিনি সঙ্গে করে ফিরে আসবেন।

দাদাদের আমার প্রতি আদেশ ছিল : "তোমার চলাফেরা যেন খুব স্বাভাবিক ও সন্দেহমুক্ত হয়। তুমি ভুলে যেও যে, তুমি বাঙালী 'বিমল দাশগুপ্ত'। তুমি মনে রেখো, তুমি একজন প্রতিষ্ঠাবান তরুণ আপ কান্টিম্যান—ব্যবসায়ীর পুত্র, ঘোর ব্যবসায়ী! গতকাল ডুণো আক্রান্ত হয়েছেন। এরা তাই বাঙালী তরুণ মাত্রকেই মৃত্যুদূত মনে করে আতঙ্কিত থাকবে।"

আমিও তাই দাদাদের আদেশ স্মরণ রেখে চেন্ সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বাস্তবাগীশ ব্যবসাদার-সুলভ চটপটে ভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করছিলাম। সেই কালে সিগারেট বস্তুটি বিপ্লবীদের মস্ত একটা ক্যামাফ্লাজ্ ছিল। গোয়েন্দারা জানত (এবং ঠিকই জানত) যে, বিপ্লবীদলের ছেলেদের পক্ষে কোনরূপ নেশা করা বা অশ্লীলতার আশ্রয় নেওয়া নিষিদ্ধ। তারা যে বিবেকানন্দের আদর্শে

অনুপ্রাণিত রাজনৈতিক সন্ন্যাসী। তাদের লক্ষ্য দেশজননীর শৃঙ্খলমুক্তি, অগণিত জনসমুদ্রের বন্ধনক্ষয়। এ লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় আত্মপ্রত্যয়, আত্মবিলয়ন, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, নিরবিচ্ছিন্ন কর্ম, আদর্শে ভক্তি।

তখন প্রায় ১২টা। আমি সংকেত পেয়ে গিয়েছি। তেতলা থেকে নেমে এসে ভিলিয়ার্স-এর চেম্বারের দিকে যথা নির্দেশ রওনা হলাম। সাহেব তাঁর কামরায় একা থাকবার কথা। আমি বিদ্যুৎ বেগে তাঁর কক্ষে ঢুকে গেলাম, এবং পর পর তিনটি গুলি করলাম।

কিন্তু বাস্তব আমার প্রতিকূল। তা' না হলে ১০ মিনিট পূর্বের দেখা দৃশ্য (ভিলিয়ার্স একাকী ঘরে আছেন) কি করে আমার প্রবেশমুহূর্তে অন্য দৃশ্যে পরিণত হল? ইতিমধ্যে ঐ ঘরে আরো তিন-চার জন সাহেব ঢুকে গেছে।

আমার প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল যে, একটা সাহেবকে ঘায়েল করতে আমার কিছুমাত্র বেগ পেতে হবে না। অধিকন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলাম যে, ফার্স্ট বুলেট্, আক্রান্তদেরকে ভয় পাইয়ে দেয়—প্রতিবাদ করার মত সাহস অনেকেরই থাকে না। তাই নিশ্চিন্ত চিত্তে ভিলিয়ার্সের চেম্বারে প্রবেশ করেই আমি পকেট থেকে রিভলবার টেনে এনে গুলি করলাম।

কিন্তু আমার ছায়া দেখেই ভিলিয়ার্স-এর ইনটুইশান্ তাঁকে সজাগ করে দিল। উদ্যত রিভলবার নিয়ে ঘরে ঢুকেই গুলি করলে দু'এক সেকেণ্ড সময় বেশি পেতাম—তন্মধ্যে ভিলিয়ার্স-এর বুক দীর্ণ করে বুলেট বেরিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু তা হল না। আমার বুলেট তাঁর বুকে সোজা বিদ্ধ হবার সুযোগ পেল না, তির্যক ভাবে তাঁর অঙ্গ বিদ্ধ করল। তিনি টেবিলের নীচে পলায়নের অবকাশ পেলেন। ভিলিয়ার্স-এর দিকে ব্যারেল-এর মুখ থাকাতে অপর সাহেবগুলো আমার দেহপার্শ্বের অরক্ষিত অবস্থার সুযোগ নিল।

এ ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় যে ভিলিয়ার্স-এর চেম্বারটির প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের দ্বার ছিল একটিই। আমি সেই দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে। কাজেই পালাবার কোন পথ না থাকায় তারা প্রাণের তাগিদে মরিয়া হয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে আমি সায়ানাইড্ গিলে ফেলার সময় টুকুও পেলাম না। এদিকে আমি বন্দী—সাহেবদের হাতে। তারা চেঁচাচ্ছে: "God has saved us! God has saved us!"

একটু দম নিয়ে তারা সমস্বরে প্রশ্ন করে: "Why have you come to shoot Mr. Villiars ?"

আমি উত্তর দিলাম: "Listen, the savage repressions in Midnapore, Chittagong and in Hijli camp were always inspired by the European Association. So I have come to settle accounts with its President."

অল্পক্ষণের মধ্যেই পুলিশের কর্ণধারদের আগমন ঘটল। আমাকে তুলে আনা হল পুলিশ ভ্যানে লালবাজার লক্ আপে। তারপর শুরু হল অত্যাচারের অমানুষিক তাণ্ডব। সন্ধ্যা ৭ টায় পুলিশ কমিশনার (তৎকালীন) মিঃ কলসনের কাছে আমাকে উপস্থিত করা হল। আমার দিকে তাকাতেই আমার রক্তাক্ত চেহারা দেখে সাহেব শিউরে উঠলেন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই অনুচরদের আদেশ দিলেন তৎক্ষনাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে।

চিকিৎসার হুকুম এলেই তার ব্যবস্থা হয় না। কাজেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হল পুলিশের দক্ষিণহস্ত নলিনী মজুমদারের কাছে। তিনিও আমার অবস্থা দেখে কোন প্রশ্ন করলেন না। আমি পুনরায় সশস্ত্র সার্জেন্ট পরিবৃত হয়ে লালবাজার থানার প্রবেশদ্বারে আনীত হলাম

কিন্তু কি আশ্চর্য। আমারই অজান্তে ভ্যান থেকে নেমেই আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। কেন এই অট্টহাসি, তা তখনো আমি জানি নে। যে সব ইউরোপীয় সার্জেন্ট লালবাজার লক্-আপে

আমার উপর অত্যাচারের চাবুক চালিয়েছে তারাতো অবাক! তাদের সম্মানে আঘাত লেগেছে। তারা চিৎকার করে বলে উঠল: "What ! the boy is laughing !"—এই বলেই তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে আমাকে 'কিক্' করতে শুরু করল। আমি ফুটবলের মত ওদের পায়ে পায়ে গড়াতে লাগলাম।

ওদের কানে তখনো বাজছে Royalist-দের কণ্ঠ: "Yesterday Durnoe ! Today Villiars !" আমার উপর তার শোধ তোলা ঐ পশুগুলোর পক্ষে তাই একটুও অস্বাভাবিক নয়।

পরবর্তীকালে কারাগৃহের নির্জন পরিবেশে আমার সেই অট্টহাসির উৎস খুঁজেছি। আমার ধারণা, ওটা ছিল আমার স্বীকারোক্তি আদায়ে পুলিশের ব্যর্থতা দেখে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ব্যঞ্জনা। লালবাজার গেটে মার খেয়ে অচৈতন্য হবার পরই সহসা আমার উপর অত্যাচারের পালা শেষ হল। দিন দুই পর থেকেই সন্ধ্যা ছ'টা হতে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে পরম সহানুভূতি ও মায়ামমতার ছলনা করে আলাপ করতে থাকলেন 'এস্ বি'-র মধুকণ্ঠ জগৎ ভট্টাচার্য এবং পুলিশের খ্যাতনামা ইনটেলেকচুয়েল শশধর মজুমদার। ভোর ছ'টা থেকে রাত বারটা পর্যন্ত গালগল্প চালাচ্ছেন জগৎবাবু মা-মাসীর দরদ ঢেলে। রাত বারটার পর থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত শশধরবাবুর অভিনয় চলেছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী-বিপ্লবীয়ানার ভঙ্গি বজায় রেখে নানা তত্ত্ব আলোচনায়। আলোচনা এক তরফা। আমি হুঁ-হাঁ করে যাচ্ছি সুবোধের মত।

একদিন জগৎবাবু একটা কৌটায় করে কতকগুলো রসবড়া এনে আমার সামনে রাখলেন। হাস্য বিকশিত করে বললেন: "নিন মশায়, আমার গিন্নীতো আপনার উপর মারপিটের কাহিনী শুনে কেঁদেই আকুল। দু'দিন ধরে আহার নেই তাঁর। আজ পরম আদরে কিছু রসবড়া করে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার জন্য। আমিতো মশায় মিনিটে-মিনিটে পান খাই। তা পানের কৌটা

থেকে পান ফেলে দিয়ে রসবড়াগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছেন। নিন, খেতে আরম্ভ করুন। সত্যি আপনারা আমাদের গৌরব।"

উঃ, কী ঘৃণ্য জীব এরা! কী ঘৃণ্য এদের অভিনয়। আমি জগৎবাবুর অভিনয়ে সাড়া দিতে পারলাম না। অবশেষে আমার দু'হাত ধরে অনুনয়ের সুরে তিনি বললেন: "দেখুন, আমাকে যখন কিছু জানালেন না, তখন শশধরবাবুকেও কিছু জানাবেন না। বলুন আমার কথা রাখবেন?"

শশধরবাবু ও আমাকে অনুরূপ অনুরোধ করেছিলেন। আমি আগ্রহে উভয়ের অনুরোধই রেখেছিলাম। আজও উভয়েই বেঁচে আছেন। তাঁরা আমার এ উক্তি অসত্য হলে অনায়াসে প্রতিবাদ করতে পারেন।

লালবাজারে থাকা কালেই তাঁরা আমাকে বলেছিলেন যে, ভিলিয়ার্স-আক্রমণ-মামলায় আমার বছর দশেক সাজা হবে, কিন্তু পেডি হত্যা মামলায় আমার ফাঁসি অবধারিত। ভগবান এলেও নাকি আমাকে বাঁচাতে পারবেন না।

আমি তখন ঠাট্টা করে বলেছিলাম: "আহা, এটাতেও যদি আপনারা 'ফাঁসি'র ব্যবস্থা করতে পারতেন, তবে আমি বিনয় বসুর গৌরবকেও ম্লান করে দিতে পারতাম দু'বার করে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়ে!"...

১০ই নভেম্বর ১৯৩১ সাল। আলিপুর কোর্টে স্পেশাল ট্রাইবুনালে ভিলিয়ার্স শুটিং মামলার বিচার শুরু হল। ট্রাইবুনালের সভাপতি ছিলেন সেশান জজ মিঃ বাটলার।

সাক্ষীরা এক এক করে তাদের সাক্ষ্য দিয়ে গেল। ভিলিয়ার্স-এর গায়ের বুলেটবিদ্ধ রক্তাক্তিত জামাগুলো এক্জিবিট রূপে দাখিল করা হল। কিন্তু স্বয়ং ভিলিয়ার্স কোথায়? সাক্ষ্য দিতে তাঁর তো সাক্ষাৎ নেই!—

পরে জানলাম, ঘটনার দিন দুই পরেই তিনি নাকি ভারত ছেড়ে বিলেতে পাড়ি জমিয়েছেন। তিনি জানতেন টেগার্ট সাহেবের হাল।

ব্ল্যাক্‌লিষ্টের যে কোন লোক বিপ্লবীদের হাতে বারে বারে টার্গেট হতেই হবে। 'মৃত্যু' ছায়ার মতই তাঁকে অনুসন্ধান করছিল বুঝি? তাই ক্ষমতা ও অর্থের মায়া ত্যাগ করে প্রাণের মায়ায় তিনি পালিয়ে গেলেন।

১১ই নভেম্বর। কাগজের মাধ্যমে সবাই জেনেছে যে, আজ ভিলিয়ার্স-শুটিং-মামলার রায় বেরুবে। কোর্টে প্রচুর লোক সমাগম।

সাক্ষীদের বক্তব্য দাখিল করার পর বার্টলার সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি সত্যি ভিলিয়ার্সকে গুলি করেছিলাম কি না।

উত্তরে আমি বললাম: "হ্যাঁ। ভিলিয়ার্স সাহেবকে নিধন করার সংকল্পেই আমি তাঁর চেম্বারে ঢুকেছিলাম, তাঁকে গুলি করেছিলাম।"

বিচারে আমার দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল—যেটা লালবাজারে থাকা কালেই জগৎবাবু আমাকে বলেছিলেন। আমার এই অদ্ভুত বিচারে বিস্ময় লাগল। এ প্রহসন যে বিচিত্র।

তখন বুঝিনি, তখন জানিনি এর পশ্চাতের রহস্য। পরে শুনেছি যে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র এবং দেশপ্রেমী শরৎচন্দ্রের অনুরোধে তাঁদের আত্মীয় তৎকালীন এ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ এন. এন. সরকার গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে সাজা-বৃদ্ধির চাপ দেন নি। কারণ তাঁকে শরৎবাবু বুঝিয়েছিলেন যে—পেডি-হত্যা-মামলায় কচি ছেলেটার ফাঁসি তো অবধারিত, সুতরাং ভিলিয়ার্স-শুটিং-মামলায় সরকারপক্ষের 'ম্যাগনানিমাস' হতে বাধা কি?

বিপ্লবীরা জানেন, শরৎচন্দ্র তাঁদের কত বড় বন্ধু ও সহায়ক ছিলেন। সুভাষচন্দ্রতো বিপ্লবীগোষ্ঠীরই অনন্য প্রতীক। নেতাজীর গরবে গরবিনী এই ভারতবর্ষ।

১৯৩২ সালের ১২ জানুয়ারী শুরু হল আমার বিরুদ্ধে পেডি হত্যার মামলা।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ভক্তকুল আনন্দে ডগমগ। কারণ তারা প্রচুর অর্থব্যয়ে আমার বিরুদ্ধে অনেকগুলো প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী

যোগাড় করেছে। পুলিশপক্ষের সাক্ষী সাবুদ সংগ্রহে বিরাম নেই। তাই তারা ন্যায় বিচারের যূপকাষ্ঠে আমাকে বলি দেবার ভরসায় আহ্লাদিত।

হাইকোর্টের তিনজন জজকে নিয়ে একটি স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল (হাইকোর্ট) গঠন করা হল। ট্রাইবুন্যালের সভাপতি ছিলেন বিচারপতি পিয়ার্সন। অন্য দু'জন জজ ছিলেন হাইকোর্টের এস্. কে. ঘোষ এবং এস্. সি. মল্লিক। সরকার পক্ষে স্বয়ং এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল দাঁড়ালেন। তাঁর সহায়ক এ্যাড্‌ভোকেট রমনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে বিপ্লবীকুলতিলক সুভাষচন্দ্র ও তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্র স্বদেশের বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন সর্বক্ষণ এই ধান্দায় যে কি করে আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে আনা যায়।

তাঁরা স্থির করলেন, বিপ্লবীনি বিমলপ্রতিভা দেবী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিজয় দাশগুপ্তের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের তরফ থেকে যোগাযোগ রেখে আমার পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থাদি করবেন।

ব্যবস্থানুসারে তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টারদের অন্যতম বি. সি. চ্যাটার্জি, এন. আর. দাশগুপ্ত, এ. কে. বসু এবং য়্যাড্‌ভোকেট বি. এন. সেনগুপ্ত প্রমুখ স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে আমার পক্ষ অবলম্বন করতে এগিয়ে এলেন।—

এদিকে পর্দার অন্তরালে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে, যার ফলে ইংরেজ ও তার বেতনভুক দালালদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল।

যেসব সাক্ষী পুলিশের তাঁবে এবং টাকাপয়সা ও চাকুরির প্রলোভনে একটি শক্ত বন্ধনে আকৃষ্ট হয়েছিল—তাদের সেই বন্ধন কেমন করে যেন আলগা হয়ে যেতে লাগল। এর কারণ অবশ্য ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে এসেছিল।...

পেডি-হত্যার আসামীরা তো ফেরার। একজনের কিছু সন্ধান

পেলেও অপর ব্যক্তি বেমালুম উধাও। উধাও—জ্যোতিজীবন কিন্তু ঘরেই বসে আছেন দিব্যি নিশ্চিন্তে।

এই অবসরে আমাদের বিপ্লবী-সতীর্থরা সংগঠন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদেরই সঙ্গীসাথী ও প্রভাবিত ব্যক্তিরা সমানে ঐ তথাকথিত প্রত্যক্ষদর্শী-সাক্ষীগোষ্ঠীর কানে নানা ভাবে একটি কথাই তুলেছেন : "তোমার মা-বোনের ইজ্জৎ যারা নষ্ট করেছে, তোমার জননী-জায়ার পবিত্র দেহ যারা উলঙ্গ করে হেসে উঠেছে, তোমার বভুক্ষু শিশুর ভাতের থালা যারা পদাঘাতে চূর্ণ করেছে, তোমার অগণিত দেশবাসীর রক্তে যারা এই মেদিনীপুরের মাটি সিক্ত করছে—তাদের একান্ত প্রতীক এই পেডি। পেডি দেশের মহা শত্রু। পেডিকে যাঁরা হত্যা করেছেন, তাঁরা দেশের বন্ধু। তোমাদের গৌরব। পেডি-হত্যার মামলায় সরকারের পক্ষে সাক্ষী দেওয়া নারী হত্যারও অধিক পাপ। দেশের বিরুদ্ধে এ হবে চরম বিশ্বাস-ঘাতকতার কাজ।"

তা' ছাড়া এও শোনান হয়েছে যে, বিপ্লবীদের হাতে বিশ্বাস-ঘাতকদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যে গভর্নমেণ্ট তার পেডি-লোম্যান সিম্পসনকে বাঁচাতে পারে না, সে পারবে কি রামা-শ্যামা সরকারী সাক্ষীগুলোকে বাঁচাতে?

এসব শুনে সাক্ষীদের মনোবল ক্ষীণ হতে-হতে একেবারেই বিলুপ্ত হল। তা'ছাড়া অন্যদিকে রয়েছেন নাড়াজোলের রাজা দেবেন্দ্রলাল খাঁ। মেদিনীপুরের গৌরবশিখা স্বর্গীয় নরেন্দ্রলাল খাঁর যোগ্য পুত্র এই দেবেন্দ্রলাল। আজন্ম স্বদেশসেবী এবং বিপ্লবীদের পরম বন্ধু দেবেন্দ্রলাল সুভাষচন্দ্রেরই দলভুক্ত কংগ্রেসের প্রথম সারির কর্মী। তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সাক্ষীদের ভাগিয়ে দিতে থাকলেন। কিন্তু রয়ে গেল প্রধান সাক্ষী রূপে সুশীল দাস। পুলিশের অটুট কব্জায় রয়েছে সে। তার বাবা ছিলেন রাজ-কাছারির কর্মচারী। রাজা দেবেন্দ্রলাল তাঁকে শেষটায় ডাকিয়ে এনে স্পষ্টই বলে দিলেন যে, তাঁর ছেলে বিমলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে পুত্রের অপরাধে তাঁকেই

কাছারির কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। রাজা বললেন: "কোন দেশদ্রোহীর পিতা নাড়াজোলের দপ্তরে কাজ করতে পারেন না। নাড়াজোলের প্রজারা দেশদ্রোহীর পিতাকে চান না। তাঁদের অন্তরের কথাকে আমি স্বীকার না করলে তাঁরা আমাকে ঘৃণা করবেন; আমার পিতৃপুরুষের কাছে আমার প্রত্যবায় ঘটবে।"...

এ কথায় সুশীল দাসের পিতা অভিভূত হলেন। রাজার কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি যে, পুত্রকে তিনি বাধ্য করবেন 'সাক্ষী' হবার পথ প্রত্যাহার করতে।

বেলা ১২টা। হাইকোর্টের দোতলায় পেডি-হত্যার বিচার চলছে। প্রথমেই সরকারী উকিল সুশীল দাস নামক প্রধান সাক্ষীকে ছোটখাটো সাহায্যকারী-প্রশ্ন করে করে মামলাটা সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন। সুশীল সে কাজের অন্তরায় হল না।

মাঝে একবার সরকারী-উকিল সুশীলকে জিজ্ঞাসা করলেন: "দেখতো, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ঐ ছেলেটিকে তুমি চেন কিনা?"

সুশীল বলল—"হ্যাঁ"।

আবার তাকে প্রশ্ন করা হল: "সেই গোলমালের মধ্যে তুমি পেডিকে যারা মারল, তাদের কি করে চিনলে?"

সুশীল উত্তর দিল: "ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, তারপর খুব কাছে থেকে পটাপট গুলি ছোঁড়ে। আমি ওদের স্পষ্ট দেখেছি।" এই ভাবে প্রায় ঘণ্টা খানেক নানা প্রশ্ন ও উত্তর চলতে থাকে।

অতঃপর সরকারী-উকিল অতিশয় প্রত্যয়ে প্রশ্ন করেন: "আচ্ছা, যে দু'জন ছেলে পেডিকে হত্যা করেছিল, তাদের একজন কি ঐ কাঠগড়ার ছেলেটি?"

সুশীল অম্লান-বদনে উত্তর দিল: "না"।

সরকারী উকিলের মাথা থেকে পা পর্যন্ত রাগে কেঁপে উঠল।

ধমকে বললেন তিনি : "এই তো বলেছ, তুমি ঐ ছেলেটাকে চেন ? বল নি ?"

সুশীলের উত্তর : "চিনি-ই তো। উনি তো আমাদের স্কুলেরই ক্যাপ্টেন্ ছিলেন। খুব ভাল খেলেন। শহরের সবাই ওঁকে ভালবাসে।"

সুশীল উকিলবাহাদুরের যুক্তিতর্কের তরী ডুবিয়ে দিল। পুলিশের ঐ একটিমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরই যোগাড় ছিল। সেও তাদেরকে অমন নির্মমভাবে অপদস্থ করল!

এরপর বহু সাক্ষীরই আগমন ঘটেছিল। তাঁরা কেউ 'প্রত্যক্ষদর্শী' নন। তাই আমাকে চিনলেও আমার কার্যকলাপের সঙ্গে কারোরই পরিচয় হয় নি। কাজেই বাঘা বাঘা আসামী-পক্ষীয় ব্যারিস্টারদের কাছে ওসব সাক্ষী দাঁড়াতেই পারল না।

কিন্তু অস্ত্রবিশারদের বিবৃতি ছিল মারাত্মক কারসাজিতে ভরা। তাঁর রিপোর্ট ছিল যে, পেডির শরীর থেকে যে বুলেট পাওয়া গেছে তার গায়ে একটি দাগ চিহ্নিত হয়ে আছে। ঠিক অনুরূপ দাগ খাওয়া ঐ ভিলিয়ার্স্ এর শরীরে প্রাপ্ত বুলেটটিও।

এসব ভনিতাও আমাদের জাঁদরেল ব্যারিস্টারদের অকাট্য যুক্তির চাপে স্তব্ধ হয়ে গেল। তখন মামলা মুলতুবি রাখার চেষ্টা হল। কিন্তু সাক্ষীদের পিটিয়ে এবং অধিকতর লোভ দেখিয়ে মজুত করার মতলব বিফল হল। কাজেই বড় দুঃখে সরকারপক্ষ চোখের সামনে দেখল—পেডি-হত্যার মামলা খারিজ হয়ে গেছে!

পেডির মৃত্যুর পর এবার বাঙলাদেশের পুলিশ-বিভাগের দম্ভও মৃত্যুবাণে বিদ্ধ হল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ভাঙে, তবু মচকায় না। তাই সাত দিনের মধ্যেই দেশে এক আইন জারি হল যে, অতঃপর 'হত্যা' শুধু নয়, 'হত্যার চেষ্টা' বা তৎসঙ্গে জড়িত থাকলেই বিপ্লবীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে।

কিন্তু বিপ্লবীদের দমন করা গেল না। পর পর যেসব প্রচণ্ড অ্যাক্শান বাঙলা দেশের বুকে বিপ্লবীরা ক্রমান্বয়ে ১৯৩৪—'৩৫ সাল

অবধি চালিয়ে গেলেন, তার গুরু গর্জন আমি কান পেতে শুনে যেতাম আন্দামানের সেলুলার জেলে বসে গভীর আনন্দে।

সে আনন্দ নিজের হাতে য়্যাক্‌শান্ করার আনন্দ থেকে কম উপভোগ্য ছিল না। শৃঙ্খল জর্জরিত বন্দীর নির্বাসনে এসব সংবাদ আমরা আকণ্ঠ পান করতাম 'elixir'-এর মত।

* শৈলেশ দের 'রক্তের অক্ষরে' গ্রন্থে শ্রীবিমল দাশগুপ্ত লিখিত জবানবন্দী।

'অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা, বুঝি আরো দিতে হবে
এগিয়ে চলার প্রত্যেক উৎসবে'।

—কবি সুকান্ত

আহত ব্রিটিশ সিংহের আর্তনাদ

[১৯৩১ সালের ৩১শে অক্টোবর বিপন্ন শ্বেতাঙ্গ সমাজ কর্তৃক প্রচারিত একটি ইস্তাহার। বিপ্লবীনায়ক ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের 'সবার অলক্ষ্যে' (২য় খণ্ড) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত]

CONGESS
TERRORISM
must be
CRUSHED

* * * *

BENGAL OUTRAGES

* * * *

MURDERED??

Lowman Simpson Peddie Mukherjce Garlick
Ashanulla

* * * *

WOUNDED!

Hodson
Nelson
Cassels

* * * *

Donovan Sent home for
SAFETY
Yesterday....Durno
This morning...Villiars
WE WANT ACTION

ROYALISTS

হিজলী জেলে

[১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর হিজলী জেলে গুলি বর্ষণের ফলে রাজবন্দী সন্তোষ মিত্র এবং তারকেশ্বর সেনগুপ্ত শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয় সারা দেশে। মনুমেন্টের নিচে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানান স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।]

'এতবড় সভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদভ্রান্তিজনক; কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।

যখন দেখা যায়, জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভব হয়, তখন ধরে নিতেই হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল।

...এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশী রাজা যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্য নিষ্ঠায়।

প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন নাও হতে পারে; কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন শক্তি?

একথা ভুললে চলবেনা যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমি আজ উত্তেজনা বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাইনে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তারা যেন একথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতঃই আপন কলঙ্ক লাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যত উর্ধে ধরে আছে, তত উর্ধে আমাদের ধিক্কার বাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছতে পারবে না'।

'দূর থেকে এসে যারা আমার জন্মভূমি অধিকার করেছে, আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল—সমস্ত যে কেড়ে নিলে, তারই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর রইল না আমার'?

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পথের দাবী)

বক্সা দুর্গে

প্রতুল গাঙ্গুলী

[অবশেষে বিপ্লবীদের সঙ্গে আপসরফার চেষ্টা। অনুশীলন ভবনের সৌজন্যে সে কাহিনী এখানে কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করা হল সমিতির অন্যতম প্রধান নেতা প্রতুল গাঙ্গুলীর 'বিপ্লবীর জীবনদর্শন' গ্রন্থ থেকে। বর্তমানে তিনি পরলোকগত]

সময়টা তখন ১৯৩১ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি। গান্ধীজী লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের জেলগুলি তখন রাজবন্দী, বিচারাধীন এবং দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীতে ভরপুর। একমাত্র বক্সা ক্যাম্পেই আমি সহ দেড়শ এরও বেশী বিপ্লবী আবদ্ধ ছিলাম। দেশের নানা দিক থেকেই বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। সত্য-আইন-অমান্য আন্দোলন যদিও গোলটেবিল বৈঠকের জন্য সাময়িকভাবে মুলতুবি ছিল, তবু কংগ্রেসও একেবারে চুপ করে বসে ছিল না।

তখন দুপুর। আমি পড়াশুনায় ব্যস্ত। এমনি সময় ক্যাম্পের সেনানায়ক ফিনে (Finnay) সাহেবের আরদালি আমার হাতে এক টুকরো কাগজ তুলে দিল। তাতে লেখা ছিল, দয়া করে এখনি একবার আমার সাথে দেখা করতে পারবেন কি? কেন এই অনুরোধ তার কোন কারণ অনুমান করতে পারলাম না বা অনুমান করতে চেষ্টাও করলাম না। প্রয়োজনও ছিল না। কেননা যে অসংখ্য কারণে এমনি অনুরোধ আসে, বর্তমানে তার যে কোনও

একটা হতে পারে। সুতরাং কালক্ষেপ না করে আমি ওঁর অফিসে গেলাম। উনি আমায় দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে ইঙ্গিতে ওঁকে অনুসরণ করতে বলে এগিয়ে যেতে লাগলেন। আমরা জেল-ফটকের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি চারদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। না, কেউ তো আমাদের অনুসরণ করছে না। কোন বাক্যালাপ নেই, নেই কোন পিছু নেয়ার লোক। এ যে একেবারে আজব ব্যাপার। একবার মনে হলো, ওরা বোধ হয় আমাকে অন্য জেলে বদলি করবে। কারণ, অনেক সময় এভাবে বন্দীদের বদলি করত হৈ চৈ এড়াতে।

অল্পসময়ের মধ্যেই জেল-ফটক পার হলাম। সামনেই ছিল একটা ফুটবল মাঠ। সেটাও পার হয়ে প্রবেশ করলাম ফিনে সাহেবের বাংলোর চৌহদ্দির মধ্যে। এক্ষণে আমি সত্যই অবাক হতে শুরু করেছি। ফিনে সাহেব ও পেছন ফিরে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বললেন—এবার কিন্তু সত্যই আপনি বিস্মিত হবেন। সে বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ ছিল না। ওঁর বাংলো-বাড়িটা ছায়াঘন। সেই বাংলোর একটা ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মশাই আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তো বিস্ময়ে হতবাক্।

অভিবাদনের পালা শেষ হলে তিনি জানালেন যে, কয়েকদিন পূর্বেই তিনি দিল্লী জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন, এবং সেখান থেকেই কলকাতা হয়ে এসেছেন এখানে আমাদের সাথে দেখা করতে। উদ্দেশ্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমি কিছুই অনুমান করতে পারলাম না।

ফিনে সাহেব ঘর ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। যাওয়ার আগে আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে, আমাদের কথাবার্তা কেউ ওত পেতে শুনবেনা বা কোন পুলিশের লোকও আমাদের খবরদারি করবে না।

সেনগুপ্ত মশাই তখনকার দিনের রাজনৈতিক অবস্থা সমীক্ষা

করে যা বললেন, তার মর্মার্থ হল এই যে, আমাদের বিপ্লবী কাজকর্মের ফলে দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে এবং ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার মোকাবিলা করতে সরকার অসমর্থ। ব্রিটিশ সরকারেরও ধারণা, যদি এ অবস্থার অবসানকল্পে কোন সূত্র আশু খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে ঘোরতর সঙ্কট সৃষ্টি হবে।

দেশের নেতারাও তখন রাজনৈতিক জট ছাড়াবার জন্য আগ্রহী ছিলেন। এদিকে গান্ধীজীও আমাদের বিপ্লবীদের সম্বন্ধে একটু শঙ্কিত ছিলেন। অর্থাৎ, যদি লণ্ডনের গোল-টেবিল বৈঠকে কোন মীমাংসা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তার বাস্তব রূপায়ণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা বৈপ্লবিক কাজকর্ম বন্ধ রাখতে প্রস্তুত আছি কিনা। এমনি পরিস্থিতিতে কোন কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে সরকার নিজেই সেনগুপ্ত মশাইকে বার বার অনুরোধ করছিলেন, যদি তিনি আমাদের বিপ্লবী ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে একটা যোগাযোগের সূত্র বার করতে পারেন। অর্থাৎ, যদি ব্রিটিশ সরকার কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আমাদের কাছে পেশ করেন, তবে আমরা তাতে সাড়া দিতে রাজী আছি কিনা।

দেশের স্বার্থই আমাদের একমাত্র কাম্য। সুতরাং এ জাতীয় প্রস্তাব বিবেচনা করাটা আমি যুক্তিসংগত বলেই মনে করলাম। বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সুতরা আমরা দুজনেই একমত হলাম যে, অন্যান্য নেতাদের সঙ্গেও এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং অবিলম্বে অনুশীলন, যুগান্তর এবং অন্যান্য দল-উপদলের প্রায় সাত-আট জন নেতার সঙ্গে আলোচনার জন্য এক বৈঠকের আয়োজন করা হ'ল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি যে, একটা বিষয়ে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে ছিলাম যে, আমরা কোন চাপ পূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সরকারের সঙ্গে আপস-মীমাংসায় বসতে রাজী নই। অর্থাৎ, আমাদের বিনাসর্তে মুক্তি দিতে হবে। তাছাড়া, শ্রীসূর্য সেনের বিরুদ্ধে

যে সমস্ত হুকুমনামা ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী ছিল তাও বিনাসর্তে তুলে নিতে হবে, এবং যদি এই মীমাংসা প্রচেষ্টা কোন কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তবে তাঁকে (সূর্য সেনকে) তাঁর পূর্বাবস্থায় নিরাপদে ফিরে যেতে দিতে হবে।

যদিও সাম্রাজ্যবাদীদের সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না, তবু আমরা এক নতুন দিগন্তের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের জন্য মনকে প্রস্তুত করতে লাগলাম। আমরা আমাদের লক্ষ্য ভাল করেই জানতাম, সুতরাং আমাদের কোন কিছু হারাবার ভয় একেবারেই ছিল না।

অবিলম্বে দল-উপদল যে যার মত নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসে গেলাম। যুগান্তর দল থেকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং অনুশীলন দল থেকে আমি প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হলাম। তবে এটা স্থির হয়েছিল যে, আমরা দু'জনে সমস্ত বিপ্লবীদের হয়েই কথা বলব, কেবলমাত্র যুগান্তর বা অনুশীলনের প্রতিভূ হিসাবে নয়। এও স্থির হ'ল যে, আলাপ-আলোচনা চলাকালে সে সমস্ত বিষয় সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হবে না, যা এই মীমাংসা প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতে পারে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মশাইকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলাম। আর স্থির হ'ল যে, আমাদের আলাপ-আলোচনা সম্পূর্ণ গুপ্তভাবে চলবে, এবং আমাদের ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে সকল প্রকার পত্রালাপ সিল-মোহর করা খামের মাধ্যমে করতে হবে।

এ সবই সেদিন অপরাহ্নের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সংঘটিত হয়ে গেল। আমরা সেনগুপ্ত মশাইর সঙ্গে শেষ বারের মত দেখা করে তাঁকে বিদায় জানালাম, তিনি বলে গেলেন যে, তিনি এখন দার্জিলিং যাচ্ছেন। সেখানে বাংলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন Sir Stanley Jackson) সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব কিছু অবহিত করবেন। পরে গান্ধীজীর নির্দেশমত বিলেতে যাবেন।

'শৃঙ্খলী ফেরে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে—
ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুটি চেপে।
যাদের কারাবাসে—
অতীত রাতের বন্দিনী উষা ঘুম টুটি ঐ হাসে'।

—কাজী নজরুল ইসলাম

তখন কুমিল্লায়

—অখিলচন্দ্র নন্দী

[কুমিল্লার প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ষ্টীভেন্স হত্যার ব্যাপারে যাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখকের সহৃদয় অনুমতিক্রমে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বিপ্লবের স্মৃতিচারণ' থেকে এই বিশেষ অংশটি এখানে প্রকাশ করা হল]

টাকা নিয়ে বীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য চলে গেলেন কলকাতায় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীকে পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেওয়া হল। তারা খুবই আনন্দের সঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণ করল।

১১ই ডিসেম্বর শুক্রবার রাত্রে আমি শান্তি ঘোষের বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম, সে পরদিনের ইতিহাস পরীক্ষার জন্য খুব মনোযোগ দিয়ে পড়া মুখস্থ করছে। দুদিন বাদে যে মেয়ে একটি সাহেবকে খুন করতে যাবে—অভিনব ইতিহাস সৃষ্টির দায়িত্ব যে নিয়েছে—সে নির্বিকার চিত্তে স্কুলের পরীক্ষার পড়ায় মগ্ন! বিস্মিত হলাম, কিন্তু খুশীও হলাম এই ভেবে যে, তার শক্ত স্নায়ু ব্যর্থ হবেনা কোন পরীক্ষাতেই।

আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম এক শিশি পটাসিয়াম সায়ানাইড। প্রয়োজনমত ব্যবহার করার জন্য এই 'শেষ অস্ত্রটি সাথে

রাখত বিপ্লবীরা। তাই শান্তি ও সুনীতিকে দেবার জন্য এনেছিলাম পটাসিয়াম সায়ানাইড।

শান্তি আমার প্রস্তাবটিকে হেসেই উড়িয়ে দিল। বলল—"আমাদের উপর বিশ্বাস রাখুন, আমরা সফল হবই"

১৩ই ডিসেম্বর মনীন্দ্রলাল চৌধুরীর মারফতে রিভলবার কার্তুজ পাঠিয়ে দিলাম শান্তির কাছে।

এল ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩১, সোমবার। বেলা দশটা বাজে। শহরের ছাত্র-ছাত্রী, অফিসের কর্মচারী সকলেই যার যার কর্মস্থলে যেতে শুরু করেছে। সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষ বাড়ী থেকে বের হয়ে এল স্কুলে যাবার কথা বলে। পূর্ব নির্দিষ্ট জায়গায় সতীশ রায় ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সুনীতিকে আগে তুলে নিল, পরে শান্তির বাড়ীর কাছে এসে শান্তিকেও তুলে নিল গাড়ীতে। ঘোড়ার গাড়ীকে যেতে বলা হল ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠির দিকে, যাবার পথে তাদের দুজনকে একটিবার দেখে নেবার জন্য আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ধর্ম সাগরের পারে।

গায়ে সিল্কের চাদর, জামার ভিতরে আগ্নেয়াস্ত্র, একটু পরেই বিরাট একটি বপুর সামনে দাঁড়াতে হবে ঐ ছোট্ট দুটি মেয়েকে কিন্তু একটুও ভয় নেই তাদের, বেশ গল্প করছে ও হাসছে। যেন সেজে গুজে পিকনিকে যাচ্ছে. আমাকে দেখে হাসতে লাগল, ভাবখানা এই—একটু পরেই বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেব।

ঘোড়ার গাড়ী ম্যাজিস্ট্রেটের কুটিরের সামনে পৌঁছতেই সতীশ রায় সরে পড়ল। তারপর কিভাবে কাজটি সমাধা করল সে সম্পর্কে সুনীতি বলছে তার স্মৃতিচারণে :

"বিনা বাধায় বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। এবারে এক আর্দালীর সাক্ষাৎ মিলল। ইন্টারভিউ স্লিপ নিয়ে ভিতরে গেল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এল বাঙালী এস. ডি. ও. সঙ্গে স্বয়ং শ্বেতকায় মিঃ স্টিভেন্স। আমাদের হাতে একটা দরখাস্ত ছিল, দেখল ভালো করে। দেখে শুনে বলল—ফয়জুন্নেসা বালিকা

বিদ্যালয়ের প্রধানা-শিক্ষয়িত্রী মিস বিশ্বাসের কাছে যেতে। তিনিই আমাদের সব রকম সাহায্য করতে পারবেন সাঁতারের ক্লাব গড়তে। বলা বাহুল্য দরখাস্তটা ছিল সাঁতারের ব্যাপারে অনুমতি চেয়ে—এ ছলনা মাত্র। শান্তি ও আমি দুজনেই কিন্তু কুমিল্লার ঐ ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। ম্যাজিস্ট্রেট মিস বিশ্বাসকে দেখিয়ে দিল বটে, কিন্তু আমাদের ভান করতে হল, যেন চিনি না মিস্ বিশ্বাসকে। আমরা এখানে বিদেশাগত। মিস বিশ্বাস ওদেরই লোক রটনা ছিল। ভাবলাম, আমাদের ওখানে পাঠাতে চাইছে ক্লিনিং-এর জন্য।

সাহেব আমাদের দরখাস্তের উপর রেফারেন্স লিখতে ভিতরে চলে গেল। এতটা সময় আমাদের নষ্ট করা উচিৎ হয়নি। এর মধ্যেই তো কাজ শেষ করবার কথা। প্রমাদ গুনলাম—কি হবে যদি আর না আসে? যদি আর্দালীর হাতেই পাঠিয়ে দেয় দরখাস্তটা—তাহলে সব পরিকল্পনাই তো ভেস্তে গেল।

"না। আমাদের সকল চিন্তা দূর করে আমাদের সামনে উপস্থিত হল দুজনেই—এস. ডি. ও. সাহেবকে সঙ্গে করে শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট। যদিও আমাদের লক্ষ্য একজন। লক্ষ্য সম্পর্কে আমরা ততক্ষণে সজাগ সতর্ক। লক্ষ্যভেদে একান্ত প্রস্তুত।

"এবার আর মুহূর্ত বিলম্ব হল না। রিভলবার ব্লাউজের ভিতর থেকে বের করে চাদরে ঢাকা হাত নিয়ে একেবারে উদ্যত। সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আর কথা নয়, ছুটল বুলেট। সাহেব দুজনও ছুটল ঘরের ভিতরের দিকে, আর আমাদের পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের পিঠের উপর বেয়ারা-আর্দালীর দল, মায় বাগানের মালিরাও বাদ গেল না।

শুনতে পেলাম এস. ডি. ও-র কণ্ঠ, তারস্বরে চীৎকার 'পাকড়ো, পাকড়ো'। রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে গরুর দড়ি দিয়ে পিছ মোড়া করে বেঁধে ফেলল চটপট। তারপর লাথি, ঘুষি, কিল, চড় যত্র তত্র চলল।

তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করে চলেছি, বাড়ীর সকলের চলাফেরা কথা-বার্তা। ঘটনাটা কি ঘটলো বুঝতে হবে তো। যখন দরজার ভারী পর্দাটা একটু উড়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পাশের ঘরে কেউ যেন শুয়ে আছে চাদর গায়ে। লোকজনও ঘরে আসছে-যাচ্ছে ধীর পদক্ষেপে, চারিদিকে যেন স্তব্ধ ভাব।

"ভাবছি, তবে কি সফল কাম, না বিফল? আহত হলে ডাক্তার আনা, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদির একটা ব্যস্ততা থাকতো। ……জানি এই কার্যের সফলতার সঙ্গে জড়িত শুধু আমাদের ব্যক্তিগত সফলতা নয়, সমগ্র বিপ্লবী গোষ্ঠীর সাফল্য, সমগ্র নারী-জাতির মর্যাদা। আমরা যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি—মেয়েরাও পারে সফলতার সঙ্গে দৃঢ় হস্তে অস্ত্র ধারণ করতে—কম্পিত নয় তাদের হৃদয়, তাদের হস্ত। পুরুষেরই শুধু একচেটিয়া অধিকার নয়, অস্ত্র ধারণে।…

পাহারা রত পুলিশকেই জিজ্ঞাসা করি না কেন?…জিজ্ঞাসা করতেই মুখ খিঁচিয়ে উঠল—একদম মার ডালা ফিন পুছতা হায় …শোবার আগে একে অন্যকে (আমি ও শান্তি) একবার দেখলাম কোথায়, কার কতটা লেগেছে। সারা গায়ে ব্যথা—যন্ত্রণা, সব ফুলে ফুলে কাল কাল হয়ে উঠেছে, তবু ঘুম এসে গেল"।

(স্মৃতিচারণ :—আমাদের ত্রিপুরা)

বালিকা দুটির উপর পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে এ্যাডভোকেট জেনারেল এন. এন. সরকার মামলার সময় বলেছিলেন—"প্রচণ্ড আক্রমণ হয়েছিল……যারা নিরীহ লোককে খুন করে, বালিকাই হউক, বা বর্ষীয়সী হউক, তারা যেহেতু মেয়েছেলে, সে জন্য আদর আশা করতে পারে না। বরং তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে, ঘটনা স্থলেই তাদের মেরে ফেলা হয়নি।"

[The Statesman, 22.1.32]

কত বড় উদ্ধত উক্তি। দেহ তল্লাসীর সময় তাদের দুজনের সাড়ী খুলে নেওয়া হয়েছিল, অশিষ্ট আচরণ করা হয়েছিল। তার

জবাবে এন্, এন্, সরকার বলেছিলেন, কলকাতার গঙ্গার ঘাটে যাদের মেয়েরা চান করে কাপড় বদলায়, তাদের পক্ষে অশিষ্টাচরণের অভিযোগ না আনাই উচিৎ। এই উক্তির বিরুদ্ধে তখন সকল দেশীয় কাগজেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল।

শান্তি সুনীতির গুলিতে মিঃ ষ্টিভেন্স নিহত হবার খবরটা পুলিশকে জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ লাইনে সাইরেন বেজে উঠলো। সারা শহর উৎকর্ণ হয়ে প্রশ্ন করতে লাগল—কি হল, কি ব্যাপার ?

এ বিস্ময় বেশী সময় স্থায়ী হল না। লোকে জেনে গেল, ম্যাজিষ্ট্রেটের হত্যাকারী তাদেরই পরিচিত দুটি বালিকা শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী, ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম ও সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী, ছাত্রী সংঘের সেক্রেটারী ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর মেজর।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নূতন অধ্যায় শুরু করার গৌরব লাভ করল কুমিল্লার দুটি বালিকা।

সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল এই অভিনব সংবাদ। তরুণ তরুণীরা, বিপ্লবীরা মেতে উঠল আনন্দে।

"এদিকে সারা বাংলায় সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষের ছবি সমেত প্যাম্পলেট ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই ছবি ও ইস্তাহারের আগুন ছোঁয়া ভাষায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের আহ্বানে, দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার সংগ্রামে তরুণ-তরুণীদের শরিক হবার আমন্ত্রণ। হাজার হাজার প্যাম্পলেট গভীর রাতে 'বেনুপ্রেসে' ছাপা হচ্ছে—আর ভোর না হতেই চলে যাচ্ছে বিভিন্ন দলের গোপন কেন্দ্রে, বাংলার শহরে গ্রামে সর্বত্র বিলিয়ে দেবার জন্য"।

(সবার অলক্ষ্যে পৃঃ ৩, ৪)

আমি ও বীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য সেদিন ১৪ই ডিসেম্বর চন্দ্রকিশোর সরকারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে সব খবরা খবর নিচ্ছিলাম। শান্তি সুনীতির কৃতকার্যতায় খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। পরদিন খবর

পেলাম, আমাদের মহিলা শাখার নেত্রী প্রফুল্ল নলিনী ব্রহ্ম আত্ম গোপন করতে সক্ষম হয়নি, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রফুল্লের অনেক কল্পনা ও আশার এরকম অপমৃত্যু হবে আমরা ভাবতেই পারি নি।

'প্রতিশোধ, প্রতিশোধ!
হাজার হাজার শহীদ ও বীর
স্বপ্নে নিবিড় স্মরণে গভীর
ভুলিনি তাদের আত্মবিসর্জন'।

—কবি সুকান্ত

সেদিনের দুটি অগ্নিশিখা

বীণা ভৌমিক (দাস)

[সুভাষ গুরু আচার্য বেণীমাধব দাসের কন্যা, যেদিন সারা দেশ কেঁপে উঠেছিল যার অগ্নি ঝঙ্কারে। বর্তমান নিবন্ধে প্রথমবার সেই অগ্নিশিখা দুটি সম্বন্ধে লিখেছেন সম্পাদকের অনুরোধে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'শৃঙ্খল ঝঙ্কার'

'উই হ্যাড দেন এ ট্রাইস্ট উইথ ডেসটিনি'—মহাকালের রুদ্র বিষাণ সেদিন সারা দেশ জুড়ে বেজে উঠেছিল। জলে, স্থলে, আকাশে-বাতাসে। সে ডাকে সাড়া দিতে পেরেছে যারা, তারা চিরদিনের জন্য ধন্য হয়ে গিয়েছে, 'পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে'।

ইতিহাস তাদের ভুলেছে? ইতিহাসকে তাহলে বলতে হয়—'অয়ি ইতিবৃত্তকথা! ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ ওগো মিথ্যাময়ী, তোমার লিখন পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন হবে—হবে জয়ী!'

দেশবাসীর হৃদয়ে তাদের জন্য স্থান নেই? পুরস্কার নেই? স্বীকৃতি নেই?—কিন্তু এসব কি তারা চেয়েছিল? তারা কি একদিন

পার্থিব সব কিছু প্রত্যাশাকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে সব-হারানোর সর্বনাশা খেলায় মেতে ওঠেনি? মৃত্যুর সঙ্গে যারা পাঞ্জা লড়েছে, কাঁটার মুকুট, লোহার শিকল, ফাঁসির রশি—এই ছিল যাদের একমাত্র কাম্য আভরণ, নিজের ক্ষুদ্র সীমিত স্বার্থের বহু উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে যারা অগণিত দেশবাসীর মুক্তির জন্য নিজের জীবনকে সমিধ করে হোমাগ্নি জ্বালতে চেয়েছিল—তাদের জন্য কেনই বা এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক্ষোভ!

আত্ম-প্রচার তাদের 'স্বধর্ম' ছিল না। নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া, বিলীন করে দেওয়াই ছিল তাদের সাধনা। আজ বহু দিন পরে, তাদের কারও কারও জীবনের যে পৃষ্ঠাগুলির উপর বিস্মৃতির ধূলা পড়ে গেছে, সেই পৃষ্ঠাগুলিকে উলটিয়ে দেখতে গিয়ে তাই কেমন যেন দ্বিধা হয়। কি জানি স্পর্শের সূক্ষ্মতম ভারও তারা সইবে কিনা। কি জানি, আজকের যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে তাদের যথার্থ পরিচয় লেশমাত্রও ফুটিয়ে তুলতে পারব কিনা। তাদের মনের আশা, ভাষা আর স্বপ্ন, তাদের অন্তরের অজস্র আকূতি আর আনন্দ-বেদনার শিহরণ আজ কোনখানেও কি অনুরণন তুলবে? যে যুগ চলে যায় সে কি একেবারেই চলে যায়? হয়তো তা নয়। আমার ভরসা—কেউ কেউ আজও শুনতে চায়, আগ্রহ জানায়। আমার দুর্বলতা—তাদের কথা ভাবতে, বলতে, লিখতে আমার ভাল লাগে।

চোখের সামনে আজও স্পষ্ট ভাসে দুটি কিশোরীর উজ্জ্বল উদ্ভাসিত মুখ। কয়েদীর মোটা কাপড় পরা—আভরণহীন, সাজ-সজ্জাহীন অঙ্গে স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য উছলে পড়ছে। দুজনে হাত-ধরাধরি করে জেলের সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গণে দ্রুত দৃঢ়পদক্ষেপে পায়চারী করছে। মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি অকারণ উচ্ছ্বসিত হাসি, আর কখনও কখনও উদাত্ত কণ্ঠের গান। এত গানও জানত ওরা। 'আমরা ভাঙব, চুরব, গড়ব নূতন শাসন-শোষণ দমন নীতি।' 'মোদের শিকল পরা ছল—শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে

বিকল।' 'কারার এই লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট—
যত সব বন্দীশালা আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা—ফেল উপাড়ি।'
—এমনি অসংখ্য। এসব গান আগে-পরে কতবারই তো শুনেছি, কিন্তু ঠিক অমন করে যেন কেউ গাইতে পারে না। ওরা যখন গাইত, গানগুলো সজীব হয়ে উঠত, মনে হত ওই দীপক-রাগিনীতে চারিদিক বুঝি রাঙা হয়ে উঠেছে, আগুন জ্বলে উঠল বুঝি।

মেয়ে দুটির নাম শান্তি ও সুনীতি। বাংলাদেশে মুক্তি-সংগ্রাম সেদিন একটি বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। সেই দুরন্ত উন্মত্ত প্রবাহ বহু জীবনকে আকর্ষণ করেছে, ভাসিয়ে দিয়েছে। সেদিন অগ্নিযুগের সেই প্রলয়ঙ্কর দিনে, সেই দুর্বার তরঙ্গে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্বেচ্ছায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যে দুটি কিশোরী, তারাই শান্তি ও সুনীতি—শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী। ওদের জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাটুকু সংক্ষিপ্ত,—একটি বা কয়েকটি দিনের মধ্যে পরিসীমিত।

তখনকার দিনে এ ধরনের ঘটনা বাংলাদেশে অন্ততঃ নূতন কিছু নয়। ক্ষুদিরাম-কানাই-সত্যেনের বাংলা, উল্লাসকর-বারীন্দ্র-অরবিন্দের বাংলা, বাঘা যতীনের বাংলা—শৌর্য আর দুঃসাহসিকতার সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়। বিশেষ করে ১৯৩০-৩১ সালে এই বিদ্রোহের আগুন আবার নূতন করে জ্বলে উঠেছিল। এর কিছু আগেই ঘটে গিয়েছে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ডালহৌসি স্কোয়ারের টেগার্টের উপর আক্রমণ, ঘটে গিয়েছে বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স-বিল্ডিংস অলিন্দ-সংগ্রাম।

তবু ১৪ই ডিসেম্বরের ঘটনা যে এমন প্রচণ্ড বিস্ময়-জাগানো যুগপৎ আনন্দ-বেদনার শিহরণ নিয়ে এল দেশের মনে, তার কারণ এ দিনের এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দুটি নারী—দেশের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এবার এগিয়ে এসেছে দুটি বালিকা। দেশের কাজে মেয়েরা পিছিয়ে ছিলেন না কোনদিনই, মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে তাঁরা অনেকেই ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে ছিলেন।

কিন্তু এতদিন পর্যন্ত তাঁদের ভূমিকা ছিল অনেকাংশেই নেপথ্যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু মেয়েরাও যে এমন করে জীবনপণ করে অস্ত্রে দীক্ষা নিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এ কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল?

অল্প দিনের মধ্যেই মেয়ে দুটিকে বিচারালয়ে আনা হল। অসম সাহসিকা দুটি বালিকার সামনে সমস্ত বিচারালয় স্তম্ভিত। আরও স্তম্ভিত তাদের আচরণে। মুখে-চোখে এতটুকু বিচলিত ভাব নেই। এতবড় সাংঘাতিক ঘটনা—মনের মধ্যে নেই তার এতটুকুও প্রতিক্রিয়া। দুর্বার প্রাণ-বন্যার জোয়ারে দুটি কিশোরী হৃদয় নিয়তই উছলিয়ে উঠছে, হাসি-খুশি আনন্দে ভরপুর।

লোকেরা অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে আর ভাবে—ভয়ঙ্কর রক্তপাত যদি এদের দিয়ে ঘটেই থাকে, মনের কোনখানেই কি তার এতটুকুও ছাপ পড়েনি? দেবতার পায়ে নিবেদিত সদ্য-ফোটা ফুলের মত এদের মুখ, পবিত্র নিষ্কলুষ কিশোরী-হৃদয়ের অনাহত মাধুর্য এদের দৃষ্টিতে। বাঁধ-ভাঙা দুরন্ত নির্ঝরিণীর চপল আনন্দ এদের হাসিতে, গানে, কথায়। আদর্শের ডাক শুনতে পেয়ে, নিজের সমস্ত সুখ আর সুখের সম্ভাবনায় আগুন জ্বালিয়ে জননী জন্মভূমির পায়ে আত্ম-নিবেদন করতে এমন করে নির্ভয়ে হাসিমুখে ছুটে যায় যারা, তাদের বিচারের মাপকাঠি কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? 'বন্ধন শৃঙ্খল চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার, কারাগার করে অভ্যর্থনা।'

এরা সগোত্র ক্ষুদিরামের—যে এমনি বালক বয়সেই ফাঁসির রশি গলায় জড়িয়ে জীবনের উদাত্ত জয়গান গেয়ে গিয়েছে। এরা ঝাঁসীর রাণীর দেশের মেয়ে—যে মেয়ে একদিন ঘোড়ায় চড়ে উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে একা সংগ্রাম করেছিলেন।

সব দিক দিয়ে সার্থকতার আনন্দে পরিপূর্ণা বিজয়িনী শান্তি-সুনীতি। কিন্তু একটা বিষয়ে ওদের বড় বেশি নিরাশ হতে হল।

বিচারে ওদের ফাঁসি হল না, অল্পবয়সের কারণ দেখিয়ে দেয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

শান্তি-সুনীতির আশা ছিল, দেশের সর্বপ্রথম নারী শহীদ হবে ওরা। এরি জন্যে ওদের কত দিন ধরে চলেছিল কঠোর প্রস্তুতি। স্কুল পালিয়ে দূরে পাহাড়ে গিয়ে রিভলবার প্র্যাকটিস করেছে—প্রমাণ দিয়েছে অব্যর্থ নিশানার। মা-র বাক্স থেকে লুকিয়ে গয়না সরিয়ে নিয়ে করেছে অর্থসংগ্রহ। এমনি করে তিলে তিলে পলে পলে নিজেদের গড়ে তুলেছে একটি মহা মুহূর্তের জন্য, যখন ওদের ডাক আসবে, আত্মাহুতি দেবার ডাক।

শান্তির ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে নিকট-আত্মীয়তা। ওর রক্তের মধ্যে সেই বিরাট জীবনের ছোট্ট একটি অগ্নি-ফুলিঙ্গ সুপ্ত হয়ে ছিল নিশ্চয়। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই ও শুনতে পেত দেশের কান্না, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেবার আহ্বান। কে বুঝি ওর কানে কানে বলত, 'জন্ম হইতে তুমি মায়ের জন্য বলি-প্রদত্ত।'—সে সময় কুমিল্লায় ছাত্র কনফারেন্সে কলকাতা থেকে নেতৃস্থানীয় অনেকে গিয়েছিলেন। শান্তি তাঁদের কাছে 'অটোগ্রাফে'র খাতা নিয়ে উন্মুখ আগ্রহে এগিয়ে গিয়েছিল। অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়েটির ললাটে তখনি কি কোন অদৃশ্য লিখন ফুটে উঠেছিল? নইলে সুভাষচন্দ্র ওর খাতাতেই কেন লিখলেন—

'আপনার মান রাখিতে, জননী,
আপনি কৃপাণ ধরো গো।'

বিমলপ্রতিভা দেবী লিখলেন, 'আনন্দমঠের শান্তির আদর্শ তোমার মধ্যে রূপায়িত হোক।'

এরও অনেকদিন আগে কুমিল্লায় সরোজিনী নাইডু সংবর্ধনা-সভায় গান গেয়েছিল শান্তি। বাড়ি ফিরে শান্তির অধ্যাপক পিতা স্মিতহাস্যে কন্যাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, 'বড় হয়ে সরোজিনী নাইডুর মত হও।'

এত জনের এত আশীর্বাদ আর শুভকামনা শান্তি ব্যর্থ হতে দেয় নি। ওর বয়সী আর দশজন মেয়ের মত গতানুগতিকতার স্রোতে নিজেকে সে হারিয়ে যেতে দিল না। জীবনের কঠিনতম পথকে বেছে নিয়ে রক্তাক্ত পায়ে এগিয়ে গেছে—ঝড়ের মুখে ভাসিয়ে দিয়েছে জীবনের তরী।

আর সুনীতি—সে-ও এক অসাধারণ মেয়ে। সহস্রের মাঝে অনায়াসেই দৃষ্টিআকর্ষণ করে। দৃঢ়তায়, আত্মপ্রত্যয়ে, সাহসে ভরপুর। বর্ন্ লিডার বলে কথা আছে একটা, সুনীতির সম্বন্ধে কথাটা কতভাবে যে প্রযোজ্য! কুমিল্লা'র ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সে ছিল কমান্ডান্ট্।

সেদিন তাকে দেখিনি। কিন্তু পরে জেলের ভেতরে অল্পবয়সী সত্যাগ্রহী মেয়েদের নিয়ে সে যখন প্যারেড করত, ওর কমান্ড্ দেবার ভঙ্গি, ওর দৃপ্ত গলার স্বর, ওর সম্রাজ্ঞীর মত চলা-ফেরা, মুগ্ধ হয়ে দেখেছি আর ভেবেছি: এ মেয়ে সুযোগ পেল না, সুযোগ হয়তো কোনদিনও পাবে না। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে বৃহত্তর পরিবেশেই এই মহিমময়ী মূর্তিকে যথার্থ মানাত।

সেদিন শান্তি-সুনীতিকে মেয়েদের মধ্যে দুর্গম পথের প্রথম অগ্রদূত রূপে যাঁরা বেছে নিয়েছিলেন—তাঁদের নির্বাচনকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। ওরা কারও ক্রীড়নক হয়ে, কারো দ্বারা অন্ধভাবে পরিচালিত হয়ে সেদিন এগিয়ে যায় নি; নিজেদের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ উপলব্ধি ও তার ফলাফল সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা নিয়েই তারা অগ্রসর হয়েছিল। যোগ্যতার দিক দিয়েও কোনখানে এতটুকু ন্যূনতাও কোনদিন দেখা যায় নি। বয়সের মাপ-কাঠি দিয়ে ওদের সেদিনের মনের ম্যাচিওরিটি-র বিচার করতে গেলেও ভুল হবে। ওদের মধ্যে একই সঙ্গে ছিল বালিকার চাপল্য আর তপস্বিনীর গাম্ভীর্য, শিশুসুলভ সারল্যের সঙ্গে মিশে ছিল বীরাঙ্গনার দৃপ্ত সাহস—কৈশোরের সহজ উচ্ছ্বাসকে সংযত করে রেখেছিল ত্যাগব্রতধারীর কঠোর সাধনা।

বিচারের দিনগুলি ওদের কেটেছিল অধীর প্রতিক্ষায়। কোর্ট বা জেলের মধ্যে বসে বসে ওরা গান গাইত, হাসত—আর প্রতীক্ষা করত ফাঁসির আদেশ শোনবার। ওদের স্বপ্ন ছিল, একান্ত আশা ছিল, ওদের শুভ্র কচি গলায় ফাঁসির দড়িটি জড়িয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে যাবে, 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ।'

কিন্তু সে আশা ওদের পূর্ণ হল না। এক হিসাবে মৃত্যুর চেয়েও কঠিনতর শাস্তি ওদের মাথা পেতে নিতে হল, যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড। বড় কঠিন শাস্তি—মৃত্যুর চেয়েও কঠিন এই জীবন্মৃত হয়ে থাকার দণ্ড।

কিন্তু পরাভব মানার মেয়ে ওরা নয়। যাবজ্জীবন কারাবাস—বেশ তাই-ই হোক।

মাথা উঁচু করে সগর্বে তারা ঢুকল কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে, ঠিক যেমন করে 'টলমল পদভরে বীরদল চলে সমরে।' (ওদেরই নিত্য গাওয়া একটি গান।) ওদের ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে জেলের আবহাওয়া যেন অনেকখানিই বদলে গেল। সেখানকার উষর মরুভূমিতে নেমে এল স্বর্গের আনন্দ-প্রবাহ।

কয়েদীর শ্রীহীন স্থূল পোশাক, বিস্বাদ খাওয়া-দাওয়া, নীরস ক্লান্তিকর খাটুনী আর প্রতি পদে পদে বাধা-নিষেধের চোখ-রাঙানী। তার মাঝেই শুরু হল দুটি বালিকার অন্তহীন, ছেদহীন, বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রা। পাথেয় শুধু নিজেদের অন্তরের ঐশ্বর্য—সম্বল শুধু অতীতের উজ্জ্বল মধুর স্মৃতি।

'বাহিরের আলোহীন আশাহীন দয়াহীন ক্ষতি
পূর্ণ করে দেয় শুধু অন্তরের অন্তহীন জ্যোতি।'

সে সময় (১৯৩২ সালে) সারা দেশে চলছিল সত্যাগ্রহ আন্দোলন। বাংলার জেলগুলি অসংখ্য সত্যাগ্রহী বন্দিনীতে ভরা। শান্তি-সুনীতিকে সবসময় তাঁদের থেকে আলাদা করে রাখা সম্ভব হত না। তাঁদের অনেকের সঙ্গেই নিবিড় স্নেহবন্ধনে বাঁধা পড়ত ওরা।

তাঁদের কারুর মেয়াদ তিন মাস, কারুর ছ'মাস, কারুর বা ন'মাস। তাই তাঁদের চলেছে জেলের মধ্যে নিত্য আসা-যাওয়া। আর তার মধ্যেই সব কিছু বন্দোবস্ত করে থাকতে হত শুধু সকলের সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে ছোট দু'টি মেয়েকে। মাসী, দিদি, বৌদি—এমনি কোন না কোন স্নেহের সম্পর্কে ওঁরা বাঁধা পড়ে গেছেন।

এক একজনের মেয়াদ যখন ফুরোয়, বেরিয়ে যেতে হয়—কেউ শান্তি-সুনীতিকে ছেড়ে যেতে চান না। চোখের জলে ওঁরা ভাসতে থাকেন। ওরা দুজনে হেসে অস্থির, 'এ রাম! আমাদের জন্য নাকি আবার মানুষ কাঁদে! এরা সব নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে।' কখনো সান্ত্বনা দেয়—'আবার আমাদের কাছে চলে এস, এখন তো জেলে আসা খুবই সোজা।' কখনো ওঁদের খুশী করার জন্য আবদার জানায়, 'বাইরে গিয়েই জেল-গেটে আমাদের জন্য একটা মস্ত বড় আচারের শিশি জমা দেবে কিংবা একটিন বিস্কিট।'

জেলে আরও যে-সব দীর্ঘ দিনের বাসিন্দে—সাধারণ অপরাধে দণ্ডিত কয়েদী—তাদের কাছেও শান্তি-সুনীতির আবির্ভাব যেন দেবদূতের আবির্ভাবের মত। 'দুঃখের ঘরে' এ কারা নিয়ে এল এত হাসি, এত গান, এত প্রাণ? 'ঐহিকের সর্বসুখ বঞ্চিত' হয়েও কোথা থেকে পায় এরা এত অনাবিল আনন্দের খোরাক?

দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীরা জেলখানার অসুস্থ পরিবেশে ভুলে গিয়েছিল যে তারাও মানুষ, তাদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি যেন কঠিন নিষ্পেষণে মরে গিয়েছিল। শান্তি-সুনীতির সংস্পর্শ অঘটন ঘটালো। কয়েদীদের শুষ্ক প্রাণে আবার স্নেহ ও বাৎসল্যের অনুভূতি জেগে উঠল, কখনও কখনও এই পবিত্র মেয়ে দুটির সামনে অভ্যস্ত কুৎসিত গালাগালি করতেও যেন ওরা একটু থমকে যেত।

একদিনের ঘটনা। রমজানের সময় মুসলমান কয়েদীদের 'রোজা' ভাঙার জন্যে সন্ধ্যায় একটু করে চিনি ও লেবু দেওয়া হত। জেলের আহারে মধুর রসটির বড়ই অভাব—তাই চির-বঞ্চিত রসনার কাছে এই স্বল্প-পরিমাণ চিনিটুকু একেবারে অমূল্য। সেই সময়

একদিন হঠাৎ দেখি 'বিশ বছরী' আসামী মেহেরের মা-র সঙ্গে সুনীতির রীতিমত ধস্তাধস্তি চলেছে। মেহেরের মা একটি গেলাসে ওর প্রাপ্য চিনি ও লেবুটুকু দিয়ে শরবৎ করে কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে এনে সুনীতিকে খাওয়াবার চেষ্টা করছে। সুনীতির ঘোরতর আপত্তি—'তুমি সারাদিন না-খেয়ে আছ, নিজে না-খেয়ে আমাকে কি বলে দিচ্ছ?' মেহেরের মা-র বক্তব্য, 'তুই পোলাপান, তুই খেলেই আমার পরাণটা জুড়োবে।'

সেদিনকার বিতর্কে শেষ অবধি কে জিতল, সে-কথা আজ মনে নেই। খালি আজও সাব্লাইম কোনও দৃশ্যের কথা যখন ভাবতে চাই, সেইদিনের সেই দৃশ্যটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

সুনীতিকে জেলে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী করে অন্য রাজনৈতিক বন্দিনীদের থেকে পৃথক করে 'বিশেষ' শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। পড়বার কোনও বই নেই, মন খুলে কথা বলার একটি লোক নেই—খাওয়ায় শোয়ায় দিনযাপনে এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য নেই। দিনের পর দিন খাওয়া শুধু লাপ্সি (সকালের মাড়-ভাত-রূপ জলখাবার), আর ঘাঁট-সংবলিত ভাত। (ঘাঁট—জেলখানার ডাঁটার তরকারী)। বিছানা শুধু দুখানি কম্বল। অহরহ দেহ-মনের উপর এই যে অপরিসীম নির্যাতন, না জানি অন্তরের কোন্ দুর্জয় শক্তি থাকলে বছরের পর বছর ধরে মানুষ এসবই অনায়াসে সহ্য করে নিতে পারে।

সুনীতির মনোবলকে ভাঙবার আরও নির্মম প্রচেষ্টাও হয়েছিল। ওর বাবার পেন্‌সন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ওর দুই দাদাকে জেলে বিনাবিচারে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। সে-সময় ওর বৃদ্ধ বাবা-মা ও দুটি নাবালক ছোট ভাই একেবারে অসহায় অবস্থায় পড়েছিলেন, কোন দিক থেকে কোনও সাহায্য-হস্তও তাঁদের দিকে প্রসারিত হয়নি।

সেই নিদারুণ দিনগুলি তাঁদের কিভাবে যে কেটেছিল, তার ওপর চিরদিনই যবনিকা টানা রয়ে গেছে। শুধু এইটুকু শুনেছিলাম

—সুনীতির পরের ভাইটি কলকাতায় এসে চাকরির সন্ধানে ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে শেষে কিছুদিন রাস্তায় রাস্তায় ফেরিওয়ালার কাজ করে। তবে সেও খুব বেশী দিন নয়, অল্প কিছুদিন পরেই অনাহারে অল্পাহারে ওর জীবন ক্ষীণ হয়ে আসে, ফলে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে কিছুদিন পরেই চিরমুক্তি লাভ করে।

দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিই নি বলে অনেকের ক্ষোভ আছে, হয়তো সে ক্ষোভের কিছু কারণও আছে। তবু এ ধরনের কথা শুনলেই আমার বুকটা কেমন যেন করে ওঠে। অনেকদিনের অনেক কিছু ঘটনা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায়, সুনীতির সেদিনের সেই তপস্যা-কঠিন অশ্রুপ্লুত মুখখানি, যেদিন ওর কাছে পৌঁছেছিল ওর ভাইয়ের এই মৃত্যুর খবর।

শান্তিকেও 'শাস্তি' দেবার চেষ্টা কম হয় নি। ওকেও বেশ কিছুদিন সমস্ত সঙ্গিনীদের থেকে দূরে সরিয়ে এক-ধরনের 'নির্জন কারাবাসের' ব্যবস্থা করা হল। জেলখানা মাত্রই তো দুঃখের ঘর, মানুষকে অবসন্ন নিরানন্দ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। তার ওপর সেখানে যদি কাউকে একেবারে নিঃসঙ্গ রাখা হয়, তাহলে মানুষের 'মন' নামক বস্তুটিকে বোধহয় চূড়ান্ত পরীক্ষায় ফেলা হয়। বিশেষ করে শান্তি তখন মাত্র ষোল বছরের মেয়ে—প্রাণোচ্ছ্বাসে ভরপুর, যার 'এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভোর!' কিন্তু সে সমস্তই অন্তরের মধ্যে রুদ্ধ করে রেখে নিঃশব্দ সাধনায় মহাযোগাসনে তাকে বসতে হল।

কষ্ট তার হয়েছে ঠিকই—এক সময় মনে হয়েছে ধৈর্য্য বুঝি আর থাকে না। কিন্তু সেদিনের সেই কঠোর তপস্যা নিরর্থক হয়নি শান্তির জীবনে, বিজয়িনী হয়েই সে ফিরে আসতে পেরেছে—হয়ে উঠেছে আরও শক্তিমতী অন্তর্মুখী, স্থির সৌদামিনীর মত অচঞ্চল।

মনে পড়ছে, শান্তির মা শান্তিকে জেলে লিখেছিলেন, 'যিনি তোমার কোমল হাতে লৌহ বলয় পরিয়ে দিয়ে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছেন, তিনি যে আমার প্রহ্লাদের হরি—তোমার

তপস্যার শেষে তিনিই আবার তোমাকে আমার বুকে ফিরিয়ে দেবেন।'

মনে পড়ে, আসন্ন সন্ধ্যায় জেলের রুদ্ধ দরজার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে সুনীতি গান গাইছে, 'ত্যাগের ব্যথা বাজবে না আর প্রাণে যবে, সেদিন মোদের স্বাধীন হওয়া সহজ হবে, সহজ হবে।'

আন্দামান সেলুলার জেলে

নারায়ণ

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে অংশ গ্রহণের জন্য দীর্ঘমেয়াদে দণ্ডিত হয়েছিলেন বিহারের দানাপুরের নারায়ণ। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের এই সৈনিক আরো প্রায় তিন হাজার সহযোদ্ধার সঙ্গে নির্বাসিত হয়েছিলেন আন্দামানে। এই বন্দীদশায় একদিন আগ্রা জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপটেন ওয়াকার ২৫০ জন নির্বাসিত বন্দীকে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে চালান দিচ্ছিলেন। জলযান থেকে সমুদ্রের অগাধ জলে লাফিয়ে পড়ে নারায়ণ চেষ্টা করেছিলেন বন্দীদশা থেকে বন্ধন মুক্ত হতে। কিন্তু, নারায়ণ ব্যর্থ হলেন। ক্যাপ্টেনের নিষ্ঠুর আগ্নেয়াস্ত্র নারায়ণকে গুলিবিদ্ধ করল। সমুদ্রের প্রশস্ত বুক রঞ্জিত করে নারায়ণের জীবন দীপ নির্বাপিত হল। বিহারের দানাপুরের নারায়ণ আন্দামান শহীদ শতদল তালিকার সর্বশীর্ষ স্থান অধিকার করে আছেন।

অজ্ঞাতনামা ছিয়াশি

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বিরাট সংখ্যক দেশভক্ত বীরকে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়। ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে এদের মধ্যে ৭৭৩ জনকে আন্দামানে চালান দেওয়া হয়েছিল। নির্বাসনে অমানুষিক ব্যবহারের ফলে এদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। ফলে, ১৮৫৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে এই নির্বাসিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে ২১৮ জন বন্দীজীবন থেকে পালিয়ে দ্বীপ থেকে দ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে। পরে এঁদের মধ্যে ৮৮ জনকে গ্রেপ্তার করে ৮৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়। মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত, 'আন্দামান নির্বাসিত, অজ্ঞাত, অখ্যাত ৮৬ জন বীর দেশভক্ত শুধু অঙ্কের অক্ষরেই শহীদ হয়ে আছেন।

শের আলী

বিগত শতাব্দীর সপ্তম দশকে ব্রিটিশ বিরোধী ওয়াহাবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে ভারী সাজায় দণ্ডিত হয়েছিলেন পাঠান সন্তান শের আলী। সুদূর আন্দামানেও নির্বাসিত জীবনে শের আলী মওকা খুঁজছিলেন ব্রিটিশ নির্যাতনের বদলা নেবার জন্য। অবশেষে মওকা এসে গেল। ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়ো এলেন আন্দামানে ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এবারডিন দ্বীপের ঠিক উল্টো দিকে মাউন্ট হেরিয়ট পরিদর্শন শেষে বড়লাট মেয়ো যখন প্রহরী ও অফিসারের দলবল নিয়ে হোপ-টাউন জেটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, শের আলী তখন হঠাৎ ছুটে এসে হাতের ছোরাখানি সোজা বসিয়ে দিলেন লর্ড মেয়োর বুকে। বড়লাট ধরাশায়ী হলেন। তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হল। সান্ত্রী পাহারা শের

আলীকে ধরে চালান দিলেন। বিচারে শের আলীর মৃত্যু দণ্ড হল। ফাঁসির রশি তাঁর জীবনের উপর যবনিকা টেনে দিল। দেশভক্ত ভারতীয় বীরদের ব্রিটিশ রাজকর্মচারী অপসারিত করার একটানা সুদীর্ঘ ইতিহাসে শের আলীই একমাত্র শহীদ, যাঁর সফল আক্রমণে ভারতের সর্ব্বোচ্চ ব্রিটিশ প্রতিভূ নিহত হয়েছিলেন।

সর্দার ভান সিং

পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার সর্দার ভান সিং গদর পার্টির অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত হয়ে তিনি দেখেন জেলের ভিতরে চলেছে অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচার। বন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও সেই নির্যাতন প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। সর্দার ভান সিং প্রতিরোধের সম্মুখ সারিতে দাঁড়িয়ে জেল কর্তৃপক্ষের প্রতিটি অন্যায় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে সুরু করেন। একদিন জেল কর্তার সঙ্গে বচসা হলে তাঁকে সকলের থেকে আলাদা করে তিন নম্বর ইয়ার্ডের ১৫৬ নম্বর কুঠরীতে তালাবন্ধ করা হয়। তার পর চলে জোয়ান জোয়ান সেপাই ও সাধারণ বন্দী দিয়ে লোক চক্ষুর আড়ালে অমানুষিক বর্বর ধোলাই। ভান সিং-এর রক্ত বমি সুরু হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর জীবন-প্রদীপ নিভে যায়। প্রতিহিংসা পরায়ণ কর্তৃপক্ষ মিথ্যা প্রচার করেন, শহীদ ভান সিং-এর রক্ত আমাশয়ে মৃত্যু হয়েছে!

পণ্ডিত রামরক্ষা

পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুরে পণ্ডিত রামরক্ষার বাড়ী। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গদর পার্টির নির্দেশে তিনি বর্মায় চলে যান। ১৯১৭ সালে মান্দালয় ষড়যন্ত্র মামলায় রাজদ্রোহের অভিযোগে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। রামরক্ষার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেলুলার জেলে ঢুকতেই রামরক্ষার উপবীত কেড়ে নেওয়া হয়। ব্যক্তিগত ধর্মীয় আচরণের প্রতি এই অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কোনরকম হুঁশ নেই দেখে পণ্ডিত রামরক্ষা উপবীত ধারণের অধিকার রক্ষায় আজীবন অনশন সুরু করেন। দীর্ঘ তিন মাস অনশনেও কর্তৃপক্ষের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয় না। রামরক্ষা ধীরে ধীরে আমরণ অনশনের অঙ্গীকার রক্ষায় মৃত্যুর কোলে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে শহীদ হন।

মহাবীর-মোহন-মোহিত

মহাবীর-মোহন-মোহিত শহীদ আকাশে তিনটি উজ্জ্বল তারকা। আন্দামান সেলুলার জেলে ১৯৩৩ সালের মে মাসে যে অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক অনশন-ধর্মঘট বর্বর জেল-আচরণের প্রতিবাদে গড়ে উঠেছিল, মহাবীর-মোহন-মোহিত সেই ধর্মঘটে আত্মবিসর্জন দিয়ে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। এই তিন শহীদের আত্মদানের ফলে সেদিনের আন্দামান বন্দীরা তাঁদের সংগ্রামে বিজয়ীর ভূমিকা পালনে সমর্থ হন। তিন শহীদের আত্মবিসর্জন আন্দামান সেলুলার জেলের সমগ্র পরিবেশকে বর্বরতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে কারারুদ্ধ বন্দীদের জীবন বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

মহাবীর সিং উত্তর প্রদেশের এক ঠাকুর পরিবারের সন্তান। যুবা বয়সে তিনি উত্তর ভারতের গোপন বিপ্লবী সংগঠন হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টির সদস্য হন। বিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত অবস্থায় তিনি ধৃত হয়ে শহীদ ভগৎ সিং, রাজগুরু প্রমুখের সঙ্গে প্রখ্যাত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩৩ সালের প্রথম দিকে আন্দামান সেলুলার জেলে এসেই এই জেলের অমানুষিক বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতিতে মহাবীর অংশ গ্রহণ করেন এবং মে মাসের ঐতিহাসিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৭ই মে তারিখে অনশন সংগ্রামের ষষ্ঠ দিনে বল পূর্বক আহারের পালা সুরু হলে জোয়ান জোয়ান একদল পাঠানের সঙ্গে মহাবীর আপ্রাণ বাধাদান করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। পশুর দল তাঁর বুকে, পেটে, পায়ে চেপে বসে। এরপর, নাক দিয়ে নল ঢুকালেও মহাবীর তা দাঁতে কেটে বাধা দেন। পরে, সমস্ত নলটাই ফুসফুসের রাস্তায় প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বর্বরেরা তাতে দুধ ঢেলে দেয়। ফুসফুসে সাংঘাতিক জখম হয়ে মহাবীর যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সেদিনই রাত ১টায় জেল হাসপাতালে মহাবীর সিং-এর জীবন দীপ নিভে যায়।

মোহন কিশোর নমোদাস পূর্ব বাঙলার ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী। কিশোরগঞ্জ মহকুমায় সরার চর গ্রামে তাঁর নিবাস। ছোটবেলা থেকেই মোহন কিশোর মানুষের সেবার কাজে ব্রতী ছিলেন। পরে গোপন বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন দলের কর্মী হন। নেত্রকোনায় সোয়ারিকান্দা গ্রামে এক রাজনৈতিক ডাকাতির অভিযোগে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মোহন কিশোর সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। সেখানে ঐতিহাসিক অনশন-ধর্মঘটে যোগ দিলে মহাবীর সিং-এর সঙ্গে একই দিনে বল পূর্বক আহারের বর্বরতার শিকার হন। ফুসফুসে দুধ ঢোকায় নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হ'লে জেল হাসপাতালে প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় তাঁকে অন্যান্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর

পর সাত দিন চলে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। কর্তৃপক্ষ তাঁর অনশন ভাঙতে বার বার অষুধ খাবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু মোহন কিশোর মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে অবিচল নিষ্ঠায় অনশন চালিয়ে যান। কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন। মোহন কিশোর নমোদাস সেলুলার জেল হাসপাতালে ২৬শে মে, ১৯৩৩ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মোহিত মৈত্র-এর বাড়ী ছিল পূর্ব বাঙলার পাবনা জেলায় নতুন ভারেঙ্গা গ্রামে। যৌবনের প্রারম্ভে গোপন বিপ্লবী সংগঠন যুগান্তর দলের রংপুর শাখার সংস্পর্শে এসে তিনি মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৩২-এর ২রা ফেব্রুয়ারী একটি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তিনি ধরা পড়লে অস্ত্র আইনে তাঁর পাঁচ বছর কারাদণ্ড হয়। দেশের জেলে কিছুদিন থেকে ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘটের পূর্বাহ্ণে তিনি আন্দামান সেলুলার জেলে চালান হয়ে আসেন। এসেই তিনি অনশন সংগ্রামে শরিক হন। সেই ১৭ই মে তারিখে বল পূর্বক খাওয়াবার বর্বর ব্যবস্থায় মোহিতও শিকার হন। ফুসফুসে দুধ ঢুকিয়ে দেওয়ায় প্রথমে যন্ত্রণা, পরে জ্বর। দুরারোগ্য নিমোনিয়ার সঙ্গে মোহিতের দশদিন ব্যাপী লড়াই চলে। সুকণ্ঠ মোহিত গান পাগল ছিলেন। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের দিন গুলিতেও তাঁর কণ্ঠে ছিল গানের কলি। অবশেষে ২৮শে মে মোহিতের জীবনাবসান হয়।

● 'মুক্তিতীর্থ আন্দামান' পুস্তক থেকে কৃতজ্ঞতা সহকারে সংগৃহীত।

'জাগো'—

জাগো অনশন-বন্দী, উঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগাহত।'

—কাজী নজরুল ইসলাম

হরিপুরা কংগ্রেস

[১৯৩৮]

'Ours is a struggle not only against British Imperialism but against World-Imperialism as well of which the former is the keystone. We are, there fore, fighting not for the cause of India alone but of humanity as well. India freed means humanity freed'.

Subhas Chandra Bose.

আমাদের সংগ্রাম শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই হল তার মূল ঘাঁটি। তাই আমরা যে শুধুমাত্র ভারতের জন্যই সংগ্রাম করছি তা নয়। আমাদের সংগ্রাম বিশ্বমানবতার জন্য। ভারত স্বাধীন হওয়া মানে বিশ্বমানবতার মহামুক্তি।

সাংবাদিকের চোখে ত্রিপুরী কংগ্রেস

[১৯৩৯]

'Truth and non-violence has been murdered in the broad daylight at Tripuri'.

সত্য এবং অহিংসাকে ত্রিপুরী কংগ্রেসে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়েছে।

বিদেশীর চোখে

'Gandhi now turned the technique of non co-operation, not against the British, but against

Congress's won President. Bose was forced to resign'.

গান্ধীজী এবার যে অসহযোগের কৌশল গ্রহণ করলেন তা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেসের নিজের সভাপতির বিরুদ্ধেই। ফলে বোস (সুভাষ) পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

'দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে,
বসে থাকবার বেলা নেই মোটে,
রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে
পূর্ব কোণ।'

—কবি সুকান্ত

বহিষ্কার

'গুরুতর নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বঃ প্রাঃ রাঃ সমিতির সভাপতির পদের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস হইতে তিনি কোন নির্বাচিত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।'

[আনন্দবাজার : ১৩-৮-৩৯]

দেশনায়ক

সুভাষচন্দ্র,

'বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশ-নায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে

রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক।

বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশ্যে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি।…

—রবীন্দ্রনাথ

'আসিতেছে শুভদিন
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ'।

—কাজী নজরুল ইসলাম

সুভাষচন্দ্রের সাথে—স্মৃতিচারণ

শ্রীনিরঞ্জীব রায়

[বি, ভি-র বিশিষ্ট সদস্য, মেদিনীপুরের তৃতীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ হত্যার ব্যাপারে যাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রখ্যাত সাংবাদিক]

"পারবেন? পারবেন বের করতে?" চোখে মুখে ফুটে উঠেছে তাঁর যুগপৎ বিস্ময়, সংশয়, উৎফুল্লের ভাব।

"হাঁ, পারা যাবে, হয়ে যাবে।" বললাম প্রত্যয়ের সঙ্গে

জরুরী তলব পেয়ে এসেছি। দোতলার প্রশস্ত ঘরটায় আরো অনেকেই সমবেত। বুঝলাম, খবর দিয়ে আনা হয়েছে সবাইকে। কাগজ প্রকাশনায় যারা ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত, সবাইকে।

সত্যদার কাছ থেকে শুনলাম জরুরী বিষয়টি। সত্যরঞ্জন বক্সি। 'De facto Editor Forward Flock'. ওপাশের টেবিলে ব্যস্ত ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সামনে ধূমায়িত চায়ের কাপ। আমাদের সব কথাই মনে হোল, শুনতে পেয়েছেন। কাপ হাতে এগিয়ে আসতে আসতে পূর্বোক্ত প্রশ্নেরই পুনরুক্তি করলেন।

"কি বলেন, পারবেন কাল বিকেলের মধ্যে বার করতে?" বসলেন সামনের সোফায়, "বলুন, ভাল করে বলুন" অনেকটা খুশি উৎফুল্ল।

"খুবই মারাত্মক খাটুনির ব্যাপার। তবু পারা যাবে। সময় মতোই বের করা যাবে।" পুনরুক্তি করতে হোল।

বসবার সময় নেই। প্রেসকে এখুনি জানাতে হয়। ওদিককার

টেবিলে গিয়ে ফোন করলাম। পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস। ওখানেই ছাপা হয় সাপ্তাহিক 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সুভাষচন্দ্রের সম্পাদনায়। ভারতব্যাপী প্রচার, ভারতের বাইরেও। দারুণ চাহিদা। ছাপা হয় পঞ্চাশ হাজারের মতো। অমন প্রচার-সমৃদ্ধ ইংরাজী সাপ্তাহিক পূর্বে আর বের হয়নি। ভারতবাসী তখন উদ্‌গ্রীব, উচ্চকিত ঐ একটি লোকের জন্যে। তাঁর বক্তব্যের জন্যে—ঐ কংগ্রেসদ্রোহী সুভাষ, বিপ্লব-পথযাত্রী সুভাষের বক্তব্যের জন্য।

সাড়া পাওয়া গেল প্রেস থেকে। সাগ্রহ সাড়া। মালিক বিজয়বাবু আগ্রহী। বিজয় ধর, জার্মান-ফেরৎ বিশেষজ্ঞ। অন্যতম মালিক দেবেন বসাক। দু'জনেই আমাদের বন্ধুলোক, নিষ্ঠাবান সমর্থক।

"এখন রাত ন'টা" ঘড়ি দেখলেন সুভাষ বাবু "কাল বিকেলে—বিকেল চারটেয় কাগজ ready হওয়া চাই—all complete" একটু কিন্তু-ভাব যেন রয়েই যাচ্ছে।

ওধারে সোফায় বসে ফণীবাবু কাগজে নিবিষ্টমন। ফণী মজুমদার, বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী। মুজিব ক্যাবিনেটের। এখানকার কর্মকর্তা ব্যক্তিদের অন্যতম।

"কি ব্যাপার ফণীবাবু?" মৃদু হেসে জানতে চাইলেন সুভাষবাবু. "আপনি যে বলছেন না কিছুই?"

"নিরঞ্জীববাবুর বক্তব্যই আমার বক্তব্য" হাসতে হাসতে কাগজটি সরিয়ে রাখলেন, "ওঁর সাথেই আমি আছি।"

পরিষ্কার হোল না কিছু। সপ্রশ্ন দৃষ্টি সুভাষবাবুর চোখে।

মণিদা টিপ্পনি কাটলেন "হাঁ মে হুঁ মিলানা।" তিনি আবার মাঝে মাঝে হিন্দী চর্চা করেন। হেসে উঠলেন ঘর সুদ্ধ সকলে।

মণিদা মানে মণীন্দ্র কিশোর রায়।

মণিদা সর্বময় পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার। সহায়ক ফণীবাবু ও আমি। ফণীবাবুও সুনাম সম্পন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, কর্মনিষ্ঠ, আদর্শ নিষ্ঠ। তিন জনেই আমরা একই সাথে বার-চোদ্দ বছর

জেল-বাস করেছি। অফিস, পেপার, প্রেস এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যাপার আমরাই অনেকটা দেখাশোনা করি।

Editorial নিয়ে বরাবরই একটু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। জানেন সেটা সুভাষচন্দ্র। তাঁরই সৃষ্টি। অনিচ্ছাকৃত অবশ্য। কলকাতায় যখন থাকেন, তখন প্রধানতঃ নিজেই লেখেন Editorial. কিন্তু কিছুতেই যেন আর সময় করতে পারেন না।

আশায় থেকে থেকে গেলাম তাঁর বাড়িতে। রাত এগার, সাড়ে এগারটায়। গভীর আলাপ আলোচনায় মগ্ন বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে। রাজ্যের বা অন্য রাজ্যের। বসে বসে কাগজ দেখি। হয়তো শেষ হোল একটা দেড়টা বা দু'টোয়।

"ও, Editorial দিতে হবে বুঝি?" বসুন, বসুন, এই খাওয়াটা একটু সেরে নিই।" ভুলে ও বিলম্বে একটু লজ্জিত সুভাষচন্দ্র, "এখুনি হয়ে যাবে।"

এই Editorial-এর ব্যাপারেই মনে পড়ে গেল একটি ঘটনা। যতদূর মনে পড়ে সুভাষবাবু তখন লাহোরে। উত্তর পশ্চিম ভারত সফররত। অবিশ্রান্ত সভা করেছেন। একটু অবসর বোধ হয় করে নিতে পেরেছেন। Editorial লিখে পাঠিয়েছেন। পরের সংখ্যা বের হতে তখনও কয়েক দিন বাকী। সত্যদা যথারীতি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন লেখাটি। একবার চোখ বুলিয়ে যথাসময়ে প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছি। শুক্রবার রাতে গেছি প্রেসে। পরদিন কাগজ বের হবে। প্রুফ দেখতে চমকে গেলাম। শেষ প্যারাটা একটু কি রকম লাগছে। একেবারে হালের রাজনীতির সাথে যেন একটু বেমানান। বন্ধ করতে হল ছাপার কাজ। ছুটলাম সত্যদার বাসায়। রাত তখন প্রায় ১১ টা।

সত্যদা পড়লেন Editorial টি। একবার, দু'বার। বললেন, "ঠিকই ধরেছ, পরিস্থিতির পারবর্তন হয়েছে—পরিবর্তন হয়েছে লেখার পর।" কি যেন ভাবলেন খানিকক্ষণ। বললেন, "চলো একবার শরৎবাবুর বাসায় একটু পরামর্শ করে নেওয়া যাক্।"

এলাম ১নং উড্‌বার্ন পার্কে শরৎচন্দ্র বসুর বাড়ীতে। তিনি তখন ভিতরে চলে গেছেন। শোবার উপক্রম। খবর করতেই নিয়ে গেলেন আমাদের অন্দরেই। শুনলেন সত্যদার কাছে সব। পড়লেন Editorial টি গভীর মনোনিবেশ সহকারে। মাথা নাড়লেন বার কয়েক, হ্যাঁ change করা দরকার last para টা।" কলম নিয়ে লিখে ফেললেন বেশ খানিকটা। একটা নতুন para-ই হবে।

এগিয়ে দিলেন সত্যদার দিকে, "দেখুন তো ঠিক আছে কিনা?" প্রেসে যখন ফিরলাম তখন রাত ১২॥ টা।

১৯৩৯ সাল। সুভাষচন্দ্র মন্থন করে চলেছেন সারা ভারতবর্ষ— "No Compromise with the British." জন-সমুদ্র হতে উঠছে তারই ধ্বনি, প্রতিধ্বনি। অমৃত—হ্যাঁ, অমৃতই—বাঁচার অভ্রান্ত মন্ত্র গোটা জাতির। আর তারই সাথে রূপায়িত হয়ে উঠেছে ভাবী বিপ্লবের কর্ম্ম-পরিকল্পনা নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে।

যে দিনটিকে ঘিরে এতো প্রস্তুতি, উদ্যোগ, আয়োজন, এত উদ্বেগ আকুল আগ্রহ, সে-দিনটির আবাহন হচ্ছে বাংলা তথা ভারতবাসীর জীবনে এক মহাদিবস, মহালগ্নের সার্থক-স্বীকৃতি নিয়ে। ইতিহাসের জয়যাত্রায় এক স্মরণ-চিহ্ন রূপে। দুই মহামানবের আশীর্বাদ পূত, মঙ্গল-বারি-সিঞ্চিত অনুষ্ঠান—উৎসব। মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপন।

সুভাষচন্দ্রের আমন্ত্রণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আসছেন ভিত্তি স্থাপন করতে। অসুস্থ থাকা সত্বেও তাঁর স্নেহ-ধন্য সুভাষের, যাঁকে তিনি 'দেশ নায়ক' উপাধিতে বরণ করে গৌরব দান করেছিলেন, তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন নি।

প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করলেন প্রেসের লোকেরা। বিশেষ করে কম্পোজিটরগণ। কি অমানুষিক পরিশ্রমই না করলেন! সারারাত, সারাদিন, ঠায় বসে রইলেন গ্যালিতে। অবিশ্রান্ত চলেছে হাত। খাওয়ার পর্যন্ত সময় নেই। মনে হোল, প্রেস সুদ্ধ লোক আজ যেন এক বিশেষ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, সংকল্পবদ্ধ। হয়তো বা রবীন্দ্রনাথ ও

সুভাষের নামেরই জন্য। বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ কাগজ ready হোল—all Complete।

কয়েক শ' কপি নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হলাম অনুষ্ঠান অঙ্গনে। লোকে লোকারণ্য। ভিড় কাটিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। রবীন্দ্রনাথ এসে গেছেন। সোফায় সমাসীন শুভ্র শান্ত সমাহিত মূর্তি।

কাগজ হাতে আমাকে দেখেই আনন্দ দীপ্ত হয়ে উঠলো সুভাষ-চন্দ্রের মুখ। পরম পরিতৃপ্তির ছোঁয়ায় যেন মহিমান্বিত, অপূর্ব সুন্দর। খুশি-চাঞ্চল্যে এগিয়ে এসে সবগুলো কাগজই নিয়ে নিলেন আমার হাত থেকে। রাখলেন পাশে। একখানা তুলে নিলেন হাতে। বদ্ধাঞ্জলি হয়ে তুলে ধরলেন কবিগুরুর সম্মুখে। রবীন্দ্রনাথও গ্রহণ করলেন যেন দু'হাত ভরে স্মিত হাস্য সহকারে। ভাবী বিশ্ববিপ্লবী তুলে দিলেন তাঁর মুখপত্রখানি বিশ্বকবির হাতে, যার রক্ত-লিখন স্বাক্ষর রয়েছে প্রাণবন্ত হয়ে বাংলার যুবশক্তির চরমতম আত্মত্যাগে, আত্মদানে।

দু'দিন বাদে। অনেকেই আবার সমবেত হয়েছেন এল্‌গিন রোডের বাড়ির দোতলায়। খবর পেয়ে আমরাও হাজির। আমি আর ফণীবাবু। ঢুকতেই খুশি-উচ্ছল হয়ে উঠলেন সুভাষচন্দ্র "কি বলে ধন্যবাদ দেব আপনাদের।"

মিষ্টির প্লেট এসে গেল। বেশ বড় প্লেট। এ বাড়ির রেওয়াজ মতোই আলোচনায় ছেদ পড়লো। স্বস্তি পেলাম কিছুটা।

ওপাশে বসে মনিদা আপন মনে পড়ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সেদিনের ভাষণাংশ। নিজের অজান্তিকেই কখন গলা উঠে গেছে—

"...অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা এখন আমাদের প্রত্যক্ষ হোক।"...

স্তব্ধ হয়ে গেছে ঘর। অলক্ষ্যে সবাই বুঝি চলে গেছেন সেদিনের সেই স্মৃতির রাজ্যে—অনুষ্ঠান অঙ্গনে। সেই Golden Voice, সেই উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বর অনুরণিত হচ্ছে বুঝি সবারই মনের পরদায়—

…'প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্দ্ধাকে দুর্গম পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে'…

সত্যদ্রষ্টা ঋষিবাক্যই সত্য হোল যুগান্তরের আলোকে। সত্য হোল 'হিংস্র দুঃসময়ের পিঠের উপরে চড়েই বিভীষিকার পথে,' সত্য হোল দুঃসাধ্য দুঃসাহসিক অভিযানে, সত্য হোল বিশ্বব্যাপী সমরানলে প্রজ্বলিত তেজ-তিলকে মহাবিপ্লবীর গৌরব লিখনে।

* 'আমাদের কথা' পত্রিকার সৌজন্যে মুদ্রিত।

'প্রেম নয়কো পারা না পারার,
অত্যাচারীর রুদ্ধ কারার
দ্বার ভাঙা আজ পণ
এতদিন ধরে শুনেছি কেবল শিকলের ঝনঝন'

—কবি সুকান্ত

মহাজাতি সদন

[১৯৩৯ সালের ১৯শে আগস্ট মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপন উৎসবে সুভাষচন্দ্র ও কবিগুরুর ভাষণের কিছুটা অংশ।]

"আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় গগন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। আমরাও ইতিহাসের এমন এক চৌমাথায় গিয়ে পড়েছি, যেখান থেকে বিভিন্ন দিকে পথ বেরিয়ে গেছে। এখন আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই—যে নিয়মতান্ত্রিকতার পথ আমরা ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বর্জন করেছিলাম, পুনরায় কি সেই পথে ফিরে যাবো? অথবা আমরা গণ-আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়ে গণ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হব? এখানে তর্ক বিতর্ক আমি শুরু করব না। আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে, নব জাগ্রত ভারতীয় মহাজাতি স্বাবলম্বন, গণ-আন্দোলন এবং গণ-সংগ্রামের পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না। এই পন্থার দ্বারাই তারা অনেকটা সাফল্যলাভ করবে বলে বিশ্বাস করে। সর্বোপরি, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা তুচ্ছ আপোষ করে তারা কিছুতেই তাদের জন্মগত অধিকার—স্বাধীনতা হেলায় ছেড়ে দেবে না।

যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি, তা শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়। আমরা চাই ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র। আমরা চাই এক নূতন রাষ্ট্র, যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম আদর্শগুলি।

গুরুদেব! আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বত কণ্ঠে আমাদের সুপ্তোত্থিত

জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবন শক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন—আপনি বিশ্বকবি। আমাদের স্বপ্ন মূর্ত হতে চলেছে দেখে যে সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে, তা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমন আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারে?

গুরুদেব! আজকের এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরহিত্যের পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমল দ্বারা 'মহাজাতি সদন'-এর ভিত্তি স্থাপন করুন। যে সমস্ত কল্যাণ-প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তি ও জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হবে—এই গৃহ তারই জীবনকেন্দ্র হয়ে 'মহাজাতি সদন' নাম সার্থক করে তুলুক—এই আশীর্বাদ আপনি করুন। এবং আশীর্বাদ করুন, যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম-পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সকল রকমে সাফল্য মণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।"

* * * *

"নবযুগের সাড়া দিতে বাংলা দেশ প্রথম হতেই জড়তা দেখায় নি, বাংলা দেশের এই গৌরব এবং এই সত্য পরিচয়···বাংলার যে জাগ্রত হৃদয়মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহা বেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাস বিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে অভ্যর্থনা করি।"

'ডাক ওঠে যুদ্ধের—
গুলি বেঁধে বুকে, উদ্ধত তবু মাথা—
হাতে হাতে ফেরে দেনা-পাওনার খাতা,
শোনো, হুঙ্কার কোটি অবরুদ্ধের'।

—কবি সুকান্ত

ঐতিহাসিক দলিল

জয়প্রকাশ নারায়ণ

[ত্রিপুরী কংগ্রেসে সোশালিস্ট পার্টির ভূমিকা সেদিন কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল কারো কারো মনে। কারণ, সভাপতি নির্বাচন কালে সুভাষচন্দ্রকে পুরোপুরি সমর্থন জানালেও পন্থ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট গ্রহণ কালে তারা ছিলেন নিরপেক্ষ। বোধহয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে একবছর বাদে—১৯৪০ সালে তৎকালীন সোশালিস্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ নাসিক জেল থেকে গোপনে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রকে। বলাই বাহুল্য যে, সুভাষচন্দ্রের পক্ষে তখন আর এ প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ, যুদ্ধ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তখন তিনি বাইরে যাবার জন্য তৎপর। কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে জয়প্রকাশ নারায়ণের সেই পত্রটি এখানে প্রকাশ করা হল।]

প্রিয় কমরেড,

আপনাকে চিঠি লিখতে আমার কিছুটা দুর্ভাবনা হচ্ছে। দুর্ভাবনার কারণ, আপনি আমার বক্তব্যকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন, সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ নই। জানিনে, আমার কথাকে আপনি কোন গুরুত্ব দেবেন কি না! তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমি কোনদিনই আপনার সম্বন্ধে কোন বিরূপ ভাব পোষণ করিনি। রাজনৈতিক ব্যাপারে আমার মত পার্থক্যও গোপন করার চেষ্টা করিনি। সব সময়েই আপনার নিষ্ঠা ও সাহসকে আমি তারিফ করেছি। আজ সবকিছুই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আপনার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিকে অভিনন্দন জানাই।....আমি স্বীকার করছি যে, আপস বিরোধী সম্মেলনে আপনি ও স্বামী সহজানন্দ যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তা খুবই যুক্তিপূর্ণ।

অত্যন্ত জরুরী একটি প্রস্তাব নিয়ে আমি এই চিঠি লিখছি। আপনাকে এই প্রস্তাবটি গভীর ভাবে বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করছি। প্রস্তাবটি হল, ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে। এ নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গেও আলাপ করেছি। তিনিও নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন। ভবিষ্যতে আরো আলোচনা হবে। যথাসময়ে তার ফলাফল আপনাকে জানাবো।

সোসালিষ্ট পার্টির যে সব বন্ধু বাইরে রয়েছেন, তাদের কাছেও প্রস্তাবটি পাঠিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ, অথবা অনুশীলন বন্ধুদের মধ্যে কেউ হয়তো এ প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন।

এ সম্বন্ধে আমি কি ভেবেছি, তা সংক্ষেপে জানাচ্ছি। আমার মনে হয়,—আমাদের এমন একটি কর্মপন্থা ঠিক করা উচিত, যা কংগ্রেস থেকে আলাদা। কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলেও এর গুরুত্ব কিছুমাত্র কমে যাবে না। কারণ, কংগ্রেসের আন্দোলনের অর্থ হবে সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে কিছুটা সুবিধা আদায় করা। দু' পক্ষের দর কষাকষির উপরেই তার ফলাফল নির্ভর করবে।

এতদিন আমরা বহু দলের ফ্রন্ট হিসেবে কংগ্রেসকেই প্রধান হাতিয়ার বলে ধরে নিয়েছিলাম, যার একদিকে ছিল কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী, অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণী।

এখন থেকে কংগ্রেসকে ভিত্তি করে আর আমাদের এগোনো ঠিক হবেনা। তার অর্থ এই নয় যে, জনগণের উপর কংগ্রেসের প্রভাব লোপ পেয়েছে। তবে তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার ভূমিকা নিঃশেষিত। কংগ্রেসের সংগঠন ঠিকই আছে, কিন্তু তার নেতৃত্ব এমন এক শ্রেণীর কুক্ষিগত, যা গণবিরোধী, শ্রমিক বিরোধী, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিকও বটে।

বর্তমান কংগ্রেস নীতিগত ভাবে সম্পূর্ণ বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান। কৃষক-শ্রমিক ও বামপন্থী দলগুলোকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে গণ-বিপ্লবের জন্য কংগ্রেসের উপর নির্ভর করা বাতুলতা মাত্র।

…কেন আমরা পৃথকভাবে গণ আন্দোলন করতে চাই, তার কারণও আছে। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল—স্বাধীনতা অর্জন। এটা কেবল বৈপ্লবিক উপায়েই সম্ভব। বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেস যে কর্মসূচী নিয়েছে, তা হল আপসের নীতি। সেই আপসের জন্য কংগ্রেস নিঃসন্দেহে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবে। হয়তো তার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে আন্দোলনের ঝুঁকিও নেবে।

সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ইংরেজপ্রভুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর প্রাণের বিনিময়ে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি যে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখেছেন, তাকে কোনরকমেই পূর্ণ স্বাধীনতা বলা চলেনা।

সুতরাং, এটা স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা একটা অধ্যায়ের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। গণ আন্দোলন মৃতপ্রায়। জাতীয় প্রতিরক্ষার নামে বুর্জোয়া শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত সমাজের একটা অংশও এই সংগ্রাম পরিত্যাগ করেছে। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে তারা হয়তো কিছুটা সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে পারবে, তা বলে এটা আশা করা যায় না যে, সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এ দায়িত্ব প্রধানত শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই নিতে হবে। তাই ভারতের মত দেশে কৃষক শ্রেণীর ভূমিকা প্রাধান্য লাভ করতে বাধ্য এবং এই পর্যায়ের বিপ্লব হবে মূলত—কৃষি বিপ্লব।

অবশ্য আমি একথা বলছিনা যে, আমাদের দেশে কৃষি বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে।…আমি যা বিশেষ ভাবে বলতে চাইছি, তা হল এই যে, ভারতবর্ষের প্রথম পর্বের বিপ্লব শেষ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং তার পরবর্তী অধ্যায়কে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের সবাইকে প্রস্তুত হতে হবে।

তাই কংগ্রেসের থেকে এবার আমাদের দৃষ্টি কিষাণ সভাগুলির

দিকে ফেরাতে হবে। অবশ্য কংগ্রেসের মত ব্যাপক সংগঠন কিষাণ সভাগুলির নেই। তা হলেও হতাশ হবার কোন কারণ নেই। উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে সর্বত্র ওরা মাথা তুলে দাড়াবে।

…আমাদের কংগ্রেসে থাকা উচিত, কি অনুচিত—এ প্রশ্নে কেউ কেউ রীতিমত উত্তেজিত। আমার কাছে এসবের কোন গুরুত্ব নেই। কারণ, আমাদের কাছে কংগ্রেস আর কোন বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান নয়। নয় বলেই আমাদের পৃথক ভিত্তি প্রস্তুত করতে হবে। যতদিন কংগ্রেস জনসাধারণের প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করবে, ততদিন থাকা চলে, কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য সাধারণকে কংগ্রেসের উপর নির্ভরশীল হতে বলা কোন রকমেই ঠিক হবেনা। তাতে জনসাধারণের চরম ক্ষতি করা হবে, বিপ্লবেরও সর্বনাশ হবে।

এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য হবে, কংগ্রেসের উপর থেকে জনগণের নির্ভরতা দূর করা। অবশ্য তারজন্য জনগণকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বলার কোন প্রয়োজন নেই। তবে তারজন্য আমাদের দুটি কাজ করতে হবে। খুব সহজ সরল ভাবে বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বের চরিত্র জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে এবং সেই সঙ্গে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠনগুলি গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে—একটি বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রী পার্টি গড়ে তোলা। কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির কথাই বলছি। আমাদের সামনে যে বিরাট কর্তব্য রয়েছে, তার পক্ষে এ পার্টি অনুপযুক্ত। দেশের সমস্ত বিপ্লবী দলগুলিকে একত্র করে একটি পার্টিতে পরিণত করতে হবে। দেশের সমস্ত বৈপ্লবিক সংস্থাকে একটি ধারায় প্রবাহিত করা দরকার। আপনার কাছে এটাই আমার প্রস্তাব।

আসুন আমরা কংগ্রেস সোসালিষ্ট দল, অনুশীলন, ফরোয়ার্ড ব্লক, কীর্তি, লেবার পার্টি এবং সমধর্মী অন্যান্য দলগুলিকে নিয়ে একটি

বৈপ্লবিক সংস্থা গড়ে তুলি, যার চরিত্র হবে অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের চাইতে আলাদা। আমি বিশ্বাস করি, আপনি ইচ্ছা করলেই এটা করতে পারেন।

তালিকায় কমিউনিষ্ট পার্টির নাম আমি করিনি। কারণ, তাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অন্য কোন সমাজতান্ত্রিক দলের সঙ্গে নিজেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা চলে না। মুখে যাই বলুক না কেন, ওদের লক্ষ্য হল, অন্য পার্টিতে প্রবেশ করে তা ভেঙে ফেলার সুযোগ খোঁজা। তাই কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে আমাদের আলাদা থাকতে হবে। তার মানে এই নয় যে, আমাদের পার্টি কমিউনিষ্ট পার্টির বিরোধিতা করবে। কাজের ভিত্তিতে বোঝাপড়া নিশ্চয়ই থাকবে। মস্কোর সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তাদের সাহায্য নিশ্চয় আমরা চাইবো। তবে আমরা আমাদের নিজস্ব নীতি অনুসারেই চলবো, মস্কোর নির্দেশে নয়।

আমাদের এই পার্টি হবে সম্পূর্ণ গুপ্ত পার্টি। দলীয় বিপ্লবীদের সবসময়েই তৎপর থাকতে হবে। তাদের কাজ হবে···ইচ্ছা করেই কথাটা শেষ করলাম না। আপনি বুঝে নেবেন।

আপনার কাছে এই আমার প্রস্তাব। এ ব্যাপারে আমি খুবই আগ্রহী। একান্ত অনুরোধ, প্রস্তাবটা একটু গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দেখবেন। আশাকরি পরের মাসেই খালাস পাবো। আপনার মতামত শর্মাজীর মাধ্যমে জানাবেন। এ পরিকল্পনা মত অগ্রসর হতে পারলে ভারতবর্ষে বড় ধরণের একটা কিছু করতে পারবো বলে আমরা আশা রাখি। শুভেচ্ছা সহ— আপনার কমরেড

● ভাস্বর—শৈলেশ দে।

'ভুলে যেওনা যে, অন্যায়ের চাইতে বড় অভিশাপ আর নেই। ভুলে যেওনা যে, অন্যায় আর দুর্নীতির সঙ্গে আপস করার চাইতে বড় অপরাধ আর নেই। মনে রেখো, জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে পেতে হলে জীবনের বিনিময়েই তা পেতে হবে। মনে রেখো, সমস্ত ক্ষয়ক্ষতিকে স্বীকার করে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'

—সুভাষচন্দ্র

অন্তর্ধান

'গত রবিবার অপরাহ্ণ হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার বাসভবনের কক্ষে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনবর্গের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি দিবা-রাত্রি এই কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন।

সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গত কয়েকদিন যাবৎ তিনি সম্পূর্ণ মৌনাবলম্বন করেন এবং সকলের সহিত এমনকি আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া ধর্মচর্চায় সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন।

তাঁহার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া উদ্বেগের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্নস্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোন ফল হয় নাই এবং সংবাদ ছাপিতে দেওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন নাই বলিয়া জানা গেল।' [আনন্দবাজার : ২৭-১-৪১]

'তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও—তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাইত দেশের খেয়া তরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাইত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়।

কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল—সেই ত তোমার গৌরব।

তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার। এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জন্য। দুঃখের দুঃসহ বোঝা বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন।

মুক্তি পথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজ-বিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটি নমস্কার।'

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পথের দাবী)

দেশে বিদেশে

'Azad Hind Radio, Berlin, I am Subhas calling....

Azad Hind! To fight and win India's liberty, and then build up India, with full freedom to determine her own future—with no interference. Free India will have a social order based on the eternal principles of justice, Equality and Fraternity'.

আজাদ হিন্দ রেডিও, বার্লিন! আমি সুভাষ বলছি···

আমাদের প্রথম কাজ হল, যুদ্ধে জয়ী হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। তারপর বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজেদের ভবিষ্যত নির্ধারণের পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে ভারতকে গড়ে তোলা। স্বাধীন ভারতে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে, যার ভিত্তি হবে ন্যায়বিচার, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের চিরন্তন নীতি।

সুভাষ সমর্থকদের হত্যা করা হোক

....'Nevertheless we all know that Bengal was the home of a small but Convinced pro-fascist party led by Mr. Subhas Chandra Bose.

It is the business of the Goverment to round up the enemies of the country forthwith and put them to death. No quarter whatever should be given to them...the penalty for traitors of India must be death.' [The Statesman : 13-3-42]

আমরা জানি, সংখ্যায় অল্প হলেও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বাংলা দেশে একটি কট্টর ফ্যাসিষ্ট সমর্থক দল রয়েছে। সরকারের কাজ হল—এদের সবাইকে ধরে ধরে ফাঁসি দেওয়া। কোথাও এদের কোন আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ভারতের এসব দেশদ্রোহীদের একমাত্র শাস্তি হবে—মৃত্যু।

কুইট্, ইণ্ডিয়া

'I shall have to fight against the whole world and stand alone,···I cannot wait any longer for Indian freedom'.

—Mahatma Gandhi

একা হলেও সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে এবার আমাকে সংগ্রাম করতে হবে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য আর আমি অপেক্ষা করতে পারিনে।

টোকিওতে

MR. SUBHAS CHANDRA BOSE ARRIVED IN JAPAN

'Mr. Subhas Chandra Bose, India's independence movement leader and one-time Indian National Congress President, has come to East Asia after staying in Germany for some time to step up the independence movement with the help of Japan and other countries in the Greater East Asia.

He arrived in Tokyo recently and met Premier Tojo on 14th June. Subsequently he met other military and Government leaders to discuss the Indian independence movement'. [Japan times]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা এবং জাতীয় কংগ্রেসের এককালীন সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু কিছুদিন জার্মানীতে থাকার পর সম্প্রতি পূর্ব এশিয়ায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। জাপান এবং বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির সহযোগিতায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরো জোরদার করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য।

● সংকলন—শৈলেশ দে

'ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা, শঙ্কা নাহিক আর
মরিয়া'র মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে মার মার'।

—কাজী নজরুল ইসলাম

আমাদের সংগ্রাম

রাসবিহারী বসু

'If Netaji came out in the light as Garibaldi of the movement, Rashbehari's part in the drama was more than that of a Mazzini'.

—Thakin Nu

একথা সবাই জানেন যে, গত দু'শো বছর ধরে ব্রিটিশ আমাদের জন্মভূমিকে শোষণ ও লুণ্ঠন করে আসছে। এই শোষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য দেশের হাজার হাজার তরুণ তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এখনো আমাদের দেশে প্রতিদিন কত তরুণ মাতৃযজ্ঞে নিজেদের উৎসর্গ করে চলেছেন। তাই শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র আজ প্রতিটি ভারতবাসী মুক্তির দাবী তুলেছেন। স্বয় মহাত্মাজী বলেছেন—'ডু অর ডাই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'।

আমি স্পষ্ট করে একথা বলতে চাই যে, ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য এই যে সংগ্রাম,—এ আমাদের একান্ত নিজস্ব। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়াই করার উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের এই সংগ্রামী সংস্থা গড়ে উঠেছে।

মনে রাখবেন, এ সংস্থা কোন জাপানী বা জাপ সরকারের নয়। এ ব্যাপারে তাদের কোন কিছু করণীয় নেই। কেবল সাধারণ শত্রুকে পরাজিত করার জন্য তারা আমাদের কাছে প্রস্তাব রেখেছে মাত্র। বলাই বাহুল্য, এরজন্য তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কিন্তু ধরা যাক, কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তাদের সাহায্য আমরা পেলাম না। তাই বলে কি আমরা আমাদের সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে যাব? কক্ষনো না। যতদিন আমাদের দেশে বিদেশী আধিপত্য থাকবে, ততদিন এ সংগ্রাম চলবেই। এ সংগ্রাম আমাদের সংগ্রাম। এর ভাগ্য নির্ধারণও আমরাই করবো। কেউ যেন অন্য কোন উদ্দেশ্যে আমাদের এই সংগ্রামকে কাজে লাগাতে না পারে, সে সম্বন্ধে আপনাদের সবসময়েই সতর্ক থাকতে হবে।

মনে রাখবেন, আমাদের এই সেনাবাহিনী কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কয়েক বছর আগে থেকেই এ সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্ব চলছে। অনেক রকম বিরোধিতা সত্বেও আমাদের প্রচেষ্টা চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই অনেকে সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের স্থান পূর্ণ করার জন্য অনেকেই আবার এগিয়ে এসেছেন।

হাজার বাধা বিপত্তি সত্বেও আমরা ক্রমশই এগিয়ে চলেছি লক্ষ্যের দিকে। আজ হয়তো আমার মৃত্যু ঘটতে পারে। তা বলে সংগ্রাম পিছিয়ে থাকবে না। আপনাদেরই একজনকে প্রস্তুত থাকতে হবে আমার জায়গা নেবার জন্য। তারও যদি মৃত্যু হয় তো আর একজনকে দায়িত্ব নিতে হবে। আমি মনে করি, দেশের মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করা প্রতিটি ভারতীয়ের পবিত্র কর্তব্য। আগামী দিনের ভারতবর্ষ আপনাদের জন্য গর্ব বোধ করবে। সংগ্রাম শেষে কেউ যদি বেঁচে থাকেন, দেশবাসীর কাছে নিঃসন্দেহে তিনি বীরের মর্যাদা পাবেন। মৃত্যু হলে পাবেন শহীদের সম্মান।

তাই মাতৃভূমির নামে আমি আপনাদের তুচ্ছ বিরোধ ভুলে গিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাবার আহ্বান করছি। নিশ্চয়ই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হবো। মনে রাখবেন, আমাদের একবারই জন্ম এবং মৃত্যু হবে, তা রোগ শয্যায় হোক, বা যুদ্ধক্ষেত্রেই হোক। তাই বলছি যে, মানুষের মত এগিয়ে আসুন। বাঁচতে হয়তো মানুষের মতই বাঁচুন, আর মরতে হয়তো মানুষের মতই মরুন,

যাতে আগামীদিনের ভারত আপনাদের জন্য গর্ব বোধ করতে পারে।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ আমার নয়, মোহনসিং-এরও নয় বা আপনাদের কারো একার সম্পত্তি নয়। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের চল্লিশ কোটী মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, কেউ যেন এ ফৌজ ভেঙে না দেয়। যদি আপনাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বলে কিছু থাকে, যদি স্বাধীন জাতি হিসাবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চান, তাহলে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মুক্তির এই ডাকে সাড়া দিন। সবাই দলে দলে যোগদান করুন।

আজ আমাদের সামনে চরম সুযোগ উপস্থিত। সব কিছুই আমাদের অনুকূলে। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি আমাদের সহায়তা করতে প্রস্তুত। আমার মন বলছে—এবারের এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হবো।

* দেবনাথ দাসের সৌজন্যে ১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুর থেকে প্রকাশিত ইন্ডিপেণ্ডেন্স লীগের মুখপাত্র 'ইস্ট ইণ্ডিয়া' পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

* ভাষান্তর—শৈলেশ দে।

'আমাদের নেতা, আমাদের [illegible],
চোখে মুক্তির [illegible]
এবার কে আর এ অগ্রগতি
সাধ্য কার?

—কবি সুকান্ত

বিপ্লব কি ও কেন?

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

'The lesson that Netaji and his army bring to us is one of self-sacrifice, unity irrespective of class and community, and discipline. If our adoration will be wise and discriminating, we will rightly copy this trinity of virtues. Then we will be able to stand before the world'.

—Mahatma Gandhi

বিপ্লবের সংজ্ঞা কি! তার সার্থকতা কোথায়! কিভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিপ্লব সার্থক হয়েছিল!

আমি মনেকরি, এ সম্বন্ধে আমাদের সবার একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। তাতে সুবিধা এই যে, আমরা নিজেরাই বিচার করতে পারবো যে, বিপ্লবের কাজে আমরা কতদূর এগিয়েছি। আর কতটাইবা এগুতে হবে।

পৃথিবীর সবকিছুর মত বিপ্লবেরও একটা নিয়ম আছে। বিপ্লবের পথ সোজা নয়! এপথ চিরদিনই দুর্গম। তবু স্পষ্ট ধারণা থাকলে এপথে নিরুৎসাহ হবার কোন কারণ নেই। হতাশ না হয়ে কি করে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করা যায়, সেটাই হবে তখন প্রধান লক্ষ্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিন্তাবিদরা এ সম্বন্ধে অনেক ভেবেছেন। তারা লক্ষ্য করেছেন যে, প্রতিটি বিপ্লবই তার পূর্ববর্তী বিপ্লবের চাইতে অনেক বেশী এগিয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশ বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। দুর্ভাগ্য, আমাদের ভারতবর্ষ এদিকটাতে এখানো খুব একটা মনোযোগ দেয়নি। কিন্তু আজ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। তাই এতদিন না হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে এ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করতে হবে।

ইংরাজীতে Revolution মানে—পরিবর্তন, কিন্তু যে কোন পরিবর্তনকেই কি বিপ্লব বলা চলে! প্রাকৃতিক কারণে কত সময় কত পরিবর্তন ঘটে, তাকে বিপ্লব বলা যায় কি?

যেমন মাঝে মাঝে নদীতে বন্যা আসে। তাতে মানুষের অনেক ক্ষতি হয়। আবার উপকারও হয় কিছুটা। তাই মিশরের অধিবাসীরা মাঝে মাঝে বন্যার জন্য প্রার্থনা করে ভগবানের কাছে। কারণ, বন্যায় ক্ষতি হয় সত্য, আবার জমির উর্বরা শক্তিও বৃদ্ধি পায় অনেকখানি।

ভূমিকম্প মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক জগতের অনেক কিছু ওলট পালট করে দেয়। এটা কি বিপ্লব! কখনোই না। বিপ্লব আমরা তখনই বলি, যখন একটা বিরাট মূলগত পরিবর্তন ঘটে

বিপ্লবে পরিবর্তন ঘটে অতি দ্রুত। সাধারণ ভাবে যা ঘটাতে শত শত বছর লাগে, বিপ্লবের মাধ্যমে তা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটাতে পারে। সাধারণ ভাবে পরিবর্তনের জন্য যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করতে হয়, কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা সমস্ত অন্যায় প্রতিরোধ ধ্বংস করে অতি সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় তাই সত্যিকারের বিপ্লবে রক্তপাত অনিবার্য

বিপ্লবের মাধ্যমে যে পরিবর্তন আসে তা প্রধানত মূলগত। ছোটখাট পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা যায় না। কোন সরকার বা মন্ত্রীসভার পরিবর্তন বিপ্লব নয়। কারণ, জাতীয় জীবন ধারায় তাতে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনা। ইউরোপে প্রায়ই এসব ঘটে থাকে। বুলগেরিয়ায় নিজেই আমি এ ধরণের পরিবর্তন ঘটতে দেখেছি। হঠাৎ হয়তো একদিন রাজা বা মন্ত্রীদের বাড়ি ঘিরে ফেলে

তাদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হল। তাতে সরকার বদল হল ঠিকই, কিন্তু দেশের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটল না। এটা আর যাই হোক, বিপ্লব নয়।

যুগ যুগান্তরে পরাধীন থাকার দরুণ ভারতবাসী স্বভাবতই দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়েছে। তারা সার্বিক ভাবে কোন কিছু ত্যাগ করতে বা প্রাণ দিতে ভয় পায়। বিপ্লবের কথা তো চিন্তাই করতে পারে না। ভাবে যে, নিয়মতান্ত্রিক ভাবে পথ চলাটাই নিরাপদ।

কিন্তু বাস্তব পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যায় যে, বিপ্লবেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। রোগীর পক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে ওষুধে কোন কাজ হয় না। তখন প্রয়োজন হয়—অপারেশনের। এমন বহু নজীর আছে, যখন বাধ্য হয়ে রোগীর হাত-পা কেটে তাকে বাঁচাতে হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, অপারেশনের জন্য রক্তপাত ঘটলেও সেটাই ছিল রোগীর জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়।

জাতির জীবনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচবার জন্য বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়াই তখন একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায়।

বিপ্লব সার্থক করে তুলতে হলে তিনটি জিনিস অবশ্যই চাই। (১) উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা। (২) কোন্ পদ্ধতিতে এগিয়ে যাবে সে সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। (৩) জন সমর্থন।

হয়তো আদর্শ ঠিক আছে, কিন্তু যে পদ্ধতি নেওয়া হল সেটা ভুল—অথবা পদ্ধতি নির্ভুল, কিন্তু আদর্শ সুস্পষ্ট নয়, আবার হয়তো দুটোই ঠিক আছে, কিন্তু পেছনে জন সমর্থন নেই—এর যে কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থতা অনিবার্য। তাই সার্থক বিপ্লবের জন্য এই তিনটি জিনিসই অপরিহার্য।

পৃথিবীতে এমন বহু বিপ্লব ঘটেছে, যেগুলি সার্থক হবার পরে কিছুদূর গিয়েই থমকে দাঁড়িয়েছে। যেমন—ফরাসী বিপ্লব। তাদের আদর্শ ছিল—সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। ফলে সহজেই তারা

জন সমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু পদ্ধতি সম্বন্ধে তাদের নেতৃবৃন্দ ছিলেন কিছুটা অচেতন। স্বাভাবিক কারণেই তখন তারা বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন বহু দলে। ফলে—ক্রমাগত সরকার বদল। উৎসাহী হয়ে উঠল অন্যান্য শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি। ফরাসীদেরকে ধ্বংস করতে হলে এইতো সুযোগ। শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেল নেপোলিয়নের আবির্ভাবে।

অপর পক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তুরস্কে বিপ্লব ঘটেছিল সোজা পথেই। মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে সেখানে এ ধরনের কোন মতভেদ দেখা যায়নি, যা দেখা গিয়েছিল ফরাসী দেশের বেলায়।

কর্মভার অসমাপ্ত রেখে সরে যাবার দরুণ সার্থক বিপ্লব ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে—এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। যেমন—নতুন চীনের স্রষ্টা সান ইয়াৎ সেন। মাঞ্চু সরকারকে গদীচ্যুত করে তিনি কর্মক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ালেন ইউয়ান সি কাই এর হাতে দেশের নেতৃত্বভার অর্পণ করে। লোকটি 'ছাললন'ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল ফলে—তার শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আবার একটি বিপ্লবের প্রয়োজন হল—১৯২৬-২৭ সালে।

আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল—দুটি। (১) রাজনৈতিক স্বাধীনতা, —এটা হল জাতীয় বিপ্লব (২) সামাজিক বিপ্লব। সোজা কথায় প্রথম কর্তব্য, দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করা, তারপর—আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।

বিদেশী শাসন থেকে আমরা মুক্তি চাই—এ উপলব্ধি আজ প্রতিটি ভারতবাসীর। কারণ, আমাদের অগ্রগতির পথে সবচাইতে বড় বাধা হল এই বিদেশী শাসন। এই পরাধীনতার শেষে যেদিন ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা আসবে, সেদিনও যদি দারিদ্র্য, শোষণ, বেকারীত্ব ইত্যাদি সমস্যাগুলি এমনি ভাবেই থেকে যায়, নিরন্নের জন্য অন্নসংস্থান বা শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা না হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের কর্তব্য অসমাপ্তই থেকে যাবে।

আমরা জানি, যতদিন বিদেশী শাসন থাকবে, সমস্যাগুলিও ততদিন থাকবে। তাই আমরা সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, যেখানে সবারই সমানভাবে অন্নবস্ত্র ও শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকবে। তার জন্যই সর্বাগ্রে চাই—বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ।

আজ আমরা যারা বিপ্লব শুরু করতে চাইছি, তারা যদি কেবলমাত্র বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের কথাই ভাবি, সেই সঙ্গে পরবর্তী কর্মসূচীর কথা চিন্তা না করি, তাহলে কিন্তু আমাদের কর্তব্য অসমাপ্তই থেকে যাবে। আমাদের কর্তব্য সেদিনই শেষ হবে, যেদিন আমরা ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ গড়ে তুলতে পারবো, যেখানে মানুষে মানুষে কোন তফাৎ থাকবে না।

আমার ছেলেবেলায় আমি ব্রিটিশকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই সবচাইতে বড় কর্তব্য বলে মনে করতাম। পরে গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে, ব্রিটিশকে তাড়ালেই যদি আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়, তাহলে ভারতবর্ষে নতুন সমাজব্যবস্থা চালু করার জন্য আর একটি বিপ্লবের প্রয়োজন হবে। কারণ, এটা খুবই স্বাভাবিক যে, দেশের মুক্তির জন্য যে সমস্ত লোক কোনদিন বিন্দুমাত্র ত্যাগ স্বীকার করেনি, তারাই ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করবে এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে ক্ষমতা ইচ্ছামত ব্যবহার করবে।

ভারতবর্ষে এমন লোক কম নেই, যারা স্বদেশবাসীকেই নানাভাবে শোষণ করতে অভ্যস্ত। তাই দেশ স্বাধীন হলেই আমরা অবসর গ্রহণ করতে পারিনে। বিদেশী শক্তিকে তাড়ানোর পরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য প্রতিমুহূর্ত আমাদের সজাগ থাকতে হবে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, আমরা যদি জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি ভারত-

বাসীকে সমান অধিকার দিতে চাই, তাহলে জনকয়েক ধনী বিত্তশালী ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুবিধা বোধ আমাদের বন্ধ করতেই হবে।

আর একটি প্রয়োজনীয় জিনিস হল—জনসমর্থন। আমি সবসময়েই লক্ষ্য করেছি যে, গরীব জনসাধারণ সবসময়েই বিপ্লবের ডাকে সাড়া দেয়। তারা বিশ্বাস করে যে, এর ফলে তাদের মঙ্গল হবে। পেছন থেকে বাধার সৃষ্টি করে ঐ বিত্তশালীরা। কারণ, —ভয়। নতুন শাসন ব্যবস্থায় তাদের ধন সম্পত্তির কি হবে কে জানে!

সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের চমৎকার একটি কৌশল হল—এই উচ্চ শ্রেণীকে তোষণ করে গরীব জনসাধারণকে শোষণ করা। তাই বিদেশী শাসনে তথাকথিত এই উচ্চশ্রেণীর জীবনে তেমন দুঃখ বেদনা আসেনি। আসেনি বলেই বিপ্লবের নাম শুনলে তারা ভয় পায়। ভাবে—বিপ্লবীরা জয়যুক্ত হলে তাদের ধন-মান সর্বকিছুই হারাতে হবে।

যে-কোন দেশে মানুষকে ধনী এবং গরীব—দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। আমাদের দেশে গরীবরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ, তাই তাদের সহযোগিতার অভাব ঘটবে না। হয়তো কিছু সংখ্যক মেরুদণ্ডহীন লোক থাকতে পারে, যাদের কোন কিছুতেই উৎসাহ বা অনুভূতি নেই। আবার ধনীদের মধ্যেও এমন কিছু লোক হয়তো রয়েছেন, যারা মনে-প্রাণে দেশপ্রেমিক। তাই কিছুসংখ্যক স্বার্থপর ধনী ও জনকয়েক প্রাণহীন সাধারণ লোক ছাড়া বলতে গেলে গোটা জাতিকেই আমরা আমাদের বিপ্লবের সমর্থকরূপে আশা করতে পারি।

আবারও বলছি—উদ্দেশ্য স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীর নানা দেশের বিপ্লববাদের ইতিহাস ভালভাবে পর্যালোচনা করে আমাদের সঠিক পন্থা ও পদ্ধতি বেছে নিতে হবে। সেই সঙ্গে চাই—জন সমর্থন। যতদিন পর্যন্ত আমরা লক্ষ্যে না পৌঁছাতে পারবো, ততদিন বিপ্লব আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে।

* মালয় থেকে প্রকাশিত K. B. Subbaiah ও S. K. Das রচিত 'Chalo Delhi' গ্রন্থ থেকে অনুবাদ সহকারে সংগৃহীত।

ভাষান্তর—শৈলেশ দে

'আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।'

—কবি সুকান্ত

উদাত্ত আহ্বান

'We would, however, get our freedom only by shedding our own blood. We will be able to preserve our freedom only if we get it through our own sacrifice and toil'.

শুধুমাত্র নিজেদের রক্তের বিনিময়েই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করবো। একমাত্র আত্মত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হলে তবেই আমরা সে স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবো।

'There is no discrimination because of religion and caste in India to day. New India wants freedom for its entire people.'

জাতি ধর্ম নিয়ে ভারতে আজ আর কোন বিভেদ নেই। নতুন ভারত তার সমগ্র জনসাধারণের জন্যই স্বাধীনতা চায়।

'Free India will not be a land of capitalists, land-lords and castes. Free India will be a social and political democracy'.

স্বাধীন ভারত পুঁজিপতি, জমিদার ও উচ্চবর্ণের দেশ হবে না। স্বাধীন ভারত হবে একটি সমাজবাদী, রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশ।

'There shall be no state religion. In the matter of political and economic rights there will be perfect equality among the whole population.

We have to live in the present…we want to build up a new and modern nation on the basis of our old culture and civilization.'

স্বাধীন ভারতে কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম থাকবে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে সমস্ত জনগণেরই সম্পূর্ণ সমান অধিকার থাকবে। বর্তমানের মধ্যেই আমাদের বাঁচতে হবে। আমরা চাই আমাদের পুরনো সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তির উপরই একটি নতুন ও আধুনিক জাতি গড়ে তুলতে।

ঐতিহাসিক স্বীকৃতি

'The fight for India's freedom was now to take place outside India and the actions of one man were to have profound effect upon the future' [Michael Edwardes

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবার ভারতের বাইরে থেকে ঘটতে চলেছে এবং শুধুমাত্র একটি লোকের কার্যাবলীই দেশের ভবিষ্যতের উপর একান্ত ফলপ্রসূ ও সুগভীর প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে।

শপথ গ্রহণ

'ভগবানের নামে, ভারতবর্ষ এবং আমার আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর মুক্তির জন্য, আমি সুভাষচন্দ্র বসু এই পবিত্র শপথ

করছি যে, আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এই সংগ্রাম চালিয়ে যাব। ভারতের আটত্রিশ কোটি ভাইবোনের সেবায় আমি চিরকাল নিযুক্ত থাকব, এই হবে আমার জীবনের সবচাইতে বড় ব্রত। স্বাধীনতা লাভের পরেও সে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রয়োজন হলে আমার শেষ রক্তবিন্দু অবধি দিতে আমি প্রস্তুত থাকব।'

প্রতিশ্রুতি

'Give me blood, and I promise you freedom'.

'তুম হামকো খুন দেও, ময় তুমকো আজাদী দুঙ্গা'। 'আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'।

ডাক ওঠে যুদ্ধের

'ওই দূরে—বহু দূরে—নদীর ওপারে, পর্বত ও অরণ্য পেরিয়ে আমাদের চির-আকাঙ্খিত দেশ—ওখানকার মাটিতে আমাদের জন্ম—ওই দেশে আমরা এবার ফিরে যাব।

শোন, ভারতবর্ষ আমাদের ডাকছে—ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকছে—কোটি কোটি স্বদেশবাসী আমাদের ডাকছে—আত্মীয় ডাকছে আত্মীয়কে।

রক্তের ডাক এসেছে। ওঠো, সময় নষ্ট করোনা। অস্ত্র হাতে নাও। সামনে আমাদের পথ প্রদর্শকদের তৈরী পথ। ওই পথ ধরেই আমরা এগিয়ে যাব। শত্রু সৈন্যের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের রাস্তা করে নেব। অথবা ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, আমরা শহীদের মৃত্যুবরণ করব। যে পথে আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লী যাবে, মৃত্যুর পূর্বে সে পথকে আমরা চুম্বন করব। দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী।'

চলো দিল্লী

[আজাদ হিন্দ ফৌজের অপ্রতিহত বিজয় অভিযান]

৪ঠা	ফেব্রুয়ারী,	১৯৪৪ সাল···	আরাকান অঞ্চল ও তাউংবাজারদখল
৬ই	"	"	মিয়া মিয়াং
১লা	মার্চ	"	সেটাবিন
৫ই	"	"	কালাদিন
৮ই	"	"	ফোর্ট হোয়াইট
১২ই	"	"	লেনাকট
১৮ই	"	"	কেনেডি পিক
১৯শে	"	"	ভারতভূমিতে প্রবেশ
২০শে	"	"	তাউংজন
২১শে	"	"	উখরুল
২২শে	"	"	টিডিডম ও মোলন
২৫শে	"	"	সাংহাক
৩০শে	"	"	মোর্স
১লা	এপ্রিল	"	তামু ও কাবাউ
৫ই	"	"	হেঙটান ও কাঙরা টংগী
৮ই	"	"	কোহিমা
১৪ই	"	"	ময়রাং
২০শে	"	"	পেলেটোলা ও টেঙনও পাল

জুলাই মাসে তিনমাস অবরোধের পর অকালবর্ষণের দরুণ ইম্ফল থেকে প্রত্যাবর্তন।

আমি চির আশাবাদী

'I am a born optimist and I shall not admit defeat under any circumstances.'

আমি আজন্ম আশাবাদী। কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় মেনে নিতে রাজী নই।

ভারত স্বাধীন হবেই

'There is no power on earth that can keep India enslaved. India shall be free and before long'.

পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই, যা ভারতকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। ভারত স্বাধীন হবেই, অচিরেই হবে।

দেশবিভাগের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

'I have no doubt that if India is divided, she will be ruined. I vehemently oppose the Pakistan scheme for the vivisection of our motherland, our divine motherland shall not be cut up'.

আমার কোন সন্দেহ নেই যে, দেশ বিভক্ত হলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ করে পাকিস্তান পরিকল্পনার আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি কিছুতেই দ্বিখণ্ডিত করা চলবে না।

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু!

'গত ২৩শে আগস্ট বৃহস্পতিবার রয়টার লণ্ডন হইতে সংবাদ দেন—জাপানী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান অদ্য সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়—গত ১৬ই আগষ্ট সুভাষচন্দ্র বিমানে সিঙ্গাপুর হইতে টোকিও যাত্রা করেন এবং ১৮ই তারিখে তাইহোকু বিমানক্ষেত্রে তিনি যে বিমানের আরোহী ছিলেন তাহা দুর্ঘটনায় ভগ্ন হয়। তাঁহাকে হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়—নিশীথে তাঁহার জীবনাস্ত ঘটে। সঙ্গী লেফ্‌-টেন্যান্ট জেনারেল সুনামাশা সিদী ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং কর্ণেল হবিবুর রহমান ও ৪ জন জাপানী আহত হয়'। [আনন্দবাজার : ২৪-৮-৪৫]

পণ্ডিত জওহরলালের শোক প্রকাশ

সুভাষবাবুর মৃত্যু সংবাদ আমাকে মর্মাহত করিয়াছে, আবার স্বস্তিও দিয়াছে। তাঁহার ন্যায় সাহসী সৈনিকের ভাগ্যে অনেক সময় যে দুঃখ-দুর্দশা নিহিত থাকে, তিনি তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, ইহাই আমার স্বস্তি। অনেক বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত মতভেদ ছিল। তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া পৃথক ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করিয়াছিলেন কিন্তু আজীবন দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি যে সংগ্রাম করিয়াছেন, এ সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। [২৪শে আগষ্ট এলাহাবাদের জনসভায় পণ্ডিত জওহরলালের উক্তি]

গান্ধীজীর মন্তব্য

'I believe Subhas is still alive. He is biding time and will come out at the right moment'.

আমি বিশ্বাস করি সুভাষ বেঁচে আছে। সঠিক সময়েই সে বেরিয়ে আসবে।

* সংকলন— শৈলেশ দে।

'তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও
'আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো' এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে'।

—রবীন্দ্রনাথ

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

সমীক্ষা ও স্মৃতিচারণ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

'India wants the sacrifice of at least a thousand of her men—men, and not brutes'.

—Swami Vivekananda.

বিপ্লব ও নেতৃত্ব

শ্রীঅরবিন্দ

'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি।

—রবীন্দ্রনাথ

জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের নেতৃবৃন্দের অনেকেরই একটা রোষানুভূতি আছে। আমাদের প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়ে থাকে যে, আমরা কি সমস্ত শাসন অমান্য করতে উদ্যোগী হয়েছি, বা সকল শৃংখলা ভঙ্গ করে, সেই সব মানুষের স্বাভাবিক গৌরবের মূলোৎপাটন করতে উদ্যত হয়েছি, যাঁরা দীর্ঘদিন দেশের সেবায় নিযুক্ত আছেন?

এই প্রশ্নের আদৌ যদি আমরা জবাব দিই, তাহলে সেটা হবে বিষয়টির সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে, ব্যক্তিগত অসূয়া প্রণোদিত দেশজ মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে নয়।

রাজনৈতিক নেতার নেতৃত্বের অধিকার তাঁর অনুগামী জনগনের অনুভূতিকে অনুধাবণ করে তাকে ঠিকমত ব্যক্ত করবার ক্ষমতার উপরই নির্ভর করে। এই অধিকার কোন নেতার ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অবস্থান করে না। নেতা তাঁর পদমর্যাদায় থাকেন, যেহেতু তিনি জন-প্রতিনিধিত্ব করেন বলে, তিনি অমুক বা তমুক বলে নয়। তিনি অতীতে নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে আজীবন তাঁর কথাই বেদবাক্য বলে মান্য করার অর্থ রাজনৈতিক জীবনের মূল নীতিকেই উপেক্ষা করা।

অতীত অবদান তাকে অন্য নেতৃবৃন্দের তুলনায় অগ্রাধিকার দেবে ততদিনই, যতদিন তিনি সময়ের প্রবণতার সঙ্গে তাল রেখে জন-সাধারণের অনুভূতিকে বাঙ্‌ময় রূপ দিতে সমর্থ হবেন।

যে মুহূর্তে তিনি জনতার আকাঙ্খাকে আত্মীকরণ করবার পরিবর্তে নিজের ইচ্ছাকে জোর করে জনগণের উপর আরোপ করবার উদ্দেশ্যে তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন, সেই মুহূর্তে তিনি নেতৃত্বের অধিকার চ্যুত হয়ে যাবেন।

নেতা যখন সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে চলতে পিছিয়ে পড়বেন, তখন তাঁর একমাত্র পথ হওয়া উচিত সরে দাঁড়ানো। তার বদলে তিনি যদি দাবি করেন যে, যেহেতু তিনি নেতৃত্বে আছেন তার জন্য জগতের গতি স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করবে, তাহলে সেই চাহিদা হবে তেমনই, যার বিরুদ্ধে মানুষের বিবেক বা বিচারবুদ্ধি বিদ্রোহ করে।

মধ্যপন্থী নেতারা চান যে, ভারতবর্ষে যে প্রচণ্ড বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছে, সেটা তার মহান লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হবার পথ নির্দেশ নিতে তাঁদের অনুমতি নেবে। এঁরা যেন সেই সব ক্যানিয়ুটের দল, যাঁরা তাঁদের সভাপতির চেয়ার নিয়ে জাতীয়তাবাদের জোয়ারের স্রোতোধারার প্রান্তে বসে সেই উত্তালতরঙ্গমালার দিকে তাকিয়ে তাঁদের সিংহাসনকে মান্য করবার জন্য হুকুম করেন এবং ক্রুদ্ধ বীচিমালাকে সংহত হতে বলেন, যাতে তার জলকণা তাঁদের বসন সিক্ত না করে।

এ এক আজব এবং বৃথা দাবী। এই জোয়ার কোন মানবিক শক্তির সৃষ্টি নয়, কোন মানুষও এর সীমা নির্ধারণ করতে পারে না। তুচ্ছ যে সব মানুষকে ভাগ্য সাময়িকভাবে তাৎক্ষণিক গৌরবে ভাস্বর করেছে, তাদের নিরাপত্তার জন্য, তাদের অনুশাসনে এই ভয়ংকর বিপ্লব নিয়ন্ত্রিত হবে ভাবা যেন উচ্চতম এক গাছকে সম্মান করতে বজ্রকে অনুরোধ করা বা আমাদের নিরাপত্তার খাতিরে হিমবাহকে অবতরণের গতি পরিবর্তন করতে অনুরোধ করার সমান।

জাতীয়তাবাদী ব্যাপারটিই কোন মানুষের সৃষ্ট পদার্থ নয় এবং এটা কোন ব্যক্তি বিশেষকে খাতিরও করে না। এটা ঈশ্বর সৃষ্ট এক বেগবান শক্তি, যা ঈশ্বরেরই অনুজ্ঞা বহন করে এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ধাবিত হতে থাকে।

অন্ধ, অনমনীয়, অসর্তক এমন এক শক্তির সে আজ্ঞাবাহী, যাকে সে অমান্য করতে পারে না। এই প্রচণ্ড বেগের মুখে যা কিছু বাধা সৃষ্টি করে, সে ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান, যাই হোক না কেন, হয় তারা ভেসে চলে যায়, না হলে এর প্রচণ্ড ভারের নীচে ধূলার মতো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। প্রাচীন পবিত্রতা, চূড়ান্ত ক্ষমতা, অতীত জনপ্রিয়তা, কিছুই তখন যুক্তিগ্রাহ্য হয় না।

হিমবাহ তার অদম্য অনিচ্ছাকৃত অগ্রগতির পথে মানব জীবনকে ধ্বংস করে ধাবিত হতে থাকলে সেটা তার অপরাধ হয় না কিংবা হাজার বছর একই ভাবে দণ্ডায়মান এক বৃক্ষের ওপর জলন্ত হস্তক্ষেপের জন্য আকাশের বজ্রের বিরুদ্ধে নৈতিক কুটিলতার অভিযোগ করা যায় না।

কেবলমাত্র প্রাচীন নেতৃবৃন্দ নন, তরুণ নেতারাও যাঁরা এই জোয়ারের তরঙ্গ চূড়ায় ক্ষণকালের জন্য উৎক্ষিপ্ত হয়েছেন, তাঁদের সকলেই সমুচিত দণ্ড পাবেন, যদি তাঁরা মনে করে থাকেন, এই মহাসাগরকে তাঁরা শাসনে রাখবেন অথবা ব্যক্তিগত পছন্দ বা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পরিচালিত করবেন।

বর্তমান যুগ বিপ্লবের যুগ, যখন আজকের জৌলুস, খ্যাতি ম্লান হয়ে আসে, তখন তাকে দূরে নিক্ষেপ করা হয়। বড় বড় শহরে আজ যে মানুষের রথ টানা হচ্ছে, মালাবৃষ্টি হচ্ছে, হাজার কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি সহ,—আগামীকাল হয়ত তাকে সম্মানচ্যুত হতে হবে, তার আলোচনা হয়ত নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। এই রকম সব সময় হয়েছে,—এ নিয়তি অপ্রতিরোধ্য।

প্রাচীন নেতারা চিরকালের নেতৃত্বের আকাঙ্খা করেন। কারণ, তাদের পূর্বের অবদান আছে। এরা হয়তো কিছু আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছেন বা সুরচিত আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। যাঁরা দেশসেবার জন্য ব্যক্তিগত কষ্টভোগ করছেন বা আত্মত্যাগ করছেন, তারাও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবেন যে, তাদেরও একথা কল্পনা করা উচিত নয় যে, তাদের এ অবদান একমাত্র চরম আত্মত্যাগ।

আত্মত্যাগী মানুষ ঈশ্বর নির্দিষ্ট বিপ্লবের গতিতে শিশুর মতো আস্থাবান। এই সব লোক ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার দ্বারা চালিত নন এবং সেই জন্যই এরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূরণ করতে কখনোই প্রতিহত হন না, ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকারের বিনিময়েও।

বিপ্লবের গতিপথ অকল্পনীয় এবং নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, বহমান সাগর কিভাবে প্রবাহিত হবে কে তা বলতে পারে? সঞ্চারমান বায়ু বয়ে যায়, কোন মানুষের প্রজ্ঞা তাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে না। দৈব অভিপ্সার প্রজ্ঞা বিপ্লবের অন্তরাত্মা।

মানুষের তাকে বিচার করবার কোন ক্ষমতা নেই। মানুষ সেই প্রজ্ঞা-নির্বাচিত প্রতিভূ মাত্র। আমাদের নির্দ্ধারিত কাজ যখন শেষ হয়ে যায়, তখন এই বোধ আমাদের আনন্দিত করে যে, আমরা এই কাজ করতে অনুমতি পেয়েছিলাম। আমরা এক মহত্তম সেবাকাজে ব্যপৃত হতে পারি, যার জন্য আমাদের নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে সেই সব লোকেদের সঙ্গে, যারা তাদের কাজের দ্বারা, বক্তৃতার দ্বারা অথবা নীরব সেবার দ্বারা, আত্মনির্যাতনের দ্বারা মহান ও মুক্ত ভারত রচনায় ব্রতী ছিলেন। এবং তাই হবে আমাদের পুরস্কার।

পরন্তু এটাও কি পর্যাপ্ত নয় যে, অনুল্লেখিত হয়েও একমাত্র ঈশ্বরের দৃষ্টিপথে থেকে আমরা যদি আমাদের অন্তিম যাত্রায় চলে যাই, কেবলমাত্র এই সচেতনতা নিয়ে যে, আমরাও এই মহান রথকে অগ্রগতির পথে ঠেলে দিতে অদৃশ্যভাবে আমাদের হস্তকে ব্যপৃত রেখেছিলাম।

এই অবদানের কথা অতি নিম্নমানের কথা। আমরা কি মাতৃসেবা করি পুরস্কারের জন্য বা ঈশ্বরসেবা করি ভাড়াটিয়ার মতো? দেশপ্রেমিক দেশের জন্য বেঁচে থাকেন। কারণ, তাকে বাঁচতেই হবে, তিনি দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করেন। দেশের দাবী তাই এবং সেটাই হচ্ছে শেষ কথা।

---

*১৯০৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ। বাংলা অনুবাদ—শ্রীরবীন্দ্র রায়।

বিপ্লববাদ কেন হয় ?

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান'

—রবীন্দ্রনাথ

বাঙ্গলা দেশে বিপ্লববাদের বিভীষিকা দেখিয়া সরকার বে-আইন চালাইয়াছেন, দেশের কয়েকজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পুরিয়াছেন, আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে,—বিপ্লববাদ কেন হয় ? ইহার মূল কারণ তাহারা খুঁজিয়া দেখিয়াছেন কি ?

বাঙ্গলা দেশে বিপ্লববাদ আছে—একথা আমিও একেবারে অস্বীকার করিতে চাহিনা, কিন্তু কেন থাকে এই বিপ্লববাদ ?

এ কথার উত্তর আর কিছুই নয়, এ দেশের একদল যুবকের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে, দেশকে পরাধীনতার লৌহ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাহাদের প্র[illegible] অনন্য আকাঙ্খা দেখা দিয়াছে।

সরকার তাহাদের সেই আশা আকাঙ্খাকে পূর্ণ করিবার জন্য কোনদিন চেষ্টা করিয়াছেন কি ? ভাবিয়াছেন কি কোনদিন—কেন এ দেশে বিপ্লববাদ গজাইয়া ওঠে ?

সে প্রচেষ্টা তাহারা কোনদিন করেন নাই, অধিকন্তু তাহাদের আশা-আকাঙ্খাকে দমননীতির প্রয়োগে দমাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ দমননীতির ফলে বিপ্লব বিদূরিত হইতে পারে না, জাতির আশা-আকাঙ্খাকে উপেক্ষা করিয়া রুদ্রনীতির প্রবর্ত্তন করিলে তাহাতে বিপ্লবের বীজ সমূলে উৎপাটিত হইতে পারে না।

দেশবাসীর ভিতর আজ স্বাধীনতা লাভের জন্য যে উদগ্র আকাঙ্খা

জাগিয়া উঠিয়াছে—দমননীতির প্রয়োগে তাহা কোনদিন তিরোহিত হইবে না, পরন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। দেশের মুক্তি কামনা ও সাধনা যদি বিপ্লববাদ হয়, তবে সে বিপ্লববাদ প্রশমন করিতে হইলে দমননীতি নহে—চাই স্বাধীনতা, স্বরাজ—স্বায়ত্তশাসন।

*তুলিকলম প্রকাশক সংস্থার সৌজন্যে 'দেশবন্ধু সমগ্র' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

ভারতীয় বৈপ্লবিকের মনস্তত্ত্ব

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

*স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অগ্নিযুগের মুখপত্র যুগান্তর পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' ও 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক দলিল'। বর্তমানে পরলোকগত।

একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে ভারতবর্ষে বিপ্লববাদ অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এই বিপ্লববাদ রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনে পর্যবসিত হইয়াছিল। যখন বিপ্লব আরম্ভ হয়, তখন সকলেরই এই ধারণা ছিল যে, সহিংস পন্থা বিনা দেশের স্বাধীনতা আসিবে না। অতএব, আজকালকার কথায় ভারতীয় বিপ্লববাদ সহিংস ছিল। এই সংগ্রাম বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতেই ১৯৪১ সাল পর্যন্ত নানাস্থানে নানাভাবে প্রকট হয়। এই প্রচেষ্টার অবদান আজ সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার ফলে যে সব কর্মী আত্মাহুতি দিয়াছেন, তাহারা আজ চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বিপ্লববাদীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা নানা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কেন তাঁহারা আগুনে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের মনস্তত্ত্ব কি ছিল, এ বিষয়টি আজ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই। কেবল ব্যক্তিগত কার্যকলাপ লিখিলেই

বিপ্লববাদের ইতিহাস পূর্ণ হয় না। সেইজন্য যতটুকু জানি ও বুঝি ততটুকু এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা করি, যিনি যাহা বোঝেন তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

বর্তমান যুগে এক শতাব্দী ব্যাপী রুশ বিপ্লব প্রচেষ্টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিপ্লবীদের বিষয়ে পিটার ক্রোপোটকিন "The Psychology of an Exile" ("প্রবাসী বিপ্লবীর মনস্তত্ত্ব") নামক এক লেখা বহুদিন আগে বাহির করিয়াছিলেন। এই লেখাটি ইউরোপের বিপ্লবী মহলে বিশেষ পরিচিত। ইহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রবাসস্থিত বিপ্লবী মনে করেন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী তাঁহার যে মানসিক পরিবর্তন হইতেছে, দেশের অবস্থাও তদ্রূপ পরিবর্তিত হইতেছে। সে নিজের অহংজ্ঞানের দ্বারা দেশের কার্যকলাপ বিচার করে। এককথায়, সে মনে করে যে, তাহার মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অবস্থাও তদনুরূপ পরিবর্তিত হইতেছে। পুনঃ দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তাহার মনে আত্মবিভ্রম উপস্থিত হয়। ক্রোপোটকিনের এই পুস্তিকার প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া প্রবাসী বিপ্লবীদের মধ্যে অনেক হাসাহাসির উদ্ভব হইয়াছিল।

আর একটি পুস্তক লিখিয়াছেন এক turncoat ('রণছোড়') বৈপ্লবিক অধ্যাপক পিটিরিম সোরোকিন। ইনি পূর্বে এক বৈপ্লবিক ছিলেন কিন্তু বলশেভিকদের অভ্যুদয়ে তাঁহার সহিত বনিবনা না হওয়ায় আমেরিকা পলাইয়া যান। ইনি এক্ষণে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইনি একজন বড় দরের সমাজ বিজ্ঞানী। ইনি "Psychology of a Revolutionist" নামে এক বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বৈপ্লবিকের মনস্তত্ত্ব অতি কুৎসিতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, যত মাথাপাগলা, স্নায়ুবিকারগ্রস্ত লোক বৈপ্লবিক সাজে। ইহার মধ্যে বৈপ্লবিক উচ্চাদর্শের কোন সন্ধান তিনি পান না। এই পুস্তকের শেষে তিনি বলিয়াছেন যে রুশ বিপ্লবের পূর্বে "আমি মার্কসবাদী ছিলাম, আমি বৈপ্লবিক ছিলাম, আমি সোস্যালিষ্ট ছিলাম, কিন্তু আজ আর তাহা নাই"। আসল

কথা, বিপ্লব যখন সমুপস্থিত হইল, তখন তাহার ভীষণতা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। এই জন্য তিনি আজ পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার ঘোর শত্রু হইয়া আছেন। ঈশপের একটা গল্প আছে যে, এক বৃদ্ধ কেবল বলিত—"যম আমাকে নাও।" কিন্তু যম যখন আসিল তখন তাহাকে দেখিয়া ভয়ে বলিল—"তোমাকে দরকার নাই।" তদ্রূপ বিপ্লব যখন রাশিয়াতে আসিল, তখন অধ্যাপক সোরোকিন তাহার তীব্রতা সহ্য করিতে পারেন নাই। এইজন্য একজন বিপ্লববাদীর আদর্শের বিষয়ে উল্লেখ না করিয়া কেবল বিপ্লববাদের নামে কে অসামাজিক কাজ করিয়াছে তাহাই লক্ষ্য করিয়া বিপ্লববাদীকে একটা ব্যঙ্গ চিত্রে পরিণত করা অতি গর্হিত কর্ম। তিনি তাহার দেশের প্রায় ৮ লক্ষ ছেলেমেয়ের আত্মবলিদানের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। অন্য পক্ষে ক্রোপোটকিনের ধারণা অন্য।

ভগ্নী নিবেদিতা লেখককে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, ভগ্নী নিবেদিতা যখন ক্রোপোটকিনের অতিথি হইয়া নরওয়েতে কালযাপন করিতেছিলেন, তখন একদিন ক্রোপোটকিন তাঁহার পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে শিশুশিষ্যাদের ফোটোগ্রাফ দেখাইতে লাগিলেন। এই ছেলেমেয়েরা প্রায় সকলেই ১৫/১৬ বৎসরের। ইহাদের কেহবা ফাঁসী গিয়াছে, কেহবা নির্বাসিত হইয়াছে। একটি ঘটনা তিনি বলিলেন। ১৫/১৬ বৎসরের এক শিষ্যা ভাবে তন্ময় হইয়াছিল। এমন সময় ক্রোপোটকিন গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ঐ সম্মুখের গীর্জাটি দেখিতেছ? ইহা শোষণ ও অত্যাচারের একটি প্রতীক। এই বোমা নাও, উহাকে উড়াইয়া দাও।" বলিতেই মেয়েটি লাফাইয়া উঠিল। বলিল, "আমায় বোমা দিন আমি যাইতেছি।" তখন ক্রোপোটকিন বলিলেন—"না, তোমায় যাইতে হইবে না। আমি তোমায় পরীক্ষা করিতেছিলাম মাত্র।" মেয়েটি কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল, "একি পরীক্ষা করিবার জিনিষ! ঐ গীর্জাটি মানবশোষণের প্রতীক। উহাকে বিনষ্ট করা আমার কর্তব্য। ইহার জন্য আমায় পরীক্ষা কেন?"

জিজ্ঞাসা করি, এ মেয়েটির মনস্তত্ত্ব কি স্বার্থজড়িত ছিল? যখন ইটালীর শহীদদ্বয়—ব্যান্ডিয়েরা ভ্রাতৃদ্বয়—আত্মাহুতি দিয়াছেন, তখন তাহা কি স্বার্থ প্রণোদিত ছিল? আর আমাদের ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী হইতে যেসব তরুণ শহীদ হইয়াছে, তাঁহারাই বা কোন্ স্বার্থে আত্মদান করিয়াছেন? সোরোকিন হয় খাঁটি বৈপ্লবিক ছিলেন না, নয় সেই আদর্শ ধরিতে পারেন নাই। সেই জন্য বিদ্বেষপূর্ণ পুস্তক লিখিয়াছেন। আমরা সুদূর ভারত হইতে তাহার প্রতিবাদ জানাইতেছি।

এই মুখবন্ধ করিয়া আমাদের নিজেদের আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে। ভারত যথার্থভাবে স্বাধীনতা লাভই মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়াছে ও বুঝিয়াছে যে স্বাধীনতা ভিন্ন এই কোটিকোটি নরনারীর মুক্তির অন্য উপায় নাই এবং তজ্জন্য সে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত, সে কোন বিপদেই ভ্রূক্ষেপ করে নাই। তাহার আদর্শ জগতের এই কোটী কোটী নরনারীর মুক্তি ও উন্নতি সাধন। তাহার জন্য যে উপায় তাহার সম্মুখে অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিয়াছিল, সে তাহাকেই গ্রহণ করিয়াছিল।

তাহার আদর্শ প্রসূত মনস্তত্বই তাহাকে আগাইয়া দিয়াছে, আর্থিক বা শারীরিক কষ্টে সে ভ্রূক্ষেপ করে নাই। আদর্শ এবং তজ্জনিত কর্তব্য বোধই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিত। এই কষ্টের কথা বিশেষতঃ ১৯১০ হইতে ১৯১৫/১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার বৈপ্লবিকদের কষ্টের সাধনার কথা লোকসমাজ বিদিত নাই।

কয়েক বৎসর পূর্বে কোন একস্থলে লেখকের সহিত একটি বয়সী মহিলার পরিচয় হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কি করেছেন?" লেখক দম্ভভরে বলিলেন—"আমরা ইংরেজকে তাড়িয়েছি।" তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"আপনারাই করেছেন! আমরা কিছু করিনি? আপনারা যখন গাঁয়ে গাঁয়ে লুকিয়ে বেড়াতেন, তখন কে আপনাদের আশ্রয় ও আহার্য্য দিত?" এই বলিয়া তিনি নিজের জীবনের একটি রোমান্টিক অভিজ্ঞতার কথা বলিলেন। পুলিশ তাহাকে ঘরে চাবী দিয়া রাখিয়াছে, তথাচ তিনি কুলের মধ্য দিয়া

লিখিয়া পাঠাইতেন—অমুক স্থানে খাদ্য আছে, ইত্যাদি। বস্তুতঃ বাংলার মহিলারা দেশের স্বাধীনতার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। ভারতের স্ত্রী ও পুরুষ বৈপ্লবিকদের কর্ম, বিদেশের শ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিকদের কর্মের সহিত সমতুল।

এক্ষণ বৈপ্লবিকের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা যাউক। যাঁহারা হুজুগে পড়িয়া বা সখ করিয়া বিপ্লবী সাজিয়াছিলেন, তাহাদের কথা এখানে বিবেচিত হইতেছে না। কিন্তু যাহারা শেষ পর্যন্ত অটল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাহাদের কথাই এখানে ভাবা যাইতেছে। যিনি বৈপ্লবিক মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তজ্জন্য দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার বিচার শক্তি তাহাকে বলিয়াছে—অন্য রাস্তা নাই। একথা বলিতে শুনিয়াছি—"বড়মার (দেশমাতার) জন্য ছোটমা (গর্ভধারিণী) কে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। বাড়ীর অনুনয় বিনয়, বাধাবিঘ্ন তাঁহারা ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। আজ পর্যন্ত এদেশে আদর্শ, যাহা বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন—ছেলে আমার সুবোধ ছেলে হবে, অর্থোপার্জন করবে, ঘর সংসার করবে এবং সুখে থাকবে—এই আদর্শ আজ পর্যন্ত বলবৎ। কোনো মা-ই চান নাই, কোন অভিভাবকই চান নাই যে ছেলে পাগল হইয়া দেশ পাগলা হইবে। বিপ্লবীদের লোকে দেশপাগলা বলিত। খাবার সংস্থান নাই, পরণের উপযুক্ত কাপড় নাই, কিন্তু আদর্শানুযায়ী কাজ করিয়া যাইতেছে। আজ এখানে খাওয়া, কাল সেখানে শোওয়া ইত্যাদি। ইহার জন্য বড় শক্ত মনের দরকার। সংসারের চাপে কেহবা সংসারী হইয়াছেন, কেহবা পুলিশের তাড়নায় ঘরছাড়া হইয়াছেন। যাঁহারা সংসারী হইয়াছেন তাঁহাদের লেখক বরাবর বলিয়াছেন—"তোমাদের খরচের খাতায় লিখিলাম।" ভারতীয় সমাজ ইউরোপীয় সমাজের মত নয়। নিজের আদর্শানুযায়ী কর্ম ও সংসারধর্ম পালন করা এদেশে চলে না। এই জনাই ভারতীয় বৈপ্লবিকদের ভিতর এতবেশী অবিবাহিত।

এইস্থলে একটি ঘটনা বলিব। ১৯৩০ সালের আগে লেখক

অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট যান। লেখক কথা বলিবার পূর্বেই তিনি তাঁহার অভ্যাসমুযায়ী লেখকের বুকে একটা থাপড় মারিয়া বলিলেন—"অমুকে বিয়ে করলে কেন? আমি ১৯০৭ সাল থেকে সব খবরতো রাখি।" "উনি বিদেশে আছে, বিয়ে না করে করে কি?" তিনি কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহার কথার ভাবে বুঝিলাম, বৈপ্লবিক কর্মীর বিবাহে তাঁহার ঘোর আপত্তি। কথাটাও ঠিক। এদেশে দুটো কাজ একসঙ্গে চলে না। যাহার পিছনে হয় জেল, না হয় নির্বাসন, না হয় ফাঁসী কাঠের দড়ি ধাবমান হইতেছে, তাহার বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়া চলে না। বৈপ্লবিকের মনের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বাহিরের লোকের নিকট অজ্ঞাত।

বিপ্লববাদ একটি ধর্ম। ধর্ম অর্থে লোকে বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপ ও নানা আচার অনুষ্ঠানের সমষ্টি মনে করেন। কিন্তু বৈপ্লবিক সে ধরণের লোক নন। আদর্শ নিষ্ঠা ও তদনুযায়ী সাধন, ইহাই বৈপ্লবিকের জীবনের ধর্ম। অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের ন্যায় বিপ্লব কর্মক্ষেত্রে বৈপ্লবিক একজন fanatic—অর্থাৎ তাঁহার আদর্শ যে একমাত্র সত্য, ইহাই তাহার বিশ্বাস।

মোরোব্লিন বলিয়াছেন, বিপ্লববাদীদের অনেকের মাথায় গোলমাল আছে। কথাটা অস্বীকার করা যায় না। কেহ কেহ neurotic বলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। স্বাভাবিক মানুষের মত কাহারও কাহারও ছিলনা। যখন বিপ্লবী তাহার আদর্শ বিষয়ে fanatic, যখন সে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার বাহিরে অবস্থিত, তখন তাহাকে crackpot ছাড়া অন্য লোকে আর কি বলবে? কিন্তু এই দোষ পৃথিবীর বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়। ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক লম্ব্রোসো বলিয়াছেন—'Genius is a form of insanity.' তাহা হইলে অন্য কা কথা?

পূর্বেই বলিয়াছি, বৈপ্লবিক তরুণ বিপ্লববাদকে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাই তাহার সাধনা। সে জ্ঞানযোগী নয়, ভক্তিযোগী নয়, সে কর্মযোগী। গীতা বলিয়াছেন—'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'।

বৈপ্লবিকের যোগসাধনা হইতেছে কর্ম্মযোগে। বৈপ্লবিক দলের বিদেশী আমলের গানের মধ্যে একটি কলি আছে,—'কর্ম্মযোগে জাগি পুরুষের মত, পরসেবাব্রত কর উদ্‌যাপন।'

এই কর্ম্মযোগের সাধনায় যুক্ত থাকিয়া আমরা প্রথম যুগে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু প্রভৃতিকে পাইয়াছিলাম। এই কর্ম্মযোগীরা ভারতে এবং বিশেষতঃ ভীরুতাঅপবাদগ্রস্থ বাংলায়, একটি নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্লেষ কষাঘাত বাংলার তরুণেরা ভোলে নাই। ইহা দেখিয়াই মনে হয় কবি বলিয়াছিলেন 'লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া।' বাংলার কলঙ্ক অপনোদন, দেশকে স্বাধীন করার জন্যেই তরুণেরা বিদেশ পর্য্যন্ত দৌড়াইয়াছিল। দেশে যখনই ঘোর সাম্রাজ্যবাদীর অত্যাচারের ঝটিকা ও ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইতেছিল, তখনই তাহা ভেদ করিয়া তরুণের আত্মাহুতি প্রকাশ পাইয়াছিল। পুনঃ কবির কথায়—পিছনে ঝরিছে ঝরঝর জল, গুরু গুরু দেয়া ডাকে, মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।' এই অত্যাচারের অমানিশায় বহু বৈপ্লবিক তরুণই নিজেকে বলি দিয়া সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া মুহ্যমান দেশবাসীকে অভয় দান করিয়াছিল।

---

* বিপ্লবী বাংলা পত্রিকার সৌজন্যে মুদ্রিত

বাংলায় বিপ্লববাদ ও গীতা

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়

[বৈপ্লবিক সংস্থা বি ভি র কার্যকরী সংসদের অন্যতম প্রধান নেতা। দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন পেশোয়ার, বেরিলী, হিজলী ইত্যাদি জেলে। রাজরোষ বার বার কণ্ঠকে চেপে ধরেছে, তবু লেখনীকে স্তব্ধ করতে পারেনি কোনদিনও। অগ্নিযুগের মুখপত্র 'বেণু' সম্পাদক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ — চলার পথে (বাজেয়াপ্ত), মুখর বন্দী, সবার অলক্ষ্যে ও ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব, যা অগ্নিযুগের প্রামাণ্য ইতিহাস রূপে স্বীকৃত। বর্তমানে পরলোকগত]।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতীয় বৈপ্লবিক-যুগ দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে ব্যাপ্ত ছিল। তার কাল ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল। এই দীর্ঘদিন ব্যাপী বিপ্লবীদের জীবনে গীতার প্রভাব ছিল অনন্ত। বর্ণমালা না পড়ে যেমন ভাষার মন্দিরে ঢোকা যায় না—গীতা না পড়েও তেমনি বিপ্লবীর রাজ্যে সে যুগে প্রবেশ করা যেত না। বিপ্লব-দলে তখন বালক-বয়সে বা প্রথম-কৈশোরেই বিপ্লবীর প্রথম প্রবেশ ঘটত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের অজ্ঞাতে সেই বালক কোন প্রিয় সঙ্গীর টানে ধীরে ধীরে এসব দলে ঢুকে যেত। সেখানে শুনত সে নানা আলোচনা। সেসব থাকত সাধারণত ব্রহ্মচর্য পালন, দৈহিক শক্তি সঞ্চয়, দেশ ও জাতিকে ভালবাসা এবং মহৎ আদর্শের প্রতীক মহান ব্যক্তিদের জীবনী ইত্যাদি পাঠ সম্পর্কে। অন্তত চার-পাঁচ বৎসর জুড়ে থাকত এই শিক্ষার কাল। তৎপর শুরু হত সরাসরিভাবে বৈপ্লবিক শিক্ষার অনুশীলন। রাজনীতি-চর্চায় এবং দেশকে ব্রিটিশ-শাসন-মুক্ত করার আয়োজনে অংশ গ্রহণ করবার চেষ্টায় কৃতিত্ব দেখাবার সময় তার এখান থেকেই শুরু। কিন্তু ঐ যে প্রথম দিন হতে যে-বালক গীতাপাঠ শুরু করেছে, তাকেই প্রায় চার-পাঁচ বৎসরের শিক্ষালাভের পর বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতিতে ঢুকতে হত গীতা স্পর্শ করে শপথ নিয়ে। দেশের প্রতি এবং দলের প্রতি আনুগত্যের শপথ বিপ্লবীকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাখতে হত। 'গীতা' ছিল তাঁর জীবনের অন্তিম কাল পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী।

বালক-বিপ্লবীর কাছে যে গীতা ছিল একটি অবশ্য পঠনীয় পুস্তক মাত্র, সে-গীতাই তরুণ-বিপ্লবীর হাতে হয়ে উঠত একটি জ্বলন্ত তরবারি। অর্জুনের 'গাণ্ডীব' হয়ে গীতা বিপ্লবীর কাছে আসত। দুর্গম পথের যাত্রায় তাঁকে শক্তি দিত গীতার বাণী—বিশেষ করে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রত্যেকটি সূত্র, প্রত্যেকটি অক্ষর।

১৮৯৮ সাল। বিচার-প্রহসন সমাপ্ত হল। দামোদর চাপেকারের বিচার। দামোদরের বিরুদ্ধে হত্যাপরাধের চার্জ। র‍্যাণ্ডসাহেব পুণার প্লেগ-অফিসার। তাঁকে হত্যা করেছেন এই মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবী।

বিদ্রোহী দামোদর চাপেকারের মৃত্যুদণ্ড উচ্চারিত হল কোর্টে। সহাস্যে দামোদর বললেন : "এই মাত্র! আর কিছু নয়?"...

যথানির্দিষ্ট দিনে পুণা শহরে যারবেদা-জেলের ফাঁসির মঞ্চে দামোদর চাপেকার আরোহণ করলেন। হাতে তাঁর ভগবদ্‌গীতা। এই গীতাখানা বন্দীকে পাঠিয়েছিলেন লোকমান্য তিলক তাঁর অন্তরের আশীর্বাদ ভরে দিয়ে। জেলখানায় দামোদরের নিত্য সঙ্গী ছিল এ বইখানা।

ফাঁসিমঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর প্রশান্ত নয়নে। মৃত্যু আসছে তাঁর দিকে বন্ধুর বেশে, সহচরের আনুগত্যে।

কণ্ঠ রোধ করল ফাঁসির নির্মম রজ্জু। ঝুলে পড়ল মৃত্যুহীনের দেহ। কিন্তু হাত থেকে তখনো গীতাখানি খসে পড়ে নি!

এই ভাবে একটি নয়—একই মার বুক থেকে পর পর তিনটি ভাই ঝরে গেলেন। দামোদর, বালকৃষ্ণ, বাসুদেব—এই তিনটি ভাই। তাঁরা চাপেকার-পরিবারের তিনটি সন্তান। বিপ্লবের দলগত সম্পর্কেও তাঁরা তিনটি ভাই এবং সতীর্থ। তবে এ ক্ষেত্রে রক্ত থেকেও আদর্শের টান অধিক। সেই আদর্শ হল দেশজননীর মুক্তিকল্পে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দান। সেই আদর্শ অব্যাহত রাখার শক্তিমূল ঐ গীতার অক্ষরগুলোর মধ্যে।

একই গৃহ থেকে তেরটি মাসের ব্যবধানে পর পর তিনটি ভাই আত্মনিবেদন করে গেলেন ইংরেজের যূপকাষ্ঠে! তাঁদের জ্যোতির্ময় রূপ দেশের মানুষকে বিস্মিত করল। কিন্তু শুধু বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে থাকার ব্যক্তি যাঁরা নন, তাঁরা চাইলেন আবিষ্কার করতে—চাপেকার-ভ্রাতৃবৃন্দের শক্তি-উৎস কোথায়?

এই জিজ্ঞাসুদের অন্যতমা ছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা। মহান যোগী, মহান বিপ্লবী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা—রবীন্দ্রনাথের 'লোকমাতা' —ছুটে গেলেন শহর পুণায় শহিদত্রয়ের শক্তি-উৎস সন্ধানে। তাঁকে যে দেখতেই হবে শৌর্যবানদের গর্ভধারিণীর রূপ!...

চাপেকার গৃহে লোকমাতা প্রবেশ করতেই দেখলেন এক মহিয়সী

নারী পূজার আসনে উপবিষ্টা। গৃহদেবতার আরাধনায় সকল সত্তা তাঁর নিমগ্ন। পূজা অন্তে আলাপ হল দু'জনার। অনুভব করলেন নিবেদিতা যে, এই মহিলা বিরাজ করছেন এক অখণ্ড শান্তির রাজ্যে আপন শক্তিতে। তাঁর সর্ব শোক-তাপ, দুঃখ বেদনা 'নারায়ণে'র পায়ে নিবেদিত। তাঁর ভাল-মন্দ, ইহকাল-পরকাল বিশ্বনিয়ন্তার ধ্যানে সমর্পিত। নিবেদিতা স্পর্শ করলেন চাপেকার-ভাইদের শক্তি-উৎস এই মহিয়সী নারীর মধ্যে। ('ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব', পৃঃ ২৮)

যে সত্য নিবেদিতা সেদিন আবিষ্কার করেছিলেন চাপেকার-ভাইদের শক্তি-উৎস সম্পর্কে, সে-সত্য মোটামুটি স্থির হয়ে আছে প্রত্যেকটি শহীদ-জীবনেরই শক্তি-উৎস রূপে। মাতৃভক্তি সে-যুগের বিপ্লবীদের মধ্যে নির্ভেজাল ছিল বলেই দেশকে তাঁরা জননীরূপে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। সেই দেশজননীর অপমান অসহ্য হয়েছিল বলেই তাঁর দাসত্ব-শৃঙ্খল ভেঙে ফেলবার চেষ্টায় তাঁরা প্রাণ দিতেন।

এই প্রাণদানের শিক্ষা বড় সামান্য ছিল না। সেই শিক্ষালাভ বিপ্লবীর শুরু হয়েছিল প্রথম দিন থেকে। মন্ত্রের মত অনুপ্রাণিত করত তাঁকে :

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ২ ॥ ৩

হাজার বছরের অন্ধকার জাতির জীবনে ক্লীবত্ব এনেছে। এই ক্লীবত্বকে দূর করতে হবে। হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা, হৃদয়ের দৌর্বল্য পরিহার করে জাতির প্রতিটি অংশকে জাগ্রত হতে হবে, কর্মোদ্যোগী হতে হবে। গীতার এই বাণী প্রত্যেক বিপ্লবীর কাছেই বরণীয় ছিল। রক্তের অক্ষরে সেই বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প ছিল তাঁদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁদের কামনা ছিল :

আত্ম অবিশ্বাস তার নাশ কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান অশনিপাতে!

বিপ্লবের কর্মীকে এক একটি 'অর্জুন' হতে হবে—কুরুক্ষেত্রের

অর্জুন। গীতার বাণী মর্ম দিয়ে উপলব্ধি না করতে পারলে সেই অর্জুন বা 'সব্যসাচী' হওয়া যায় না।

বিপ্লবের কর্মী শুনলেন :

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ২ ॥ ১৬

অর্থাৎ শুনলেন তিনি পার্থসারথির কণ্ঠে—"প্রিয়বস্তুর 'প্রাপ্তিতে' হর্ষ অথবা 'অভাবে' বিষাদ, এই দু'টি বস্তুই ত্যাগ করতে হবে। অসৎ বস্তুর স্থায়িত্ব নেই। সৎ বস্তুর বিনাশ নেই। যাঁরা তত্ত্বদর্শী, তাঁরা সদসৎ উভয় বস্তুরই স্বরূপ উপলব্ধি করেন।" সুতরাং বিপ্লবী বুঝলেন যে, তাঁকে তত্ত্বদর্শী হতে হবে। বিপ্লব-পথের পথিক শুনলেন :

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ২ ॥ ১৮

পার্থকে বলছেন পার্থসারথি—"আত্মা যে-দেহে বাস করেন সেই দেহ নশ্বর। কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও নিত্য এবং স্বপ্রকাশিত। অতএব হে অর্জুন, যুদ্ধ কর।" সুতরাং বিপ্লবীকেও আত্মার অবিনাশিতা ও দেহের নশ্বরত্ব স্মরণ রেখে বীরের মত স্বধর্ম অর্থাৎ 'বিপ্লবীর ধর্ম' পালন করতে হবে।

বলছেন গীতার ভগবান :

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ২ ॥ ১৯

অথবা

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২ ॥ ২০

অন্তরের নিভৃতে এই বাণীকে স্পর্শ করতে চাইলেন বিপ্লবী। তিনি বুঝলেন—"আত্মা কাউকে হত্যা করেন না, তাঁকে কেউ নিধন করতেও

পারে না। কারণ আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। আত্মা সংরূপে নিত্য বিদ্যমান। ইনি শাশ্বত।" বিপ্লবী তাই মৃত্যুর ভয় করবেন কেন? তাঁর আত্মা তো মৃত্যুহীন।

বিপ্লবী বিশ্বাস করলেন গীতার বাণী:

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২॥ ২২

মহারাষ্ট্র পেরিয়ে বিপ্লব-বহ্নি এসে অভ্রলিহ শিখায় জ্বলে উঠল বাঙলা দেশে। ১৯০১ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত চলল প্রস্তুতিপর্ব। অরবিন্দ বিপ্লবের ঋষি। নিবেদিতা তাঁর সহায়দাত্রী। পি. মিত্র, সরলা দেবী, সতীশ বসু প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তি বাঙলার তরুণদের মধ্যে শরীরচর্চা ও দুঃসাহসিকতার শিক্ষাদান করে যাচ্ছেন। অরবিন্দ বিপ্লবী-দল সংগঠনে তৎপর। তাঁর অনুগামী হলেন বারীন ঘোষ, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, হেম কানুনগো, যতীন মুখার্জি এবং আরও কত তরুণবীর।

এই তরুণদলের সম্মুখে 'আনন্দমঠে'র সাংগঠনিক আদর্শ। কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি! 'সন্তান' দলের ত্যাগনিষ্ঠ কর্মযাত্রা তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে। আনন্দমঠের ঋষি-প্রবর্তিত আদর্শে দেশকে 'বিশ্বজননী'র ক্রোড়ে অবস্থিতা ভারতমাতার ধ্যানে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। সেই ভারতমাতা হলেন ত্রিংশ কোটি ভারতবাসীর সামগ্রিক রূপ—তার মধ্যে রয়েছেন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান-জৈন-শিখ-পার্সী সকলে; তার মধ্যে রয়েছেন ধনী-দরিদ্র, মজুর-কিষাণ, ছোট-বড় প্রত্যেকটি নর-নারী। এহেন যে ভারতবর্ষ—তার শৃঙ্খলমুক্তি জীবনের একমাত্র পণ। এই পণ সার্থক করবেন তাঁরা সর্বস্ব দিয়ে ভক্তির অর্ঘ্য। এক একটি বিপ্লবীকে তাই অর্জন করতে হবে সেই শক্তি, যা দুঃখসুখকে সমজ্ঞানে গ্রহণ করে নিঃশেষে আত্মদান করতে তাঁকে সাহায্য করবে। এই তপস্যা-লালনে সর্বোত্তম সহায়ক ও বন্ধুরূপে বিপ্লবী কর্মীরা গ্রহণ

করলেন গীতার বাণী। বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা সত্যি অবিনাশী আত্মার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছিলেন, যাঁরা যথার্থই নিত্যানিত্য বিবেচক হতে পেরেছিলেন—তাঁরাই ফাঁসি গেছেন অথবা নিঃশেষে আত্মত্যাগ করেছেন অবিমিশ্র আনন্দে। তাঁরা বুঝেছিলেন—জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র পরিধান্ করার মতই সবার আত্মা জীর্ণ দেহ পরিহার করে নূতন দেহ পরিগ্রহণ করেন। কাজেই সেসব বিপ্লবী ছিলেন বিগতভয়, অবিচল।

বিপ্লবীরা প্রত্যহ গীতা পাঠ করতেন, অন্তত বিপ্লবের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে। গীতা ছিল তৎকালে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান অস্ত্র। তাঁদের মধ্যে যাঁরা অনন্য—তাঁরা সত্যি সর্বসত্তা দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ঃ

> নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
> ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২ ॥ ২৩
> অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ
> নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
> অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে॥ ২ ॥ ২৫

তাঁরা জেনেছিলেন—"আত্মার অবয়ব নেই। সুতরাং অস্ত্র তাঁকে ছেদন করতে পারে না, অগ্নি তাঁকে দহন করতে পারে না, জল তাঁকে ভেজাতে পারে না, বায়ু তাঁকে শুকাতে পারে না। আত্মা অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। আত্মা নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য।"

এই সত্যকে নিত্য গীতাপাঠে শুধু নয়, নিত্যকার ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীরা আত্মস্থ করেছিলেন বলেই সম্মুখ-যুদ্ধে বাঙলার প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকি ১৯০৮ সালের মে মাসে শত্রুর জীবন নিতে যেমন শক্তিবিধৃত হয়ে উঠেছিলেন, নিজের জীবন দিতেও তেমনি ভয়মুক্তের বিভা বিকিরিত করতে পেরেছিলেন। আবার ঐ বছরই, ১১ই আগস্টের এক প্রভাতে, মজঃফরপুর জেলের ফাঁসিমঞ্চে জীবন দিলেন প্রফুল্ল চাকির সতীর্থ ক্ষুদিরাম বসু প্রশমিত চিত্তে, অপার

সৌন্দর্যে। শহীদ-তীর্থে ক্ষুদিরামের এই অভিযাত্রা সন্দর্শনেই সেই কালে 'দি এম্পায়ার' নামক কাগজে প্রকাশিত হল : "Khudiram Bose was executed this morning :…it is alleged that he mounted the scaffold with his body erect. He was cheerful and smiling" এই অপরূপ রূপটি কল্পনা করেই এক অখ্যাত কবি বঙ্খ্যাত এবং সর্বকণ্ঠে ঝঙ্কৃত সেই গানখানি রচনা করেছিলেন :

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।…
হাসি হাসি পরব ফাঁসি,
দেখবে জগৎবাসী…

গীতায় 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' বাক্যটি বিপ্লবীর একটি প্রতিজ্ঞা হয়ে গিয়েছিল। তাই দেখা যায় বিপ্লবীদের শাসনদণ্ড অচল থাকল না ১৯০৮ সালেও। মোকামা-ঘাটে পুলিশ সাব্‌ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জির অতিরিক্ত উৎসাহে প্রফুল্ল চাকি পুলিশ কর্তৃক ঘেরাও হয়ে নিজের আগ্নেয়াস্ত্রের বুলেটেই আত্মদান করলেন। বিপ্লবীরা, দুষ্কর্ম যে করল, তাকে ন্যায্য শাস্তি দেবেনই! প্রফুল্ল চাকির আত্মবিলয়নের পর মাস ছয় কেটে যেতেই ঢাকার গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি 'মুক্তি সঙ্ঘে'র (পরবর্তীকালের 'বি-ভি') কর্মনেতা শ্রীশচন্দ্র পালের হাতে প্রাণ দিতে হল নন্দলালকে কলকাতার সার্পেনটাইন লেনে, ৯ই নভেম্বরের (১৯০৮) এক সন্ধ্যায়। কেউ খুঁজে পেল না শ্রীশচন্দ্রকে। কেউ জানলনা যে তাঁর সাথী ছিলেন অপর একটি তরুণ, 'আত্মোন্নতি সমিতি'র রণেন গাঙ্গুলি।

১৯০৮ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন কানাই দত্ত, সত্যেন বসু, চারু বসু ও বীরেন দত্তগুপ্ত। তাঁরা প্রত্যেকে মৃত্যু জয় করেছিলেন বিপ্লবীদলে কাযভার পাবার মুহূর্তেই। তাঁদের প্রত্যেকের রক্ষাকবচ ছিল ঐ গীতার অক্ষয় বাণী। ঐ বাণীই মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁদের বিপ্লবগুরু শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে। এ সেই

অরবিন্দ—যাঁর 'বাসুদেব দর্শন' লাভ হয়েছিল ইংরেজের কারাগারে, আলিপুর বোমা-ষড়যন্ত্র-মামলার কালে।

স্থিতধী কানাইলাল দত্ত। তাঁর মধ্যে দেখা গেল বিস্ময়কর, প্রচণ্ড এক আত্মসমাহিত শক্তি। তাঁর ফাঁসির দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলের কথা উঠলে তিনি বলেছিলেন: **"There shall be no appeal."** ...আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই উক্তি শুনে বলেছিলেন: "কানাই শিখিয়ে গেল হে!...**'Shall'** আর **'Will'**-এর ব্যবহার করতে আর কেউ ভুল করবে না।" ('বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', পৃঃ ৩২৯)

আরো একটি ঘটনা। শিবনাথ শাস্ত্রীকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হিসেবে ব্রাহ্মধর্মী সত্যেন বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য জেলের কণ্ডেম্‌ড-সেলে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি তাঁকে শেষ আশীর্বাদ করেন। সাক্ষাৎকার অন্তে জেলের বাইরে চলে এলে শাস্ত্রীমহাশয়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কানাইকেও তিনি আশীর্বাদ করে এলেন কিনা। উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "সে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ! বহু তপস্যা করলে তবে যদি কেউ তাকে আশীর্বাদ করার যোগ্যতা লাভ করতে পারে।" ('বিঃ জীঃ স্মৃঃ', পৃঃ ৩১৯)

সত্যেন বসু। জয় করেছেন তিনি ভয়কে। তিনিও কানাই দত্তের মত গীতার বাণী হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন: "বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি"। অর্থাৎ—এই অব্যয় স্বরূপের বিনাশ কেহই করতে পারে না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার পূর্ব মুহূর্তে সত্যেনকে সেল্ থেকে নিয়ে এসেছিলেন যে শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট, তাঁর উক্তি: **"When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide awake. When I said, 'be ready', he answered, 'Well, I am quite ready', and smiled He walked steadily to the gallows. He mounted it bravely and bore it cheerfully."** ('শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশী যুগ', পৃঃ ৭৪৮) তাঁর সম্পর্কেই শ্বেত পুলিশ-সুপার বলেছিলেন জেল-গেটে অপেক্ষমান বিপ্লবীদেরই জনৈক বন্ধু ব্যক্তিকে: **"You can go**

now. The thing is over Satyendra died bravely." এ সব ঘটনার সময়কাল ১৯০৮ সাল ('শ্রীঃ অঃ বাঃ স্বঃ যুঃ', পৃঃ ৭৪৮)

এল ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি। আলিপুরের সরকারী উকিল আশু বিশ্বাসকে মৃত্যুদণ্ড দান করলেন চারু বসু। চারু বসু কি বলেছিলেন? দায়রা জজের কোর্টে বলছেন বন্দী কিশোর: No sessions trial, but hang me to-morrow. It was all pre-ordained that Ashu Babu shall be shot by me, and I shall be hanged. I killed him as he was an enemy of the country. ('Roll of Honour', p 206)

১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারি। হাইকোর্টের সিঁড়িতে পুলিশের কর্তা সামসুল আলম নিহত হলেন বীরেন দত্তগুপ্তের গুলিতে। এই এ্যাকশানের পাঁচ দিন পর (২৯শে জানুয়ারি) 'কর্মযোগিন্' কাগজে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: "Boldest of the many bold acts of violence. They (the revolutionaries) prefer public places and crowded buildings—Nasik-London-Calcutta,—Goswami in jail—These are remarkable features." ('শ্রীঃ অঃ বাঃ স্বঃ যুঃ', পৃঃ ৮১৬)

দুঃসাহসের এই বাণী কোথায় পেয়েছিলেন অরবিন্দ? কোথায় পেয়েছিলেন তাঁর বিপ্লবী-অনুগামীর দল এবং সর্বভারতের সকল বিপ্লবী? মৃত্যুহীন সত্তায়, ফলাফলের মোহ হতে মুক্ত থেকে, কর্তব্যপালনে আত্মনিবেদনের যে নিষ্ঠা—তার উৎস তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন কোথায়? অরবিন্দ থেকে সেই যুগের প্রত্যেকটি বিপ্লবীই এর উত্তরে 'গীতা'র নামোচ্চারণ করবেন। গীতার শ্লোকগুলো বিপ্লবীদের ছিল মর্মবাণী, রক্তের সম্পদ।

১৯০৮ সাল থেকে পর পর নাসিকের প্রেক্ষাগৃহে জ্যাকসন-হত্যা, লণ্ডনের সভাকক্ষে কার্জন উইলি নিধন, কলকাতার জেলের অভ্যন্তরে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে মৃত্যুদণ্ড দান করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের কার্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বললেন—'These are remarkable

features'; আর এসব কর্মীর সম্পর্কেই গীতার উক্তি—'বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।' বিপ্লবীদের কাছে তাই গীতা ধর্মগ্রন্থ ছিল না—ছিল মর্মগ্রন্থ, ছিল প্রতিদিবসের মননশীলতায় প্রাপ্ত অমূল্য আভরণ। রণসাজে সজ্জিত হবার বিশিষ্ট আভরণ।

এ-ও একটি জানা কথা যে, নিজে পড়বার সময় না করতে পারলে বিপ্লবী মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ অপরের কণ্ঠে গীতাপাঠ শুনতেন। তাই আমরা দেখি—তাঁর মাউজার-পিস্তল বাজাতে পেরেছিল 'পাঞ্চজন্যে'র রণ-ধ্বনি। ১৯১৫ সালের বালেশ্বর-যুদ্ধ তাঁর কাছে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেরই একটি সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়ে এসেছিল। তাঁরা পাঁচটি বীর তাই লড়তে পেরেছিলেন রাইফেলধারী দুর্ধর্ষ ইংরেজের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে। মৃত্যুকে বরণ করতে তাঁরা দ্বিধা করেন নি। কারণ তাঁরা জানতেন: 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'। তাঁরা জানতেন:

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ২ ॥ ৩২

অর্থাৎ, এ-যুদ্ধ মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ। ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়ের জন্যই এমন যুদ্ধলাভ সম্ভব। বিপ্লবীর বিশ্বাস, এমন প্রবুদ্ধ-ক্ষাত্রশক্তির উদ্দেশ্যেই হয়ত রবীন্দ্রনাথ আহ্বান জানিয়েছেন:

আকাশে ধ্বনিছে বারম্বার,
'মুখ তোলো,
আবরণ খোলো,—
হে বিজয়ী, হে নির্ভীক,
হে মহাপথিক,
তোমার চরণক্ষেপ পথে পথে দিকে দিকে
মুক্তির সংকেতচিহ্ন
যাক্ লিখে লিখে।'

গীতার প্রভাবে প্রবুদ্ধ অপর একটি বিপ্লবী-নায়কের কথা মনে পড়ে। দীর্ঘ তিরিশটি বছর সেই ব্যক্তি জেলে জেলে সকল দুঃখ ও

গ্লানি, জেলকোডের সবগুলো সাজা ভোগ করেছিলেন প্রশান্ত চিত্তে—মধুর হাসি হেসে। দেশ স্বাধীন হবার পরও সেই ব্যক্তির বেশ কিছুকাল কেটেছে পাকিস্তানের কারাকক্ষে। অশীতি বৎসর পেরিয়ে রোগজীর্ণ দেহে এইতো সেদিন এলেন ভারতখণ্ডে। মৃত্যু হল কর্মরত অবস্থায়ই তাঁর, রাজধানী দিল্লী শহরে সতীর্থদের স্নেহাশ্রয়ে। এই ব্যক্তির বিপ্লবী নাম 'মহারাজ'। পোষাকী-নাম ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। অদ্ভুত এক কর্মযোগী। কর্মযোগের মাধ্যমেই ঘটল তাঁর কর্মনিবৃত্তি। লাভ করলেন তিনি নির্বাণ। ১৯৭০ সালের ৯ই আগষ্ট সহস্র সহস্র মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল সেই নির্বাণ-প্রাপ্ত বিপ্লবী-নায়কের শবযাত্রা দিল্লীর পথে।

এই যে মহারাজ—তাঁর জীবনের সর্বোত্তম অবলম্বন ছিল 'গীতা'। গীতা ছিল তাঁর রক্ষাকবচ। তিনি গীতাভাষ্য রচনায় নিযুক্ত থাকতেন সেই আনন্দে, যে-আনন্দে মানুষ গুনগুনিয়ে গান গায়। তিনি লিখেছেন "১৯২৮ সালে জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর ১৯৩০ সালে পুনরায় ধৃত হইয়া আমি গীতার বাকি অধ্যায়গুলির ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা প্রকাশিত হয় নাই। ছাপাইবার টাকা আমার ছিল না।"* ('জেলে ত্রিশ বৎসর', পৃঃ ১৩১)

বিপ্লবী যুদ্ধ করেছেন—আঘাত হেনেছেন, আঘাত খেয়েছেন ফাঁসির মঞ্চে বা গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে বহু বিপ্লবী 'শহীদ' হয়েছেন। কিন্তু ১৯২৯ সালে দেখি নূতন এক পটভূমির বুকে নূতন এক দৃশ্য। এমন দৃশ্য ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনে পূর্বে কেউ দেখে নি ...

বাঙলার বিপ্লবী-তরুণ যতীন দাস। পাঞ্জাবের জেলে আমৃত্যু অনশনের প্রতিজ্ঞায় তিনি অচঞ্চল। সারা ভারতবর্ষ শঙ্কায় ও বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আদর্শনিমগ্ন তাপসের দিকে। এ-প্রসঙ্গে 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থে পাই : "ভারতের টেরেন্স ম্যাকসুইনি জেল-বন্দীদের প্রতি 'মানুষের ব্যবহার' দাবী করে তেষট্টি দিন নিরম্বু উপবাস করেন

* পরে ১৯৭০ সালে "গীতায় স্বরাজ" নামে বই আকারে প্রকাশিত হয় (লেখক)

লাহোর সেনট্রাল জেলে। এই অনশনে তাঁর মৃত্যু ঘটে। দেহত্যাগের তারিখ ১৩ই সেপ্টেম্বর। এ-মৃত্যু তো সাধারণ 'অনাহারে মৃত্যু' নয়। এ-যে চিরঞ্জীবী হওয়ার দুর্জয় তপস্যা। এ-তপস্যায় প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে জয় করেছেন তিনি তিলে তিলে জীবন দিয়ে। দান সম্পূর্ণ করে তিনি হলেন জীবিতেশ্বর।" ('সবার অলক্ষ্যে', ১ম পর্ব, পৃঃ ৩৪)

যতীন দাসের তিলে তিলে এই আত্মদানের উৎস কোথায়? উৎস ঐ আপ্ত বাণীর মধ্যে—"সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।" অর্থাৎ সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় তুল্যজ্ঞান করে এই যুদ্ধে তিনি উদ্যুক্ত হয়েছিলেন। কাজেই তাঁর কাছে অন্নগ্রহণ বা অন্নত্যাগের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। আদর্শের জন্য তিনি নিষ্কাম-চিত্তে এগিয়ে গেলেন। মৃত্যু এল। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত দেহ ত্যাগ করলেন তিনি। কিন্তু তাঁর আদর্শ মৃত্যুহীন হয়ে রইল।

ভারতীয় বিপ্লবের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগ কেটেছে ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯২০ সালের পরিসরে। প্রথম, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক ইংরেজ-রাজপুরুষদের দুঃসাহসিকতায় হত্যা করে, এবং ধরা পড়লে নির্ভয়ে ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করে দেশবাসীকে ভয়মুক্ত করার প্রোগ্রাম ছিল বিপ্লবীর। সেই যুগ অতিক্রম করলেন মহানায়ক যতীন মুখার্জি ১৯১৫ সালে, বুড়িবালামের তীরে, বালেশ্বর-যুদ্ধে। এ-যুগেরই অবদান ইন্দো-জর্মান ষড়যন্ত্র ও গদর-অভ্যুত্থান সশস্ত্র-বিপ্লব ঘটানর সংকল্পে। কিন্তু ব্যর্থ হল সকল চেষ্টা আপাত-দৃষ্টিতে। এখানেই শেষ হল দ্বিতীয় যুগ—বাধ্যতামূলক খণ্ড-যুদ্ধের যুগ। অতঃপর চার-পাঁচ বৎসর বিপ্লবী-কর্মীরা রইলেন কারার অন্তরালে। ১৯২০ সাল থেকে ('এ্যামনেস্টি' লাভের পর) শুরু হল আবার বিপ্লবের প্রস্তুতি—তৃতীয় যুগের অনুপ্রবেশ। এই তৃতীয় যুগে আমরা দেখি বিপ্লবীর কাছে গীতার মূল্য একটুও খর্ব না করে তার পাশে স্থান নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা। রবীন্দ্র-কাব্যে বিপ্লবী-কর্মীরা পেলেন গীতা-উপনিষদের ছড়িয়ে-থাকা বাণী। অতি সহজে ও নিটোল আনন্দে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ও রবীন্দ্র-কাব্যে আস্ত একখানি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সন্নিবেশিত দেখলেন তাঁরা তাঁদের মায়ের ভাষায়। এ-বস্তু মস্তিষ্ক দিয়ে হৃদয় স্পর্শ করে না, এ হৃদয় দিয়ে মাথায় ঢোকে। এ গীতা বড় আপন, বড় মধুর।...

এ প্রসঙ্গে শহীদ দীনেশ গুপ্তের সঙ্গে একটি কথোপকথন থেকে কিছুটা উল্লেখ করা যায়।

১৯২৭ সালের কথা। ৯৩-১-এফ্ বৈঠকখানা রোডের বাড়িতে (কলকাতা), 'বেণু'-মাসিকপত্রের আপিসে, 'বেণু'র তৎকালীন সম্পাদকের সঙ্গে দীনেশ গুপ্তের আলোচনা হচ্ছে। এখানে আলোচনার একাংশ 'ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব' নামক গ্রন্থ থেকে (পৃঃ ৩২৩) তুলে দিচ্ছি:

"প্রশ্ন করলাম: আচ্ছা দীনেশ, তুমি তো ভীষণ চঞ্চল ছেলে—কোন্ বস্তু পড়বার সময় তুমি শান্ত হয়ে যাও?

—কবিতা।

—গীতার শ্লোকগুলোও তো কবিতা। তবে একদিন বলেছিলে কেন যে, গীতা পড়বার সময় তোমার কষ্ট করে মন বসাতে হয়?

—গীতা পড়তে ভাল লাগে; কিন্তু দু'লাইন পড়লেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কথা মনে পড়ে, আর তখুনি ভাবতে বসি, কবে আমাদের যুদ্ধ শুরু হবে, কবে আমি সে-যুদ্ধের সৈনিক হব! বাস্, গীতাপাঠ খতম হয়ে যায়।

—কিন্তু কার কবিতা তুমি স্থির হয়ে পড়?

—রবীন্দ্রনাথের।

—কেন?

—রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেই আমি গীতার বাণী আমার মাতৃকণ্ঠে খুঁজে পাই।"...

দীনেশ গুপ্তের শেষোক্ত কথাটি সে-যুগের প্রত্যেকটি বাঙালী বিপ্লবীরই অন্তরের কথা।...

এখানে আরো একটি বক্তব্য আছে। বাঙলার বিপ্লবীদের কাছে বিপ্লবের তৃতীয় যুগে নজরুল ইসলামের প্রভাবও সামান্য ছিল না

নজরুল স্বভাব-ধর্মে ক্ষত্রিয়—মহা ক্ষত্রিয়। তাঁর কাব্য-গান যথার্থ ক্ষত্রিয়ের জয়যাত্রাকে প্রকটিত করেছে। দীনেশ গুপ্তই যখন আবেগদৃপ্ত স্বরে 'অগ্নিবীণা' খুলে আবৃত্তি করতেন :

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত,
আমি সেই দিন হব শান্ত।

তখন মনে হত, এই কিশোরই বুঝি কবি নজরুলের মানস-বিদ্রোহী। এই বিপ্লবী-কিশোরদের মধ্যেই বুঝি কবি আহ্বান করেছেন সেই যৌবন-দেবতাকে যাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত :

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪ ॥ ৮

অর্থাৎ 'সৎকে রক্ষার জন্য, অসৎকে বিনাশের জন্য এবং মানব ধর্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।'

আবার 'বিদ্রোহী'-কবিতা-পাঠে তন্ময় এই দীনেশচন্দ্রই যখন রবীন্দ্রনাথ থেকে আবৃত্তি করতেন :

তিমির রাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে ॥

তখনও মনে হত গীতার তত্ত্বকেই তিনি যেন রবীন্দ্রকাব্য-রসধারায় 'অমৃত' করে নিয়ে পান করছেন সর্ব সত্তা দিয়ে।

সত্ত্বগুণাভিমুখী-ক্ষাত্রশক্তির ধারক দীনেশচন্দ্রের মত প্রত্যেকটি শহীদই অবশ্য গ্রহণ করেছিলেন গীতার মন্ত্র :

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ২ ॥ ৩১

অর্থাৎ 'স্বধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখে তোমার ভীত, কম্পিত হওয়া

উচিত নয়। ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় আর কিছুই নেই।’ তাই তাঁদের কানে গীতা অনবদ্য আবেগে মাতৃকণ্ঠের ঘুমপাড়ানী ছন্দের মতো ধ্বনিত হত নজরুলের অগ্নিবীণায়, রবীন্দ্রনাথের স্বর্ণ-ঝলমল কাব্যস্রোতে। তাঁরা এঁদের গানে-কাব্যে এবং গীতার মন্ত্র-গুঞ্জনে ঘুমিয়ে পড়তেন, এসব শুনে জেগে উঠতেন। এই বাণী-সঙ্গমে গাহন করেই তাঁদের ‘যাত্রা’ হতো ‘শুরু’। বলতেন—‘ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার!’…

বিপ্লবের তৃতীয় যুগের প্রথম প্রকাশ ঘটল ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। ‘ইনসারেকশান’-এর যুগ একে বলা চলে। সূর্য সেনের নেতৃত্বে তাঁর বিপ্লবী-বাহিনী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে স্বাধীনতার জয়-পতাকা উড়িয়ে দিলেন চট্টলার আকাশতলে। স্বাধীন হয়ে গেল শহর চট্টগ্রাম স্বল্পকালের জন্য। পালিয়ে গেল ব্রিটনপুঙ্গবেরা স্ত্রী-কন্যা-পুত্র নিয়ে, শহর ছেড়ে, নদীনালায় সমুদ্রে। এই যে দুর্ধর্ষ অভিযান—এ-তো শুধুই কতিপয় মৃত্যুঞ্জয়ী যুবকের রণ-যাত্রা, বিপুল ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে! প্রচণ্ড আঘাত হেনে, অভূতপূর্ব আত্মদান করে সমগ্র ভারতবাসীকে জাগ্রত করবার এই চেষ্টার মূলে ছিল সেই শক্তি, যা মুষ্টিমেয় ঐ বিপ্লবী-যোদ্ধার দল আহরণ করেছিলেন গীতা থেকে। শহীদ হলেন নির্মল সেন, তারকেশ্বর, রামকৃষ্ণ এবং আরো কত তরুণ। দ্বাদশ-বীর যুদ্ধ করে শহীদ হলেন জালালাবাদ রণাঙ্গনে! প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, নেত্রীর দক্ষতায় পাহাড়তলী-এ্যাকশান পরিচালিত করার পর আত্মবিলয়ন ঘটালেন পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে কী অনায়াসে! সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন দীর্ঘ চার বৎসর কঠিন সংগ্রাম চালাবার পর বন্দী হয়ে প্রাণ দিলেন ফাঁসির মঞ্চে! এই যে ‘জীর্ণ বস্ত্রে’র মত অতি সহজে দেহকে পরিত্যাগ করে প্রশান্ত চিত্তে শহীদ-লোকে যাত্রা—এ সম্ভব হয়েছিল শুধু মনোবলে, গীতার মন্ত্র এঁদের ‘কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল’ বলে

১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাকা শহরে মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতালে যে তরুণ মিঃ লোম্যান ও মিঃ হডসনকে নিখুঁত-

ভাবে টার্গেট্ করেছিলেন—তাঁর মধ্যে আমরা কি পাই? পাই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ-শক্তি, অসীম স্থৈর্য, অপূর্ব আত্মপ্রত্যয় এবং অবিশ্বাস্য সহজতা। এসব গুণাবলী 'সমত্ব-বুদ্ধি লাভেরই লক্ষণ। বিনয় বসু সমত্ব-বুদ্ধির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন গীতার নির্দেশ :

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ২ ॥ ৪৮

তাই বিনয়বসু-জাতীয় শহীদদের মধ্যে দেখা যায় সেই শক্তি—যার আশ্রয়ে তাঁরা যোগস্থ হয়ে, ফলাসক্তি বর্জন করে, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান করে কর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

শহীদ দীনেশ গুপ্তের জেলখানা থেকে লিখিত পত্রাবলী এক অপূর্ব জাতীয়-সম্পদ। সেই পত্রগুলো যেন স্বচ্ছ মুকুর। তাদের বুকে ছায়া পড়েছে শুধু দীনেশচন্দ্রের অন্তরের নয়, শহীদগোষ্ঠির হৃদয়গুলোরই।

দীনেশ লিখেছেন : "মরণ আমাদের হয় না, হয় এই নশ্বর দেহের। কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। সেই আত্মাই আমি—আমার সেই আত্মাই ভগবান। মানুষের যখন সে-উপলব্ধি হয়, তখনই সে বলিতে পারে, আমিই 'সে'—আগুন আমাকে পুড়াইতে পারে না, জল আমাকে পচাইতে পারে না, বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না, আমি অজর, অমর, অব্যয়। গীতা বলিয়াছেন—শাস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না। এ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী।"

গীতার মর্মবাণী দীনেশের তপস্যালব্ধ অনুভূতি। তিনি আত্মাকে জেনেছেন, ভগবদ্-ধারণাকে স্পর্শ করেছেন। তাই যে-কর্মে নিযুক্ত, সে-কর্ম ভগবানেরই কাজ বলে তিনি বুঝেছিলেন। তাই মা'কে লিখলেন দীনেশ : "তিনি (ভগবান) যাকে বরণ করেন, মরণ-মালা তারই গলায় পরিয়ে দেন। সে মালা কি সহজ? 'এ-তো মালা নয়

গো, এ যে তোমার তরবারি' !"...তিনি আরো বললেন অতি সহজ সুরে : "যে খবর না-দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাহাকে পরম শত্রু মনে করিব ? ভুল, ভুল। 'মৃত্যু' মিত্র রূপেই আমার কাছে দেখা দিয়াছে।"

গীতার সূত্র এর চেয়ে গভীরতর করে পাণ্ডিত্যাভিমানী কোন বিদ্বজ্জনও কখনো কি উপলব্ধি করেছেন ?...

২২শে নভেম্বর, ১৯৩২ সাল। ডগ্‌লাস হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য কারাগার থেকে লিখেছেন তাঁর বড় বৌদিকে : "পুনর্জন্মে মৃত্যুর পর অন্য দেহ পরিগ্রহে বিশ্বাস তো আছে, এবং শ্রীগীতাতে আছে শ্রীকৃষ্ণের বাণী—'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'।" মৃত্যুতোরণ-উত্তীর্ণ-জীবন ডাক দিয়েছিল প্রদ্যোৎকে। গীতার বাণী অনায়াসে তাই শুনতে পেয়েছিলেন তিনি 'গীতাঞ্জলি'তে :

আকাশ হতে প্রভাত-আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাঙা কারার দ্বারে আমার
জয়ধ্বনি উঠল রে, এই উঠল রে।

১৯৩৪ সাল, ২রা অক্টোবর। রাজ-নিধন মামলায় ফাঁসির-দণ্ড প্রাপ্ত বন্দী রামকৃষ্ণ রায় লিখেছেন তাঁর মাতৃদেবীকে : "আপনার কোল হতে চিরবিদায় নিয়ে চললাম। 'গীতা'টি দিয়ে গেলাম।"...

রাজ-নিধন মামলারই অপর বন্দী ব্রজকিশোর চক্রবর্তী ১৯৩৪ সালের ২১শে অক্টোবর কারাকক্ষ থেকে লিখছেন তাঁর দাদাকে :

...তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে—জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে। জানি না কে, চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী...।

"পুনঃ, 'গীতা' পুস্তকটি আপনার করকমলে দিয়ে গেলাম।"

('ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব', পৃঃ ৯০)

কারারুদ্ধ প্রদ্যোৎ বা রামকৃষ্ণ-ব্রজদের মত আত্মসমাপত যুবকদল মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে-ভয়হীনতার দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত ছিলেন, তার উৎসমুখের ইতিহাস প্রদ্যোৎ-ব্রজদের ছোট্ট চিঠিগুলোয় ধরা পড়েছে।

পাহাড়তলী-অভিযান-নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার আত্মবিলয়নের পূর্বে তাঁর মা'র কাছে লিখেছিলেন: "আমি যে সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি—তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না?" সে পত্রের তারিখ—২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সাল।

আবার গভর্ণর স্যার জন এণ্ডার্সন সাহেবের দণ্ডদাতা ভবানী ভট্টাচার্য ফাঁসি যাবার পূর্বে, ১৯৩৫ সালের ৩০শে জানুয়ারী, চিঠির মাধ্যমে তাঁর ছোট্ট ভাইকে বলে গেলেন: "অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়—সাধক সেখানে সিদ্ধিলাভ করে।"...

এই যে সব অনুভূতি—যা থেকে প্রীতিলতা পেলেন 'সত্য'কে উপলব্ধি করে প্রাণদানের সংকল্প, অথবা ভবানী জানলেন ভয়হীন 'সাধকে'র স্তরে পৌঁছবার সঙ্কেত—এর পশ্চাতে ঐ একই শক্তি-উৎস। সে শক্তি-উৎস উৎসারিত হয়েছে 'গীতা' থেকে, গীতার বাণী-অভিষিক্ত রবীন্দ্রকাব্য থেকে।

এর-ও পরে, ১৯৪০ সালে, ঐ যে বিপ্লবী উধম সিং জালিয়ান ওয়ালাবাগ-হত্যা-লীলার নায়ক ও'ডায়ারকে নিধন করার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে শহর লণ্ডনের কারাগৃহে অবস্থান করার কালে বলেছিলেন: "I have seen people starving in India under British Imperialism. I am not sorry for protesting. It was my duty to do so just for the sake of my country. I do not mind what sentence —ten, twenty or fifty years, or be hanged"—এই অবিস্মরণীয় উক্তি কোন্ শক্তির বলে উচ্চারিত হয়েছিল? কোন্ শক্তির বলে তিনি নির্ভয়ে, স্মিত-হাস্যে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেছিলেন সেই দুঃসহ প্রভাতে, স্বদেশ থেকে বহু দূরে ঐ ব্রিটিশ-রাজধানীর নির্বান্ধব

পরিবেশে অবস্থান করে? তিনি গীতার সেই বাণী সম্বল করেই 'ব্রাহ্মীস্থিতি' লাভ করেননি কি?

> কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
> মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ২ ॥ ৪৭

তিনি নিশ্চয় জেনেছিলেন—"কর্তব্য কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনো তোমার অধিকার নেই। কর্মফল যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়, কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।"

কানাই-ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লচাকি-সত্যেনবসু-নলিনীবাগচি-প্রীতিলতা-ধীংড়া-আসফাকউল্লা-বসন্তবিশ্বাস-বিনয়-বাদল-দীনেশ-ব্রজকিশোর-অনাথপাঞ্জা-প্রদ্যোৎ-মৃগেন-যতীনদাস-মতিমল্লিক-ভবানী-উধমসিং-রামকৃষ্ণ-নির্মলসেন-দীনেশ মজুমদার-ভগৎ সিং প্রমুখ অসংখ্য শহীদদের প্রত্যেকে সেই যুগে একটি বাণীর মর্মকথা হৃদয় দিয়ে জেনেছিলেন:

> তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
> বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২ ॥ ৬১

তাই এই অগণিত মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবী সকল ইন্দ্রিয় সংযত করে চিত্ত সমাহিত করতে চেয়েছিলেন। ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত করেই ক্রমে তাঁরা 'সমাহিত-চিত্ত' হতে পেরেছিলেন। নিজেকে আত্মদান করে তাঁরা প্রমাণ করে গেছেন যে তাঁরা ছিলেন 'স্থিতপ্রজ্ঞ'।...

১৯৪০ সাল পেরিয়ে এল বিপ্লবের চতুর্থ যুগ। এ যুগের রূপায়ণ সংঘটিত হল বর্মার বুকে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূখণ্ডে নেতাজীর অকল্পনীয় বৈপ্লবিক নেতৃত্বে।

এই যে বিরাট পুরুষ, এই যে বিশ্ববিশ্রুত আপোষহীন সংগ্রামী নায়ক, এই যে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র—এঁর সমগ্র জীবন জুড়ে ব্যাপ্ত ঐ গীতার নিগূঢ় প্রভাব। গীতার বাণী কোন্ ভাবে সম্বল করেই দুর্গম পথে 'বিশ্বপথিকে'র বেশে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন। তিনি সার্থক হয়েছিলেন—কারণ, তিনি শুনেছিলেন তাঁর অন্তরতমের কণ্ঠে:

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ১৮ ॥ ৬৬

এজন্য সুভাষচন্দ্র সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র তাঁর অন্তরতমেরই শরণ নিতে পেরেছিলেন। সে অন্তরতমের নির্দেশ ছিল ভারতবর্ষের শতকরা ৯৯ জনের রাজনীতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক মুক্তি আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করা। এ নির্দেশ পালনে তাঁর ফাঁক ছিল না, ফাঁকি ছিল না। এই মহোত্তম কর্ম-যোগী তাই হলেন সর্ববিধ কল্মষ থেকে মুক্ত। তিনি সাফল্যে বীতরাগ, অসাফল্যে বীতশোক। তাই তিনি 'নেতাজী'। অদ্বিতীয় কর্ম-পুরুষ নেতাজী।…

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপী সশস্ত্র-বিপ্লবের ধারকদের শক্তি-উৎস কোথায় জানতে হলে তাঁদের উপর কোন্ বস্তুর প্রভাব কতখানি ছিল তা' জানতে হবে। তা' জানবার চেষ্টা করতে গিয়েই দেখা যায়, গীতার বাণী তাঁদের পথ চলায় অশেষ সামর্থ্য যুগিয়েছে। আরো দেখা যায়—গীতার বাণী রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-গানে নব কলেবর ধারণ করে, নূতনতর প্রেরণায়, বিশেষ করে বাঙলার বিপ্লবীদের, প্রচুর শক্তিমান করে তুলেছে।

তাঁদের কাছে গীতার শাশ্বত আহ্বান :

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২ ॥ ৩৭

তাঁদের কানে রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী কণ্ঠ :

বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিন্ধুর

যত ক্ষোভ, যত শঙ্কা

দাসত্বের জয়ডঙ্কা,

দূর, দূর, দূর ॥…

* অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতির সৌজন্যে সাহিত্যিক সত্যেন চৌধুরীর কাছে রক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপি থেকে ধন্যবাদ সহকারে সংগৃহীত।

পটভূমিকা

চিত্তপ্রিয় মিত্র

বৈপ্লবিক সংস্থা শ্রী সংঘের সদস্য। বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত রেজিষ্টার ও সুপরিচিত প্রবন্ধকার

ইংরেজরা বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বাঙ্গালীদের ভীরু বা টিমিড ও ক্ষাত্রধর্মবিহীন বা ননমিলিটেন্ট জাতি বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের লেখা ইতিহাসে এ ধরণের মতবাদ প্রসঙ্গত নানাস্থানে উল্লেখ আছে। পলাশীর পর তাঁদের দ্বারা তৈরী বেঙ্গল আর্মিতে শতকরা আশীভাগ সৈন্য অযোধ্যা ও তৎসংলগ্ন স্থানের ব্রাহ্মণ শ্রেণী হতে নিয়োগ করেছিলেন। বিশভাগ ছিল মুসলীম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত। কোম্পানীর "বেঙ্গল আর্মিতে" বাঙ্গালীদের স্থান ছিল না। বাঙ্গালীদের সৈন্যবিভাগে নিয়োগ করতে তাঁরা চিরদিন উদাসীন ছিলেন।

কি কারণে ইংরেজদের বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে এ ধরণের মনোভাব ছিল তা জানবার জন্যে সিপাহী বিদ্রোহের সমসাময়িক কালীন লিখিত বেশ কিছু বই পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দুই-এক জায়গায় মন্তব্য করা হয়েছে, বাঙ্গালীরা কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ। যুদ্ধকালীন প্রয়োজনবোধে ট্রেঞ্চ কাটতে হলে বাঙ্গালী সৈন্যরা অবহেলা প্রকাশ করতেন। তাঁরা মিলিটারী নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন না।

বাঙ্গালীরা ভীরু জাত হলে কি করে তাঁরা সেরা বিপ্লবী হয়েছিলেন, এ প্রশ্ন রয়ে যায়। স্বাধীনতার পর জল, স্থল ও বিমান বাহিনীতে কি করে বাঙ্গালী অফিসাররা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন সে প্রশ্নও থেকে যায়। বাঙ্গালীদের সৈন্যবিভাগে নিয়োগ না করার

প্রকৃত কারণ ইংরেজরা গোপন করে গেছেন। তাঁরা অন্যান্য জাতির মতো বিদেশী শাসকের অধীনে ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে যোগদানে বিরত ছিলেন। বিদ্রোহী ভাবাপন্ন বাঙ্গালীরা বিদেশী রাজ্যবিস্তারে শরীক হতে উৎসাহী ছিলেন না।

মহারাজা নন্দকুমার সিরাজের অধীনে হুগলীর ফৌজদার বা মিলিটারী গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইংরেজরা চেয়েছিলেন, তাঁকে তাবেদার শ্রেণীভুক্ত করে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে তাঁর সাহায্য নেবেন। নন্দকুমার বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি ছিলেন। তাই ইংরেজদের অত্যাচারে তিনি বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে উঠেন। তাঁতীদের যখন আঙ্গুল কাটা হয়েছিল, তখন তিনি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ও অভিযোগ এনেছিলেন। উক্ত বিবরণ গণেশ দেউস্কর লিখিত "দেশের কথা" পুস্তকে লেখা আছে। ইংরেজদের গোপন নথিপত্রে নন্দকুমার প্রথম নম্বর শত্রুরূপে বিবেচিত হয়েছিলেন। তাঁকে প্রকাশ্যে ফাঁসী দিয়ে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বাঙ্গালী জাতিকে চিরদিনের জন্য ভীত, সন্ত্রস্ত রাখতে চেয়েছিলেন। তারও আগে "কাশ্মীরি বাই পিরী বাঙ্গালী জঞ্জালী", "হিক্‌মতে চীন হুজ্জতে বাঙ্গাল" প্রভৃতি জনপ্রবাদ মোগল আমলে প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ কাশ্মীরীরা রুচিবিহীন ও চীনদেশীয় লোকেরা কর্মপটু, বাঙ্গালীরা গণ্ডগোলপ্রিয়।

অথচ জাহাঙ্গীরের সময় জনার্দন কর্মকার দ্বারা তৈরী কামান মুর্শিদাবাদে এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে। তার নাম—"জাহান কোষা"বা বিশ্বধ্বংসী। গিড়িয়ার যুদ্ধে গোলা বারুদ কারখানার অধিকর্তা ছিলেন শ্যামসুন্দর নামে একজন বাঙ্গালী। বারুদ তৈরীর প্রধান উপকরণ সল্ট পীটার বা সোরা জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ বঙ্গদেশে প্রচুর তৈরী হতো। মোগলদের বিরুদ্ধে পাঠানরা বঙ্গের নানাস্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।

ঐসব কারণে অন্যের বশ্যতা স্বীকার করা বাঙ্গালীদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সিপাহী বিদ্রোহকে দমন করতে বাঙ্গালীদের সৈন্যবিভাগে নিয়োগ করতে ইংরেজরা সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা তাতে

মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার শুধুমাত্র বাঙ্গালী ভদ্রলোক শ্রেণীর যুবকদের নিয়ে একটি বাঙ্গালী ব্যাটেলিয়ান তৈরী করেন। তারা মেসোপোটামিয়ার যুদ্ধে বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে বাঙ্গালা ব্যাটেলিয়ান ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং নেতৃস্থানীয় বিদ্রোহীদের ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী অবলম্বনে "বিদ্রোহী বাঙ্গালী" পুস্তক লেখা হয়েছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট "দেশের কথা" ও "বিদ্রোহী বাঙ্গালী" উভয় পুস্তক বাজেয়াপ্ত ও প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। সিপাহী বিদ্রোহের প্রারম্ভে বহরমপুরে যিনি বিদ্রোহীদের মুখপাত্র ছিলেন, তিনি ছিলেন একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সন্তান।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে আনন্দমঠ ও অন্যান্য বহু বিদ্রোহী ভাবাপন্ন পুস্তক রচিত হয়েছিল। গ্যারিবল্ডি ও ম্যাটসিনি প্রভৃতির জীবনী বাঙ্গলা ভাষায় লেখা হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পুস্তক ও রচনাবলী সম্বন্ধে বাঙ্গালীরা অবহিত ছিলেন। পিয়েনের "রাইট্স অব্ ম্যান" বহুল প্রচারিত ছিল। ঐসব পুস্তক বাঙ্গলার বিপ্লবীদের প্রভাবিত করেছে। বিপ্লবী যুগের প্রথম দিকে গীতার বাণী ও কালীর ভাবমূর্তি বিদ্রোহী বাঙ্গালীদের মূলমন্ত্র ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, দেবী চৌধুরাণী ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা, উত্তরবঙ্গে প্রথম কৃষক বিদ্রোহের ভূমিকা, আন্দামানে গভর্নর জেনারেল ও কলিকাতায় নরম্যানকে হত্যার কাহিনী, বাঙ্গালী কৃষক শ্রেণীভুক্ত কতিপয় মুসলমান যুবকের বৃটিশের বিরুদ্ধে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রাণ বিসর্জন, বারাসতে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ও বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাহিনী, ওয়াহিবিয়াদের বৃটিশ বিরোধী মনোভাব, উপরি উক্ত ঘটনাগুলি বিপ্লবের ইতিহাসের সামিল হতে পারে কিনা বিচারের প্রয়োজন আছে। ঐ সকল ঘটনাবলীর সময় বাঙ্গালী ভদ্রলোক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সমাজ বিপ্লব সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিল।

পরিশেষে আদিবাসী সাওতাল, কোল ও গনড্ প্রভৃতি জাতির

বিদ্রোহের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। বিপ্লবী সাভারকার তাঁর "ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্টস্" পুস্তকে শঙ্কর শাহ্‌র কথা উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতা প্রিয় বিদ্রোহী শঙ্কর সাহ্‌ সিপাহী বিদ্রোহের সমকালীন ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর নিকট প্রাপ্ত একটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পরিবেশন করে এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করলাম।

"O great Kali, cut up the back slanderers ;
Trample under your feet the wicked,
Grind down the enemies, the British to the dust.
Kill them that none remain.
Destroy their women, servants and children,
Protect Sankar Sahae
Preserve thy desciple O'Kali,
Listen to the call of the humble
Devour them quickly O'Kali."

অগ্নিযুগের পরিচয়

নলিনীকিশোর গুহ

[বৈপ্লবিক সংস্থা 'অনুশীলন সমিতি'র অন্যতম নেতা। মহানায়ক রাসবিহারী বসুর সহকর্মী। বিখ্যাত গ্রন্থ—'বাংলায় বিপ্লববাদ'। বর্তমানে পরলোকগত]

বাংলার অগ্নিযুগের কথা আপনারা দেশবাসীকে শোনাতে চান, হয়তো সেকথা শোনা ও শোনানো ভাল মনে করেন। বাংলার অগ্নিযুগকে জানতে হলে বাংলার স্বদেশী যুগ, বাংলার বিপ্লব যুগকেই

বুঝতে হবে। দেশপ্রাণতার, ত্যাগ-তপস্যার অগ্নিশুদ্ধ যুগকেই অগ্নি-যুগ বলে আমরা জানি।

বঙ্গ-বিপ্লব-যুগের যুগন্ধরগণের অনেককে দেখেছি, জানিও অনেককে, অনেকের চরিত্র, চরিত্রের মহিমা এই বুড়ো বয়সেও স্পষ্ট মনে আছে। এমনি করে তারা আমাদের অন্তরে চিরদিনের জন্যে বেঁচে আছেন এবং থাকবেন। সেই বিপ্লবী চরিত্রের বনিয়াদটি কি?

এখানে সংক্ষেপে বলে রাখি, এবং স্মরণ রাখতে বলি, বিপ্লব আর বিদ্রোহ এক বস্তু নয়। বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ বুঝতে হলে—বিদ্রোহ ও বিপ্লব এই দুইয়ের পার্থক্য মনে রাখতে হবে। বিপ্লবীনায়ক শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পত্নী মৃণালিনীকে এক পত্রে লিখেছিলেন—'দেশকে মা বলে জানি। যদি দেখি মায়ের বুকে একটা রাক্ষস চেপে বসে মায়ের কণ্ঠ নিপীড়ন করিতেছে, তখন স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার করতে বসব, না, যে করে হোক ঐ অসুরকে মায়ের বুক হতে টেনে সরিয়ে ফেলে দেব?'

এই যে, যে করে হোক, আগে টেনে ফেলে দেবার সঙ্কল্প, ইহাই বিদ্রোহ। বিদ্রোহের প্রয়োজন থাকলেও তার লক্ষ্য ও প্রয়োজন সীমিত ও সাময়িক। কিন্তু বিপ্লব তা নয়। বিপ্লবীর আদর্শ রূপায়নে, রাষ্ট্রীক বশ্যতা দূর করা একান্ত প্রয়োজন, মানবিকতার মহত্তর চেতনা ও আদর্শের জন্যই কোটি কোটি স্বদেশবাসীর বন্ধন-মুক্তির প্রয়োজন একান্ত।

কিন্তু আদর্শ বিপ্লবীর কর্মকাণ্ডের সেইখানেই ইতি হয় না, তার বৈপ্লবিক আদর্শের রূপায়ণের আকুতি থাকে অনির্বাণ। জাতির রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটানো বিপ্লবীর আদর্শ বলেই তার সাধনা দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য।

বাংলার স্বাদেশীকতা ও জাতীয়তা সম্পর্কে বিপ্লবী নায়ক শ্রীঅরবিন্দ বলেন: আমাদের জাতীয়তাবাদও একটা ধর্ম, যা আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করেছি। জাতীয়তা সম্পর্কেই বিপ্লবী নায়ক শ্রীঅরবিন্দ বলেন: 'যখন সত্যই ভগবৎ-বাণী নামিয়া আসিল—

বাঙালী তখন সেই বাণী গ্রহণের জন্য প্রস্তুতই ছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি (সকলের নাম নাই করিলাম) চিন্তানায়ক মনীষী কবি ও সাহিত্যিকগণ অজস্রদানে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াই রাখিয়াছিলেন, মুহূর্তে বাঙালী সেই বাণী গ্রহণ করিল। গোটা জাতি মুহূর্তে জাগিয়া উঠিল, মোহনিদ্রা মুহূর্তে টুটিয়া গেল।...'

বাংলার বিপ্লববাদের মূলে ছিল একটা আস্তিক্য বুদ্ধি, ভগবদ্বিশ্বাস। তাই দেশ-সেবাই ছিল ভগবৎ-সেবা। মনুষ্য-জীবনের প্রধান লক্ষ্য দেশের সেবা, মানুষের সেবা, আর এর মাধ্যমেই ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণতা, চরিতার্থতা, এই প্রত্যয়ে-জ্ঞানে অভীষ্ট লাভের জন্য বিপ্লবীরা সর্বত্যাগের মহামন্ত্রের দীক্ষা নিয়েছিলেন।

বাংলার বিপ্লবীরা দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে ভগবৎ সেবার অঙ্গ রূপে মেনে নিয়েছিলেন বলেই তাঁদের সেই মহান অভিযান সাময়িক ও সীমিত উত্তেজনার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি। বিপ্লবী নেতারা সেদিনের কর্মীদের চরিত্র সেইভাবেই গঠন করতেন।

এস্থলে এই শিক্ষাদান সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। বিপ্লবী নেতা তাঁর দীর্ঘ ৬০ বছরের জীবন দর্শন প্রসঙ্গে বলেছেন, 'নিজের জীবনে এমন কিছুই দেখি না, যা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করতে পারি। বিপ্লব ও বিপ্লবী জীবন গঠনের ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নিজের বলে স্মরণ করতে পারি না। কিশোর কালেই প্রশ্ন মনে জাগত, জাগানো হত, জীবনের লক্ষ্য কি, সার্থকতা কি? সে তো সুখভোগ আহার-বিহার নয়।

আমাদের চিন্তাধারা এমনই এক মহৎ-পর্যায়ে উন্নীত করার কৃতিত্ব ছিল বিপ্লবী পথিকৃৎদের। চরিত্র-গঠন, সদাচরণ, ধর্ম-বিশ্বাস, ভগবৎ-বিশ্বাস—এসবই মনে হত মনুষ্য জীবনের ভিত্তি। এই ছিল বিপ্লবী জীবনের প্রকৃত বনিয়াদ।

এই একই নৈতিক মূল্যবোধ থেকে গড়ে উঠত বিপ্লবী চরিত্র। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলতে হত;

বোমা-পিস্তল, সন্ত্রাসমূলক কর্ম, ব্রিটিশ বিতাড়নের কথা আসত অনেক পরে। বহু বৎসর বিপ্লব-সমিতির একান্ত বিশ্বাসী, দায়িত্বশীল সদস্য থেকে কখনো বোমা-পিস্তল দেখেননি, হাতে ধরা তো দূরের কথা, এমন অনেকে ছিলেন। ত্যাগ-নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার ফলে মনপ্রাণ দিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবিসর্জন, কারাগারে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয়, ফাঁসীতে ও গুলীবিদ্ধ হয়ে আত্মদান করে এবং আত্মবিলুপ্তিতে জীবনের পরিপূর্ণতা, সার্থকতা খুঁজে পেতেন। সব চেয়ে বড় কথাই এই যে, পরিচালকরাই হতেন এই বিপ্লবী চরিত্রের আদর্শ-স্বরূপ।

বিদ্রোহ আর বিপ্লব দুইয়ের পার্থক্যের উল্লেখ করেছি। বিপ্লববাদ তথা বিপ্লব-আদর্শ এবং দর্শন বাংলার মৃত্তিকায় সৃষ্ট পুষ্ট ও পরিণত হয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে (অরবিন্দের উক্তি: 'বাঙালী মুক্তিপথ চিনিল এবং সমগ্র ভারতকে ঐ পথের সন্ধান দিল', ইত্যাদি)।

এই সত্যটি উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ বাংলার বিপ্লব চেতনার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে সব বিপ্লব-প্রয়াস চলেছিল, তার মৌলিক প্রভেদ এইখানে। সেই সব বিপ্লব-প্রচেষ্টা আতসবাজীর মত সাময়িক ঝলক তুলে চিরদিনের মত মিলিয়ে গেল কেন? আর বাংলার বিপ্লবাভিযান দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে, রাসবিহারী বসু থেকে শুরু করে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের 'দিল্লী চল' অভিযান পর্যন্ত কেনই বা স্থায়ী হল? বাংলার বিপ্লব ভাবনার আদর্শগত বৈশিষ্ট্যই তার উত্তর।

১৯০৫ সালে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করলাম:

'চরিত্রটি নির্মল পবিত্র রাখিব—নেতার আদেশ-নির্দেশ মানিয়া চলিব, কোন ত্যাগেই পশ্চাৎপদ হইব না, দেশের ও ক্রমে জগতের সেবার জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করিব।'

এরপর বিপ্লব সমিতির নির্ধারিত যে-কোন কর্মানুষ্ঠানে, যেমন মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহে, রোগীর সেবা, লাঠি খেলা, শরীরচর্চা, পঠন-পাঠন প্রভৃতি বহিরঙ্গের কাজ কিংবা গুপ্ত সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টায় নির্ধারিত

অংশগ্রহণ—সবকিছুকেই মনে করতাম স্বাধীনতা-অর্জনের জন্যই করছি, কোন দ্বিধা-সংশয় আমাদের ছিল না।

আজকের দিনের মত আত্মপ্রচার তখন ছিল না। নিজেকে একেবারে গোপন রেখে, এমন কি কাজের মধ্যে, দলের মধ্যে, আদর্শের মধ্যে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলতেন তখনকার বিপ্লবীরা। গুপ্ত সমিতির কাজের প্রয়োজনেই এইরকম আত্মবিলোপের আবশ্যকতা ছিল, এ-কথাও অস্বীকার করা চলে না।

তবু এ-কথা না বললে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে যে, কেবলমাত্র প্রয়োজনের জন্যে, নিরাপত্তার জন্যেই যে তাঁরা আত্মপ্রচারে বিমুখ ছিলেন, তা নয়, আত্মপ্রচারকে তখনকার দিনে বিপ্লব-দর্শনের বিরুদ্ধ বলেই মনে করা হত। জীবনে-মরণে তাঁরা ছিলেন তথাকথিত প্রচারের অনেক ঊর্ধ্বে। তাই তাঁরা নিজেদের ঢাক নিজেরা পেটাতেন না এবং বিপ্লবী সহকর্মীরাও না।

এই জন্যেই এঁদের গৌরবোজ্জ্বল জীবনেও মহত্ত্বর মৃত্যুর কথা বহুক্ষেত্রে গোপন রয়ে গেছে। তাঁদের কথা প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে আপনারা একটি মহৎ দেশ-প্রেমিক কাজ করলেন। আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এইখানেই নিবন্ধের উপসংহারটি টানছি।

অনুশীলন ভবনের সৌজন্যে অগ্নিযুগ সংখ্যা উদ্দীপন থেকে সংগৃহীত

দীনেশ-বাদল-বিনয়ের

মৃত্যুরূপা মা

রসময় শূর

['বি-ভি'র অন্যতম নেতা। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩২ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হবার পূর্বাবধি প্রখ্যাত বিপ্লবী হরিদাস দত্ত ও প্রফুল্ল দত্তের সঙ্গে একত্রে 'বি-ভি'র 'অ্যাকশন স্কোয়াড'-এর অধিনায়কত্বে ছিলেন।]

বিপ্লবী দলে একদিন যাদের সঙ্গে ছিলাম, যাদের স্নেহ করতাম, আদেশও করতাম, আজ তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য দিই, পূজা করি। কি বিরাট সম্ভাবনাই ছিল তাদের মধ্যে। ছোট্ট কুঁড়ি এক মুহূর্তে যেন ফুটে উঠল সহস্র শতদলের দীপ্তি নিয়ে। অবাক বিস্ময়ে আমরা চেয়ে দেখলাম—সাড়া জাগল সারা দেশের অন্তরে।

নিজের জননীকে জন্মভূমির মধ্যে লাভ করে যাত্রা যার শুরু, তার কাছে জীবন ও মৃত্যু একই সূত্রে বাঁধা। তাকে বলা হয়েছে ইটারন্যাল লাইফ। সে ইটারন্যাল লাইফ-এর সাধকের কাছেই জননী, জন্মভূমি ও বিশ্বরূপা মহাশক্তি একাকার হয়ে গেছে। আমি তাদের কথাই আজ ভাবছি।...

রাইটার্স-অলিন্দ যুদ্ধের তিনটি সৈনিক—যুদ্ধনেতা বিনয়কৃষ্ণ, বালক বীর বাদলচন্দ্র, তারুণ্যের দীপ্ত প্রতীক দীনেশচন্দ্র। সে যুদ্ধের ইতিহাস সবার জানা আছে। আমি তার উল্লেখ করব না। আমি শুধু তাদের মৃত্যুরূপা মা'র কোলে আশ্রয় নেবার তত্ত্বটুকু বুঝতে চাই।

●দীনেশ গুপ্ত

আহত ক্ষত-বিক্ষত দীনেশ গুপ্ত পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়েও মরল না। এভাবে তো দীনেশের মত মৃত্যুঞ্জয়ী বীর মরতে পারে না। তার জন্যে যে ফাঁসীর দড়ি অপেক্ষা করে আছে। মৃত্যুরূপা জননী কৃতকর্মা পুত্রকে কোলে তুলে নেবার জন্যে ফাঁসীর মঞ্চে সকলের অলক্ষ্যে কোল পেতে বসে আছেন।

দীনেশ গুপ্ত কারার সুউচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী সে গভীর উপলব্ধি! জন্ম-জন্ম সাধনা করে মহাসাধক যা পান না, দীনেশ আজ সেই অমৃতের অধিকারী। 'মৃত্যুরূপা মা' তাঁর করাল বিভীষিকার আবরণ খুলে ফেললেন তাঁর প্রিয়তম সন্তানের জন্য। দীনেশ দর্শন পেল মায়ের, মহান মৃত্যুর।

'মৃত্যু মিত্র রূপেই আমার কাছে দেখা দিয়েছে'—চিঠি লিখলো দীনেশ কারাকক্ষ থেকে তার মাকে। পরম সত্যের সাক্ষাৎলাভ করেই স্বামী বিবেকানন্দ বলতে পেরেছিলেন :

'সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মৃত্যুরূপা তারি কাছে আসে।...

দীনেশের মণিদি দুঃখ করেছিলেন, কেন তার ভাইটি সেই বিপদ-সংকুল পথে পা বাড়াল। তারই জবাবে দীনেশ লিখল—'যার প্রাণ আছে, শ্রেয়কে বরণ করবার জন্য যার আছে শ্রদ্ধা, সে কি কখনো তাঁর মহাশঙ্খের আহ্বান শুনে স্থির থাকতে পারে? কি শক্তি আছে এই মিথ্যা মোহের যে, তাকে আটকে রাখবে? তাঁর আহ্বানে কি শক্তি আছে জানি না—

'শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাঁহার আহ্বান গীত,
ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট আবর্ত মাঝে।...
...মৃত্যুর গর্জন—
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।'

সে-সঙ্গীত তাকে দোলা দিয়েছিল যৌবনে—তার তরুণ প্রাণে। যাত্রাপথের শেষে এ কথাই তো জানিয়ে গেল দীনেশ—

'দুঃখের বেশে এসেছ সখা, তোমারে নাহি ডরিব হে
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করি ধরিব হে।'

● **বাদল গুপ্ত**

সেই জাতের বীর—যে এল, জয় করল, কিছু কামনা না-রেখে নিঃশেষে চলে গেল। ...'বালক বীরের বেশে' এই বীর 'ভারত জয়' করেছিল সেদিন।

কবির কণ্ঠে বলব : 'সে কী গো বিস্ময় !'

বিপ্লবীত্রয়ের সর্বকনিষ্ঠ ছিল বাদল (সুধীর) গুপ্ত। বালক বয়সেই তার বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। তখন ঢাকা বিক্রমপুরের 'বাণরী' উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। দেশের মুক্তি-ব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। স্বল্পভাষী নীরব কর্মী—নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের প্রতিমূর্তি।

গ্রামবাসীরা তাকে ভালবাসে। সকলের দুঃখে শোকে বাদল এগিয়ে যায়। মানুষের সেবায় তার জন্মগত অধিকার। আড়ম্বর নেই, আত্মপ্রকাশের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা নেই। নির্বাক, নিরলস,………অতি সংগোপনে চলেছে তার অগ্নিমন্ত্রের সাধনা।

সাইমন কমিশন এসেছে দেশে। এ ব্রিটিশ চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে হবে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল—বয়কট কর, প্রতিবাদের ঝড় তোল দেশ জুড়ে 'কালো কমিশনে'র বিরুদ্ধে। বিপ্লবীরাও এ বিষয়ে অবহিত। বাদলের পার্টির (বি ভি) নেতারা নির্দেশ দিলেন, টেলিগ্রাফের তার কেটে দেশের টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা অচল করে দিতে হবে।

এ কাজের কিছুটা ভার পড়ল বাদলদের উপর তাদের অঞ্চলে। পরম নিষ্ঠায় এবং কর্মকুশলতার সঙ্গে বাদল এ বিপজ্জনক কাজ সমাধা করল। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। পুলিসের কর্তারা ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে এমন সরকার-বিরোধী দুষ্কর্ম কে বা কারা করল ? …কোন্ ছেলেদের এ কাজ ?

চতুর্দিকে গোয়েন্দা-পুলিসের তৎপরতা বেড়ে গেল। বাদল ইতিমধ্যে আত্মগোপন করেছে। সেদিন থেকেই অদৃশ্য। তারপর বহুদিনের ব্যবধানে—রাইটার্স-প্রাসাদ অলিন্দ যুদ্ধে ঘটল তার আবির্ভাব।

এ অভিযানের প্রস্তুতি চলছে কিছুদিন ধরে। দলের আদেশ এসেছে—বাদল এতে অংশ গ্রহণ করবে। তার সহযাত্রী হবে বিনয় ও দীনেশ। বাদল লাফিয়ে উঠল আনন্দে। এত কালের সাধনা বুঝি সার্থক হতে চলেছে। বিনয়দার নেতৃত্বে এবং দীনেশদার সঙ্গে

এই দুর্ধর্ষ কর্মে যোগদানের অধিকার তাকে দেওয়া হয়েছে। শরীরের অণু-পরমাণুতে আনন্দ-শিহরণ। পরম সার্থকতার তীর্থে তার শুভ-যাত্রা।

অভিযানের পূর্বরাত্রে কথা হচ্ছে পার্টির দাদাদের সঙ্গে—'কি খাবে ভাই কাল কাজে বেরুবার আগে, বল তো?'

বাদল জানাল—'মেনু আমরা (বাদল ও দীনেশ) ঠিক করে দেব। কিন্তু একটি শর্ত—"আর না," বলা পর্যন্ত খাইয়ে যেতে হবে।'

খেলোও তাই, যাত্রার পূর্বে প্রচুর খাওয়া—পরম পরিতোষ সহকারে। মৃত্যু-পথিকের এ কী আনন্দ। এ কী সহজ নিশ্চিন্ত ভাব—'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'। মুছে গেছে জীবন ও মৃত্যুর পার্থক্য। মৃত্যু—সে যে অভিসার—'প্রিয়ার মিলন লাগি'। কত দীর্ঘকালের কত দুশ্চর সাধনা। কত রাত্রির তপস্যা—মনে, বনে, কোনে কত মন্ত্র জাগরণ প্রচেষ্টা। একা সঙ্গীহীন। 'একা ফিরি তাই যমুনার তীরে, দুর্গম গিরি মাঝে; মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে, মিলাতেছি গান নদীকলরোলে, যোগ্য হতেছি কাজে।'

সেই কাজের আদেশ এসেছে। বিপ্লবী প্রস্তুত। যাত্রাপথে নেমে পড়েছে বাদল। 'নির্ভীক পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ।'....

পৌঁছে গেল বিপ্লবীরা অভিযান-স্থলে। ইংরেজের সুরক্ষিত দুর্গে তাণ্ডবলীলা চলল তিনটি সৈনিকের। তখনকার ব্রিটিশ-পরিচালিত দৈনিক 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা এ-যুদ্ধের নামকরণ করেছিলেন 'দি ভেরানডা ব্যাট্‌ল্'।

যুদ্ধশেষে এবার তীর্থারোহণ। জীবনের তপস্যা সার্থকতার স্বর্ণশিখরে। বাদল 'সায়ানাইড'-এর অ্যাম্পুল মুখে পুরে একটি কামরায় ঢুকে চেয়ারে বসে পড়ল। কী প্রশান্তি তার ললাটে, চোখে, মুখে—সারা অন্তরে! যুক্ত হয়ে গেল সে পরমের সাথে। ধ্যানাসনে নিশ্চল, নিস্পন্দ, নিষ্প্রাণ। দেশজননী তথা বিশ্বজননীর পাদপদ্মে নিবেদিত একটি প্রাণোচ্ছল অমূল্য অর্ঘ্য।

● বিনয় বসু

দেখেছি একান্ত কাছ থেকে। শান্ত, সমাহিত, সৌম্য। কিশোর বয়স থেকে বিনয় ধীর স্থির—চেহারার মধ্যে ছিল তেমনি কমনীয়তা, যা সকলকে মুগ্ধ করত।

ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্র। খেলাধূলায়, বিশেষ করে টেনিসে, নাম-করা খেলোয়াড়। পরিচিত কেউ ভাবতে পারেনি, অতবড় দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিক কাজ এই তরুণ একা সম্পূর্ণ করবার শক্তি রাখে। ঢাকায় লোম্যান-হডসন আক্রমণে বিনয় বসুর সত্যিকারের পরিচয় উদঘাটিত হল। উক্ত আক্রমণে সফল হয়ে বিনয় পালিয়ে গেল সকলের চোখে ধুলো দিয়ে। সে-কাহিনী যে কোন গোয়েন্দা-কাহিনীর চেয়েও রোমাঞ্চকর।

সে যুগের সে সব ঘটনা এখন ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ। আমরা সেদিকে যাব না, আমরা চলে আসব তার শেষ আশ্রয় রাজেনদার (রাজেন্দ্রকুমার গুহ) মেটিয়াবুরুজের বাসায়।

বৌদি তখন আঁতুড়-ঘরে। আঁতুড়-ঘর থেকে বেরুবার তখনও বেশ দেরি। অথচ এদিকে ঐ ছোট্ট আস্তানায় অতিরিক্ত ঘরের অভাব। বৌদি স্নান করে চলে গেলেন তাঁর শোবার ঘরে। তখনকার দিনে অশৌচ যাবার পূর্বে আঁতুড়-ঘর ত্যাগ করায় বিস্তর সামাজিক ও সংস্কারগত বাধা ছিল। কিন্তু 'রাজা' এসেছে ঘরে — রাজার স্থান করে দিতে হবে—এ গৌরব নিতে বৌদি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।

দিনের পর দিন বিনয় রইল দাদা-বৌদির কাছে উদ্বেগহীন, শান্ত সমাহিত। কোন প্রশ্ন নেই বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। সকালে দাদা বেরিয়ে যান ওয়ার্কশপে। বৌদির সঙ্গে গল্পগুজবে কেটে যায় বিনয়ের এই আত্মগোপনের দিনগুলি।

কলকাতায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তার জন্য ভাল জামা-কাপড় কেনা হল, সঙ্গের একটি লাল রঙের লুঙ্গি আনা হয়েছিল। লাল লুঙ্গিখানা প্রায়ই পরত বিনয়। বৌদির ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে

বিনয়ের বেশ ভাব হয়ে গেল। নানা গল্প-উপকথায় তাদের মন জয় করে ফেলল। ছেলেমেয়েরা প্রায়ই ঘিরে থাকত তাকে।

লাল লুঙ্গির রঙ উঠে যেত বলে বিনয়ের পেটে ও কোমরে লাল রঙ লেগে থাকত। একেবারে ঘরে বসে থাকার ফলে একটু ভুঁড়িও দেখা গিয়েছিল। ছেলেমেয়েরা তাই তাকে ডাকত 'লাল-ভুঁড়ি কাকু'।

খুব নিশ্চিন্ত সহজ জীবন চলল তার। ওটা অবশ্য তার স্বভাব। অহেতুক চঞ্চলতা তার প্রকৃতিতে ছিল না। রাতে দু-চারবার অবশ্য উঠতে হত একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্যে। কারণ পুলিস তার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে মরছিল। তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য সরকার পক্ষ দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। রাতে দু-চারবার উঠত বলেই সকালে তার ঘুম ভাঙত দেরিতে। বৌদি কাজকর্ম সেরে একটু বেলা হলেই চা তৈরি করে নিয়ে এসে বিনয়ের মশারি উঠিয়ে ডাকতেন —'ঠাকুরপো, এবার ওঠ। চা খাও। বৌদির আদর যত্ন তার নিজের মা-বৌদির যত্ন আদরকেও যেন ছাপিয়ে যেত।

পার্টি সিদ্ধান্ত নিল যে, তিনজন-অর্থাৎ বিনয়-বাদল দীনেশ যাবে রাইটার্স বিল্ডিংস্ অ্যাকশনে। বিনয়কে জানানো হল। কিন্তু তার ধীর স্থির চিত্তে কোন ঢেউ উঠতে দেখলাম না। খাওয়া পরার মত অতি সহজ ও সুনিশ্চিত এ ব্যাপার যেন। মনের অন্তস্থল থেকে এর জন্যে যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল বিনয়।

যাবার দিন। বৌদি পরম মমতায় খাইয়ে দিলেন তার জন্ম জন্মান্তরের ঠাকুরপোকে। বৌদির চোখ ঝাপসা। চেষ্টা করেও তিনি চোখের জল থামাতে পারছেন না। বিনয় প্রণাম করল বৌদিকে। ছোট্ট ভাইপো-ভাইঝিদের জানাল নিবিড় স্নেহ। রওনা হল সম্মুখের পথে। এদিকে বৌদির অঝোর কান্না। দাদা বলেন—'হাসিমুখে বীরকে বিদায় দাও, তবেই তো তোমার দেশজননীর সেবা সার্থক হবে।' বিনয় বীরদর্পে চলে গেল। পশ্চাতে ফিরে তাকাল না।

বিনয় হাসপাতালে। নিজের রিভলভারের গুলি দিয়ে নিজের মাথা জখম করে দিয়েছে বিনয়। মৃত্যুযন্ত্রণা অসাধারণ। কিন্তু মাতৃসাধনার

দুঃখব্রত যার, তাকে কাতর করার জন্য বিধাতা কোন শক্তি তৈরি করেন নি। জীবনভোর বিনয় 'মা' 'মা' করেছে—মা শৃঙ্খলিতা, মা পরপদানতা। দুঃশাসনের অত্যাচারে মা অপমানিতা, লাঞ্ছিতা।

মায়ের কান্না শুনেছিল বিনয়। তাই পাগল হয়ে ফিরত মাঠে-ময়দানে রাত্রির অন্ধকারে। নির্জনে গোপনে কঠোর হয়ে উঠেছে তার মন। বিসর্জন দিয়েছে সংসারের গতানুগতিক সুখ-সম্ভোগ কামনা-বাসনা। অস্বীকার করেছে পরিবারপরিজন বাবা-মা ভাই-বন্ধু আত্মীয় স্বজন। মুক্তি—মায়ের মুক্তি তার একমাত্র লক্ষ্য—মাতৃমন্ত্রের জপ চলেছে জীবনভোর।

সাধক রামকৃষ্ণের মাতৃ-সাধনা দক্ষিণেশ্বরে। গঙ্গাতীরে 'মা' 'মা' বলে পাগল। মা-পাগল সন্তানের দিন নেই রাত নেই—শুধু 'মা' 'মা'। 'মা' দেখা দে, দেখা দে মা।' পঞ্চবটীর বেলতলায় দক্ষিণেশ্বরের মাঠে-ঘাটে সেই এক আকুল আহ্বান—বুক-ফাটা ক্রন্দন। আকাশে-বাতাসে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি উঠেছে।

এই আকুল আহ্বান, এই বুক-ফাটা ক্রন্দনই উঠেছিল বিনয়ের বুকে। আজ সাধনায় সিদ্ধিলাভের সূচনা। হাসপাতালে মৃত্যু-পাগল—মা-পাগল বিনয়। আর সহ্য হচ্ছে না এ দেহ-সীমা। জীবন মায়া। জীবন জুড়ে চলেছিল মায়ার খেলা, মায়ের লীলা। আর লীলাতে মন নেই। 'নিত্য' যে তার চাই-ই। জীবন তো বন্ধন এ মুহূর্তে। এ বন্ধন তার ছিন্ন করতে হবে। যাবে সে লীলার ওপারে 'নিত্যে'র সাক্ষাতে, মাতৃ-মিলনে। বিনয় তাই মৃত্যুপাগল।

মাথার দুর্বিষহ ক্ষতে বিনয় আঙুল ঢুকিয়ে ক্ষতস্থান ঘেঁটে দিয়েছে। ক্ষত যে সেপটিক্ হয়ে যাবে, তা ডাক্তারী ছাত্র বিনয় জানত। ক্ষত সত্যি বিষাক্ত হয়ে গেল। অমিতবীর্য তরুণের জীবনদীপ নির্বাপিত হল। সাধনার সিদ্ধি। মাতৃসাধক বিপ্লবী বীর, মায়ের প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান বিনয়কৃষ্ণ মাতৃক্রোড়ে নির্বাণ লাভ করলেন।

প্রবর্ত্তকের নববর্ষ

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

[অগ্নিযুগের ইতিহাসে চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সংঘের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। সংঘ গুরু ৺মতিলাল রায় থেকে শুরু করে আজো তা চলছে অপ্রতিহতভাবে। সংঘের বর্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্তের এই লেখাটি ১৩৮২ সালের নববর্ষ সংখ্যা প্রবর্ত্তক পত্রিকা থেকে ধন্যবাদ সহকারে এখানে প্রকাশ করা হল।]

"প্রবর্ত্তক"—একটি যুগের নাম-রূপ। নামে—পত্রিকা। রূপে—সঙ্ঘসৃষ্টি। প্রবর্ত্তক প্রথমে পাক্ষিক, পরে মাসিক, প্রথমে চন্দননগরে প্রকাশ, পরে ঐতিহাসিক ঘটনায় ও প্রেরণায় কলিকাতায় স্থানান্তর। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘেরও বীজ ও অঙ্কুর চন্দননগরেই—তার শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়াছে, ছড়াইতেছে, ছড়াইবে—গ্রামে, নগরে, মহকুমায়, জেলায়—দেশ থেকে দেশান্তরে। নামের আবির্ভাব সমুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে—সঙ্ঘগুরুরই চিদাকাশে। মহাগুরু শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী "Arya" নবযুগেরই বাণী প্রকাশের সূচনা করে—১৫ই আগষ্ট, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। বাংলায় "প্রবর্ত্তকের" প্রথম প্রকাশ—১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে।

পণ্ডিচেরী থেকে "আর্য্য"—চন্দননগর তথা কলিকাতা থেকে "প্রবর্ত্তক"। 'আর্য্য' আজ আর নাই, আছে 'প্রবর্ত্তক'। 'প্রবর্ত্তক' আজ ৫৯ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৬০ বৎসরে পদার্পণ করিল। ইহা তাই তার 'Diamond Jubilee' অর্থাৎ হীরক জুবিলীরই সম্বৎসর।

ইতিহাসেরই সাক্ষ্যে 'প্রবর্ত্তকের' মিশন, অর্থাৎ জীবন-ব্রত এখনও ফুরায় নাই।

'প্রবর্ত্তকের' জন্মবর্ষের ১ম সংখ্যার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানপত্রে সঙ্ঘগুরু লিখিয়াছিলেন: "প্রবর্ত্তক কি করিবে? প্রবর্ত্তক নূতন ভাবের ভাবুক

করিবে, নূতন চিন্তা করিতে শিক্ষা দিবে—নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দিবে। যাহা না থাকিলে মানুষে-মানুষে সহানুভূতি থাকে না—ঘরে ঘরে হাহাকার উঠে—যাহা না থাকিলে মানুষ স্বার্থপর হয়, বিষের জ্বালা অনুভব করে—প্রবর্ত্তক সেই অমূল্য বস্তু গঠনের সহায়তা করিবে। সেটা কি? চরিত্র। এই চরিত্র দেবচরিত্র। ইহা মানববুদ্ধির অতীত, ইহা সাধনার সামগ্রী। প্রবর্ত্তক এই কার্য্যের আরম্ভ মাত্র।"

মহাগুরুর অনুপ্রেরণা লইয়াই এই কার্য্যের আরম্ভ। "প্রবর্ত্তক" আমি লিখি আর না লিখি আমার মধ্য দিয়া "ভগবান্ মতিকে লিখাইতেছেন"—এ অন্তরঙ্গ স্বীকৃতি শ্রীঅরবিন্দেরই। সংক্ষিপ্ততর মর্ম্ম প্রকাশচ্ছলে সঙ্ঘগুরুর প্রতি মহাগুরুর ইহা পরম আশীর্ব্বাদ। এ আশীর্ব্বাণীর স্বাদ, শক্তি, তাৎপর্য্য নিগূঢ়, অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয়।

"প্রবর্ত্তক" সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের আরও আশীর্ব্বচন আছে। ছাপার পরে পণ্ডিচেরীতে 'প্রবর্ত্তক' যথারীতি প্রেরিত হইলে, শ্রীঅরবিন্দ তাহা নিবিষ্ট চিত্তে দেখিয়া লইতেন, পত্রিকার প্রকাশে বিলম্ব হইলে তিনি চিন্তিত হইতেন, এমন কি স্বীয় অধ্যাত্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া বাধা দূর করার জন্য আশ্বাস দিতেন, পত্রিকার উৎকর্ষের জন্য পথনির্দ্দেশ করিতেন। এরূপ একখানি পত্রে মহাগুরু লিখিয়াছিলেন.

"What has become of the Prabartak? The last number was very good, but for a long time we have had no other. Is the administration withholding visa or are there other reasons for the irregularity? I hope it is not a discontinuance. We have the Arya here visaed without delay or difficulties.

If you have difficulties of any kind, it is well to let me know at once: for I can then concentrate what force I have more particularly to help you. The help may not be always or immediately effective,

but it will count and may be more powerful than a general will, not instructed in the particular necessity. You must not mind, if you do not get always a written answer, the unwritten will always be there."

এই চিন্তা ও চেষ্টায় তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভয়দানের অন্তরঙ্গোচিত প্রেরণা অনুভব্য। 'প্রবর্ত্তকের' প্রকাশ যাহাতে নিয়মিত ও অব্যাহত হয়, তজ্জন্য তাঁহার কি গভীর ও ঐকান্তিক আকুলতা ছিল, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় রোমাঞ্চিত হয়, চিত্ত গৌরবে ও পুলকে শিহরিয়া উঠে।

মহাগুরুর কারুণ্যস্নিগ্ধ আর একখানি পত্রের কথাও উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এর শেষাংশে তিনি লিখিয়াছিলেন :

"It seems to me that Prabartak is getting on well enough as it is, though if Nalini could write, it could produce an element of greater variety.

You should be able to develop more writers with the necessary spiritual experience, grasp of the thoughat and literary ability—these things the inner Shakti can bring to the surface if it is called upon for them—so that Prabartak will not have to depend on three or four people for its sustenance"

ইহা প্রতিভাসৃষ্টির অন্তর্মুখী প্রেরণা ও সাধনা। নূতন লেখক লেখিকাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত রচনাশক্তির উন্মেষ—অন্তরশক্তির উদ্বোধনের উপর নির্ভর করে, মহাগুরু তাহা জানিতেন। সেই সূক্ষ্ম অন্তরশক্তির উদ্বোধনেরই নির্দ্দেশ তিনি দিয়াছেন। এই স্বচ্ছ সংকেতে প্রতিভার জাগরণ ও প্রকাশের সুস্পষ্ট সন্ধান তিনি উত্তর-পুরুষদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্মত অমোঘ বৈজ্ঞানিক

সঙ্কেত। শক্তি আছে অন্তরমূলে—Inner Shakti. এই অন্তঃশক্তি ভিতরে ঘুমাইয়া আছে—তাঁহাকে জাগাইয়া, ভিতর থেকে বাহিরে ডাকিয়া আনাই প্রয়োজনীয়। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, চিন্তার গ্রাহিকা-শক্তি, রচনার প্রকাশ ক্ষমতা—অন্তরে অধিনিহিত এই গুণগুলিকে প্রবুদ্ধ, সক্রিয়, অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত অবস্থায় বিকশিত ও পরিণত করাই চাই—'These things the inner Shakti can bring to the surface, if it is called upon for them'—এই আবাহন করার অমন্ত্র ইঙ্গিত গুরু দিলেন শিষ্যকে। "আমার মধ্য দিয়া ভগবান্ মতিকে শিখাইতেছেন"—এই সংক্ষিপ্ত কথারও গূঢ় মর্মগত ইঙ্গিত তো ইহাই!

এই অন্তর্নিহিত প্রতিভাশক্তির উদ্বোধন ও স্ফুরণেই তো প্রকাশের পূর্ণ সার্থকতা! এখানে শ্রীগুরুশক্তির চাই উদ্দীপন বা স্পর্শ, আবেশ বা আবেগ, তাঁহারই করুণা বা প্রেরণার আবাহন। "প্রবর্তকের" ক্ষেত্রে এই কুণ্ডলিনী প্রতিভার উন্মেষ ও পরিবর্ধন অনেক জীবনদৃষ্টান্তে আমরা দেখিয়াছি ও পাইয়াছি। 'প্রবর্তকে'র ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হইবে—এই সিদ্ধবিজ্ঞানেরই অনুসরণে ও সাধনায়। "প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের" সৃষ্টি ও সাধনা এই মূল বীজগত উদ্দেশ্যকেই সার্থক করুক—এই প্রার্থনা।

প্রবর্তকের বাণী ও প্রচার—নবজাতির জন্ম ও জীবন। প্রবর্তক সঙ্ঘেরও জীবনব্রত তাহাই। তাই জাতির জীবনসাধনার সঙ্গে প্রবর্তক পত্রিকা ও প্রবর্তক সঙ্ঘের জীবন বিকাশ ওতপ্রোত বিজড়িত। বাংলার স্বদেশীযুগ, বিপ্লবযুগ, স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতোত্তর সংগঠন যুগ, মহাগুরুর ভাষায় 'ভাঙ্গের পর গড়া'—প্রবর্তকের বুকে ধারাবাহিক রেখাপাত করিয়াছে। জাতির সাধনা প্রবর্তকের পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত। জাতির ইতিহাস প্রবর্তক সঙ্ঘের জীবনধারায় লীলায়িত, রূপায়িত।

স্বাধীনতা-সাধনায় প্রবর্তকসঙ্ঘ ঐতিহাসিক বিপ্লবতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। বিদেশী রাজশক্তির সন্দেহদোলায় নিপতিত প্রবর্তক-

সাহিত্যসম্ভার "Sea Customs Act"-এ চন্দননগরের বাহিরে যাইতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। 'প্রবর্ত্তকে' প্রকাশিত বিশেষ কয়েকখানি গ্রন্থ বৃটিশরাজ কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ ফরাসী-গভর্ণমেণ্টও ইংরাজের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহাপরাধে অভিযুক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য 'প্রবর্ত্তক'কে তিন মাস বন্ধ করিয়াছিল। ইংরাজ-রাজের সংশয়মোচনের জন্য ফরাসী অধিকারের নিরাপদ আশ্রয় হইতে ছাপাখানা লইয়া বৃটিশ ভারতের প্রধান নগরী কলিকাতার বুকে 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকাকে নব পর্যায়ে নব কলেবরে বাহির করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। এই সকল ঘটনার রোমাঞ্চকর কাহিনী ও যুগান্তকর ইতিহাস 'প্রবর্ত্তকে' যথাস্থানে, যথাকালে লিপিবদ্ধ আছে। 'প্রবর্ত্তকের' পাতায় ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, রাজা রামমোহন হইতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, কানাইলাল, রাসবিহারী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র—সকলের কথা ও কীর্ত্তি, দেশসাধনার পরিচয়—সবই একাধারে মিলিবে।

মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দেরই অলক্ষ্য নির্দ্দেশ, বিপ্লবের মোড় ঘুরাইয়া সংগঠনের পথে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ অগ্রগামী হইয়াছে। জাতিকেও ডাক দিয়াছে 'প্রবর্ত্তক'—সংগঠনব্রতী হইবার জন্য। জাতীয় শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনা একদিকে, অন্যদিকে স্বাবলম্বী হওয়ার তপস্যায় সর্ব্বাত্মক ভাবে ঝাঁপ দিয়াছে সঙ্ঘের মানুষ—পরমপূজ্য সঙ্ঘগুরুর লেখনী অনর্গল ধারায় সেখানে আশা ও আদর্শের আলো, অগ্নিময় উৎসাহ এবং অনাহত অনুপ্রেরণাশক্তি যোগাইয়াছে। 'প্রবর্ত্তকের' ডাকেই ছুটিয়া আসিয়াছে দেশের আশিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী তরুণের দল—অখণ্ড বাংলার পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহারাই দিক্‌পালরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ।

এই 'প্রবর্ত্তকের' বাণী ও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সাধনা এখনও শেষ হয়

নাই—তাই 'প্রবর্ত্তকের' মিশন ও তার সম্মুখের ভবিষ্যৎ অনন্ত ও অফুরন্ত।

আজ 'প্রবর্ত্তকের' নববর্ষে—তার হীরক জুবিলী সম্বৎসরের প্রবেশ-মুখে সেই দূর ভবিষ্যৎকে হাতছানি দিয়ে ডাক দিতেছি—বরাভয়করা মহামাতৃশক্তির দিব্যাঘনস্নেহভরা আহ্বান জানাইতেছি—গভীর-গাঢ়-উদাত্ত স্বরে—'এহি' বলিয়া—যাহারা উত্তরাধিকারী নবীন অগ্রদূত, তাহাদিগকেই।

ওগো অতীত—প্রসন্নচিত্তে ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। ওগো বর্ত্তমান—উদার সাগ্রহ হৃদয়ে ইহাদিগকে স্বাগত জানাও, ইহাদের সহায় হও।

ওগো নবীন—'প্রবর্ত্তকের' নেতৃগণকে, স্কন্ধে তুলিয়া উদীয়মান নবজাতির জীবন সাধনা ও সংহতি জীবনে আগামী নবযুগ-প্রবর্ত্তনের শুভ আদর্শে, অদম্য সাহসে, ও দৃঢ়তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হও।

এই নূতন বাংলা, এই নূতন ভারতের ভবিষ্যৎ—সম্বৎসরের স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভাতে, চারিদিকে দিকে দিকে বিকীর্ণ করিয়া—বিশ্বমানবের শান্তিমন্ত্রগীতি জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিঃকণারূপে তুমি আবির্ভূত হও—

"আবিরাবির্ম এধি
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্"
ওঁ শান্তি—শান্তি—শান্তি। হরিওম্

বক্সাদুর্গে ২৫শে বৈশাখ

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

[মাদারীপুরের পূর্ণদাসের দলের অন্যতম নায়ক। এক ভাই নীরেন দাশগুপ্ত প্রাণ দিয়েছেন ফাঁসিমঞ্চে। নিজেও অশেষ নির্যাতন সহ্য করেছেন বিভিন্ন কারাগারে। পরবর্তীকালে সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ডেটিনিউ ও বক্সাক্যাম্প। শেষোক্ত গ্রন্থ থেকে এ অধ্যায়টি ধন্যবাদ সহকারে এখানে প্রকাশ করা হল। লেখক বর্তমানে পরলোকগত।]

২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্ণ হইবে। সমগ্র জাতি এই উপলক্ষে তাঁহার জন্মজয়ন্তী উৎসবের আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছে। বিরাট ব্যাপার ও বিরাট উৎসব, তাই অনুষ্ঠানের তারিখটি জয়ন্তী-উৎসবের কর্তৃপক্ষ পিছাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা ঠিক করলাম যে, ২৫শে তারিখেই আমরা কবিগুরুর জয়ন্তী-উৎসব পালন করিব।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দেশের লোকের ও বিদেশীদের কি মনোভাব, তাহা আপনারা নিশ্চয় জানেন। এখনও যদি না জানিয়া থাকেন, তবে আর খামোকা চেষ্টা করিয়া সময় নষ্ট নাই বা করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রচনা লিখিতেছি না। কবিগুরু সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত ধারণাটা এই সুযোগে এখানে পেশ করিয়া রাখিতে চাই। আশা করি, আমার মতামত একান্ত আমারই বলিয়া গ্রহণ করিবেন, কলহের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিবেন না।

পড়াশোনা আমার খুব বেশী, এমন অহংকার আমি করি না। আপনাদের আশীর্বাদে যতটুকু বিদ্যাচর্চার দুর্ভোগ আমার হইয়াছে, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই আমার প্রথম অভিমতটি ব্যক্ত করিতেছি। ব্যাসদেবের পর ভারতবর্ষে এত বড় সাহিত্যিক প্রতিভা আর আসেন

নাই, কবিগুরু সম্বন্ধে ইহাই আমার ধারণা। যুক্তি দিয়া এ-ধারণা পরিবর্তন আপনারা করিতে পারিবেন না। আমি যাহা বুঝিয়া রাখিয়াছি, তাহা আর রদবদলের অবকাশ নাই।

আমার দ্বিতীয় ধারণা, বর্তমান যুগে উপনিষদের এত বড় ভাষ্যকার আর কেহ আসেন নাই। বর্তমান ভারতবর্ষে উপনিষদের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার বলিয়াই কবিগুরুকে আমি মনে করি।

আমার তৃতীয় ধারণাটি একটু বিশেষ। প্রথম দুইটি ধারণা লইয়া আলোচনার অবকাশ হয়তো আছে এবং হইলে আলোচনা করাও চলে। কিন্তু তৃতীয় ধারণাটি সম্বন্ধে সে-সুযোগ নাই। ধারণাটি ব্যক্ত করিলেই আমার উক্তির অর্থটুকু পরিষ্কার হইবে। আমি মনে করি, রবীন্দ্রনাথ সমাধিবান পুরুষ। ঋষির সমাধিই আমি বুঝাইতেছি, যে-সমাধিতে ঋষিও ব্রহ্মজ্ঞ পদবীতে সাধকগণ উপনীত হইয়া থাকেন। জানি, প্রশ্ন করিবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছেন যে, কেমন করিয়া জানিলাম, ইহার প্রমাণ কি? ক্ষমা করিবেন, যতটুকু বলিয়াছি, তার অধিক কিছু আমার আর এ-বিষয়ে বক্তব্য নাই। আমি মনে করি, শুধু তাহাই নহে, রবীন্দ্রনাথ আমি জানি, সমাধিবান পুরুষ। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলিতেন, ইহা রীতিরক্ষা নহে, ইহা সত্য সম্বোধন। এই সত্য অজানা থাকিলে গান্ধীজীকে আর ভারতবর্ষের 'মহাত্মা' হওয়া চলিত না। ভারতবর্ষের মহাত্মা যাঁহাকে 'গুরুদেব' বলিয়া ডাকিয়া গিয়াছেন, তিনি প্রকৃতই গুরুস্থানীয় ছিলেন।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর আয়োজন চলিতে লাগিল। এই উৎসবের সমস্ত ব্যবস্থা ও আয়োজনের মূলে ছিলেন ভূপেনবাবু (রক্ষিত)। ভবেশবাবু (নন্দী) তখন ছিলেন আমাদের সাহিত্যসভা ও লাইব্রেরীর সেক্রেটারী। তাঁহাকে লইয়া আমার যতদূর মনে পড়ে অনিলবাবুও (রায়) সঙ্গে ছিলেন, ভূপেনবাবু তিননম্বর ব্যারাকের বারান্দায় আমার কম্বলের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইহাই ছিল আমার অধ্যয়নগৃহ।

ভূপেনবাবু বলিলেন, সকলের ইচ্ছা যে, অভিনন্দনপত্রটি আমি

রচনা করি। প্রস্তাব শুনিয়াই মন লোভী হইয়া উঠিল। বিপ্লবী-বন্দীদের পক্ষ হইতে কবিগুরুকে অভিনন্দন জানাইবার অধিকার, এই সৌভাগ্যকে প্রত্যাখ্যান করিবার মত নির্লোভ আমি ছিলাম না। 'আচ্ছা' বলিয়া আমি সম্মত হইলাম। আমার জীবনে ইহাকে ভাগ্যের শ্রেষ্ঠতম একটি দান বলিয়াই আমি মনে করি। মুখে বলিলাম না কিন্তু মনে মনে বন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম।

ভারতীয় রীতিতে মঞ্চটি সুসজ্জিত হইল। মঞ্চের সম্মুখে দুই ধারে কদলীবৃক্ষ ও আলপনা-দেওয়া মঙ্গলঘট স্থাপিত হইল। সম্মুখের দিকে এক সারি প্রদীপমালা। প্রথমে ঐকতান, তৎপর অভিনন্দন পাঠ করিয়া মঞ্চোপরি রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির পাদমূলে স্থাপিত হয়। সর্বশেষে 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' সঙ্গীত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। পরে কবিগুরুর 'বিসর্জন' নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকের পৌরোহিত্য করেন বন্ধুবর ভূপেন রক্ষিত।

সুধীরবাবু (বসু) ছিলেন শিক্ষিত আর্টিস্ট। রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র একটি চিত্র অংকিত করিয়া নীচে অভিনন্দনটি চীনা-কালিতে লিপিবদ্ধ করিয়া দেন। একটি বাঁশের নলের আধারে 'অভিনন্দনপত্রটি' রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরিত হয়।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী কমিটির পক্ষ হইতে অমল হোম মহাশয় এক পত্রে জানান যে, অভিনন্দনটি কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি প্রত্যুত্তরে একটি 'প্রত্যভিনন্দন' কবিতা লিখিয়াছেন। কবির স্বহস্তে লিখিত "প্রত্যভিনন্দনটি" অভিনন্দন রচয়িতাকেই যেন দেওয়া হয়, ইহাই কবির ইচ্ছা। দুর্ভাগ্যবশতঃ কবির স্বহস্তের সেই 'প্রত্যভিনন্দন'-পত্রটি পৌঁছিতে পারে নাই। পরে জানিয়াছি, লেখাটি বক্সা-ক্যাম্পের অফিস হইতে কবির নিকট ফিরিয়া গিয়াছে। কবি লেখাটি শ্রীযুত অমলহোমকে দিয়াছেন। এখন তাহা শ্রীযুত হোমের নিকট আছে।

আমাদের অভিনন্দন পত্রটির প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল—

'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চরণকমলে—

ওগো কবি,

তোমায় আমরা করিগো নমস্কার।

সুদূর অতীতের যে-পুণ্য প্রভাতক্ষণে তোমার আবির্ভাব, আজ বাঙলার সীমান্তে নির্বাসনে আমরা বন্দীদল তোমার সেই জন্মক্ষণটিকে বন্দনা করি। আর স্মরণ করি বিরাট মহাকালকে, যিনি সেইক্ষণটির দ্বারপথ উন্মুক্ত করিয়া এই দেশের মাটির পানে তোমাকে অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে পথ দেখাইয়াছেন।

যেদিন জ্যোতির্ময় আলোক দেবতা তমসা-তীরে প্রথম চোখ মেলিয়া চাহিলেন, আলোক বহ্নির আত্মপ্রকাশই তো সেদিনকার একমাত্র সত্য নয়। সেই একের প্রকাশে সুপ্তির অন্ধকারে তটে তটে বিচিত্র বস্তুও যে আপনাকে জানিয়া জানাইয়া উঠিয়াছে। হে মর্ত্যের রবি, তোমার আকাশ-বিহারী বন্ধুর সঙ্গে তোমার যে পরম সাদৃশ্য আমরা দেখিতে পাইতেছি। তুমি নিজেকে প্রকাশ করিয়াছ, তাই তো বিস্মৃতির অন্ধকার প্রদেশে আমাদের মাঝে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হে ঐশ্বর্যবান, তোমার মাঝে জাতি আপন ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইয়াছে।

হে ধ্যানী, তোমার চোখে জাতি মহান বিশ্ব-মানবের স্বপ্ন দেখিয়াছে।

হে সাধক, তোমার হাতে জাতি আপনার সাধনার ধন গ্রহণ করিয়াছে।

তাই কি তুমি প্রত্যেকের পরমাত্মীয়?

হে ঋষি, তোমার জন্মক্ষণে এই বাঙলায় জনমনে সমগ্র জাতির জন্ম জয়ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। অজ্ঞাতে আমরা সেদিন অন্ধকার নীহারিকাপুঞ্জের মাঝে না জানিয়াও শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। আজ জাগ্রত জীবনের যাত্রাপথে দাঁড়াইয়া হে অগ্রজ, তার ঋণ শোধ করি। আমরা না আসিতে তুমি আমাদের জীবনের জয়গান গাহিয়াছ। আমরা সে-দান প্রণামের বিনিময়ে আজ অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিতেছি।

তোমার জন্মক্ষণটি পিছনের অতীতে হয়তো হারাইয়া গিয়াছে,—

আজিকার এই স্মরণ-দিনে আমাদের কণ্ঠের জয়ধ্বনি সম্মুখের অগণিত মুহূর্ত শ্রেণীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া অনন্তে শেষ সীমান্ত-পারে গিয়া পৌঁছুক।

হে কবিগুরু, "তোমায় আমরা করিগো নমস্কার।" অবরুদ্ধের অভিনন্দন গ্রহণ কর।

ইতি

গুণমুগ্ধ সমবেত রাজবন্দী—

বক্সা-বন্দীশিবির

২৫শে বৈশাখ

১৩৩৮

আমাদের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে কবিগুরু পাঠাইলেন "প্রত্যাভিনন্দন" ঋষি কবির প্রত্যাভিনন্দন, আমরা স্বভাবতঃই একটু বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম, অভিনন্দনের উত্তর হয়তো একটা তিনি দিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া বিনিময়ে তিনিও আমাদের জন্য অভিনন্দন পাঠাইবেন, ইহা বস্তুতঃই আমরা আশা করি নাই। বুঝিলাম, বাঙলার বিপ্লবীদের প্রণাম বাঙলার কবিকে সত্যই বিচলিত করিয়াছে, কাজেই এই অগ্নি-প্রণামের প্রত্যুত্তরে ঋষির অভিনন্দন উৎসারিত হইয়াছে বিপ্লবীদের জন্য নয়, বিপ্লব-শক্তির জন্য।

কবিগুরু প্রত্যুত্তরে জানাইলেন—

প্রত্যাভিনন্দন

(বক্সা-দুর্গের রাজবন্দীদের প্রতি)

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হোতে
উন্মুখর ঊর্দ্ধস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন॥
মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি

স্মসমুখ শক্তি বলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিয়া বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্ত নরের রাজধানী॥
'অমৃতের পুত্র মোরা' কাহারা শুনালো বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়॥

১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দার্জিলিং

কবিগুরু এই প্রত্যভিনন্দন যত সাময়িক কালের জন্যই হউক, বন্দীদের একটু বিশেষভাবে আত্মসচেতন করিয়া তুলিয়াছিল, এইটুকু আমার মনে আছে। আমার নিজের কথা পূর্বেই একটু ব্যক্ত হইয়াছে। আমার লেখা কবিগুরুকে স্পর্শ করিয়াছে, ইহাতে সেদিন আমার দৃঢ় ধারণা হইল যে, আমি লিখিতে পারি এবং চেষ্টা করিলে সাহিত্যিক বলিয়াও হয়তো একদিন পরিচিত হইতে পারি। অর্থাৎ এই ঘটনা—যাহা ঘটে তাহাই ঘটনা নহে, যাহাতে চরিত্রের বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায়, আমি তাহাকে ঘটনা আখ্যা দিয়া থাকি,— আমাকে আমার সম্বন্ধে বেশ খানিকটা সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল যে-মনোভাব আমার সেদিন আমি দেখিয়াছিলাম, তাহাকে নাম দেওয়া যাইতে পারে আত্ম-আদর।

বয়স বাড়িয়াছে, রক্ত ঠাণ্ডা হইয়াছে, হয়তো মাথাও কিছু ঠাণ্ডা হইয়াছে, তাই আজ আর আমার আত্ম-আদর বা আত্ম-অনাদর কোন ভাবই মনে আসে না। যেটা আসে, তাহা একটি প্রশ্ন অথবা প্রত্যাশা।

'প্রত্যভিনন্দন'-এর শেষ কথাটিতে কবি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়", "উত্তরে আজ আর বলিতে পারি

না, আমি বা আমরা। অপরের কথা জানিনা, কিন্তু নিজের কথা যতটুকু জানি তাহাতে বলিতে পারি যে, বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের পরিচয় অন্ততঃ আমি দিতে পারি নাই। আমার মুক্ত পরিচয় আমার কাছে এখনও অনুদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে, বাহিরের শৃঙ্খলচ্ছন্দে তাহার পরিচয় দেওয়ার কথা তো উঠেই না।

কিন্তু কবি এমন কথা কেন লিখিলেন? 'অমৃতের পুত্র মোরা', একথা তো আমরা জানিনা, বিশ্বময় জানানো তো অনেক পরের কথা। কেন কবি আমাদের সম্বন্ধে লিখিলেন, 'আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।' অথচ শুনিতে পাই 'ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না, ঋষির রসনা মিছে না কহে।' প্রত্যভিনন্দনে আমাদের সম্বন্ধে ঋষিকবির এই উক্তি কি প্রকৃতই সত্য—ইহাই আমার প্রশ্ন।

ইহাকে প্রশ্ন না বলিয়া প্রত্যাশাও বলা চলে। ঋষিকবি আমাদের নিকট কি প্রত্যাশা করেন? তাহাই প্রশ্নের আকারে ঐভাবে প্রত্যভিনন্দনে জানাইয়া গিয়াছেন. এই অর্থেই আজ আমার মন ঋষির 'অভিনন্দন' গ্রহণ করিয়াছে এবং আমার ধারণা, ইহাই প্রত্যভিনন্দনের প্রকৃত অর্থ।

ঋষির প্রত্যাশা যদি আমাদের একজনের জীবনেও পূর্ণ হইত, তবে দেশের ভাগ্য আমরা ফিরাইয়া দিতে পারিতাম। যে-শক্তিতে গান্ধীজী ভারতবর্ষকে আন্দোলিত করিয়া গিয়াছেন, তখন বাঙলার বিপ্লবীরা তাহার চেয়েও প্রবলতর ভাবে দেশ ও জাতিকে আন্দোলিত ও মন্থিত করিতে পারিত। সে-মন্থনে অমৃত যদি নাই বা উঠিত, অন্ততঃ বাঙলা-বিভাগের গরল উঠিত না, কিংবা সাম্প্রদায়িকতার বিষও সে মন্থনে সঞ্জাত হইত না। বাঙলার বিপ্লবীদের কোন নেতা বা কর্মীর জীবনেই ঋষি কবির এই প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নাই, কেহই নিজ জীবনে ঋষির জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই।

আজ নিজের নিভৃত মনের গহনে তাকাইয়া দেখিতে পাই যে, বাঙলার বিপ্লবের অসমাপ্ত যজ্ঞশালা পরিত্যক্ত পড়িয়া আছে, কিন্তু

ভস্ম মাঝে এখনও অগ্নি অবসান হয় নাই। মহাযাজ্ঞিক ও মহাতাপসের অপেক্ষায় এক কণা অগ্নি এখনও অপলক তাকাইয়া আছে।

বক্সাদুর্গের গান

ভূপতি মজুমদার

যুগান্তর দলের অন্যতম নেতা। বাঘাযতীনের সহকর্মী এবং ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রের অন্যতম অংশীদার। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সিঙ্গাপুরে। পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভার প্রাক্তন সদস্য। বর্তমানে পরলোকগত

ঝড় তুফানের যাত্রী মোরা
মোদের যে এই পরিচয়
জীবন ভরে মনের মাঝে
সকল কাজে জেগে রয়।
হয়তো কঠিন যাত্রাপথে
হয়তো ঘন আঁধার রাতে
কারার কারা শৃঙ্খলেতে
নব যুগ উদয় হয়।
[illegible]ক্ষণের [illegible] দেখা
আমরা সবাই চির সখা
স্মৃতির বুকে রয় যে আঁকা
সবার ছবি প্রেমময়।

বিপ্লবী বাংলার সৌজন্যে বক্সাদুর্গে লেখা এই গানটি প্রকাশ করা হল

আশীর্বাদ

কাজী নজরুল ইসলাম

পৃথিবীতে সব পাবে
রহিবেনা স্বর্গের প্রয়োজন
অন্তরে হও বৈরাগী শিব
বাহিরেতে নারায়ণ।
ভোগের ষড়ৈশ্বর্য রহিবে
চরণের কাছে পড়ে
নিত্যলোকে—নিত্য পরম
অমৃত পড়িবে ঝরে
ধরা গাহে তারি জয়—
সকল পেয়েও সব ছেড়ে যে
পুরুষোত্তম হয়।

• সম্পাদকের অটোগ্রাফ খাতা থেকে সংগৃহীত

শহীদ ভগৎ সিং

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ

[ঐতিহাসিক কানপুর ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান নায়ক। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রখ্যাত মার্কসবাদী চিন্তানায়ক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি'। বর্তমানে পরলোকগত]

ভগৎ সিং-এর সঙ্গে আমার অল্প কয়েকদিনের মাত্র পরিচয়। এত কম দেখা-সাক্ষাৎ যাঁর সঙ্গে হয়েছে, তাঁর বিষয়ে কিছু লিখতে যাওয়া অনধিকারচর্চা। তবুও আমি একান্তভাবে অনুরুদ্ধ হয়েছি যে, কমপক্ষে একটি পৃষ্ঠা হলেও যেন আমি কিছু লিখি।

১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি লাহোরে গিয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল, ডিসেম্বরের বাকী ক'টা দিন ও পুরো জানুয়ারী মাস আমি সেখানে কাটিয়ে আসব। লাহোরে পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত মস্কো বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় দণ্ডভোগী ও আমাদের কমরেড মীর আবদুল মজীদের বাড়িতে ভগৎ সিং-এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমি কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় জেল-খাটা লোক বলে তিনি আমায় দেখতে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আবদুল মজীদ আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

ভগৎ সিং-এর হাজার হাজার ফটোগ্রাফ দেশময় বিতরিত হয়েছে। সারা দেশের সংবাদপত্রসমূহেও তাঁর ফটো ছাপা হয়েছে। দাড়ি-কামানো, ছোট করে চুল ছাঁটা এবং শার্ট ও হ্যাট পরিহিত ফটোগ্রাফের এই ভগৎ সিংকেই সারা দেশ চিনেছেন ও মনে রেখেছেন। কিন্তু মীর আবদুল মজীদের বাড়িতে আমি প্রথম যাঁকে দেখেছিলেম, তিনি ছিলেন একজন শিখ নবযুবক। লম্বা চুলের উপরে মাথায় যত্ন করে পাগড়ি বাঁধা। পাতলা দাড়ি এখনও পুরো চেহারা ঢেকে ফেলেনি. পরনে পায়জামা, শার্ট ও কোট, মিষ্ট স্বভাবের এই ভগৎ সিং-এর ছবিই আমার মনে ছাপা হয়ে আছে

আমার লাহোর যাওয়ার আগে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু কতদিন আগে তা মনে নেই, সেখানে 'নওজওয়ান ভারত সভা' গঠিত হয়েছিল। বাইরে থেকে দেখে আমি যা বুঝেছিলেম, উদ্যোক্তাদের ভিতরে সকল মতের ও সকল পথের লোকেরা ছিলেন। তাতে ন্যাশনালিস্টরা ছিলেন, কমিউনিস্টরা ছিলেন, আর ভগৎ সিং ও তাঁর বন্ধুরাও ছিলেন। তার মানে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাও ছিলেন 'নওজওয়ান ভারত সভা'য়। বয়সের দিক হতে বিশ বছরের নবযুবকেরা ছিলেন. তিরিশের কোঠায়

যুবকেরা ছিলেন, আর চল্লিশের কোঠায় লালা কেদারনাথ সেহগলও ছিলেন। কেউ কেউ উৎসাহের আতিশয্যে বলে ফেলেন যে, ভগৎ সিংই ছিলেন 'নওজওয়ান ভারত সভা'র প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু আমি লাহোরে যা শুনেছি তাতে এই বয়ান ইতিহাস-সম্মত নয়।

ভগৎ সিং তখন ভগবতীচরণ বোহারার রাজনীতিক প্রেরণায় চলতেন। আমি 'নওজওয়ান ভারত সভা'র বিশিষ্ট সভ্যদের মুখে একথা শুনেছি। সভার কার্য-নির্বাহক কমিটির বৈঠকে ভগবতীচরণের প্রেরণায় ভগৎ সিং মাঝে মাঝে সন্ত্রাসবাদী প্রস্তাব উপস্থিত করতেন, কিন্তু সভার বহু মত তখন সভাকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে পরিণত করতে চান নি। ক্রমশঃ সভার কাজে ভগৎ সিং এর উৎসাহ কমে যায়। আমি লাহোরে গিয়ে শুনলাম কেউ কেউ বলাবলি করছেন, 'ভগৎ সিংকে আলস্যে ধরেছে।' আসলে আলস্য তাঁকে ধরে নি, গোপন সংগঠনের কাজে তিনি তখন বেশি আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

'নওজওয়ান ভারত সভা' সকলের নিকট হতে চাঁদা নিতেন। একদিন আমি দেখেছিলেম রামচন্দ্র কাপুর। তিনি তখন নিজেকে কমিউনিস্ট বলে দাবি করতেন। সারফজ্‌ল্‌ই হুসেনের সঙ্গে টেলিফোনে সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট করছিলেন। সারফজ্‌ল্‌-ই-হুসেন তখন গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। আমি আশ্চর্য হয়ে রামচন্দ্র কাপুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের কী প্রয়োজন? কাপুর বলেছিলেন, 'নওজওয়ান ভারত সভা'র জন্যে তাঁর নিকট হতে চাঁদা আদায় করব।

বাংলাদেশে এভাবে চাঁদা আদায় করলে তখনকার দিনে কেউ ভাল চোখে দেখতেন না।

পুরো জানুয়ারী মাস আমি লাহোরে থাকতে পারি নি। ১৯২৭ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে কমরেড সাপুরজী সাকলাৎওয়ালা বম্বে পৌঁছবেন জানতে পেরে তার দু'তিন দিন আগে আমি বম্বে চলে গিয়েছিলাম। যতদিন আমি লাহোরে ছিলেম, ততদিন ভগৎ সিং

আমার সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। প্রয়োজন হলে আমার দু'একখানা পত্রও তিনি টাইপ করে দিয়েছেন। তাঁদের দলের আর কে কে তখন লাহোরে ছিলেন তা জানিনে, তবে, রামচন্দ্র কাপুরের ছোটভাই বংশীর সঙ্গে এসে শুকদেব একদিন আমার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলেন।

লাহোরে থাকার সময়ে আর একটি ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছিলাম। ভগৎ সিং সহ কিছু সংখ্যক যুবক (বেশীর ভাগ ন্যাশনাল কলেজে পড়ছিলেন) লালা লাজপৎ রায়ের কঠোর সমালোচনা করে মুদ্রিত ইশতিহার বিতরণ করেছিলেন। এই ইশতিহারের ভাষা ছিল ব্যক্তিগত শত্রুতাপূর্ণ, অন্তত আমি তা বুঝেছিলাম। কিন্তু ১৯২৮ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে ব্যাপারটি অন্য দিকে ঘুরে গেল। সেদিন সাইমন কমিশন লাহোরে পৌঁছেছিল। লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে সেদিন কমিশনের বিরোধিতা করে রাস্তায় মিছিল বার হল। তার উপরে পুলিস লাঠি-চালনা করে। তাতে লালাজীও আঘাত পান।

পরের মাসে, অর্থাৎ নভেম্বরের ১৭ই তারিখে লালাজী মারা গেলেন। ৩০শে অক্টোবরের লাঠির আঘাতেই তাঁর মৃত্যুর কারণ এটা সকলে ধরে নিলেন। প্রতিবাদের ঝড় উঠল দেশে। ভগৎ সিং এর বিপ্লবী দল স্থির করলেন যে, লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ তাঁরা নেবেন। লাহোরের পুলিসের অ্যাসিস্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্যান্ডার্সকে তাঁরা হত্যা করলেন, যদিও তাঁদের হত্যা করার কথা ছিল পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে। ফলে ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরু ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ-বিসর্জন দিলেন। আরও অনেকের লম্বা লম্বা কয়েদ হল।

যতটা মনে পড়ে ১৯২৬ সালে (আরও আগেও হতে পারে, আমার হাতের কাছে এখন কোনো দলিল নেই) অমৃতসর হতে গুরুমুখী হরফে মুদ্রিত 'কিরতি' নামক পাঞ্জাবী ভাষার একখানি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালের নভেম্বর কিংবা

ডিসেম্বর মাসে যখন পাঞ্জাবে 'কিরতি কিসান পার্টি' (দি ওয়ার্কারস্ অ্যাণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টি অফ দি পাঞ্জাব) গঠিত হল, তখন মাসিক 'কিরতি' হল তার মুখপত্র। কিন্তু পাঞ্জাবে পাঞ্জাবী ভাষা সকলেই বলতেন ও বুঝতেন। তবে, তাঁরা স্কুলে পড়তেন উর্দু ভাষা। আর, গুরুমুখী হরফ পড়তে পারতেন মূলত শিখেরা। এই কারণে অনেক বেশী পৃষ্ঠা-সংখ্যাসহ 'কিরতি'র মাসিক উর্দু সংস্করণ বার করা হয়। ১৯২৮ সালে উর্দু 'কিরতি'তে সোহন সিং জোশের সহকারীরূপে ভগৎ সিং কিছুকাল কাজ করেছিলেন। কর্মক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে ভগৎ সিং-এর প্রথম ও দীর্ঘ যোগাযোগ ঘটেছিল 'নওজওয়ান ভারত সভা'য়, আর শেষ যোগাযোগ ঘটেছিল উর্দু 'কিরতি'তে।

১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ তারিখে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সংস্রবে আমরা অনেকে গ্রেফতার হই। মীরাট ডিস্ট্রিক্ট জেলে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। ক্যাণ্টনমেণ্টে পেশকার গার্ডেন হাউসে (ইস্টার্ন জোনের জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং-এর বাড়ি) কোর্টের কাঠগড়া ইত্যাদি তৈয়ার হচ্ছিল, খানাতালাশীর সময় বিভিন্ন স্থানে যে-সব পুঁথি-পুস্তক ও দলিল-পত্র পুলিস আটক করেছিল, সে সব তখনও মীরাটে এসে পৌছয়নি। কাজেই অপেক্ষা আমাদের করতেই হচ্ছিল।

হঠাৎ একদিন (৯ই এপ্রিল, ১৯২৯) সকালের খবরের কাগজে ছাপা হল যে, আগের দিন পাবলিক সেফটি বিলের আলোচনার সময়ে দর্শকের গ্যালারি হতে দুটি বোমা কেন্দ্রীয় এসেম্বলিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং যাঁরা বোমা নিক্ষেপ করেছেন তাঁরা ধরা দিয়েছেন। তাঁদের নাম ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। আমি মনে মনে ভাবলাম, কি কাণ্ড রে বাবা! বটুকের পেটে পেটে এত বুদ্ধি ছিল?

১৯২৮ সালে মজুর আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল। আমাদের একেবারেই ফুরসত নেই। একদিন একজন এসে আমাকে বললেন যে একটি ছেলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, বাঙালী হলেও হিন্দী ভালো জানেন। ছোটবেলা হতে কানপুরে মানুষ হয়েছেন।

লেখাপড়াও করেছেন হিন্দী স্কুলে। আমি খুশী হলাম। বন্ধুটিকে বললাম, যেমন করেই হোক ছেলেটিকে একদিন আমাদের আফিসে নিয়ে আসুন। বন্ধু নিয়ে এলেন বটুকেশ্বর দত্তকে। লোক বর্ধমানের হলেও কানপুরের বাসিন্দা। বয়স ১৮ হতে ২০ বছরের হবে। হয়তো কিছু বেশীও হতে পারে। কলকাতার বড়বাজারে কোন এক দর্জি স্কুলে কাটিং-এর কাজ শিখছিলেন, থাকতেন হাওড়ায় এক মেসে। বটুক আমাদের সাহায্য করেছিলেন। হিন্দী ইশতিহার লিখে তো দিয়েছিলেনই, হাওড়ায় স্ক্যাভেঞ্জারের ধর্মঘটের সময়ে আমাদের মিটিং-এ বক্তৃতাও দিতেন। তাঁর মেসটাও আমি চিনে রেখেছিলাম, যেন দরকার হলে তাঁকে ডাকা যায়।

জেল হতে মুক্তি পাওয়ার পরে অন্য অনেকের মত বটুকেশ্বর দত্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন নি। কিন্তু তিনি তাঁর আন্দামানের সহবন্দী দেবকুমার দাস ও রণধীর দাশগুপ্তর মারফতে আমায় অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে বিহারের তাঁর এক বন্ধুকে যেন আমরা কমিউনিস্ট পার্টিতে নিই। তাঁর বন্ধুর বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আমাদের নিকটে এসেছে, সে-সব একেবারেই ভিত্তিহীন। বটুকেশ্বরের বন্ধু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে স্থান পেয়েছিলেন।

আমি আবার 'নওজওয়ান ভারত সভা'র কথা বলছি। এই সংগঠনের আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে অন্য কোন যুবসংগঠন 'নওজওয়ান ভারত সভা'র মত এত বেশী রাজনীতিক প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে নি। বিভিন্ন বিপ্লবীর সহিত ব্যক্তিগত সংযোগের ভিতর দিয়ে ভগৎ সিং রাজনীতিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি রাজনীতিতে বিকশিত হয়েছিলেন 'নওজওয়ান ভারত সভা'র মারফতে।

• অগ্নিযুগ সংখ্যা উল্টোরথ পত্রিকার সৌজন্যে

সেদিনের স্মৃতি

অর্ধেন্দু গুহ

[আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বসু। তুমি তো একেবারে শিশু দেখছি। সেই থেকে সবার কাছেই তিনি শিশু। মাস্টারদার কাছেও।]

১৯৩০ সালে ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পর আমরা শতাধিক বালক ও যুবক গ্রেপ্তার হয়েছিলাম। যুব-বিদ্রোহের প্রায় ৩ মাস পর অন্যতম প্রধান নায়ক অনন্ত সিং আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর আত্মসমর্পণের পক্ষ-কালের মধ্যে শতাধিক ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আমাদের ৩২ জনের নামে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও অন্যান্য অপরাধের জন্য চার্জসিট গঠন করে স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচারের জন্য প্রেরণ করে। বাকী সকলকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ট্রাইবুনালে বিচার শুরু হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে আমাদের ৬ জনকে ১০,০০০ হাজার টাকা করে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। এই ৬ জনের মধ্যে আমি সর্ব কনিষ্ঠ ছিলাম। তখন আমার বয়স মাত্র ১৬ বৎসর ছিল।

ট্রাইবুনালে বিচার চলাকালীন অনন্তদা প্রভৃতি বিচারাধীন বন্দীদের জেলখানা হতে সশস্ত্র প্রহরাধীনে আদালত-গৃহে এনে বিরাট এক লোহার খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হত। আমরা জামিনে মুক্ত ৬ জন বন্দী নিজ নিজ গৃহ হতে কোর্টে এসে ১০টা হতে ৫টা পর্যন্ত মামলা চলাকালীন ঐ একই খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ থাকতাম।

গভর্ণমেণ্টের আমাদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, অনন্তদা নিশ্চয় জামিনে মুক্ত বন্দীদের মাধ্যমে মাস্টারদার সঙ্গে

যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করবেন, তখন পুলিস আমাদের অনুসরণ করে মাস্টারদা ও অন্যান্য পলাতক বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়স্থলে হানা দিয়ে তাদের বন্দী করতে সক্ষম হবে। সেজন্য পুলিস আমাদের জামিনে মুক্ত সকলের পেছনে অনেক গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিল, এবং আমাদের গতিবিধির প্রতি কঠোর নজর রেখেছিল। তা সত্ত্বেও আমাদের বিচার আরম্ভ হবার কিছুদিনের মধ্যেই মাস্টারদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ সাধিত হয়।

মাস্টারদা ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের গোপন আশ্রয়স্থান ছিল চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ১০।১১ মাইল দূরে কর্ণফুলী নদীর অপর তীরে পর্বতশ্রেণীর সন্নিকটে বনবসতিপূর্ণ গ্রামসমূহে। মাস্টারদা এবং অনন্তদা জামিনে মুক্ত ৬ জনের মধ্যে আমাকেই তাঁদের যোগসূত্রের মাধ্যম ব্যক্তি মনোনীত করেছিলেন।

সাধারণতঃ আমি আমাদের মোকর্দমা বন্ধের দিন মাস্টারদার গোপন আশ্রয়স্থলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। কোর্ট ছুটি হওয়ার পর রাত্রে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করার জন্য গিয়ে ভোর হওয়ার পূর্বেই প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে ফিরে আসতাম।

মাস্টারদার সঙ্গে গোপন আশ্রয়স্থানে দেখা করতে যাবার সময় বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পোশাক পরিবর্তন করে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের অগোচরে আমাকে যেতে হত।

চট্টগ্রাম শহর হতে গ্রামে মাস্টারদার আশ্রয়স্থানে যেতে নদীপথে নৌকায় ৩।৪ ঘন্টায় ১০।১২ মাইল পথ অতিক্রম করতে হত। গ্রামে গিয়ে সোজাসুজি মাস্টারদার আশ্রয়স্থানে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হত না। কারণ, আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থানের নিরাপত্তার জন্য তা গোপন রাখা হত।

আমি গ্রামে পৌছনোর অল্প সময়ের মধ্যে যাতে মাস্টারদা ও নির্মলদার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি, তার জন্য বিভিন্ন গ্রামে কয়েকটি বাড়ি আমার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, আমি সেখানে গিয়ে পৌছনোর

সঙ্গে সঙ্গেই মাস্টারদার কাছে আমার উপস্থিতির খবর গিয়ে পৌঁছত।

মাস্টারদা তৎক্ষণাৎ তাঁর বিশ্বাসী বাহককে আমাকে গুপ্তস্থানে নিয়ে যাবার জন্য পাঠাতেন। তার সঙ্গে ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে আমি মাস্টারদার কাছে গিয়ে হাজির হতাম।

সাধারণতঃ গভীর রাত্রে মাস্টারদা ও নির্মলদার সঙ্গে মিলিত হতাম। আমাদের আলোচনার বৈঠক বসত সাধারণতঃ (১) কোন শ্মশানভূমির সন্নিকটে (২) কোন নির্জন মন্দিরে (৩) কোন দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মাঝখানে (৪) কোন নির্জন জঙ্গলাকীর্ণ দীঘির পারে অথবা নির্জন পাহাড়ের পাদদেশে।

ট্রাইবুনালে আমাদের মামলা আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন পরেই চন্দননগরে টেগার্টের বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষের পর চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা গণেশ ঘোষ এবং লোকনাথ বল ধৃত হয়ে চট্টগ্রামে আমাদের সঙ্গে বিচারের জন্য আনিত হন।

চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহের ৬ জন অধিনায়কের ৩ জন, যথা—সূর্য সেন (মাস্টারদা), অম্বিকা চক্রবর্তী ও নির্মল সেন এবং আরও প্রায় ২০৷২৫ জন যুব-বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবী চট্টগ্রামের বিভিন্ন গ্রামে আত্মগোপন করেছিলেন।

অনন্তদা ও গণেশদা জেলখানা হতে আমার মাধ্যমে আত্মগোপনকারী মাস্টারদা ও নির্মলদা সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে পরবর্তী মিলিত কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। সেই কর্মসূচী অনুসারে প্রথমেই চট্টগ্রাম জেলখানার মধ্যে রিভলবার, পিস্তল, বোমা এবং ডিনামাইট আমদানী করে জেলখানার দেওয়াল উড়িয়ে দিয়ে মাস্টারদার প্রধান আত্মগোপনকারী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবার প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়, এবং চট্টগ্রাম শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ও পদস্থ ইয়োরোপীয়ান অফিসারদের বাসস্থানের মাটির নিচে, ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের নিচে, ডিনামাইট বসিয়ে ঐ সব জায়গা উড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

অনন্তদা ও গণেশদা জেলখানার কয়েকজন ইয়োরোপীয়ান ও

ভারতীয় পাহারাদারকে বশীভূত করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাদের মারফৎ জেলখানার মধ্যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও ডিনামাইট প্রভৃতি পাঠাতাম।

মাস্টারদা ও নির্মলদা বাহিরে পলাতক ঘাঁটি হতে ঐ সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র আমাকে সরবরাহ করতেন। ১৯৩০ সাল হতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত দুই বৎসর আমার মাধ্যমে জেলে আবদ্ধ নেতাগণ ও পলাতক নেতাগণের মিলিত কর্মসূচী অনুযায়ী অনেক বিপ্লবী কর্মপন্থা কার্যকর করা হয়েছিল, কিন্তু পুলিশ বহু চেষ্টা করেও বিপ্লবীদের গোপন আস্তানার কোন সন্ধান পায় নি।

সেই সময়ে চট্টগ্রামের সমস্ত গ্রামাঞ্চল পুলিস, গোয়েন্দা ও মিলিটারীতে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক গ্রামেই মিলিটারী ঘাঁটি বসানো হয়েছিল, কিন্তু চট্টগ্রামের জনসাধারণের অসীম দেশপ্রেমের জন্য বহু অত্যাচার ও লাঞ্ছনা পাওয়া সত্ত্বেও পুলিস বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় নি। বিশেষ করে তখনকার চট্টগ্রামের ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী এবং মহিলারা বিপ্লবীদিগকে সর্বপ্রকারে সাহায্য ও আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। প্রত্যেকটি গ্রাম এক একটি বিপ্লবী দুর্গে পরিণত হয়েছিল।

[illegible]

রক্তকরবী

মণিলাল অধিকারী

[যুগান্তর দলের সদস্য। প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক হরিকুমার চক্রবর্তীর মন্ত্রশিষ্য। বর্তমানে খ্যাতিনামা শিশু সাহিত্যিক।]

রক্তকরবী থোকা থোকা আর লাল জবায় গাছ লাল। আধখানা চাঁদের মত করে সাজানো — ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কেয়ারি করা রক্তকরবী আর জবার গাছ।

বেষ্টনীর মধ্যেটা ঘাসকাটা যন্ত্র দিয়ে ছাঁটাই করা সবুজ দূর্বার কার্পেট। বিশাল বাগানবাড়ির দক্ষিণ দিকের পুকুর পাড়ের এই মনোরম স্থানটুকু আজও অম্লান হয়ে আঁকা রয়েছে আমার কৈশোর জীবনের স্মৃতিপটে।

একটি একটি করে কতদিন চলে গেছে। বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে—ধুয়ে গেছে, মুছে গেছে অনেক কিছু। তবু আজও ভুলিনি পুকুর পাড়ের সেই মনোরম স্থানটুকু।

কত নিঃশব্দ নিঝুম দুপুর কাটিয়েছি পুকুরপাড়ের ঐ গাছ দিয়ে ঘেরা জায়গাটায়। ছাঁটাই করা নরম ঘাসের উপর আমরা বসেছি, শুয়েছি, আনন্দে ডিগবাজি খেয়েছি। হেসেছি-কেঁদেছি, আর শুনেছি দেশ জননীর পায়ে নিজের জীবন বলি দেওয়া শহীদদের অমর জীবন কাহিনী। বেসুরো কণ্ঠে গেয়েছি—"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান......"

দক্ষিণ কলিকাতা সে সময় এখনকার মত ঘিঞ্জি শহর হয়ে ওঠেনি। উপকণ্ঠে তখনও চাষবাস হত। শেয়াল ডাকত ভর সন্ধ্যেবেলায়। আশে পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল টাকাওয়ালা লোকেদের বাগানবাড়ি। এইরকম একটা বাগানবাড়ি ছিল আমাদের লীলাভূমি। বাড়ির মালিক দিনের বেলা বড় একটা আসতেন না। সন্ধ্যের পরই ছিল তার আনাগোনা।

নির্জন দুপুরটা ছিল আমাদের গোপন আড্ডার মিলন সভা। প্রথম যেদিন গেলাম বাগানে তখন কতই বা বয়স হবে আমার? বড় জোর পনের। স্কুলের দশম শ্রেণীতে পড়ি, ১৯২৮ সালে।

বছর খানেক আগেই বিপ্লবী দলের আওতায় এসে পড়েছি। অবশ্য দাদাদের মুখেই শোনা। আমরা যুগান্তর দলের হরিকুমার চক্রবর্তীর গ্রুপের। বিপ্লবী দল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা কি তখন ছিল আমাদের? বোধহয় না। তবে আমাদের মনে জাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল পরাধীনতার জ্বালা, দেশাত্মবোধ, আর দেশকে স্বাধীন করার উজ্জ্বল স্বপ্ন। প্রস্তুত হতে হবে আমাদের বিদ্রোহের জন্য। লড়াইয়ের বদলে লড়াই, মারের বদলে মার। চাই শক্তি, চাই অস্ত্র। অস্ত্রের বলে বলীয়ান ব্রিটিশ রাজকে অস্ত্র দিয়েই নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে ভারতবর্ষ থেকে। অগ্নিগোলার বদলে অগ্নিগোলা। অস্ত্রের বদলে অস্ত্র।

তিলকদার কণ্ঠে উত্তেজনা ঝরে পড়ত। বলতেন, ভাইসব কাজটা কি এত সহজ? একটুও না—একটুও না।

আমাদের কাঁচা মনে প্রশ্ন জাগত—তাহলে?

পুকুরপাড়ের রক্তকরবীর ছায়ায় বসে আকাশের দিকে মুখ করে শিবনেত্র হয়ে যেতেন তিলকদা। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তিলকদার চোখের দৃষ্টি সোজা এসে পড়ত আমাদের উপরে। নিঝুম-নিঃশব্দ পুকুরপাড় গম গম করে উঠত তিলকদার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে—'সাহস-শক্তি-ধৈর্য্য আর নিষ্ঠা, এই দিয়েই আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলব। আর সে জন্যে চাই প্রস্তুতি। প্রস্তুত হতে হবে। তোমাদের বুকের

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিয়ে আরও তরুণ প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হবে। গড়ে তুলতে হবে ছোট ছোট দল। আর এই ছোট ছোট দলগুলিই একদিন বিন্দু বিন্দু জলকণা দিয়ে গড়া সমুদ্রে পরিণত হবে।'

কত চিন্তাই না আমাদের মনে জড় হত—কত স্বপ্নই না দেখতাম তখন। স্বাধীনতার জন্য দেব আমাদের তাজা প্রাণ। দেব তাজা লাল রক্ত। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে রাঙি[redacted]দেব দেশ-জননীর রাঙা পা। ছিনিয়ে আনব দেশের স্বাধীনতা। আমরা মুক্ত........আমরা স্বাধীন।

পুলিসের সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে খুব গোপনে আমরা প্রবেশ করতাম বাগানে। জীবনের সে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। নিজেকে মনে হত কোন এক রোমাঞ্চকর কাহিনীর নায়ক।

কোন একটা ছুটির দিন। সেদিন আমার জীবনে প্রথম এল রক্তকরবীর ডাক। পুকুরপাড়ের গোপন স্থানটির নাম দিয়েছিলাম রক্তকরবী।

আমার ঠিক উপরের দাদার কাছ থেকে আগেই নির্দেশ পেয়েছিলাম কি উপায়ে বাগানে প্রবেশ করতে হবে। বড়রাস্তা ছেড়ে বাগানবাড়ির নিজস্ব লাল নুড়ি ঢালা পথ দিয়ে দুরু দুরু বুকে এগিয়ে চললাম গেটের দিকে।

বন্ধ গেটের একপাশে ইয়া পালওয়ান দারওয়ানজী টুলের উপর বসে গানের সুর ভাঁজছিলেন,—আমাকে দেখে একগাল হেসে বললেন,—ডর নেই আছে খোঁকাবাবু, চলিয়ে যান।

ডর না করবার মতই চেহারা বটে দারওয়ানজীর। শঙ্কিত মনে এগিয়ে চললাম বাগানের পিছনের দিকে। ছোট্ট একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। মেথরদের যাওয়া আসার দরজা বোধ হয় এটা।

দরজায় কয়েকটা টোকা মারতেই দরজা খুলে গেল। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিলকদা।

বড় বড় চোখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম তিলকদার দিকে।

তিলকদার অমন সুন্দর শক্ত সমর্থ দেহটাকে কে যেন ডাণ্ডার ঘা মেরে মেরে বাঁকা চোরা করে দিয়েছে। ঘাড়টা একপাশে এত বেঁকে গেছে যে সোজা করবার কোন উপায় নেই। একা পেয়ে একদিন তিলকদাকে প্রশ্ন করেছিলাম,—তিলকদা আপনার ঘাড়টা অমন করে বেঁকে গেল কি করে? অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন তিলকদা—পুলিসের মারের চোটে ঘাড়টা বেঁকে গেল ভাই। ওদের হাত থেকে কিভাবে যে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম সেদিন, সেটাই একটা রহস্য। তিলকদা লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। পরনে ময়লা খাট ধুতি আর গেঞ্জী। ঠোঁটে সেই চির পরিচিত হাসি।

—তিলকদা আপনি এখানে এ-বেশে?

রহস্যময় হয়ে উঠলেন তিলকদা। জিজ্ঞাসা করলেন,—তিলকদা? সেটি কে অছি? মু বাগানের মালী। নাম অছি বনমালী।

তারপর সে কি হাসি। হাসিতে ফেটে পড়লাম দুজনে।

বকুলতলীর আসরে ছোট বড় মিলে আমরা মাত্র আটজন সভ্য ছিলাম। আসরের প্রাণ ছিলেন তিলকদা। তিনি ছিলেন বক্তা আর আমরা শ্রোতা। আমাদের শোনান হত বিপ্লবীদের রোমাঞ্চকর সব কাহিনী। বিপ্লবমূলক বই পড়তাম আমরা বকুলতলীর ছায়ায় বসে। একে একে পড়ে শেষ করলাম "নির্বাসিতের আত্মকথা, পথের দাবী, ফাঁসির সন্তান, কারাকাহিনী, বিনয়-বাদল-দীনেশ, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, বাঘাযতীন, ভগৎ সিং" বইগুলি সবই ইংরেজ সরকার সে সময় বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। এর যে কোন একটি বই কারো কাছে পেলে সরকারি আইনে তার কম করে দুবছর জেল হত।

তিলকদার আদেশে আমরা দলগঠনের কাজে লেগে গেলাম। দলের সভ্য তৈরী করতাম অত্যন্ত গোপনে। আশেপাশে পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট লাইব্রেরী, ব্যায়ামাগার, আর স্কাউট ট্রুপ গঠন করেছিলাম।

আমরা কাজ শুরু করেছিলাম বেশ একটু বড় এলাকা জুড়ে। নতুন নতুন ছেলে আসতে লাগল আমাদের দলে

আমাদের উপর পুলিসের নজর পড়ল। পুলিসের নজর এড়াবার জন্যে কিছুদিন কাজ বন্ধ করে দিয়ে স্কাউটিং আর লাইব্রেরী নিয়ে মেতে উঠতাম। সকাল সন্ধ্যে রাস্তায় রাস্তায় স্কাউটের পোষাক পরে প্যারেড করতাম, আর ছুটির দিনে "লঙ মার্চ" করে দশ বিশ মাইল হেঁটে সুদূর গ্রামে চলে যেতাম স্কাউট দল নিয়ে। সাধারণ মানুষ ভাবত আমরা ভীষণ রকম রাজভক্ত প্রজা। কিন্তু আসলে আমরা ছিলাম এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

শেষ পর্যন্ত রক্তকরবীর খবর পুলিশের সজাগ কানে গেল। সেদিন হঠাৎ খবর এল, এখুনি তিলকদার সঙ্গে দেখা কর। প্রয়োজন খুবই জরুরী।

তিলকদার বাড়িতে হাজির হলাম সঙ্গে সঙ্গে। তিনি তখন থাকতেন তাঁর দাদার বাড়ির একটা ছোট্ট ঘরে।

ঘরে ঢুকে দেখি তিলকদা বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলাম,—কি হয়েছে আপনার? তিলকদা উহু-আহা থামিয়ে হেসে বললেন, সে কোরে—আর সবাই জানে আর তুই জানিস নে? আমি বাতের ব্যথায় তুমাস শয্যাশায়ী।

হাসতে হাসতে বললাম,—তু'দিন আগেও জানতাম না, এইমাত্র আপনার মুখে শুনলাম।

বেশ কয়েক মিনিট স্থির নেত্রে আমার চোখে চোখ রাখলেন তিলকদা। ওর চোখের দৃষ্টি যে এত তীক্ষ্ণ আর তীব্র অনুসন্ধানী আগে কোনদিন লক্ষ্য করিনি।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নিঃশব্দে। তিলকদার চোখের দৃষ্টি ফিরে গেল মুক্ত আকাশের দিকে। কণ্ঠে উদাস সুর। ফিস্ ফিস্ করে বললেন,—'আজ থেকে রক্তকরবীর আসর বন্ধ করে দেওয়া হল,—সভ্যদের জানিয়ে দিবি। ওখানকার সব খবর পুলিশ পেয়ে গেছে খবর পেয়েছি—তু'একদিনের মধ্যে বাগানবাড়ি সার্চ করবে ওরা। ওখানকার মালপত্র পাচার করবার ভার তোর উপর দিলুম। যাদবপুরের স্মৃতিদির বাড়িতে গোপনে মালগুলি পৌছে দিতে হবে'। একটু থেমে

আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন,—মালপত্র চারটে প্যাকেট
করে গুছিয়ে বেঁধে রেখেছি। তোদের এক নম্বর লাইব্রেরীতে আজ
দুপুরে কোন একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবি। একজন পুরানো কাগজ
বিক্রীওলা পিঠে বোঝাই ঝুলি নিয়ে ঠিক দুপুরে ওখানে হাজির হবে।
সে তোর কাছে কিছু পুরান বই বিক্রি করতে চাইবে। তুই জিজ্ঞাসা
করবি—কি বই আছে? সে জবাব দেবে রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী"
আরও অনেক ভাল ভাল বই। তুই বই কেনার ইচ্ছে প্রকাশ করবি
আর তাকে ঢুকিয়ে নিবি লাইব্রেরী ঘরে। ঘরে ঢুকেই সে তোকে
আমার পাঠান চারটে প্যাকেট দিয়ে দেবে। এরপর আমার কাজ
শেষ। তোর কাজ শুরু।

বন্দোবস্তটা সন্ধ্যার আগেই করে ফেললাম। আমাদের
স্কাউটদলের ট্রুপ লীডার স্বয়ং আমি। দলের সবাইকে খবর দিলাম—
আগামীকাল দলের রুটমার্চ। মার্চ শেষে ফাঁকা মাঠে পিকনিক—
মানে, খিচুড়িভোগ।

পরদিন সকালে আমার স্কাউট দল মার্চ করে চলল গড়িয়াহাট
রোড ধরে ঢাকুরিয়া রেল ক্রসিং পেরিয়ে। [illegible] স্কাউটের
পোষাক সবার অঙ্গে। হাতে লাঠি, পিঠে বাঁধা রয়েছে হ্যাভারস্যাক্।
আমার পিঠের হ্যাভারস্যাকটা বেশ একটু ফুলে উঠেছে। ওর ভেতর
আছে ত্রিলোকদার পাঠান চারটে প্যাকেট। অবশ্য হ্যাভারস্যাকের
মুখের ফাঁকা অংশ দিয়ে আলু, টমাটো আর পেঁয়াজ উঁকি ঝুঁকি
মারছে। ...লেফ্ট্...রাইট্...লেফ্ট্...।

অবিশ্রান্ত মুখে কমাণ্ড করে চলেছি, আর আমার স্কাউট দল তালে
তালে পা ফেলে সদর্পে এগিয়ে চলেছে।

সামনে পুলিসের আউট-পোষ্ট। আদেশ দিলাম, গাও ইংরেজ
রাজের জয়গান। দুটি বিউগিল তীক্ষ্ণ সুরে বেজে উঠল। তারপর
মিলিত কণ্ঠে শুরু হল গান···

"Long live the king···God save the king".

যাদবপুর অঞ্চলে তখন এখনকার মত ঘিঞ্জি শহর হয়নি। শুধু

টেক্‌নিক্যাল কলেজের সামনে গড়িয়াহাট রোড থেকে পশ্চিমমুখো একটা নতুন রাস্তা বেরিয়েছে। এই রাস্তার দুধারে নতুন তৈরী হয়েছে খান কুড়ি বাড়ি। রাস্তার শেষ প্রান্তের শেষ বাড়িতে থাকতেন স্মৃতিদি। তার পরই ফাঁকা মাঠ। আর সেই মাঠে পৌঁছে আমাদের যাত্রার শেষ হল। আমি আনন্দে চীৎকার করে আনন্দ হাঁক ছাড়লাম ...জিলিপিওলা, দলের সবাই একসঙ্গে প্রাণ কাঁপান শব্দে চীৎকার করে উঠল...জি...ই...ই...ই...।

আশেপাশের সবাই জেনে গেল একদল স্কাউট এসেছে পিক্‌নিক্‌ করতে। আমাদের চীৎকার শুনে স্মৃতিদি দোতালার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

আমি এগিয়ে গেলাম বারান্দার নীচে। ওপর দিকে তাকিয়ে বললাম,—দিদি আপনার বাড়ির কল থেকে একটু খাবার জল দিলে আমরা সবাই খুব খুশী হব।

দিদি উত্তর দিলেন,—নিশ্চয় জল দেব—এসো ভাই।

আমি হাঁড়ি হাতে করে ঢুকে পড়লাম স্মৃতিদির বাড়ির অন্দর মহলে। আর অত্যন্ত সহজে তিলকদার দেওয়া চারটে প্যাকেট ওর হাতে দিয়ে দিলাম। উনি আমার শূন্য হাভারস্যাক্‌ আলু পেঁয়াজ দিয়ে ভরে দিলেন। তারপর আমার গালেটিপে আদরে চড় কসিয়ে বললেন...সাবাস ভাইটি সাবাস...

যতই রাজভক্ত প্রজা সেজে গা ঢাকা দিয়ে দূরে বেড়াই না কেন "এস. বি." পুলিসের সন্ধানীদৃষ্টি এড়াতে পারিনি। সহসা একদিন হুম্‌ করে দু'জন "এস. বি." অফিসারের শুভাগমন হল আমাদের বাড়িতে। আমার সৌভাগ্য—বাবা বাড়িতে ছিলেন না। অফিসারদের অভ্যর্থনার ভার নিয়েছিলেন কাকা। চা আর জলযোগের ব্যবস্থা ভালরকমই করেছিলেন তিনি। জলযোগের কারণও ছিল একটা। কারণ দুই অফিসারই কাকার বহুদিনের পুরাণ বন্ধু। কাকার সঙ্গে গল্প-গুজব শেষ করে আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করলেন অফিসাররা, আর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তাদের কেস ডায়েরী বুকে লিখে নিলেন।

তারপর ওদের মধ্যে, একজন আমার কাকাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—তোর ভাইপো, কাজেই এটাকে নিয়ে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করব না। তবে ওর যদি সুমতি না হয়, আবার যদি বিপ্লবীদলের পিছু পিছু ঘুর ঘুর করে, তাহ'লে ওকে একদিন আমাদের অফিসে নিয়ে গিয়ে এইসা ধোলাই দেব যে বিপ্লব-টিপ্লব একদিনেই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে।

আমার দিকে তাকিয়ে হা...হা...হা করে হাসতে লাগলেন অফিসার দুজন।

মনে অনেক আশা অনেক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দিন গুনছি। কবে আসবে সেই অনাগত শুভদিন। যেদিন আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব স্বাধীনতার যুদ্ধে! ওপর মহলের নেতারা সবাই জেলে। আমরা শুধু দল গঠনের কাজ করে চলেছি। শেষে একদিন শুভ খবর এল। আমাদের দলের সর্বভারতীয় নেতা হরিকুমার চক্রবর্তী জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। আছেন কোদালিয়ার বাড়িতে। সময় বুঝে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।

দু'মাস পরে আমাদের ডেকে পাঠালেন। আমরা চারজন আলাদা আলাদা হয়ে ঠিক দুপুরে হরিদার বাড়িতে পৌঁছলাম। অতি সাধারণ পুরান একতলা পাকা বাড়ি। পলেস্তারা খসা বৈঠকখানা। চেয়ার টেবিল নেই। মেঝেতে মাদুর বিছান। হরিদা বসেছিলেন মাদুরে। আমরা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একমুখ হেসে বললেন,—আয়...আয়...বসে পড় সব। তার কণ্ঠে এমন একটা আন্তরিকতার সুর, যেন আমরা তার বহুদিনের পরিচিত।

মানুষটিকে দেখতে লাগলাম তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে, মাঝারি সাইজের গড়ন, শক্ত সমর্থ দেহ। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে মোটাসোটা। পরনে মোটা খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী। মুখে সরল শিশুর হাসি। চোখের দৃষ্টি দুঃসাহসী তীক্ষ্ণ আর প্রাণবন্ত। প্রথম দর্শনে মানুষটিকে দেখলে মনে হবে অতি সাধারণ বাঙালী কেরানী।

আশ্চর্য, এরই বুকের মধ্যে লুকিয়ে আছে অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি। ইনিই হরিকুমার চক্রবর্তী। বাঙলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের প্রথম শ্রেণীর নেতা। দোর্দণ্ড দুঃসাহসী রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন, যাদুগোপাল মুখার্জী, বিপিন গাঙ্গুলীর সহকর্মী। প্রসিদ্ধ "ইন্দো জার্মান" ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা।

১৯১৫ সালের সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ বানচাল হয়ে গেল। রাসবিহারী চলে গেলেন জাপানে। শক্ত হাতে বাঙলার বিপ্লবী দলগুলির হাল ধরলেন বাঘা যতীন। জার্মানীর অস্ত্র-সাহায্যে বাংলাদেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করবার যে ষড়যন্ত্র হয়, তার সর্বদলীয় নেতা নির্বাচিত হল যতীন্দ্রনাথ। সেই বিরাট সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজনের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন হরিকুমার চক্রবর্তী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান "হ্যারি এণ্ড সন্স"-এর মাধ্যমে জার্মান কনসাল প্রদত্ত টাকা আসত। হ্যারি এণ্ড সন্সেই ছিল বিপ্লবীদের গোপন আড্ডা। পুলিশের নজর পড়ল বাটাভিয়া থেকে হাজার হাজার টাকার ড্রাফট্ আসছে কেন অর্ডার সাপ্লাই কোম্পানীর কাছে? ব্যাপারটা রীতিমত সন্দেহজনক। তল্লাসী চালাল পুলিশ। গ্রেপ্তার হলেন হরিকুমার চক্রবর্তী। তালা পড়ল 'হ্যারি এণ্ড সন্সের' দরজায়।

আমি যেন স্বপ্ন দেখছি আমার জন্মের অনেক আগে যে ইতিহাস ঘটে গেছে—সহসা তারা যেন প্রাণবন্ত হয়ে আমার চোখের সামনে ভাসছে।

বাস্তব জগতে ছিলাম না বোধহয় তখন। চোখে স্বপ্নের ঘোর। বড় বড় চোখে শুধু তাকিয়েছিলাম হরিদার দিকে।

হরিদা লক্ষ্য করছিলেন আমাকে। হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অমন করে কি দেখছিস ভাইটি?

আমি যেন স্বপ্নের ঘোরে উত্তর দিলাম "হ্যারি এণ্ড সন্স।" হাসল সবাই। আমি বেকুব। হরিদার চোখে উদাস দৃষ্টি।

এরপর কতবার কতভাবে দেখেছি হরিদাকে। যতবারই এই নিরহংকার, নির্লোভ, শক্তিমান, সদাহাসি-মুখে অগ্নিযুগের নায়কটিকে দেখেছি, ততবারই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়েছে।

এইখানেই আমাদের রক্তকরবীর ইতি টানাছ। এরপর আমি অন্যভাবে অন্য আদর্শে প্রভাবিত হয়েছি, সে আর এক কাহিনী।

ক্ষণিকের সান্নিধ্যে—সুভাষচন্দ্র

অনন্ত লাল সিংহ

[যুব বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নায়ক, যাঁর নাম করে চট্টগ্রামের শ্বেতাঙ্গ মহিলারা সেদিন দুরন্ত শিশুকে ভয় দেখাতেন—"Sleep baby sleep, Singh will not take you away.' দীর্ঘকাল কেটেছে সুদূর আন্দামানে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ, অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম, মহানায়ক মাষ্টারদা ইত্যাদি।]

১৯২৮ সাল। কলকাতায় নিখিল বঙ্গ কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সভাপতি। সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র। জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং রূপে অশ্ব পৃষ্ঠে তেজোদীপ্ত মূর্তি—স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সৈনিক ও অক্লান্ত যোদ্ধা। সুভাষের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, "বর্জন কর সাইমন কমিশনের সুপারিশ।—Dominion

Status আমাদের প্রয়োজন নেই। ভারতের একমাত্র দাবী—পূর্ণ স্বরাজ-পূর্ণ স্বাধীনতা চাই—স্বাধীনতায় আমাদের জন্মগত অধিকার"!

স্ফীত বক্ষ, উন্নত শির, প্রাণ প্রাচুর্যে উপচীয়মান জীবনপাত্র, অন্তরে তাদের পরাধীনতার জ্বালা, চক্ষে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ—সম্মুখে দণ্ডায়মান সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত বিশাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী—এই মহাপ্লাবনের বেগ কে রোধ করবে? **Dominion Status**-এর গৃহীত প্রস্তাব কি অন্তরের একমাত্র কাম্য—পূর্ণ স্বরাজের দাবীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারে?

কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হোল না। সমর সজ্জায় সজ্জিত ভাবীকালের এই সেনাবাহিনীর অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র, প্রস্তাবের ব্যর্থতাকে উপেক্ষা করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন—"করেঙ্গে ইয়্যা মরেঙ্গে।"

প্রায় এক যুগ পরে ভারতের পূর্বসীমান্ত মুহুর্মুহুঃ কামান গর্জনে ধ্বনিত করে ঘোষিত হোল—"ইংরেজ ভারত ছাড়!" বিজয়ী আজাদ হিন্দ ফৌজের রণবাদ্যে ও "জয়-হিন্দ" জয়ধ্বনিতে ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। "দিল্লী চলো", "দিল্লী চলো" সিংহনাদ আজাদ হিন্দ ফৌজের অপ্রতিহত গতিকে দুবার করে তুললো।

সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের বিরাট অধ্যায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ অংশ অধিকার করে আছে। সেই বৃহৎ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে আমরা পাই, বহুদল উপদলের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুভাষের আপোস-বিরোধের কাহিনী, সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ, নানাসময়ে বিনা বিচারে বন্দীত্বের ও কারাদণ্ডের বিবরণ, হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়া ও পরবর্তী ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীজীর বিরোধীতার সম্মুখীন হওয়ার কাহিনী, রামগড়ে পাল্টা কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন, সরকারের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে জার্মানীতে উধাও হওয়া এবং ডুবো জাহাজে আবার জার্মানী থেকে জাপানে আসা ও 'দিল্লী চলো অভিযান' সুরু করার বিস্ময়কর

অবিশ্বাস্য ঘটনাবলী। এই ব্যাপক ইতিহাসের অজস্র পাতায় সবার মত আমিও সুভাষের কর্মবহুল জীবনের গুরুত্বপূর্ণ চাঞ্চল্যকর বিবরণ খুঁজে দেখবো—বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করবো।

ইতিহাসের এই বিরাট অধ্যায়ের পাতায় পাতায় স্বাধীনতা সংগ্রামের অক্লান্ত যোদ্ধা এই মহানায়কের জীবন কাহিনী সকলকে আনন্দিত ও গর্বিত করে—আমিও তার ব্যতিক্রম নই। কিন্তু সৌভাগ্য বশে, ক্ষণিকের জন্য হলেও কয়েকবার এই মহানায়কের সান্নিধ্যে এসে যে স্বর্ণ খনির সন্ধান আমি পেয়েছি তা আজও আমার অন্তরের মণি-কোঠায় সযত্নে রক্ষিত আছে। এতদিন পরে আমার জীবনস্মৃতির ধূসর পাতা থেকে সেই অমূল্য সঞ্চয় প্রকাশের চেষ্টা করছি।

১৯৩৭ সালে আন্দামান হতে বাঙলার জেলে ফিরে এলাম। গান্ধীজী আমাদের সঙ্গে জেলে দেখা করলেন। সুভাষচন্দ্র তখন হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি—তিনিও আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই সময় দেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তিত। বাংলার শাসনভার ফজলুক হক্—সুরাবর্দীর উপর ন্যস্ত। গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র আমাদের কাছে একটি বছর সময় চাইলেন—ইতিমধ্যে আমরা মুক্তির দাবিতে যেন অনশন আরম্ভ না করি। মুক্তির ব্যাপারে চেষ্টা চালিয়ে যেতে আমরা গান্ধীজীকে পূর্ণ সুযোগ দিলাম।

জেলে তখন আমরা মাত্র ষাট জন বা তারও কিছু কম। তবু সরকার আমাদের মুক্তি দিতে রাজী হলেন না—গান্ধীজীর চেষ্টা সফল হল না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এইভাবে কেটে গেল গান্ধীজীর নিষ্ক্রিয়তায় বা অক্ষমতায় আমাদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হল। অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা আর যুক্তিযুক্ত হবে না মনে করে দমদম ও আলিপুর জেলে আমরা প্রায় ষাট জন মুক্তির দাবীতে অনশন ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত হয়ে সরকারকে চরম পত্র দিলাম। গান্ধীজীকেও এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হল।

গান্ধীজীর সেক্রেটারী ৺মহাদেব দেশাই, ৺বিধান রায় ও সুরেন্দ্র-

মোহন ঘোষ (মধুদা) জেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গান্ধীজীর অনুরোধ জানালেন—আমরা যেন অনশন ভঙ্গ করি। "অনশন ভঙ্গ কর"—এই বার্তাটুকুই গান্ধীজীর কাছ থেকে তাঁরা বয়ে এনেছেন; কিন্তু অনশন ভঙ্গ করার সর্ত সম্বন্ধে গান্ধীজীর কোন নির্দেশ নেই! কাজেই গান্ধীজীর অনুরোধ রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

জেলে সকলে মিলে একমত হয়ে অনশন আরম্ভ করা সহজ সাধ্য নয়—তার জন্য অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন। বহু পরামর্শ ও আলোচনার পর সকলে একমত হয়ে তবেই এই চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। গোপন বন্দোবস্ত ছিল, যেন সংবাদপত্র প্রভৃতিতে আমাদের এই চরম সিদ্ধান্ত প্রচারের ব্যবস্থা হয় এবং এর জন্য সভা সমিতি, মিছিল ইত্যাদির আয়োজনও যেন অব্যাহত থাকে। কাজেই এত সব ব্যবস্থার পর, গান্ধীজীর কাছ থেকে মুক্তির সঠিক কোন প্রতিশ্রুতি না পেলে, আরব্ধ অনশন বিনাসর্তে মাঝপথে ভঙ্গ করার কোন যৌক্তিকতা আমাদের মনে স্থান পায়নি।

গান্ধীজীর অনুরোধ জানাতে জেলে আগত মহাদেব দেশাই ও বিধান রায়কে এইসব যুক্তি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতে তারা অধৈর্য হয়ে উষ্মা প্রকাশ করে বিদায় নিলেন। আমরা গান্ধীজীর নির্দেশ পালনে অক্ষম সংবাদে গান্ধীজী অকুণ্ঠিত চিত্তে সংবাদপত্রে একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর বিবৃতি দিলেন। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (মধুদা), বিধান রায় ও মহাদেব দেশাই এর প্রস্থানের পর বুঝতে পারলাম যে, আরও দৃঢ়তার সঙ্গে বহুদিন ধরে অনশন চালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। একটি একটি করে ইতিমধ্যে প্রায় বিশটি দিন অতিবাহিত হল। আন্দামান প্রত্যাগত রাজনৈতিক বিপ্লবী বন্দীরা অনশনে জেলে প্রাণত্যাগ করবে, আর বাঙলার নরনারী, তরুণ তরুণীরা নির্বাক দর্শকের ভূমিকা নেবে—এই কি কখনও সম্ভব? সংবাদপত্রে গান্ধীজীর এই বিবৃতিটিতে বাংলার তরুণদল বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল! সুভাষ ও তাঁর দাদা শরৎবাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না! গান্ধীজীর 'এক বছরের প্রতিশ্রুতি' ভঙ্গ হল—সরকারের হাত হতে মুক্তি আদায়ে অক্ষম হয়ে

তিনি আমাদের এইরূপ অসহায় অবস্থায় রেখে আসর হতে বিদায় নেওয়া সাব্যস্ত করলে স্বয়ং সুভাষচন্দ্র আমাদের মুক্তির দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নিলেন। আমাদের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত গান্ধীজীর বিবৃতিটির প্রতিবাদ জানিয়ে এবং এই অনশন সংগ্রামকে সমর্থন করে সুভাষচন্দ্র এক পাল্টা বিবৃতি দিলেন। শরৎবাবু ও সুভাষচন্দ্র দুজনেই সরকারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে জেলে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন।

এই খবরে জেলে আমরা সকলেই আকুল আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম—তাঁরা আসছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে, পরামর্শ হবে, পরবর্তী কর্মসূচী স্থির হবে! আমার মনে হচ্ছিল, কত কাল পরে আবার শরৎবাবুকে দেখবো।

সেই ১৯৩০ সালে মামলায় আমার পক্ষ সমর্থনে তিনি যখন চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে সেই আমার প্রথম ও শেষ দেখা। জেলে বন্দী জীবন দীর্ঘ অনশনে ক্লান্ত দেহ মনে নিকটতম আপনজনের মত তাঁদের এই আগমন প্রাণে বিপুল আনন্দ ও আশ্বাসের জোয়ার বয়ে আনল।

সেপাই, জেলার ও ডেপুটি জেলারদের তৎপরতায় বুঝতে পারলাম শরৎবাবু ও সুভাষচন্দ্র জেলে উপস্থিত। তাঁদের অভ্যর্থনায় আমরা প্রস্তুত হলাম। দু ভাই একসঙ্গে জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। কারাবাসে বন্দী-জীবন যাপনে ও দীর্ঘ অনশনে আমাদের সকলেরই স্বাস্থ্য ভগ্নপ্রায়। সুভাষচন্দ্র প্রত্যেকের শারীরিক অবস্থার কথা বিশেষ ভাবে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন। তাঁর প্রতিটি কথায়, প্রতিটি জিজ্ঞাসার মধ্যে গভীর মমতা, সহানুভূতি ও উৎকণ্ঠার প্রকাশ আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। আন্দামানে আমরা সাঁইত্রিশ দিন ব্যাপী অনশন ধর্মঘট চালিয়েছি। আলিপুর জেলেও প্রায় ত্রিশ দিন অনশনে অতিবাহিত হল—এখনও মিটমাটের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। সুভাষের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, দীর্ঘকালব্যাপী অনশনের প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটার আগে কেমন করে এই অনশন ধর্মঘট

সসম্মানে মেটানো যায় এবং দেশবাসীর পক্ষ থেকে মুক্তির একটা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায়, সেই চিন্তায় তিনি যেন বিশেষ চিন্তিত ও বিচলিত।

এই উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র তিন-চারবার আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। গান্ধীজীর বিবৃতির প্রতিবাদে তিনি যে বিবৃতিটি সংবাদ-সেবী প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছিলেন, আমাদের দেখাবার জন্য তার নকলটি প্রথমবারই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি আমাদের বারে বারে বললেন—"আপনাদের মুক্তির দায়িত্ব বাঙ্গালীর ও ভারত-বাসীর। মহাত্মাজীর ওই বিবৃতির পরে আপনাদের মুক্তির গুরু দায়িত্ব আমাদের উপরেই এসে পড়েছে।"

অনশন, মুক্তি ও সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব নিয়ে নানা দিক থেকে নানাভাবে নিজেদের মধ্যে ও সুভাষের সঙ্গে অনেক আলোচনা হল। অনশনের পঁয়ত্রিশ দিনের দুপুরে প্রায় দুটা থেকে আমরা সুভাষ-চন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় বসি। শেষ পর্যন্ত স্থির হল—আমরা সুভাষের নেতৃত্বের উপর নির্ভর করবো এবং তাঁর প্রস্তাব মেনে নেব। প্রস্তাবটি খুবই সংক্ষিপ্ত—"একমাসের মধ্যে সকলকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সরকারকে একটি চরম পত্র দেওয়া হবে। এই চরম পত্র উপেক্ষিত হলে ব্যাপক গণ-আন্দোলনে আপনাদের মুক্তি দিতে সরকারকে বাধ্য করা হবে।" গান্ধীজীর প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়ে ছিলাম সত্য; তবে হিংসাত্মক পথে যাঁরাই স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাঁদের প্রতি গান্ধীজীর বৈমাত্রেয় সুলভ মনোভাবে তাঁর প্রতিশ্রুতিতে আমাদের আস্থা ছিল না। সুভাষচন্দ্রের এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে ও দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের মুক্ত করে নেওয়ার অঙ্গীকারে আমাদের প্রত্যেকের মনেই গভীর প্রত্যয়ের সৃষ্টি হল।

আমরা অনশন ভঙ্গ করা স্থির করলাম। "এক্ষুনি ফিরে আসছি" বলে সুভাষচন্দ্র তখনই প্রেসে সংবাদ পাঠাতে চলে গেলেন। আমাদের এই সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষকেও জানানো হল। আমাদের অনশন ভঙ্গে

কর্তৃপক্ষের দু-একজন ছাড়া আর সকলেই খুব খুশী হলেন। সন্ধ্যা প্রায় সাতটা—রান্নার তোড় জোড় সুরু হল। কাজেই রান্না শেষ হয়ে খাওয়া দাওয়া হতে হতে রাত ১০।১১ টা হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। যাই হোক্ আমরা তো জেলেই আছি। খাওয়া যখনই হোক্না কেন, তার জন্য বসেও থাকবো এবং খাওয়ার পর এখানেই ঘুমিয়ে পড়বো—এতে আর ভাবনার কি আছে।

আমরা কিন্তু অধীর প্রতীক্ষায় আছি—সুভাষচন্দ্র কতক্ষণে ফিরে আসবেন! এক ঘন্টার মধ্যেই সুভাষচন্দ্র ফিরে এলেন। তাঁর মুখ উদ্ভাসিত। এতদিন ধরে সুভাষকে কতবার দেখেছি এবং প্রতিদিনই ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি; কিন্তু সব সময়েই মনে হয়েছে তাঁর শরীর যেন ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছে—সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় মন চঞ্চল—আলোড়িত। আমাদের অনশন ত্যাগে তিনি যেন মানসিক উৎপীড়নের হাত হতে মুক্তি পেলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে বহু রাজনীতিজ্ঞ নেতৃবৃন্দের ও বৈপ্লবিক পরিবেশে বহু বিপ্লবী নেতার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ আমার হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের অনেকের বৈশিষ্ট যে অননুকরণীয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবল রাজনীতি বা বিপ্লবের সমষ্টিই যে একজন দেশবরেণ্য নেতা গড়ে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট তা নয়। সুভাষ যে কেবল মাত্র ভারতের ও বিশ্বের রাজনীতি ও বৈপ্লবিক ভূমিকার নায়ক নহেন, সেই অনুভূতি লাভে ধন্য হয়েছিলাম সেই দিন,—যেদিন আমাদের ভগ্ন স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর দরদী মনের স্পর্শ, আমাদের জীবন-সংশয় অবস্থাতেও তাঁর অধীর ও বিচলিত হৃদয়ের গভীর অনুভূতির অভিব্যক্তি আমাদের হৃদয় মন কানায় কানায় পূর্ণ করে তুলেছিল—অন্তরের অন্তস্থল আলোকিত করে তুলেছিল মানুষ হিসেবে তাঁর অন্তরের গভীরতায় ও মহত্বে।

সুভাষচন্দ্র বসে রইলেন। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে তাঁকে বাড়ী ফিরে যেতে আমরা অনুরোধ করলাম। সুভাষের কিন্তু সেই

এক কথা—"না, তা হতে পারে না। সবার খাওয়া না হলে আমি যেতে পারিনা।"

প্রত্যেকের কাছে তিনি গেলেন। প্রত্যেকেরই খাওয়ার তদারক করলেন। তারপর সকলের খাওয়া দাওয়া হলে রাত প্রায় বারোটায় তিনি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। যাবার সময় দৃঢ়তার সঙ্গে বলে গেলেন—আমাদের মুক্তিদানে তিনি সরকারকে বাধ্য করবেন।

ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। ভারত আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সুভাষ অন্তর্হিত হলেন—আর ফিরে এলেন না।

* বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি-সংস্থার সৌজন্যে শ্রীরথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থ থেকে ধন্যবাদ সহকারে সংগৃহীত।

সুভাষচন্দ্রের শেষ বিচার

সন্তোষকুমার বসু

[দেশবন্ধুর সহকর্মী। প্রাক্তন পৌর প্রধান। পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলা দেশ) প্রথম ডেপুটি হাইকমিশনার]

আমার যতদূর মনে পড়ে, সুভাষচন্দ্র তিনবার আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তার মধ্যে দুবার রাজদ্রোহের অভিযোগে, আর একবার

১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। এছাড়া বহু বৎসর তিনি রাজবন্দী ছিলেন ভারতের বিভিন্ন জেলে বিনাবিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে যে শেষ মোকদ্দমা হয় ১৯৪১ সালে কলকাতার পুলিশ কোর্টে, সেটিই ছিল ভারতের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা পরম্পরার প্রথম পদক্ষেপ।

সুভাষচন্দ্র তার আগে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেছেন কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভায়।

তারপরে প্রকাশিত হল ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র 'Forward Bloc' (ফরওয়ার্ড ব্লক)। সুভাষচন্দ্র নিজেই তার সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন রণাঙ্গনে একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করেছে জার্মানী ইংরেজদের পরাজিত করে। লণ্ডনের উপর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

একদিন বিকালে বাড়ীতে বসে রেডিওতে শুনছি বিলাতের খবর হঠাৎ এরোপ্লেনের ভীষণ শব্দে কান ফেটে যাবার উপক্রম হল লণ্ডনের উপরে জার্মান ব্লিজ (Blitz)। তারপরেই রেডিও বন্ধ হয়ে গেল। কলকাতায় বসে লণ্ডনের ব্লিজ শুনলাম। সেই ধ্বংসলীলা দেখলাম কল্পনা-চক্ষে।

সুভাষচন্দ্র তাঁর Forwarc bloc পত্রিকায় এক দুর্দ্ধর্ষ প্রবন্ধ লিখলেন ইংরেজদের ক্রমান্বয় পরাজয়ে। প্রবন্ধের শিরোনাম হল 'Day of Reckoning'—হিসাব নিকাশের দিন'। ইংরেজের ঔপনিবেশিক শোষণ ও অত্যাচারের হিসাব নিকাশের এইবার দিন এসেছে—এই হ'ল প্রবন্ধের মূলকথা।

এতো ভীষণ রাজদ্রোহ ইংরেজের চোখে। ইংরেজের তখন দারুণ দুঃসময় চলছে। এমন কি তার স্বাধীনতাও বিপন্ন। আত্মরক্ষার বিপুল আয়োজনে সে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে। সেই সময় ভারতের সেই শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্রের লেখনীতে এই চরম শ্লেষ ও আক্রমণ: এতো একেবারে অসহ্য।

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট মামলা দায়ের করলেন। অভিযোগ—রাজদ্রোহ (ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের ১২৪এ ধারা)। নালিশের দরখাস্তের সঙ্গে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার অভিযুক্ত সংখ্যাটিও সংযুক্ত করা হল। সেটিই তাঁদের অভিযোগের মূল প্রমাণ।

সুভাষচন্দ্রকে কিন্তু কোর্টে হাজির করা গেল না। তিনি তখন অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতও বন্ধ।

সুভাষবাবুর অগ্রজ শরৎ বসু মহাশয় আমাকে অনুরোধ করলেন, এই মামলায় সুভাষচন্দ্রের পক্ষে হাজির হয়ে তাঁর মামলা পরিচালনা করতে। আমি সানন্দে ও সগৌরবে এই ভার গ্রহণ করলাম।

তখন পর্যন্ত মামলায় একজন মাত্র সাক্ষী। কলকাতা পুলিসের যে ইন্সপেক্টর নালিশ দাখিল করেছেন প্রবন্ধটি সংযুক্ত করে, তাকেই জেরা করতে হবে। ঐ প্রবন্ধ থেকে ও সাক্ষীর জেরা থেকে বিচারককে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এই প্রবন্ধ ১২৪ এ ধারার আওতায় আসে না; সুতরাং আসামীর কোন শাস্তি হতে পারে না, তিনি নিরপরাধ। এই উদ্দেশ্যে প্রবন্ধের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি লাইন ধরে জেরা করতে লাগলাম। তাতে অনেক সময় লাগত এবং মামলার দিন পড়তে লাগল। .

এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল, আমার জেরা আর শেষ হয় না। আইনতঃ জেরা যদি সঙ্গত হয়, তবে বিচারক তাতে বাধা দিতে পারেন না। তৎকালীন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ালি উল ইসলাম সাহেব। সুবিচারক বলে তাঁর নাম ছিল।

যে দিনই মামলার দিন ধার্য্য থাকত, সেইদিনই সুভাষচন্দ্র অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত থাকতেন। তাঁর অনুপস্থিতির কারণ দেখিয়ে কলকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের সার্টিফিকেটসহ কোর্টে দরখাস্ত দাখিল করতাম।

সুভাষচন্দ্রের বড়দাদা সতীশচন্দ্রের বড়ছেলে গণেশ আমার পিছনে বসে ঐ সার্টিফিকেটগুলি আমাকে দিতেন ও আমি ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে

তুলে দিতাম। মোকদ্দমা মুলতুবি হয়ে যেত। আসামী সুভাষচন্দ্র অন্যদিনের মত সেদিনও গরহাজির।

একদিনের শুনানী স্থির হয়েছিল বেলা আড়াইটার সময়, টিফিনের অবসরের ঠিক পরেই। সেদিন আমার জ্বর হয়েছে ১০২ ডিগ্রী। হাইকোর্টের বার এসোসিয়েশনে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসেছি। বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁদের জানিয়ে দিলাম, কোন বিশেষ মামলার জন্য আমাকে কোর্টে আসতে হয়েছে। আর তখুনি পুলিশ কোর্টে চলে গেলাম। কোর্টে গিয়ে দেখলাম আমার অতি পরিচিত পাবলিক প্রসিকিউটর কোর্টে বসে আছেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—'শরীর খারাপ নাকি?' হাতটা বাড়িয়ে দিতে বল্লেন—'এ যে খুব জ্বর। হাকিম চেম্বারে আছেন। চল, সেখানেই তাঁকে বলে আসি আজ মামলা মুলতুবি করার জন্য।'

আমরা দুজনে ম্যাজিষ্ট্রেটের চেম্বারে গেলাম ও তাঁকে মামলা মুলতুবির জন্য অনুরোধে তখনই তিনি রাজি হলেন কোর্টে এসে অর্ডার দেবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট এজলাসে বসতেই আমার অসুস্থতার বিষয় উল্লেখ করে অনুরোধ জানালাম মামলা মুলতুবি করার জন্য, কারণ সাক্ষীকে জেরা করা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে। পাবলিক প্রসিকিউটর মহাশয় আমার অনুরোধ সমর্থন করলেন। কিন্তু তার পরেই তিনি যা বল্লেন তা আগে আর কোন দিন বলেছেন বলে মনে হয়না। তিনি খুব জোর দিয়ে বল্লেন, 'এ কি রকম মামলা হচ্ছে, ফৌজদারি মামলায় আসামী ত হাজিরই নেই। আর কোন জামিন ও হয়নি, হাজির হবার কোন ব্যক্তিগত মুচালেকা—তাও সই করেননি।'

আমি বল্লাম, 'আসামী খুবই অসুস্থ। তিনি কি করে কোর্টে জামিন দেন বা বণ্ড সই করতে পারেন?' তখন অপর পক্ষের জবাব হল যে, পুলিশ আসামীর বাড়ীতে গিয়ে বণ্ড তার সই করিয়ে আনতে পারে।

আমি তখন বিশেষ জোরের সঙ্গে প্রায় চীৎকার করে জিজ্ঞাসা

করলাম—সুভাষ বোস কি জেলের ভয় করেন? তিনি জেলের ভয়ে পালিয়ে যাবেন এইটাই বলা হচ্ছে?

ম্যাজিস্ট্রেট তখন বল্লেন, না, কোনো কিছু সই করার দরকার নেই। মামলা আবার মুলতুবি হয়ে গেল।

তার কিছুদিন পরেই একদিন সুভাষচন্দ্র আমাকে ডেকে পাঠালেন। সকালে এলগিন রোডের বাড়ীতে গিয়ে দেখি একমুখ দাড়ি গোফ নিয়ে সুভাষচন্দ্র খাটে শুয়ে আছেন। তাঁর এক ভাইঝি মাথার দিকে বসে বাতাস করছেন।

সুভাষচন্দ্রের এমন চেহারা আগে কখনো দেখিনি। কালো চাপ-দাড়ি গজাতে বেশ কিছুদিন লেগেছে—এখন তাঁকে চেনাই যায় না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মামলার ফল কি রকম দাঁড়াল।

আমি বল্লাম, 'প্রবন্ধটি তো আর কিছু রেখে ঢেকে লেখেনি, সাজা হয়ে যাবে।'

একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত হবে?', আমি বললাম, 'ম্যাজিস্ট্রেটের যতদূর ক্ষমতা, দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছমাস জেল হতে পারে।'

সুভাষচন্দ্র বললেন—'রাজদ্রোহের মামলায় কলকাতায় এক বছর জেল হয়েছিল জহুরসালের।' আমি বললাম, 'ফৌজদারি মামলায় কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাজা হতে পারে। এখন ইংরেজের দারুণ দুঃসময়, আর আসামী হচ্ছেন সুভাষ বোস।'

আবার একটু হাসলেন। কিছুক্ষণ পরেই বিদায় নিলাম। এখন যা জেনেছি তা থেকে মনে হয়, মামলার খবর জানার জন্য তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হননি। আমাকে ডেকে পাঠাবার উদ্দেশ্য ছিল, ব্যক্তিগত ভাবে যাঁদের তিনি অন্তরঙ্গ বলে মনে করতেন, অল্পসংখ্যক সেই কয়জনকে শেষবারের মত দেখবার জন্য তিনি ডেকেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার। আর একজন সাহিত্যিক সরোজ কুমার রায়চৌধুরী।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করি। বহুদিন আগে যখন

গভর্নমেন্ট তাঁকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যাবার অনুমতি দেন, তখন তাঁকে আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। সে সময়ে তিনি প্রাণে ভীষণ বেদনা পেয়েছিলেন।

এবার আর তিনি সে বেদনা ও ক্ষোভ নিয়ে বিদায় হননি। ইচ্ছামত আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

তার কিছুদিন পরেই মামলার দিন ধার্য ছিল। সেই দিনের আগের দিন রাত্রি ৯টার সময় আমায় ফোনে ডাকলেন শরৎবাবু তাঁর বাড়ীতে তখনই যাবার জন্য। গিয়ে দেখি সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গদের মধ্যে কয়েকজন উপস্থিত আছেন। শরৎবাবু বললেন, 'সুভাষ তার ঘরে পর্দার আড়ালে থাকত। তার খাবার ও কাপড়চোপড় বাইরে থেকে রেখে আসা হত। কয়দিন থেকে দেখা যাচ্ছিল সব তেমনই পড়ে থাকে, ব্যবহার হয়না। ভিতরে গিয়ে আজ দেখা গেল, সুভাষ ভিতরে নেই। নানা জায়গায় খোঁজ নেওয়া হচ্ছে—মঠে, মন্দিরে, শ্মশানে।' তারপর আমাকে বললেন, তিনি খুবই দুঃখিত যে তার কথায় সুভাষচন্দ্রের মামলায় হাজির হয়ে আমি খুবই মুস্কিলে পড়েছি।

আমি তাঁকে বললাম, সে বিষয়ে তিনি যেন কিছুমাত্র বিচলিত না হন। ফৌজদারি মামলায় অনেক সময়ে এ রকম হয়ে থাকে। আমি সব ঠিক করে নেব।

পরের দিন কোর্টে আবার মামলা উঠল এবং আমারই মুখে প্রথম জানানো হল যে, সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশ

সরকার পক্ষ একেবারে ক্ষেপে পড়লেন। দাবী করলেন যে, সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করা হোক—আর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করা হোক।

আমি বললাম, 'সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পত্তি? তা ক্রোক করা হোক!'

আমি জানতাম সর্বত্যাগী, নিঃসম্বল বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের আর্থিক সম্পত্তি বলতে কিছুই ছিল না। ছিল শুধু দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, মনোবল, ভগবৎভক্তি ও অদম্য-সাহস ও সংগঠনীশক্তি। এই নিয়েই

গঠিত হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ, ভারতের মুক্তি যুদ্ধের বিরাট আয়োজন ও পরিচালনা।

আজ তাঁর দেশবাসীর প্রাণে ও মুখে একই মাত্র প্রশ্ন।—কোথায় আছেন তিনি—কোথায়? আমার উত্তর—আর যেখানেই থাকুন না কেন, আছেন তিনি ভারতের কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় আসনে। আমরা শুধু তাঁর শুভ জন্মদিনের উৎসবই পালন করব আর একান্ত ভাবে আহ্বান জানাব—

সুদীর্ঘ তপস্যা অন্তে
এসো আজ ফিরে
তৃষিত এ কর্মক্ষেত্রে,
হে তাপস বর
জননী দাঁড়ায়ে আছে
পরাইতে শিরে
বিজয় মালিকাখানি
শীতল সুন্দর!

ফ্রীডম ফাইটার্স এ্যাসোসিয়েশনের সৌজন্যে 'উজ্জীবিত' পত্রিকা থেকে অনুমতি সহকারে সংগৃহীত

রাজশাহী জেলের চিঠি

ডাঃ ভূপাল বসু

(প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা। ডালহৌসী ষড়যন্ত্র মামলার বিচারে দীর্ঘদিন কেটেছে আন্দামানে। ১৯৪৩ সালে রাজশাহী জেল থেকে তিনি এই চিঠিখানি লিখেছিলেন সহকর্মী শ্রীঅদ্বৈত দত্তকে।)

······২০শে থেকে কোলকাতার উপর বিমান আক্রমণ সুরু হয়েছে বলে কাগজে দেখলুম। তোমাদের ব্যবস্থা কি জানতে পারলে সুখী হব।

আমাদের এখান থেকে সরাবার পালা ; হয়ত বা সময় এসে গেছে। চলেও যেতাম হয়ত বক্সা, কিন্তু স্থগিত হয়ে গেছে হঠাৎ। বোধ হয় রেলগাড়ীর অনটন ও যাত্রীর ভীড়ের জন্য। কোলকাতা থেকে লোক নিষ্কাশনের সংবাদ ও কাগজেই পাচ্ছি। ধ্বংসের লীলায় আজ পৃথিবী উচ্চকিত। নরশোণিতের এ-বীভৎস মন্থন চলেছে আজ মানবের ইতিহাসকে নিয়ে। যারা সৈনিক, পুরোভাগে অস্ত্র-চালনা করছে, তারাও মরছে, আর যারা সাধারণ নাগরিক, পেছন থেকে যুদ্ধের রসদ যোগাচ্ছে, তারাও মরছে। বিগত মহাযুদ্ধে জার্মান সেনা-নায়ক লুডেনডর্ফের রণনীতির এ-একটি বিশিষ্ট পরিকল্পনা ও অঙ্গ। আজ নিরপেক্ষ বলে কোন বস্তুই নেই। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সবাই আজ এ মহাসমরের প্রথম শ্রেণীতে। যে যার সুবিধের জন্য খাটছে, লড়ছে—নানা সাধুবাদের নামাবলী জড়িয়ে দলে ভেড়াবার প্রচার চলছে পরাধীন দেশের মানুষের কাছে—শোণিত চাই।...

এ সুন্দর ধরিত্রী, মধুক্ষরা বসুন্ধরা, প্রভাত কল-কাকলী, নিবিড় ছায়া বিছানো স্নিগ্ধ পল্লী, মানুষের সুখ-দুঃখ ঘেরা মায়ার সংসার, কেন তবে আগুনের রথে সূর্যের এ ভয়ঙ্কর আবির্ভাব ! যারা গুলিতে মরল না, বোমার ঘায়ে মরল না—মৃত্যুর করাল ছায়া তাদেরও ছাড়ছে

না। মৃত্যুর এক মহা উৎসব চলেছে আজ ধরণীর বুকে। যুদ্ধের এ ভয়ঙ্কর মূর্তিকে আমি বীভৎস বলে ভাবতে পারিনে। এর অতি ভীষণতা আমার মনকে মুগ্ধ করে। যুদ্ধের একটা সাব্‌লাইম গ্র্যাণ্ড্‌জার আছে—একটা লোকোত্তর সৌন্দর্য।

প্রশ্ন উঠেছে—পৃথিবীর এ শান্তি-ভঙ্গের কি প্রয়োজন ছিল? কি প্রয়োজন ছিল মাটির বুকে এ শোণিত সিঞ্চনের? মানব সভ্যতার কোন্ স্বর্ণ-ভবিষ্যত এ-মহাযুদ্ধের মর্মস্থানে নিহিত রয়েছে? আমার বিশ্বাস—সমাজ ও যুগের প্রয়োজনে মানুষের আত্মার এ আহুতি অবশ্যম্ভাবী। আমার বিশ্বাস - রক্তকের পাটের মতো সমাজের বহু দিনের সঞ্চিত গ্লানি, যা মানুষের কাছে মানুষকে পরিচয়হীন করেছে, মর্য্যাদা বোধহীন করে তুলেছে, এক মাত্র যুদ্ধই সেই গ্লানিকে ধুয়ে-মুছে সাফ্ কোরে দিতে পারে। আমার বিশ্বাস—এ ধ্বংস পৃথিবীর নূতন জন্মের সূচনা। সভ্যতার প্রয়োজনেই যুদ্ধ-অবশ্যম্ভাবী—ইতিহাসের পর্যালোচনা এর সাক্ষ্য দেয়। অতীতেও যুদ্ধের অভাব ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। বিশ্ব শান্তি শুধু মানব মনের একটা ভাব-কল্পনা। এ মৃত্যু মর্মান্তিক হলেও মর্মহীন নয়।

আজকের এ-যুদ্ধ নূতন পৃথিবীর জন্মের পূর্বাভাষ এবং আমার বিশ্বাস, সে নূতন পৃথিবীর অঙ্কুরোদ্গম্ হবে ভারতের মুক্তিতে। আমার বিশ্বাস—একমাত্র মহানায়ক সুভাষচন্দ্রই সে মুক্তিকে সম্ভব করে তুলতে পারবেন তাঁর সশস্ত্র অভিযানের পরিকল্পনায়। কাজেই মুক্তি কারো দান হিসাবে আসবে না—তা সম্ভব হবে, ভারতের আত্মার নবউন্মেষে—আজ সূচনা তার স্পষ্ট। আমি তাই মানব-সভ্যতার প্রয়োজনে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবীতায় বিশ্বাস করি। তাই বলেছিলাম, পথ আমাদের সঙ্কীর্ণ ও বিপদসঙ্কুল। সজাগ মন নিয়ে চলতে হবে এ বন্ধুর পথে। এ মন্থনের অমৃত গৃহে আমাদের আসতেই হবে। সেই বিশ্বাসেই আজ আমরা বুক বেঁধে চলেছি।

---

* ফ্রীডম ফাইটার্স এ্যাসোসিয়েশনের সৌজন্যে প্রিয়রঞ্জন [illegible] সম্পাদিত "দক্ষিণীবার্তা' পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

রাসবিহারী বসুর প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলী

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

যুগান্তর দলের অন্যতম প্রধান নায়ক। বাঘা যতীনের সহকর্মী এবং ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান কর্মীনায়ক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'। বর্তমানে পরলোকগত।

রাসবিহারী ছিলেন একজন মহান বিপ্লবী নেতা। কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বিরাট। দুঃসাহস, যে-কোনো কাজের জন্য প্রচণ্ড উৎসাহ এবং অফুরন্ত উদ্ভাবনী শক্তি যেন মূর্তরূপ পরিগ্রহ করেছিল তাঁর মধ্যে। বাংলা দেশেই হোক, আর বাইরে দূরদেশেই হোক, সবত্রই তিনি সমান সহজ ছিলেন; প্রগাঢ় শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেই হোক, আর সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতেই হোক, তিনি কখনো মানসিক স্থৈর্য হারাতেন না। বিভিন্ন সময়ে তাঁকে বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে কাটাতে হয়েছে। পৃথিবীরূপী এই মঞ্চে তিনি যথার্থই অনন্য ছিলেন। তাঁর সমকক্ষ আর কাউকেই দেখা যায় না।

তিনি যেন ছিলেন ঝটিকা-বাহিনীর সেনাপতি। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের এই প্রাচীন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ক্রমাগত চেষ্টা করতে হবে—একটির পর একটি ধাক্কা দিয়ে তাকে এগিয়ে নিতে হবে। তাই তাঁকে দেখা যায় দুটি বিভিন্নরূপে—সন্ন্যাসব্রতী, আবার দুর্দান্ত সমরনায়ক বা গেরিলা বাহিনীর সেনাপতি। তাঁর অন্তরাত্মা যথার্থই গীতার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা ছিল।

আমার বিশেষ পরিচিত জনৈক আই. এন. এ. অফিসারের ডায়রি থেকে কিছু অংশ দিচ্ছি।

"অসামরিক সাধারণ ভারতীয়গণই ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতীয়গণের অধিকাংশই লীগের ব্যাজ ধারণ

করতেন। অসামরিক অধিবাসীগণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লীগই নিয়েছিল। রাসবিহারী ছিলেন লীগের প্রাণস্বরূপ।

১৫ই জুন, ১৯৪২—মালয়, থাইল্যাণ্ড, জাভা, ফিলিপাইন, হংকং, চীন এবং ব্রহ্মদেশ থেকে লীগের প্রতিনিধিগণ ব্যাঙ্ককে এসে একটি সম্মেলনে মিলিত হন। সামরিক বাহিনীর কয়েকজনও এ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এই সম্মেলনে রাসবিহারীকে কার্যকরী মন্ত্রণাপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এই মন্ত্রণাসভার সদস্য চারজন—দু'জন সামরিক বাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং দু'জন অসামরিক প্রতিনিধি। সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি দু'জন ছিলেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং ক্যাপ্টেন গিলানী, আর অসামরিক তরফে শ্রীরাঘবন ও শ্রীমেনন। লীগের অধীনে একটি সেনাবাহিনী গঠন করবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সেনাবাহিনীর নাম স্থিরীকৃত হল ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। এই বাহিনীতে যাঁরা যোগদান করেছিলেন, সকলেই স্বেচ্ছায় যোগদান করেছিলেন, এবং প্রত্যেকটি সাধারণ সৈনিক থেকে অফিসার সকলেই মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। রাসবিহারী মোহন সিংকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করলেন।

সেনাবাহিনীর সকলে মোহন সিং-এর অধীনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভুক্ত হলেন। সকলে মোহন সিং-এর অধীনে সংগ্রামের শপথ নেয়। এই সময়ে দেখা দিল এক অভাবিত সঙ্কট, যার কোন সহজ সমাধান হলো না। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে নতুন যাত্রা শুরু হলেও এবার একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। রাসবিহারীর সঙ্গে মোহন সিং-এর বনিবনা হলো না। সেনাপতি চাইলেন "তাঁর" সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দিতে। তিনি কার্যতঃ তাঁর কার্যকরী মন্ত্রণা-পরিষদ (Council of Action) এবং তাঁর ওপরওয়ালা হিসেবে রাসবিহারীকে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

নতুন জয়যাত্রার মহানায়ক রাসবিহারী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, যখন মোহন সিং বললেন যে, সেনাবাহিনী তাঁর 'ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী'।

রাসবিহারী সবিনয়ে ঘোষণা করলেন যে, সেনাবাহিনী কখনও কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। সেনাবাহিনী সমগ্রভাবে দেশের—দেশের জন্য সংগ্রামই তার কাজ।

কিন্তু মোহন সিং এসব মানলেন না! তিনি আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভেঙে দিয়ে এক ঘোষণা প্রচার করলেন। একটা নতুন স্বপ্নের—একটি গৌরবময় পরিচ্ছেদের সমাপ্তি ঘটলো। সেনাবাহিনী সাময়িকভাবে লোপ পেলো।

রাসবিহারী যেন অথৈ সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন। কিন্তু তিনি নিরাশ হলেন না, এই দুঃসময়ে সাহস হারালেন না। কার্যকরী মন্ত্রণাপরিষদের (Council of Action) সকলে একে একে পদত্যাগ করলেন। রইলেন রাসবিহারী একা।

এতদিনে রাসবিহারীর তেজ-বীর্য-সাহস সুবুদ্ধির যেন পূর্ণ প্রকাশ ঘটতে লাগল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন—মাতৃভূমির জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত চলবেই—তাতে যদি ঝঞ্ঝা আসে আসুক, যে ক্ষতি হবার হোক।

কিছু পূর্বেও যাঁরা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে রাসবিহারীর সহযোগী, তাঁরা সবাই যে যাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখতে লাগলেন, দুনিত স্বার্থান্ধের মত। সকলে রাসবিহারীকে ছেড়ে গেলেন, তাঁকে ছোট করবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁকে অপমান করতেও দ্বিধা করলেন না। কিন্তু উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্থির লক্ষ্য, একাগ্রতা, অমত্ত দৃঢ়তা এবং জীবনের মহত্তর আদর্শের প্রতি অচঞ্চল আস্থা মূলধন করে রাসবিহারী সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে সক্ষম হলেন। ঘনকৃষ্ণ থরে থরে সাজানো মেঘের আড়ালে তিনি সূর্যের দীপ্তি লক্ষ্য করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত নতুন করে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এবার রাসবিহারী তাঁর অন্তরে যেন আরও সুতীব্র প্রেরণা অনুভব করতে লাগলেন। মাতৃভূমির মুক্তিরূপী মহত্তর উদ্দেশ্যের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য, চরম আত্মাহুতির আহ্বান যেন

তিনি নতুন দিগন্তে প্রসারিত পর্দার অন্তরাল থেকে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে লাগলেন। এবার তিনি নতুন বাণী শোনালেন তাঁর অনুগামীদের—'মাতৃভূমির মুক্তির উদ্দেশ্যে সর্বস্ব ত্যাগের জন্য তৈরী হও'। (সব নাঙ্গা হো যাও)। সকলের মনের বহুধা বিভক্ত দিকগুলি কিছু করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো। সর্বত্র যেন একটা যাদুর প্রভাব লক্ষ্য করা গেল।

বহু-বাঞ্ছিত চূড়ান্ত বিজয়ের এই চরম মুহূর্তেও রাসবিহারীর মধ্যে আত্মপ্রচার বা অহমিকার লেশমাত্র দেখা যায় নি। মাতৃভূমি ছিল তাঁর নিকট সবকিছুর ঊর্ধ্বে। চরম মুহূর্তে তিনি যেন প্রেরণা পেলেন অন্তরে—'হে মোর দেশমাতৃকা, আমি গাহি তব জয়গাথা।'

দেশ এবং তার জনগণকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি-নির্ধারিত অধিকতর শক্তিশালী এবং যোগ্যতর পুরুষের করকমলে নিজের সবকিছু তিনি সমর্পণ করতে পেরেছিলেন। বিজয়-গৌরবের সুউচ্চ চূড়ায় সমাসীন হয়েও রাসবিহারী একটি মহোত্তর আত্মত্যাগ সম্পন্ন করলেন। সুদূর ইউরোপ থেকে তিনি নেতাজীকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তাঁর কর্মস্থলে নিয়ে এলেন এবং নবগঠিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজ-এর সর্বোচ্চ ক্ষমতায় তাঁকে অধিষ্ঠিত করলেন।"

রাসবিহারী যথার্থই এতো বিরাট ছিলেন যে, আজ পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর দেশাত্মবোধ এবং মহত্বের যথাযোগ্য পরিমাপ কার্যতঃ সম্ভব হয় নি। সে কঠিন কাজ ভবিষ্যতের বংশধরগণের জন্য রইলো। এ হেন বিরাট পুরুষকে সৃষ্টি করেছে যে সমাজ, যে দেশ, তা' অবশ্যই মহৎ। সে যুগ ছিল অতিমানবগণের যুগ—চুনোপুঁটিরা স্বভাবতই নজরে আসে না।

রাসবিহারীর কথা মনে এলে তাই শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে আসে।

• ফ্রীডম ফাইটার্স এ্যাসোসিয়েশনের সৌজন্যে শ্রীযুক্ত শান্তিকুমার মিত্রের 'বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু' গ্রন্থ থেকে ধন্যবাদ সহকারে সংগৃহীত।

'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তার দিন-পঞ্জিকা লিখে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ।'

-কবি সুকান্ত

হৃদয় দিয়ে গড়া

শান্তিময় গাঙ্গুলী

[illegible] সেই দুঃসাহসী তরুণ, যিনি পায়ে হেঁটে, দুর্গম পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে কাবুল পৌঁছে বার্লিনে অবস্থানকারী নেতাজীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

সুভাষ। সুভাষচন্দ্র বসু। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ছোট থেকে বড়, আরো বড়, আরো—আরো—আরো অনেক বড় হলেন উল্কার বেগে, এই পরমাশ্চর্য পুরুষ—বাংলার, ভারতের, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নেতাজী।

কিন্তু কি করে হলেন? কী তাঁর সেই গুণ, সেই মহত্ব, সেই বৈশিষ্ট্য, যা তাঁকে পূর্ব গোলার্ধের বিশাল জনতার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করল? যারা তাঁর কাছাকাছি থেকেছেন, তাঁরাই জানেন এই দিব্যকান্তি, সুশিক্ষিত, মার্জিতরুচি, ধর্মভীরু মানুষটির মধ্যে কী এক 'জাদু' ছিল, যা অসম্ভবকে সম্ভব করত, দুর্লভকে আয়ত্তে এনে দিত।....

১৯৩৯ সালে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' প্রতিষ্ঠার দিনগুলির কথা মনে আছে। ব্রিটিশ রাজ আর বিপ্লবীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন মহাত্মা গান্ধী।...বিপ্লবীরা নানা দল-উপদলে বিভক্ত। কত কাল

থেকে কত চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু দল-উপদলের কঠিন বাঁধন শিথিল হয় নি। অথচ 'রাষ্ট্রপতি সুভাষ' যেদিন বিপ্লবের পথে পা বাড়ালেন—সেদিন কোথায় উড়ে গেল দলের বাঁধন। কোথায় গেল সেই বিরোধ সেদিন, যেদিন এক রৌদ্রতপ্ত অপরাহ্ণে, কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, সর্বভারতের ভারতীয় কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতাদের নির্লজ্জ অপকৌশলে বিরক্ত হয়ে, অধিকাংশ দেশবাসীর নির্বাচনে লব্ধ গৌরবমণ্ডিত 'সভাপতি'-র আসনখানিও তুচ্ছ করে চলে এলেন সুভাষচন্দ্র বাংলা, তথা ভারতের সংগ্রামী-জনতার 'হৃদয়-আসনে'।...

সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বিপ্লব-পূজারীদের পানে। সমগ্র ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের বৈপ্লবিক-সংগঠনগুলোও নিজেদের বিভেদ ভুলে গেল। বাংলায়, মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিপ্লবী কর্মীরা নিজস্ব সংস্কার মাধ্যমে তৈরী করলেন একটি 'পাবলিক ফোরাম' সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে। সুভাষচন্দ্র তার নাম দিলেন—'ফরওয়ার্ড ব্লক্'।

বিভিন্ন অনুশীলন সমিতি, শান্তিসেনা, শ্রীসংঘ এবং উত্তরবঙ্গ-নদীয়া-হাওড়া বা কলকাতার নানা দল-উপদলগুলোর সঙ্গে অনায়াসে মিলন ঘটল পাক্কা কম্যুনিস্ট কীর্তিকিষাণ (পাঞ্জাব) পার্টি ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 'নওজোয়ান-ভারত সভা' ইত্যাদি দলগুলোর।

এই যে নেতৃত্ব—এ কি বৈজ্ঞানিক? চিন্তা চালনায় উৎকর্ষ? বৈপ্লবিক তত্ত্বের উপর যে-দখল ছিল লেনিনের তার সংযোগে? ... ওসব তাত্ত্বিক দর-কষাকষির মধ্যে সুভাষচন্দ্রের ঘূর্ণিপাক খাওয়া নয়, তাঁর বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রধান উৎস তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর অনুভূতির নিভৃতে, তাঁর হৃদয়-গভীরে।

শঙ্করের মোহমুক্তি, চৈতন্যের প্রেম, বিবেকানন্দের কর্ম-সাধনা—এই মহান গুণত্রয়ে সাজানো তাঁর মন যেমন আকৃষ্ট করেছে অপরকে, তেমনি গর্জে উঠেছে জগতের সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তুচ্ছ সাংসারিক জীবনের আকর্ষণ—লোভ, মোহ, ক্ষুদ্রতা, পরশ্রীকাতরতা ও ক্ষমতার লিপ্সা—ঘেঁষবে কী করে তাঁর কাছে, যিনি সমগ্র বিশ্ব-সংসারকে

আপন করে নিয়েছেন?...এই যে কঠিন, নির্মম অথচ পেলব-মধুর 'প্রেম' এতো হৃদয় ব্যতীত লাভ হয় না।

কাবুলের পথে পা বাড়িয়েছেন সুভাষ। সঙ্গী ছিলেন ভগৎরাম। পথপ্রদর্শক এই তরুণ। ইতিপূর্বে ভগৎরামকে সুভাষচন্দ্র তেমন কিছু চিনতেন না। যদিও এই তরুণ কর্মীর অবদান উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সংগঠনে সামান্য ছিল না। হয়তো কোন সভায় বা ঘরোয়া বৈঠকে এর আগে দেখা হয়েছে পরস্পরের। কিন্তু এত কাছাকাছি, এত নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ বা প্রয়োজন পূর্বে না হবারই কথা। কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন মিঞা আকবর শা— তাঁকেই চিনতেন সর্বভারতীয় ফরওয়ার্ড-ব্লক নেতারা। ভগৎরাম ঘর সামলাতেন, সংগঠন রক্ষা করতেন।...

পথ চলছেন সুভাষচন্দ্র ও ভগৎরাম। দুর্গম, নিষ্ঠুর, রুক্ষ চড়াই। প্রচণ্ড হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা। কিছু কিছু তুষারপাতও হচ্ছে। চিত্ত বিপ্লব-রঙে রঙীন, কিন্তু দেহ তবু দুর্বল হয়। বুঝি বা প্রকৃতির বৈরীতা আর সহ্য করা যাবে না। হয়তো মুখ থুবড়ে পথের মাঝেই পড়তে হবে।....কত দূর? আর কত দূর?...

ভগৎরামের প্রচণ্ড ভয় —পৃথিবীর ইতিহাস-স্রষ্টাদের অন্যতম এই মহানায়ককে সুস্থদেহে কাবুল সীমান্তে পৌঁছে দেবার গুরুদায়িত্ব নিয়ে এসেছেন তিনি, তাঁকে ব্যর্থ হলে চলবে না। বিপ্লবী-ভারতবর্ষের দুর্ধর্ষ 'গাইড' তিনি : সুভাষচন্দ্রকে 'মুখ-থুবড়ে' পথমধ্যে পড়তে তিনি দেবেন না।....

হঠাৎ তাঁর মাথায় চকিতে বুদ্ধি খেলে গেল। বললেন সোৎসাহে : 'সুভাষবাবু, আমরা ব্রিটিশ-সীমানা পেরিয়ে এসেছি। এখানে দিল্লীর বড়লাটের শাসন অচল; ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতাপ খর্ব।'...

কোথায় গেল ক্লান্তি! কোথায় অবসাদ! কে বলে এই পথ বন্ধুর, দুর্গম? একটু পূর্বেই কেন মনে হয়েছিল দুস্তর এই পথ-পারাবারের বুঝি শেষ নেই? মিলিয়ে গেল শীতের হিমস্পর্শ। যেন শোনা যায় দূর থেকে ভেসে আসা বসন্ত-কোকিলের সঙ্গীত।....

আনন্দে, আবেগে বুক ভরে স্বাধীন-ভূমির বুকে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস নিলেন সুভাষচন্দ্র। আর দেরি নয়—সংগ্রাম শুরু করতে হবে অনতিবিলম্বে। ঐ অদূরে ইংরেজ-শাসন্। আর এখানে সার্বভৌম স্বাধীনতা। পদানত ভারতের এত কাছে? তবু ভারত-মাতার শৃঙ্খল আমরা খুলে ফেলতে পারছি না কেন?....

মুখর হয়ে উঠেছেন সুভাষচন্দ্র। নানা কথা বলছিলেন নেতা তাঁর অনুগামী সহযাত্রীকে। মন ভারমুক্ত—সে-মন আর একটি মনের কাছে অন্তরের কপাট খুলে দিতে চাইল, তাকে ঘনিষ্ঠতর করে নিকটে পেতে চাইল। তাই সুভাষচন্দ্র অভ্রংলিহ নেতৃত্বের আসন থেকে নেমে এসে বন্ধুর স্থান গ্রহণ করে ভগৎকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর পিতার পরিচয়, গ্রামের নাম, বাড়িতে কে কে আছেন, ভাইবোন ক'টি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন: 'বিয়ে করেছ?' ভগৎ উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ।'...

সুভাষচন্দ্র সহসা হতাশ, চিন্তিত ও বিস্মিত। একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই তিনি বললেন: 'তুমনে কি'উ শাদি করলিয়া?'...অধোবদনে ভগৎরাম জবাব দেন যে, বিয়ে সে করলেও বাবুজির আদেশ পালনে তা কোনদিন অন্তরায় হবে না।

এই কাহিনীর উল্লেখই ভগৎরাম আমার কাছে একদিন পেশোয়ার-কাবুলের পথে বলেছিলেন: 'শান্তুবাবু, বিয়ে তো সবাই করতে পারে —কিন্তু বিবাহিত জীবনে এমন নেতার নেতৃত্বে বিপ্লব-সাধনার সৌভাগ্য ক'জনের হয় বল তো?...'

সুভাষচন্দ্রকে রুশ সীমান্তে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন ভগৎরাম। নবপরিণীতা বধূর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ। বালিকার কৌতূহলী প্রশ্ন: 'কোথায় চলে গেলে হঠাৎ? কোথায় ছিলে এতদিন? এ তোমার কী চেহারা হয়েছে? আমাকে বলতে হবে সব। আমার চিন্তা-ভাবনা নেই বুঝি?...

কোনদিন এ-সব কথার নিশ্চয়ই জবাব দিতে হবে—ভগৎরাম তা জানেন। কিন্তু তখনকার মত দায়-সারা গোছের কিছু একটা বলে

ভগৎরাম আবার পালিয়ে যান।...তাঁকে যেতে হবে কলকাতায় শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের কাছে। সুভাষচন্দ্র চিঠি লিখে রেখে গেছেন 'মেজদা'র নামে। সেটা পৌঁছে দিতে হবে। দেশবাসীর উদ্দেশে সুভাষ তাঁর অজ্ঞাতবাস থেকে বাণী পাঠিয়েছেন—অক্লান্ত, আপসহীন সংগ্রামের ডাক। সে 'ডাক' পৌঁছে দিতে হবে শরৎবাবুর মাধ্যমে বি-ভি-র নেতা সত্যরঞ্জন বক্সীর কাছে।

কাজ অনেক। তুচ্ছ সাংসারিক-জীবনের সঙ্গিনী বালিকা-বধূর মুখের কথা বা চোখের জল তাঁর পথরোধ করতে পারে না। ভগৎরাম আবার উধাও। মহান সন্ন্যাসী, মহান অধিনায়ক এমনি করেই সেদিন শিথিল করে দিয়েছিলেন বিপ্লবী ভগৎরামের ঘরের বন্ধন।...

আর একটি ঘটনা। ভগৎরামের গুপ্ত আস্তানায় এসেছিলেন আবাদ খাঁ। সুভাষচন্দ্রকে 'খাজুরি ময়দান' অবধি গাড়ি করে পৌঁছে দেবার কঠিন দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি সেদিন। গৃহে তাঁর অতি রুগ্না স্ত্রী। দেখা শুনা করার কেউ নেই। কিন্তু তাতে ভ্রুক্ষেপ করবার চিন্তা নেই আবাদ খাঁর। বাবুজীকে মঙ্গলমত যথাস্থানে পৌঁছে দেবার পর স্ত্রীর খবর নেওয়া যাবে।

প্রত্যুষে তিনি ঘর থেকে বের হন, আবার গভীর নিশীথে ঘরে ফিরে আসেন। এমনি করে যাত্রার উদ্যোগ-পর্বে তাঁর দিন কাটে। আর্তকণ্ঠে রুগ্না স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন: 'তুমি সহসা আমাকে এমন যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করলে কেন? কী অপরাধ আমার?'...নিরুত্তর আবাদ খাঁ মাথা নীচু করে থাকেন। কিন্তু সময়কালে আবার তাঁকে বেরুতে হয়।...

১৬শে জানুয়ারি (১৯৪১) খাজুরি ময়দানে গাড়ি থামল। আভূমি নত হয়ে আবাদ খাঁ বিদায়-অভিবাদন জানালেন। করজোড়ে বললেন: 'বাবুজী', একটি প্রার্থনা। যেদিন আপনার জিহাদের আয়োজন সম্পূর্ণ হবে, সেদিন যেন ভুলবেন না এই তুচ্ছ বান্দাকে। আমি একটি বিশেষ কাজের ভার চাই সেদিন।'...

স্মিত হাস্যে সুভাষ শুধালেন: 'কী কাজ?'...আবাদ খাঁ বললেন:

'আমি চাই, আটক দরিয়ার পুলটাকে আমি একা-ই উড়িয়ে দেব। পেশোয়ার থেকে রাওয়ালপিণ্ডি ও লাহোর হয়ে ফিরিঙ্গিফৌজ গড়গড় করে গাড়ি চালিয়ে তামাম হিন্দুস্থানের বুকের ওপর যাতে ঝড় না উঠাতে পারে তার এস্তেজাম আমি নিজের হাতে করতে চাই।'

রুদ্ধবাক সুভাষচন্দ্র বিস্মিত নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন: 'তোমার ঘরে রুগ্না স্ত্রী—তোমার তো দায়িত্ব রয়ে গেছে, আবাদ খাঁ।' আবেগোচ্ছল কণ্ঠে পাঠান জবাব দেন: 'রুগ্না স্ত্রীর জন্যে মায়ের সেবা আটকে থাকবে কেন, বাবুজী? স্ত্রী ভাল থাকলে তো আমরা দুজনেই আপনার হুকুমে এই কাজের ভার নিতাম।'...

'তা-ই হবে, আবাদ খাঁ'—সশ্রদ্ধচিত্তে সুভাষচন্দ্র বিদায় নিলেন।...

আবাদ খাঁ ঘরে ফিরে গেলেন। ঘর ও বাহিরকে একাকার করে দিয়ে তাঁকে বিশ্বের পথে বেরুবার শক্তি দিয়ে গেলেন বিশ্ব-পথিক, রুদ্রের সন্তান, মহানায়ক সুভাষচন্দ্র।...

তিন মাস পর। একই অবস্থায় আমরা (ভগৎরাম ও আমি) যখন বিদায় নিচ্ছিলাম আবাদ খাঁর কাছ থেকে, তখনও তিনি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের প্রতিশ্রুতির কথা। বলেছিলেন: 'জানি না বাবুজীর সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে কিনা। যদি হয়, তবে তাঁকে বোলো, আবাদ খাঁর কাছে 'নেতা' যে-কথা দিয়েছিলেন 'বান্দা' তা ভোলেনি। আজো তার চোখে আটকের পুল ভাঙবার স্বপ্ন লেগে আছে।'

আরো বলেছিলেন আবাদ খাঁ: 'আমার স্ত্রীকে খুলে বলেছি বাবুজীর কথা। আগে বলি নি গোপনতা রাখার জন্যে। এখন আর ভয় কি? এখন তো বাবুজী ফিরিঙ্গিগুলোর হাতের বাইরে।... আমার বিবিও বলেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই যদি বাবুজীর আদেশ আসে, তবে আমি যেন তাঁর জন্যে একটুও না ভাবি। বাবুজীর হুকুম তামিল করতে গিয়ে আমার কিছু হলে খোদা-ই তাঁকে দেখবেন।'...

এই অক্ষরজ্ঞানবর্জিতা পাহাড়ী নারীকে পরম জ্ঞানে মহীয়সী

করে তুলেছিল কার জাদু স্পর্শ? এই 'জাদু' তখন পেশোয়ার থেকে কাবুল পর্যন্ত আকাশে-বাতাসে গিরি-পর্বতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সন্ন্যাসী-বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র। তাঁর হৃদয় থেকে উঠে আসা কথিত ও অকথিত বাণী সবার মর্ম ছুঁয়ে গিয়েছিল অলক্ষ্যে ও অজান্তে ....

রাশিয়া মিত্র-পক্ষে যোগ দেবার পর ইংরেজের যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে কম্যুনিস্টরা সুভাষচন্দ্রকে ছেড়ে ইংরেজের পক্ষে চলে গেলেন। ফলে যে-কারণেই হোক, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সুভাষচন্দ্রের কার্যক্রম পুলিশের হস্তগত হল। কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বহু কর্মী ও নেতা বন্দী হলেন। আবাদ খাঁ-ও রেহাই পেলেন না। তাঁর বন্ধনকালেই তাঁর স্ত্রী দেহরক্ষা করেন ...

১৯৪৬ সালে কলকাতায় একদিন দেখা হয়েছিল আমার আবাদ খাঁর সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করেছিলেন দুর্ধর্ষ পাঠান: 'কোন রাজনৈতিক দলে কাজ করছ নাকি?' ওর প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার জন্য পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম, 'তুমি?'...

উত্তেজনায় ও আবেগে চকচক করছিল আবাদ খাঁর দুটি প্রোজ্জ্বল চোখ। জবাব দিলেন পাঠান: 'আমি নেতাজীর সৈনিক। সেনাপতির হুকুম না পেলে হাত উঠবে না কোন কাজে, কারো কাছে।'...অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কোন্ যাদুকর অলৌকিক কিসের স্পর্শ দিয়ে এই মানুষটির হৃদয়ে বিপ্লব বহ্নি চির প্রোজ্জ্বল করে রেখে গেছেন? সে শুধু মস্তিষ্ক নয়, বুদ্ধি নয়, তত্ত্ববাণী নয়। সে ছিল স্পর্শ উত্তপ্ত প্রাণের, গভীরতম হৃদয়বৃত্তির। এই স্পর্শের জাদু দিয়েই নেতাজী জয় করেছিলেন কোটি কোটি মানুষকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ....

যাঁরা নেতাজীকে দেখেছিলেন, তাঁদের দু-একজনের মনের কথা বলা হল। এবার বলব তাঁদের কথা, যাঁরা নেতাজীর পদধ্বনি শুনেছিলেন —তাঁকে হয় চোখে দেখেন নি, নয়তো তেমন করে কাছে পাননি ....

আব্দুল লতিফ খাঁ একেবারে নির্বাসিতের জীবন যাপন করেছিলেন 'মোমন্দ্' এলাকায়! মোমন্দ্রা পাহাড়ী আফগান এলাকার দুর্ধর্ষ

এক উপজাতি। অনুরূপ অজ্ঞাতবাসে ঐ অঞ্চলে ছিলেন সোনাবর হোসেন।

একেন্দি সাহেব শুনলেন সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সকল কথা বিপ্লবী ভগৎরামের মুখে। জানলেন যে সুভাষচন্দ্র চলে গেছেন ভারত ছেড়ে রাশিয়ার পথে, জার্মানির দিকে।

উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন তিনি। দেয়ালে ঝোলানো তাঁর রাইফেলটায় হাত দিলেন একবার। তারপর বললেন: কী আফসোস বাবুজি অতদূরে চলে গেলেন। এখানে নিয়ে এলে না কেন? আমরা কি মরে গেছি? আমরাই বাবুজিকে নিয়ে লড়াইয়ে লেগে যেতাম। ফিরিঙ্গির দল পালাবার পথ পেত না।'

মনে হল (আমিও তখন সেখানে উপস্থিত), তিনি বুঝি উড়ে চলে যাবেন, যেখানে বাবুজি সুভাষ বোস বীরাসনে বসে আছেন। কবুল করলেন আফিন্দি সাহেব যে, বাবুজির কাছ থেকে বার্তা এলে তার ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে জীবন দিতে তিনি পশ্চাৎপদ হবেন না। ...

বয়োবৃদ্ধ সোনাবর হোসেনের চোখে আনন্দাশ্রু। ভগৎকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'অশক্ত হয়েছি ভাইসাব—তা বলে বাবুজিকে পেলে আর একবার বন্দুক ধরতে দ্বিরুক্তি করব না।...তুমি বাবুজিকে খবর পাঠাও—আমরা তৈয়ের। দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, রাইফেলে যতক্ষণ কার্তুজ আছে—ততক্ষণ লড়াই থামবে না।'

সোনাবর হোসেন শেষ দেখেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে বিদ্রোহীর বেশে করাচী কংগ্রেসে। তারপর পুলিশের তাড়নায় চলে আসেন মোমন্দ্ এলাকায়। 'ডুরাণ্ড্ লাইন' নিয়ে একদিন যে-সংঘর্ষ হয়েছিল মোমন্দ্ উপজাতীয়দের সঙ্গে ব্রিটিশের, তাতে তাঁর ভূমিকা সামান্য ছিল না। ...একেন্দি সাহেব কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে কোনকালে চোখেও দেখেননি। শুনেছেন তাঁর কথা, পড়েছেন তাঁর লেখা—মনে মনেই তাঁকে বরণ করে নিয়েছিলেন নেতার গৌরবে।

গান্ধীজী নাকি এক সময় কতিপয় বিপ্লবী নেতাকে নিভৃত এক বৈঠকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'তোমরা যতটা মৃত্যুভয় জয় করেছ,

তার কতটা সঞ্চারিত করতে পেরেছে দেশের সাধারণ মানুষের মনে?' উক্ত বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ নাকি সেদিন বলেছিলেন যে, যেহেতু তাঁরা গোপন-পথের-পথচারী, সেহেতু জনসংযোগের সুযোগ তাঁদের ছিল বড়ই সীমাবদ্ধ।...দেশের সাধারণ লোকের মৃত্যুভয় দূর করার মত অবস্থা তাঁরা তখনো সৃষ্টি করতে পারেন নি।

কিন্তু নেতাজী তাঁর অভূতপূর্ব কর্ম তপস্যায় জনগণকে মৃত্যুহীন বিপ্লবীর পথে পথ চলার প্রেরণা দিলেন। এই প্রেরণা দানের মূলে তাঁর হৃদয়, তাঁর অনন্যসাধারণ প্রেম। তাই দেশের বিপ্লবী-ঐতিহ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ঐ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

প্রফুল্ল চাকি বা ক্ষুদিরামের যুগ থেকে যে ব্যক্তিগত শৌর্য ও ত্যাগ মৃত্যুকে উপেক্ষা করেছে হাসিমুখে, যে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র সেদিন থেকে বিপ্লবী ভারতের কানে কানে, প্রাণে প্রাণে উচ্চারিত হয়েছে—সেই মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম প্রবর্তক হিসেবে নেতাজী বিপ্লবের পতাকা উড়িয়ে দিলেন দেশান্তরে। দেশ-বিদেশে সমগ্র ভারতীয়ের প্রাণে জাগালেন দুর্বার সাহস। নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় অকাতরে ভারতবাসী মেতে উঠল বিপ্লবের একতানে। 'দিল্লী চলো' বাণী কণ্ঠে নিয়ে নেতাজীর বাহিনী জয় করল আন্দামান নিকোবর, জাতীয় পতাকায় বিভূষিত করল ইম্ফলের পর্বতশিখর।'

গোপন পথের যাত্রীরা একদিন বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব বা উত্তরপ্রদেশে দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করেছিলেন তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে, তার প্রধান আকর্ষণ ছিল হৃদয়ের টান। এক বিপ্লবী অপরকে সমধর্মী জানা মাত্রই অন্তরের রক্তের আত্মীয়তায় তাকে গ্রহণ করে তৃপ্ত হতেন। পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে অনায়াসে স্বাধীনতা কামনায় আত্মদানে ব্রতী হতেন।

অনুরূপ হৃদয়বৃত্তিই সহস্র গুণ ব্যাপকতায় সুভাষচন্দ্রের মধ্যে বিকশিত। সুভাষচন্দ্র এই দরদী-সংগঠনের ধারাকে গোপনতা থেকে নিয়ে এলেন বিপুল এই দেশের অগণিত জনতার সম্মুখে। প্রদীপ জ্বলে উঠল মশাল হয়ে। এবং সেই মশালের আগুনে শুচিশুদ্ধ হয়ে

স্বাধীন ভারতের জন্ম হল।...নেতাজীর হৃদয় দিয়ে গড়া আজাদ হিন্দ ফৌজ, রাণী ঝান্সী বাহিনী, বাল-সেনা ও আজাদ হিন্দ্ সরকার। হৃদয়-দিয়ে-গড়া বিপ্লব-সংস্থা। এই হৃদয়-দিয়ে-গড়া অবদানই পৃথিবীর ইতিহাসে একখানি জ্বলন্ত বাণী হয়ে মৃত্যুহীন গৌরবে চিরকাল লিখিত থাকবে।

জয়তু নেতাজী।

'নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট,
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত।

—কবি সুকান্ত

নেতাজীর জীবন দর্শন

জ্যোতিষ জোয়ারদার

বি. ভি.-র যুগ্ম সম্পাদক। [illegible] বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত প্রভৃতি ভলান্টিয়ার্স কোরের এঁরাই প্রধান পরিচালক ছিলেন। বিধান সভার প্রাক্তন সদস্য। বর্তমানে 'বিপ্লবী' পত্রিকার সম্পাদক।

নেতাজীকে দেশপ্রেমের জ্বলন্ত তরবারি, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ এবং অনন্যসাধারণ বিপ্লবী রণাচার্য বলে সমগ্র পৃথিবী গ্রহণ করেছে। কিন্তু, তাঁদের পেছনে সুপ্ত রং নেতাজীর অজস্র কর্মধারার পেছনকার মূল প্রেরণার উৎস, যা তাঁর দর্শনকে বাদ দিলে সবই বাদ পড়ে গেল বলতে হবে। তাঁর দর্শন বা মূল দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁর জীবনব্যাপী দুর্গম পথযাত্রার সহজাত পাথেয়।

নেতাজীর জীবন দর্শন সম্বন্ধে তাঁর আত্মজীবনী বা ভারত পথিক একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

আপন মূল দর্শন বর্ণনায় নেতাজী এখানে বলেছেন:

(১) আমার পক্ষে বাস্তবতা হচ্ছে সচেতন উদ্দেশ্যশীল, স্থান কালের মধ্যে ক্রিয়াশীল সত্তা।

(২) আমার দৃষ্টিতে বাস্তবতার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রেম—কি বিশ্বজগতের, কি মানব জীবনের, উভয়েরই মূলে প্রেম।

(৩) চেতনাই বাস্তব, আর চেতনার মূল হচ্ছে প্রেম—যার বিকাশ নিয়তই চলেছে সংঘাত ও সমাধানের মধ্য দিয়ে।

তাঁর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পথ যথার্থই যুক্তিবাদী। স্বভাবতই

অন্ধ গোঁড়ামির বা অলীক কল্পনার স্থান নেই সেখানে। ভারতীয় অভারতীয় যাবতীয় দর্শন বিচার করে তিনি দেখলেন যে, পুরাতন কোন দর্শন তাঁর মনকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করতে পারে না। শুধু তাই নয়, সৃষ্টির শেষ ব্যাখ্যার শেষ কথা বলার প্রয়াস তাঁর মতে স্ববিরোধী কল্পনা মাত্র। কারণ তাঁর মতে "বাস্তবতা স্থাণু নয়—সচল, সদাই পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তনের কি কোন গতিমুখ আছে? অবশ্যই আছে। এর গতি শ্রেষ্ঠতর অস্তিত্বের দিকে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে পরিবর্ত্তন কেবল অর্থহীন গতি নয়, প্রগতি।"

নেতাজী আপন দার্শনিক মতবাদকে অভিহিত করেছেন সহৃদয় সজ্ঞেয়বাদের আখ্যায়। শুধু মাত্র বিশ্বাসে ভিত্তি করে কিছু ধরে নিতে তিনি রাজী নন। তাই বলছেন: "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার চাই অথচ পাই না।" "অপর পক্ষে অসংখ্য ব্যক্তি অতীতে যা পেয়েছেন বলে দাবী করেন তাকে ধোঁকাবাজী বলে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। উড়িয়ে দিতে হলে আরো অনেক কিছু উড়িয়ে দিতে হয়, তাতে রাজী নই। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত না নিজ পরা-মনের এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করছি ততদিন পর্যন্ত হাঁ বা না কোনটাই বলা চলে না। সুতরাং আপেক্ষিকতাবাদের আশ্রয় নিতেই হয়। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের আয়ত্বে যে জ্ঞান আসে সে জ্ঞান পরম নয়, আপেক্ষিক। আমাদের যৌথ (common) মানসিক কাঠামোর, ব্যক্তি প্রকৃতির এবং ব্যক্তির মধ্যে কালগত পরিবর্ত্তনের প্রতি তার আপেক্ষিকতা।" এই দৃষ্টিতে দেখতে গেলে পরমাত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার প্রত্যেকটিই গ্রাহ্য হতে পারে; কারণ ভিন্নতার মূল হচ্ছে ব্যক্তি প্রকৃতির ভিন্নতায়। এমন কি মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একই ব্যক্তির জ্ঞানের তারতম্য ঘটতে পারে। নানা জ্ঞানের কোনটাকেই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বিবেকানন্দের ভাষায়, "মানুষের গতি মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে নয়, সত্য থেকে আরো উচ্চতর সত্যের দিকে।" সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে পূর্ববর্তী মানুষের অভিজ্ঞতা বা সত্যগুলো পরবর্ত্তী প্রাপ্তির সিঁড়ি, বা সত্যের বিভিন্ন অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং তাঁর

মতে সত্যসন্ধিৎসুর পক্ষে সহিষ্ণুতার ভিত্তিটা খুবই ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন।

এ-সহিষ্ণুতা আপন বলিষ্ঠ মতবাদেরই নামান্তর। এখানে সুবিধাজনক মিথ্যাকে আপাত বিরোধী সত্যের রূপবৈচিত্র্যের ঊর্ধ্বে স্থান দেবার ভীরুতা নেই। এখানে রয়েছে মানুষের দুনিয়াতে মানব প্রকৃতিকে সত্যাসত্য বিচারের কষ্টি পাথর বলে মেনে নেওয়ার সৎসাহস।

এবারে সুভাষচন্দ্রের জীবন দর্শনের মূল সূত্র তিন খানির খানিকটা আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ ধরা যায় বাস্তবতার মূলে আত্মার কথা। সুভাষচন্দ্রের কথায়: "কেন আমি আত্মাকে বিশ্বাস করি? কারণ এই বিশ্বাসের ব্যবহারিক প্রয়োজন Pragmatic necessity) আছে। আমার প্রকৃতির দাবী এই আত্মায় বিশ্বাস। প্রকৃতির মধ্যে আমি উদ্দেশ্য ও বিন্যাস দেখতে পাই, নিজের জীবনে দেখি বিস্ফারমান উদ্দেশ্য। আমার বোধ শক্তি বলছে যে আমি কেবল মাত্র পরমাণুর স্তূপ নই। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, বাস্তবতা কেবলমাত্র বিভিন্ন অণু-পরমাণুর এলোমেলো সংযোগ নয়। তাছাড়া বাস্তবকে আমি যে ভাবে বুঝি তাকে এর চেয়ে ভাল ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। বস্তুত এই ব্যাখ্যা হচ্ছে বুদ্ধি ও নীতির — প্রয়োজন আমার জীবনের জন্য, অস্তিত্বের জন্য।

বিশ্ব হচ্ছে আত্মার প্রকাশ, এবং আত্মার মত সৃষ্টিও অমর। কারণ সত্যের আশ্রয় বা প্রকাশ মিথ্যা হতে পারে না। সৃষ্টি কোথাও থেমে যেতে পারে না। সৃষ্টি পাপজাত নয়, শঙ্করবাদীর মতানুযায়ী অবিদ্যার ফল নয়। সৃষ্টি হচ্ছে অমর শক্তির অমরলীলা।" এখানেই আবার দেখা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্রের মানসভূমিতে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পরিণয়: মানুষের সকল সত্য নির্দ্ধারণের মধ্যে মানবীয় গন্ধ স্পর্শের স্বীকৃতি।

আপাতঅভিজ্ঞতা ছেড়ে বাস্তবের মূল প্রকৃতির কথা কেন উত্থাপন করা হল, এর উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেন, "যে মুহূর্তে আমরা অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করি সে মুহূর্তে আমি, যার মন গ্রহণ করছে, আর আমি বহির্ভূত যা কিছু আমাদের ধারণা জন্মাচ্ছে, অভিজ্ঞতার ভূমি রচনা করছে, তাকে ধরে নিতে হয়। আমি-বহির্ভূত অস্তিত্বকে মেনে নিতেই হবে। চোখ বুজে থাকলে তাকে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এই অস্তিত্ব, এই বাস্তব আমাদের সমগ্র অভিজ্ঞতার পশ্চাতে রয়েছে, তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণাতেই আমাদের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক মূল্যবোধ নিরূপিত হয়। না, অস্তিত্বকে অবহেলা করা চলবে না। এই আপেক্ষিক সত্তাই আমাদের জীবনের ভিত্তি, তা যত পরিবর্তনশীল হউক না কেন।"

এবার প্রশ্ন উঠছে চেতনার প্রকৃতি নিয়ে। সুভাষচন্দ্র বলেন "আমার মতে বাস্তবতার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রেম। কি বিশ্বজগতের, কি মানবজীবনের, উভয়েরই মূলে প্রেম।" এই ব্যাখ্যার মধ্যেও অপূর্ণতা আছে তা স্বীকার করেই সুভাষচন্দ্র বলেন, "সমস্ত অপূর্ণতা সত্ত্বেও আমার কাছে এই ব্যাখ্যা সব চেয়ে সত্য—এবং এই জ্ঞানই পরম জ্ঞানের সব চেয়ে নিকট।"

বাস্তবতার মূলে এই প্রেমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নেতাজী স্বীকার করেছেন যে তাঁর নির্ণয় পদ্ধতি মোটেও সনাতন নয়। তিনি বলেন, "আমার সিদ্ধান্ত এসেছে কিছুটা জীবনের বুদ্ধিগত বিচার থেকে, কিছুটা বুদ্ধিবহির্ভূত প্রত্যক্ষ-বোধ থেকে, কিছুটা ব্যবহারিক বিবেচনা থেকে। আমার চারদিকে দেখতে পাই প্রেমের লীলা, নিজের ভিতরেও দেখি তারই প্রকাশ। নিজের পূর্ণতার জন্য প্রেমের প্রয়োজন বোধ করি, জীবনকে গড়ে তোলার একমাত্র ভিত্তি পাই প্রেমে। বিভিন্ন চিন্তায় আমাকে একই সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেয়।"

তারপর-ই বলেছেন, এ প্রেমের ভিত্তির এখনও পরিপূর্ণ প্রকাশ হয় নি, স্থান কালের মধ্যে নিত্যই তার প্রকাশ বিস্ফারমান (Unfolding)। বাস্তবের মূলে প্রেম, বাস্তবের মতই সে নিত্য পরিবর্তনশীল।

এবারে প্রশ্ন উঠছে বিকাশের দিক ও রীতি নিয়ে। সুভাষচন্দ্রের মতে এ বিকাশ হচ্ছে অগ্রগতিশীল বা প্রগতিমুখি। "প্রগতি সরাসরি এক লাইনে চলেছে এমন নয়। তার পথে বাধা আছে নিয়তই। কিন্তু দীর্ঘকালীন দৃষ্টিতে দেখতে গেলে প্রগতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। এই বুদ্ধিগত বিচার ব্যতীত বুদ্ধিবহির্ভূত প্রত্যক্ষ জ্ঞান রয়েছে যে, কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এগিয়ে চলেছি। জৈব ও নৈতিক কারণে প্রগতির প্রতি বিশ্বাস রাখাও আমাদের পক্ষে অনিবার্য প্রয়োজন।

এ প্রগতির নিয়মকে জানার চেষ্টাতে সুভাষচন্দ্র সাংখ্য দর্শন থেকে শুরু করে স্পেন্সার, হার্টমান, বের্গ্‌সঁ এবং হেগেলের সিদ্ধান্ত তন্ন তন্ন করে অনুধাবণ করে দেখেছেন। এঁদের মধ্যে একমাত্র হেগেলীয় ধারণাই বিবর্তন ব্যাখ্যার নিকটতম প্রকাশ বলে মনে হয়েছে তাঁর। এঁর মতে, "বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, বাহ্যজগতে ও অন্তরজগতে, উভয়েই দ্বান্দ্বিক। সংঘাত ও সমাধানের মধ্য দিয়েই জীবনের প্রগতি। প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে। সমাধানেই তার নিবৃত্তি। কিন্তু তা থেকে আবার প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়, ইত্যাদি। এখানে মার্ক্সীয় ডায়লেক্‌টিকের সঙ্গে তাঁর বিরোধ। মার্কসের মতে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার এক প্রান্তে এসে সংঘাতেরও শেষ, দ্বান্দ্বিক রীতিরও শেষ। এই শেষ মানতে হলে ইতিহাসের ও প্রগতিরও শেষ মানতে হয়। এতে যুক্তির অপমৃত্যু ঘটে। দার্শনিক সুভাষের মন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করে পারে না। সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে শেষ কথার চেয়ে সত্যের মর্যাদা বড়। তা হলে অন্যান্য ব্যাখ্যা অপেক্ষা হেগেলীয় ধারণাতেই শ্রেষ্ঠতর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তবু সমগ্র সত্য এতেও নেই। কারণ প্রতি ঘটনা এর সঙ্গে মেলে না। বাস্তবতা এত বৃহৎ যে, আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে তার স্থান কুলোয় না। তা হলেও বৃহত্তম সত্য যে ধারণায় আছে তারই ভিত্তিতে জীবনকে গড়ে তোলা চাই। পরম জ্ঞানকে জানি না বা জানা যায় না বলে নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না।

সুতরাং চেতনাই বাস্তব, আর তার মূল হচ্ছে প্রেম, যার বিকাশ নিয়ত চলেছে সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে।

আত্মপ্রকাশের বেদনা বা সফলতার তীব্র আগ্রহই বিশ্ব-সৃষ্টির মূল প্রেরণা। সফলতা একের এবং বহুর। ব্যক্তিকে অস্বীকার করে বহুর জন্য যে কল্যাণ প্রচেষ্টা তা দোষদুষ্ট। তেমনি বহুকে অস্বীকার করে, সমাজ বা দেশকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিগত চরিতার্থতার যে অপচেষ্টা তারও ব্যর্থতা কাম্য এবং অবশ্যম্ভাবী। আপাতবিরোধী এক এবং বহুর সফলতার মিলন বা সৌষম্যের মধ্যে রয়েছে বিশ্ব সফলতার ইঙ্গিত। কিন্তু স্বাধীনতার অভাবে সফলতা বা সৌষম্য অলীক কল্পনা মাত্র। তাই স্বাধীনতা, সফলতা ও সৌষম্যের সাবিত্রয় গৌরবে সম্মান পেয়ে এসেছে নেতাজীর জীবন দর্শনে।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মবীর সুভাষচন্দ্রের কর্মজীবনই তাঁর দর্শনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। স্বাধীন কোন দেশে জন্ম নিলে তাঁর বিকাশ কি রূপ নিত জানি না। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের নিষ্ঠুর পরিবেশে এ জন্ম-বিদ্রোহীর জীবনদর্শনের পূর্ণতম বিকাশ যে তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে ঘিরেই হয়েছে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। তাই তাঁর দর্শনের মূল নীতি আলোচনা করতে গেলে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন আলোচনার অবতারণা করতে আমরা বাধ্য।

সৃষ্টির পরিসরে বিবর্তন নীতির মত রাজনৈতিক ব্যবস্থার ইতিহাসেও দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের নির্দেশকে সর্ব্বাগ্রগণ্য বিবেচনা করেন সুভাষচন্দ্র। ১৯৩৪ সালে তাঁর শ্রেষ্ঠ পুস্তক 'ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল্'-এ এবং ১৯৪৪ সালে তাঁর ঐতিহাসিক টোকিও-ভাষণে তিনি ভারতের যোগ্য রাজনৈতিক নবব্যবস্থার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তিনি সেখানে বলেছেন যে জগতে বর্ত্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার একটা যথার্থ সমন্বয়েই নির্মিত হবে ভাবী ভারতীয় নবব্যবস্থার উপাদান।

উদাহরণ স্বরূপে তিনি ফ্যাসিবাদ ও কম্যুনিজমের পারস্পরিক লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করে বলেছেন এতদুভয়ের সংঘাত ও সমাধানের ফলে সৃষ্ট রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাই আনবে আদর্শ নবব্যবস্থা। নেতাজীর মতে এ দু'য়ের একটিকে মাত্র মানব প্রগতির শেষ স্তর বলে গণ্য করা একটা বিরাট ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। দর্শনে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য যে মানব প্রগতি কখনও থেমে যেতে পারে না। বস্তুতঃ অতীতের অভিজ্ঞতা হতে নব নব ব্যবস্থার গোড়া পত্তন আমাদের করতেই হবে। কাজে কাজেই আমরা পরস্পর বিরোধী বর্ত্তমান ব্যবস্থার সংশ্লেষণে তৈরী করবো এমন এক নব ব্যবস্থা যার মধ্যে উভয়ের যা কিছু ভাল তাই থাকবে রূপায়িত হয়ে।

ন্যাশনাল সোশ্যালিজম্ ও কম্যুনিজমের ভেতরকার কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যাপারের মধ্যে তুলনা টেনে দেখাচ্ছেন নেতাজী: "এ দুই ব্যবস্থাই মূলতঃ অগণতান্ত্রিক ও সর্ব্বগ্রাসী বা Totalitarian। উভয়েই ধনিকতন্ত্র-বিরোধী। য়ুরোপীয় ন্যাশনাল সোশ্যালিজমের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ন্যাশনাল সোশ্যালিজম জাতীয় ঐক্য এবং স্থৈর্য্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে তাতে জনসাধারণের অবস্থারও উন্নতি হয়েছে তা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু ধনিকতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধন সেখানে সম্ভব হয়নি। অপরদিকে সোভিয়েত দেশের কম্যুনিজমের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায়, তাদের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হচ্ছে সারা দেশ ব্যাপী জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠাতে। কম্যুনিজমের দুর্ব্বল দিক হচ্ছে এই যে স্বাজাত্যবোধকে তা মোটে বরদাস্ত করতে পারে না।

অথচ ভারতবর্ষের জন্য চাই এমন একটা প্রগতিশীল সমাজ-ব্যবস্থা যা একাধারে সমগ্র জনসাধারণের চাহিদা মিটাবে এবং সহজ স্বাজাত্য-বোধকেও যথার্থ আসন দেবে। এক কথায় বলতে গেলে স্বাজাত্যবোধ (Nationalism) ও সমাজবাদ (Socialism)-এর যথার্থ নব সংশ্লেষনই শুধু সে আশা সফল করতে পারে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রেণী সংগ্রামের চেয়ে কমনওয়েলথ-

বিরোধী সংগ্রাম প্রাধান্য পেতে বাধ্য। সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ধনিক তন্ত্রেরও বিনাশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে। তেমন অবস্থায় ভারতীয় রাজ্যপ্রশাসন জনসাধারণের প্রভু না হয়ে দাস হিসাবেই বিরাজ করবে এবং গৌরব বোধ করবে। সোভিয়েত ব্যবস্থায় মজদুর ও কিষানদের মধ্যে শিল্প-কারিগরদেরকে যে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে ভারতবর্ষে সে প্রাধান্য কিষানদের প্রাপ্য হবে।

তা ছাড়া মার্কসবাদের দৃষ্টিতে মানবিক জীবনের মূল্যবোধের তৌলে অর্থনৈতিক দিকটা অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট হয়েছে বলেই নেতাজীর মত। রাষ্ট্র তথা সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক চাহিদাকে মূল্য দেয়া অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু অতিমূল্য দিতে গেলে ভুল হবে।

তা হলে পুনরুক্তি করে বলতে হয়, সুভাষচন্দ্রের মতে ভারতীয় রাষ্ট্র তথা সমাজব্যবস্থার মূল দৃষ্টিকোণ হবে ন্যাশনাল সোশ্যালিজম ও কম্যুনিজমের এক যথার্থ সংশ্লেষণ বা সিনথেসিস্। থিসিস ও অ্যান্টিথিসিসের সংঘাত এক উচ্চতর সংশ্লেষণে মিলে যাবে। দ্বান্দ্বিক সমন্বয়বাদের এই তো দাবী। মন গড়া মত এই ডায়ালেকটিক্ রীতিকে থামাতে চাইলে মানব প্রগতির অন্ত বা মৃত্যু কামনা করতে হয়। তাই নেতাজীর দৃষ্টিতে সংঘাত ও সমাধানের নিয়মকে মেনে রাষ্ট্র তথা সমাজ বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হবে ভারতবর্ষ।

এখানে নেতাজীর পরিকল্পিত ভারতীয় সমাজবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না নিশ্চয়। নেতাজী বলেছেন, এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে, সমাজবাদের পথেই ভারত তথা বিশ্বের পরিত্রাণ। সমাজবাদের সংজ্ঞা তো দু-একটি নয়, তবে কোন্ সমাজবাদের কথা বলেছেন সুভাষচন্দ্র? এই বহুরূপী সমাজবাদের বিভ্রান্তি হতে আপন দেশবাসীদেরকে মুক্ত করবার জন্যই তিনি সমাজবাদের তিনটি প্রশস্ত ধারার তুলনা করে নিজের সমাজ-বাদের রূপ বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ দক্ষিণপন্থী সমাজবাদীদের

কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, ওঁরা আর যাই বলুন, তাঁদের আসল কথা নরম পন্থা এবং রিফরমিষ্ট কর্মসূচী। আমূল পরিবর্তন ওঁরা চান না, তাঁদের কাজ রয়ে সয়ে। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পন্থীদেরকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন, "মস্কো-বন্ধু" তথা "মস্কো-শিষ্য" বলে। আপন সমাজবাদকে দিয়েছেন এ দুয়ের সংশ্লেষণের ফল। এই সমাজবাদকেই তিনি বর্ণনা করেছেন রক্ত মাংসের তৈরী বাস্তব সমাজবাদ হিসাবে। তাঁর মতে ভারতবর্ষ আপন প্রয়োজনে আপনার ঐতিহ্য এবং ভূগোলের দাবীকে মেনে এবং ভারতীয় আবহাওয়ায়, আপন ঐতিহ্য ও মণীষার অনুগামী করে এক বিশেষ ভারতীয় সমাজবাদের প্রবর্তন করবে। সে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা হবে ভারতের নিজস্ব পন্থাতে। "India should produce her own form of Socialism as well as her own methods". সুভাষচন্দ্র নিজে এই ভারতীয় সমাজবাদীদের একজন বলেই নিজেকে পরিচিত করে গেছেন অভ্রান্ত ভাবে। তাঁর নিজের ভাষায়—"To this group I humbly claim to belong"—দাবী করেছেন তিনি যে সমগ্র পৃথিবী যখন এই Socialist Experiment নিয়ে ব্যস্ত, তখন ভারত কেন অনন্যসাধারণ এক সমাজবাদের প্রবর্তন করবে না, যার ফলে হয়ত সমগ্র পৃথিবী উপকৃত হবে এবং শিক্ষা নেবে। ভারতীয় সমাজবাদ শীর্ষক এক বিখ্যাত অনুচ্ছেদে সুভাষচন্দ্র তাঁর সমাজবাদ বর্ণনা করেছেন। এই প্রকারে তাঁর সফলতা-স্বাধীনতা-সৌষম্যের বাণী মূর্ত হবে। সেই সমাজবাদে থাকবে অবিমিশ্র স্বাধীনতা—"Complete all round undiluted political freedom, বৃটিশ কমনওয়েলথ হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ; এবং এতে থাকবে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি "Complete economic Emancipation;" এতে থাকবে, প্রতি মানুষের বিবেক বা ধর্মের স্বাধীনতা, খেটে খাবার অধিকার এবং স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণের যোগ্য মজুরী লাভের অলঙ্ঘ্য অধিকার। অনার্জিত আয়ের পথ থাকবে না সেখানে। উপার্জনের সমান সুযোগ থাকবে সেইখানে।

সর্বোপরি সমাজের ধন-উৎপাদন এবং বণ্টনের নীতির ভিত্তি হবে কর্ম-দক্ষতা, ন্যায় ও সাম্য (Equity)। উৎপাদনের উপায়স্বরূপ যাবতীয় যন্ত্রপাতি বা প্রতিষ্ঠান জাতীয় সরকারের পরিচালনাধীন থাকবে, প্রয়োজন মত। সামাজিক জীবনে সুভাষচন্দ্র চান পূর্ণ সাম্য। সমাজে বর্ণভেদ থাকবে না, অনুন্নত শ্রেণী বলে কাউকে কোন বঞ্চনা ভোগ করতে হবে না। স্বত্বাধিকারে এবং পদমর্যাদায় সবাই থাকবে সমান। তদুপরি নারী পুরুষে থাকবে না কোন ভেদ, অধিকারের ক্ষেত্রে—কি আর্থিক, কি সামাজিক পদমর্যাদায়, আর কি আইনের বিচারে, নারী সবভাবে পুরুষের সমান সহকর্মিনী হিসাবে গণ্য হবেন। এক কথায় সুভাষ পরিকল্পিত এ ভারতীয় সমাজবাদের অর্থ নৈতিক দিকটাকে বলা যায় অর্থ নৈতিক গণতন্ত্রবাদ (Economic Democracy)। এ ভারতীয় সমাজবাদে মার্কসীয় দর্শনের অসহিষ্ণু মনোভাব নেই। সুবিধার যূপকাষ্ঠে মানুষের বিবেক, ধর্ম, ঐতিহ্যকে বলি দেয়া নেই। শত অসুবিধা সত্বেও সত্য যা তাকে স্বীকার করাতেই সুভাষচন্দ্রের জীবন দর্শনের মর্যাদা।

বিবেকের মুক্তি বা Freedom of conscience-এর সাথে রাষ্ট্রীয় মুক্তি (National Independence) তথা গণতন্ত্র বা Political Democracy ও Economic Democracy, এই সব কয়েকটিকেই ঠাঁই করে দেয়া চাই, ভাবী নব-ব্যবস্থাতে। চিরস্থায়ী ডিক্টেটরতন্ত্রের স্থান নাই ওখানে। এই ডিক্টেটরীর বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় অভিযানই মানুষের জীবনেতিহাসের একটা বড় দিক। ভগবৎদত্ত শক্তির দোহাই দিয়েছে যে রাজা, আইন নিয়ন্ত্রিত রাজা এবং সহৃদয় "ডেস্‌পট" (Benevolent Despot) এদের সবাইকেই মানুষ দেখেছে, হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং উচ্ছেদ করেছে কিন্তু Dictatorship of the proletariat যে যথাকালে ফলতঃ পরার্থ শ্রমিকদেরকেও ডিক্টেট করবেন, এই কথাটাই তখনও বুঝতে বাকী ছিল। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে, আজ আর এক মৌলিক বিপ্লব ছাড়া এই ডিক্টেটর-তন্ত্রকে উৎখাত করা যাবে না। সেই অনাগত বিপ্লবেরই আয়োজন

আজ ভারতভূমিতে। দুনিয়ার মানুষ যথার্থ সমাজবাদকে চায়, কিন্তু বহু কষ্টে পাওয়া গণতন্ত্রকে বিসর্জন দিয়ে নয়, প্রতিষ্ঠিত করে।

নেতাজী বলেন যে আজকের জগতের আন্দোলনে যত মহৎ ফল বা সম্পদ আছে তাদের প্রতি উপেক্ষা নয়, তাদের এক উচ্চতর সংশ্লেষণে পরিণত করাই ভারতের তথা দুনিয়ার মানুষের কাজ। তাই মুক্তির ত্রিবেণী সংগমে চতুর্থের আগমনী হ'ল ধ্বনিত। মানুষের মর্যাদা বা Dignity of man — এই সত্যটিকে আসন দিতে হবে ত্রিধারা স্বাধীনতার পাশে। তাহলে বিবেকমুক্তি, অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের পাশে মানুষের মর্যাদাকে দিতে হবে স্থান। ভয়ে বা লোভে আড়ষ্ট হয়ে এই মর্যাদাখানি যদি খোয়া গেল তাহলে মানুষের মধ্যেকার মনুষ্যত্বটুকু পড়ে গেল বাদ। কবিগুরু বলেন, 'জীবে শিবে মানুষ' ভয়ের দাসত্বে বা দয়ার দানে জীবের ভাণ্ড যদি বা ভরে, শিবের ভাণ্ডে শূন্যতাই শুধু যায় বেড়ে। মর্যাদা হারিয়ে কায়ক্লেশে যদি শুধু জৈব সত্তাটি রক্ষা করতে হয়, তাহলে মানুষের জগতে মানুষকে খুঁজে পাওয়া ভার হবে। যথার্থ মনুষ্যের অমরত্বের যিনি পূজারী, তিনি বরং জীবন দিয়েও ঐ মনুষ্যত্বটুকুকেই তুলে ধরবেন সর্বকালের সর্বমানবের জন্য। তাই এক ঐতিহাসিক জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে সুভাষচন্দ্রের মুখে ধ্বনিত হল—"One individual may die for an idea but the idea will, after death incarnate itself a thousand lives." আদর্শের বেদীমূলে কোন ব্যক্তি যখন জীবন দান করেন, তখন তাঁর মৃত্যুর পর ঐ আদর্শ মূর্ত হয়ে ওঠে হাজারো জীবনে। কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে অনশনরত নেতাজীর মুখে এই কথা উচ্চারিত হল। আত্মোৎসর্গের জলন্ত প্রতীক নেতাজীর মুখে তাই ধ্বনিত হল: "আত্মোৎসর্গে মানুষ হারায় মাটি,—লাভ করে অমরতা।" এই মরণজয়ী বিশ্বাসের জোরেই সারা আজাদ হিন্দ ফৌজের হৃদয়ের ছন্দ তিনি বেঁধে দিয়েছিলেন, এক মহামন্ত্রের ছন্দে, "কর সব নিছাবর বনো সব ফকির।"

তা'হলে নেতাজী পরিকল্পিত ভারতীয় নব ব্যবস্থায় পূর্ণ স্বাধীনতার স্তম্ভ হল (১) বিবেক মুক্তি (২) রাষ্ট্রিক গণতন্ত্র, (৩) অর্থনৈতিক গণতন্ত্র আর (৪) মানুষের মর্য্যাদা।

এই চতুবর্গ স্বাধীনতার প্রাণতন্ত্রী ছন্দিত রয়েছে আবার স্বাধীনতা সফলতা সৌষম্যের বিশ্বছন্দে। সেই বিশ্বছন্দের মর্ম্মবাণী অমর প্রেম। এই ভাবী নব-ব্যবস্থা ভারতে প্রতিষ্ঠিত করবার সঙ্কল্পেই নেতাজী বলেছেন আমি চাই ভারতে এক সমাজবাদী সাধারণতন্ত্র (**Socialist Republic in India**)। এই **Socialist Republicanism**ই তাই হয়ে দাঁড়ালো তাঁর জীবনের স্বপ্ন, সাধনার ধন। আজ তাই এই সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকান-ইজমই নামান্তরে সগৌরবে আখ্যাত হচ্ছে **সুভাষবাদ** বলে।

এই প্রসঙ্গে সুভাষ পরিকল্পিত নব ব্যবস্থা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে যে যুদ্ধোদ্যম ও অভিযানের অবসরে পূর্ব এশিয় সংহতি নামক যে ব্যবস্থা স্বাধীনতা, ন্যায়ধর্ম এবং পারস্পরিকতার উপর নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই হ'ল নেতাজীর পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রতীক। ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে অনায়াসে অনুভূত হবে যে এই সুভাষবাদ বস্তুতঃ একটা মৌলিক বিপ্লবের বাণী ধারণ করেই এসেছে ভারতবর্ষে। "হোলি রোমান" সাম্রাজ্যের অধীন জার্মানীর "রিফরমেশন" বিবেক-মুক্তির বাণী বহন করে, ফরাসী বিপ্লব বিবেক ও গণতন্ত্রের বাণী বহন করে, এবং রুশ বিপ্লব সমাজবাদের বাণী বহন করে যদি বিশ্বব্যবস্থা বা **world order** বলে আখ্যাত হয়ে থাকে, মানুষের ভাব ও কর্মরাজ্যে দুনিয়া জুড়ে; তাহলে বিবেক—গণতন্ত্র—সমাজবাদ—মানুষের মর্য্যাদাকে একই ব্যবস্থায় ধারণ করে সুভাষবাদ বিশ্ব-ব্যবস্থার গৌরব অর্জ্জন কেন করবে না? তা ছাড়া, জন সংখ্যায় ভারত একাই পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ।

প্রকৃত প্রস্তাবে, কি ভাব-মৌলিকত্বের দিক দিয়ে, কি সত্য

স্বীকারের আস্পর্দ্ধার দিক দিয়ে, আর কি ক্ষেত্র মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে, যে কোন দিক দিয়েই বিচার করা যাবে, সে দিক দিয়েই প্রতীয়মান হবে যে এই ভারতীয় নব ব্যবস্থা বা সুভাষবাদ একাধারে একটা মহাজাতীয় এবং বিশ্বব্যাপী বিপ্লব।

ভারতাত্মার আত্মপ্রকাশের বেদনাই সুভাষবাদের মর্মবাণী। ভারতের দরিদ্রনারায়ণের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে ঐকাত্ম্যবোধের গভীরতায় এর চলৎশক্তি। ঐ ঐকাত্ম্যবোধের মানস সরোবরে ভারত উদ্ধারের নব গায়ত্রীমন্ত্র 'জয়হিন্দ' নাদ উপজাত। 'জয়হিন্দের' মন্ত্রদ্রষ্টা ঋত্বিক নেতাজী স্বয়ং। জয়হিন্দ মন্ত্রের জ্বলন্ত ভাবমূর্তিই হয়েছে প্রতিফলিত নেতাজীর ভাবে-কর্মে-জ্ঞানে, জীবন-মৃত্যুকে করেছে তাঁর পায়ের ভৃত্য, রাজ্যলোভ, মৃত্যুভয়, মোক্ষলাভকে করেছে তাঁর দৃষ্টিতে ক্রীড়নকের সমান। তাঁরই মন্ত্রপূত আহ্বানে এর মণিস্পর্শে এসে অগুন্তি হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খৃষ্টান, বিহারী-বাঙ্গালী-পাঞ্জাবী নারী-শিশু, যুবা-বৃদ্ধ সকল ব্যবধান ভুলে, কাড়াকাড়ি করে বুকের রক্ত উজাড় করে রঙীন করে দিল ভারতের মুক্তি সংগ্রামের বিশ্বব্যাপী দৃশ্য-অদৃশ্য রণাঙ্গনগুলোকে। পূর্ণ স্বাধীনতা এল না। কিন্তু ভারতের আপামর সাধারণ অভূতপূর্ব আন্দোলনের প্লাবনে প্লাবিত হল। বিলম্বে হলেও বুঝতে পারল, কি হতে পারত। সারা ভারত আজ অন্তরের দুয়ার খুলে উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে আছে আকাশ পানে নেতাজীর স্পর্শমণির স্পর্শের আশায়, তাঁর অমর বাণীর প্রতিধ্বনির আশায়।

ভারতের মরা-গাঙে এমন বান, এমন কল্লোলিনীর ধারা আর কোনদিন বয়েছিল কি? প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে কষে এমন করে এত বড় সত্য-কথা দেশবাসীর প্রাণে প্রাণে কয়েছিল কি কেউ কোনকালে ভারত ইতিহাসের পরিসরে—"আজ আমি জীবন দেব, যাতে করে ভারত বাঁচতে পারে, স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে, এবং যশস্বী হতে পারে।" তবু আজও সফলতা এল না! কিন্তু

আজও জয় পরাজয়ের চেয়েও বড় যে দুর্জয় আশা ও দুর্বার কর্ম-প্রেরণার ঐতিহ্য, তাইতো নেতাজীর শ্রেষ্ঠ দান।

এ দানের উৎস মূলে রয়েছে নেতাজীর ধ্যানলব্ধ জীবন-দর্শন। এ জীবন দর্শনই সুভাষবাদের প্রাণগঙ্গা এবং এ প্রাণগঙ্গার গঙ্গাধর নেতাজী স্বয়ং। নেতাজীর প্রতি ভারতবাসীর যে শ্রদ্ধা তা দুর্বার কর্ম প্রেরণায় রূপান্তরিত হলে তবেই এ-জীবন-দর্শনের যথার্থ উপলব্ধি সম্ভব হবে; অন্য পথ নেই। ভারতবর্ষ বাঁচতে চাইলে নেতাজীর জীবন-দর্শনকে উপেক্ষা করতে পারবে না। আপন স্বার্থ, মায় জীবন পর্যন্ত, বিসর্জন করতে প্রস্তুত না হলে এ মহাজাতির অন্ন, বস্ত্র, কর্মসংস্থান, ইমান ইজ্জতের পথ রচনা আকাশ-কুসুম মাত্র।

* 'বিজয় শঙ্খ' পত্রিকা থেকে ধন্যবাদ সহকারে সংগৃহীত।

'ভারতবর্ষ পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের নীতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। কিন্তু ভারতবর্ষ মস্কো বা ওয়াশিংটনের কারো অন্ধ অনুকরণকারী হবে না। ভারতবর্ষের নীতি হবে সম্পূর্ণ ভারতীয়'।

— নেতাজী সুভাষচন্দ্র

এই যুগ রহিয়াছে জাগি

অনিল রায়

[বৈপ্লবিক সংস্থা শ্রীসংঘের প্রধান পরিচালক। দার্শনিক ও বিদগ্ধ চিন্তানায়ক। কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত—প্রতিটি ব্যাপারে তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে মার্কসবাদ' ও 'নেতাজীর জীবনবাদ'। বর্তমানে পরলোকগত]

যে বাণী খুঁজিয়া ফিরে ভাষা
যার বুকে নীরবে ঘুমায়ে আছে যুগান্তের মৃত্যুহীন আশা
তাহারি চলন্ত স্পর্শ বিদ্যুত শক্তিতে ভরা
জাগায়ে তুলুক আজি মূর্ছিত কালের সপ্তস্বরা।

তরঙ্গিয়া অনুদাত্ত-উদাত্ত-স্বরিত ছন্দে
সৃজন প্রবুদ্ধ সুরে অনন্ত আনন্দে
সেই বাণী উঠুক জ্বলিয়া
উদয় গগন আকুলিয়া।

যে মন্ত্র হারায়ে গেছে রাত্রির আঁধারে
উদ্ধার করিয়া তারে।
বজ্রগর্ভ মেঘের ভাষায় কালাক্ষর-লিপি লিখে দিক্
রচিয়া নতুন বেদ, জীবনের নবগীতি, নবতম ঋক্
দিগন্ত-প্রাচীর-পটে
নব প্রভাতের তটে
জ্যোতির আখরে।

তারি পরে
অতন্দ্রিত দৃষ্টি রাখি মরুযাত্রী কাফেলার দল
চলুক অনন্ত পথে বন্যাসম দুরন্ত চঞ্চল
ছাড়াইয়া পথপ্রান্তে অগণিত কংকালের স্তূপ
শ্মশানের হাহাকার-গীতি আর মৃত্যুর কুৎসিত রূপ
অশিবের প্রেতনৃত্য, বেতালের খলখল হাসি
ছাড়াইয়া চিতার আগুন রাশি রাশি
দুর্নিবার চলার সঙ্গীত
অভিযাত্রী গোষ্ঠীদের মরুজয়ী ক্লান্তিহীন প্রাণের ইঙ্গিত
অনাগত যুগের ইশারা
বাধা বন্ধ হারা
ফুটিয়া উঠুক এই রাত্রিশেষে জ্যোতিপুঞ্জ ধূমকেতু সম
ভবিষ্যের শুভগাথা, অজানা কালের মর্মবাণী নিরুপম
বর্ণহীন রিক্ত শোভা বর্তমান-যবনিকা পরে

ওরে ভাই কতযুগ ধরে
কথার কুসুম গেঁথে কত গান হলো গাওয়া কত সুরে তালে
কালে কালে
কত যে মধুর লীলা, কত খেলা হলো
রঙীন কথার জাল বুনে মিছে সে খেলায় কী বা হল বলো?
শতাব্দীর আত্মা আজ হারায়েছে আপনারে, হারায়েছে পথ
মিথ্যার মরুতে এসে থেমে গেছে জীবনের রথ।
কে চিনাবে পথ, বলো, কে তাহারে দিবে আজ গতি
কার কণ্ঠে 'কথা' হবে অনন্ত স্ফুলিঙ্গ জ্যোতিষ্মতী?
অন্ধকার হল আজ জয়ী
তাহারে দমিয়া আজ শানিয়া তুলিতে হবে বাণী বজ্রময়ী
সে বাণীর দুর্ধর্ষ সাধনা
কে করিবে এ শ্মশানে শক্তিমন্ত্রে শব আরাধনা?

ঝড়ের দেবতা আর সর্বনাশা দুঃখের আহ্বান
প্রলয়ের গান
মন্ত্রিয়া তুলিতে হবে, ঝংকারিয়া অশান্তির স্তুতি
অমারজনীর বুকে জ্বালায়ে অশেষ ধৈর্যে বেদনা-প্রদীপ দ্যুতি।
সে বাণীর সাধকের লাগি
আঘাত জর্জর চিত্তে আত্মহারা এই যুগ রহিয়াছে জাগি

---

* 'জয়শ্রী' পত্রিকার আষাঢ়, ১৩৪৫ [illegible] সংখ্যায়

বিবেকানন্দ, নিবেদিতা ও সুভাষচন্দ্র

অধ্যাপক সমর গুহ

[illegible] বৈপ্লবিক সাধনা [illegible] [illegible] লোকনেতার মন্ত্র, তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠ নেতাজী [illegible] [illegible] প্রতিধ্বনিত [illegible] [illegible] [illegible] নেতাজীর চারিত্রিক [illegible] তুলে ধরার ব্যাপারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

১৮৯৭ সালে সুভাষচন্দ্রের জন্ম। এই বছরে বিপ্লব-তীর্থ আয়ার-ল্যাণ্ডের অগ্নিকন্যা ভগ্নী নিবেদিতা ভারতে আসেন বিবেকানন্দের সঙ্গে। ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক, কিন্তু আত্মিক অনুভূতিতে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় বিপ্লববাদের যজ্ঞবেদী রচনা করেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। এই যজ্ঞবেদীতে হোমাগ্নি সঞ্চার করেন ভগ্নী নিবেদিতা। সুভাষচন্দ্র সেই বৈপ্লবিক প্রজ্বলিত শিখা। বিপ্লব যজ্ঞের এই সাগ্নিক জ্বলন্ত শিখা-রূপেই সুভাষচন্দ্র ভারত ইতিহাসে স্বর্ণাসন লাভ করেছেন, 'নেতাজী' মহানায়কত্বের অদ্বিতীয় পরিচয়ে।

সুভাষচন্দ্রের যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। সুভাষচন্দ্র তখন কটকে—সুভাষের সেই কৈশোরেই অগ্নি-কন্যা নিবেদিতার জীবন শিখা নিভে যায়। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বিবেকানন্দ বা ভগ্নী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয় নি। তবুও জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লবমন্ত্রে সুভাষচন্দ্রের দীক্ষাদাতা হলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগ্নী নিবেদিতা। এই দীক্ষা ও প্রেরণার ভাবাত্মক বাহন হলো বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক জীবনদর্শনের অনুভূতি,—যে অনুভূতিকে ভগ্নী নিবেদিতা তীক্ষ্ণ ও তীব্র করে তোলেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের দিশারীরূপে।

কিশোর সুভাষের জীবন-স্বপ্ন কিভাবে সার্থক হয়ে উঠলো বিবেকানন্দের আত্মিক স্পর্শে, তার বিবরণ সুভাষ নিজেই অনুপম বর্ণনায় লিখে রেখেছেন। সুভাষ তখন কিশোর,—মন তাঁর জীবন ভরে ফসল ফলাবার আগ্রহে উন্মুখ। কি হবে সেই ফসলের বীজ, —কোন্ মহীরূহে পূর্ণতা লাভ করবে কিশোর সুভাষ—সেই প্রশ্ন তার কচি মনকে সেদিন মথিত করে তুলেছিল। সুভাষের নিজের কথায়:

"সে সময়ে আমার মনলোকে এক প্রচণ্ড ঝড়ের যুগ চলছিল। মানসিক দ্বন্দ্বে আমার মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সংঘাত ও বেদনায় আমার সারা অন্তর জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। কোন কিশোরের জীবনে বোধহয় স্বাভাবিকভাবে এমনি অভিজ্ঞতা দেখা যায় না। কিন্তু আমার মানসিক গঠনে কিছুটা অস্বাভাবিকতার স্পর্শ ছিল। আমি অনেক বেশি পরিমাণে শুধু যে আত্মমগ্ন ছিলাম তাই নয়—মনের দিক দিয়ে অনেকটা বেশি মাত্রায় বাড়ন্ত ছিলাম। পার্থিব আকর্ষণ বা স্বাভাবিক জীবনের অনুসরণের আগ্রহের বিরুদ্ধে আমার উচ্চতর অনুভূতি বিদ্রোহ করতে শুরু করেছিল। আমি যা চাইছিলাম,—অজ্ঞাতসারে যার সন্ধানে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম সে হলো একটি মৌল আদর্শ,—যার উৎসে নিমগ্ন থেকে, যার সংকল্পে অবিচ্যুত হয়ে জীবনের নানা বিপক্ষকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতে পারবো।"

জীবনের প্রভাতে এমনি যখন এক 'সংকট' সুভাষ-জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল,—স্বপ্নচারী কিশোর সেই সময়ে আকস্মিক একদিন বিবেকানন্দের রচনাবলীর সাক্ষাৎলাভ করলো। যেন এক নতুন জীবনের সন্ধান পেলো সে। নিজেই সুভাষ লিখেছেন সেদিনের এই নব চেতনার উন্মেষের কথা :

"আমি বুভুক্ষুর মত গ্রাস করতে লাগলাম সেই রচনাবলী,—আমার সমস্ত অস্থিমজ্জায় শিহরণ খেলে গেল। যে আদর্শের মধ্যে আমি আমার জীবনসত্বাকে সমর্পণ করতে পারি—বিবেকানন্দ তাই দিলেন আমাকে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস আমি মগ্ন হয়ে রইলাম তাঁর রচনাবলীর মধ্যে। আমার বয়স তখন মাত্র পনেরো, বিবেকানন্দ প্রবেশ করলেন তখন আমার জীবনে। আমার অন্তর্লোকে এক বিপ্লব শুরু হলো—সবকিছু উলটে গেল। তাঁর প্রতিকৃতি দেখে ও তাঁর শিক্ষার অনুধাবন করে,—বিবেকানন্দ আমার সামনে এক পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তিরূপে প্রতিভাত হলেন। বিবেকানন্দের পথই হলো আমার পরম দিশারী।"

বিবেকানন্দের কাছে সুভাষ যে জীবনদর্শন পেলেন তাই সুভাষকে দিল বিপ্লব-মন্ত্রের দীক্ষা। ভারতকে তিনি দেখলেন বিবেকানন্দের অনুভূতি দিয়ে। তিনি নিজেই লিখেছেন :

"নিজের মুক্তির জন্যই মানবতার সেবা। এই মানব সেবার অর্থ অবশ্যই দেশসেবা। তাঁর (বিবেকানন্দের) জীবনী রচয়িতা এবং তাঁর প্রধান শিষ্যা ভগ্নী নিবেদিতা তাই লিখেছেন,—"The queen of his adoration was his motherland······There was not a cry within her shorses that did not find in him a responsive echo."

বিবেকানন্দ ভারতমাতার যে অনুভূতি লাভ করেছিলেন,—সুভাষ তারই স্পর্শ পেলেন নিবেদিতার লেখনীতে। সেদিনেই সেই কৈশোরেই জন্ম হয়েছিল বিপ্লবযাত্রী 'ভারত-পথিক' সুভাষচন্দ্রের।

ভারতে যে নতুন জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লববাদের চেতনা গড়ে

ওঠে, তারও পথিকৃত হলেন বিবেকানন্দ এবং তার প্রবল প্রবক্তারূপে অভিব্যক্তি লাভ করলেন ভগ্নী নিবেদিতা। বিবেকানন্দ বোমা ছোড়েন নি, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভাষণ দেন নি, বা কোন রাজনৈতিক দল গঠন করেন নি। তবুও তিনিই ভারতীয় বিপ্লববাদের জনক বা মূল দার্শনিক। সে যুগে বিপ্লবীদের ঘরে ঘরে তল্লাসী করার সময়ে এক ফিরিঙ্গী শাসক ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, "কে এই বিবেকানন্দ, তাকে ধরে এনে ফাঁসি দাও।" ভারতে বিপ্লবীদের সংগঠন ও কার্যকলাপের অনুসন্ধান করতে যেয়ে সিডিশন কমিটিও বলেছে যে, 'বিপ্লবীদের অবিচ্ছেদ্য অনুসঙ্গী ছিল বিবেকানন্দের রচনাবলী।' বস্তুত, শুধু আত্মাহুতির প্রেরণার উৎসই নয়,—ভারতপ্রেম ও দেশসেবার মর্মবাণীর সন্ধানও বিপ্লবীরা পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের রচনাবলীতে।

ভারতে সমাজ চেতনা ও রাজনৈতিক চেতনা গড়ে উঠেছিল বিবেকানন্দের অবির্ভাবের আগেই। রাজা রামমোহন মানবতাবাদের ভিত্তিতে নতুন সমাজ চেতনা সৃষ্টি করেছিলেন ভারতের, বিশেষ করে বাঙালীর জনমানসে। এই চেতনার উৎস ছিল বেদান্ত কিন্তু আঙ্গিক ও আবরণে অতি মাত্রায় প্রাধান্য ছিল পাশ্চাত্য আচরণবাদের। বিবেকানন্দের 'বিশ্বজয়ের' অভিযাত্রার আগেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কিন্তু কংগ্রেসের এই জাতীয়তাবাদে ভারতীয়তাবোধের প্রমূল্য গড়ে ওঠে নি। পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ভাবধারা ও সংস্কার দিয়ে ভারতের সদ্যসৃষ্ট জাতীয় কংগ্রেস ভারতের জাতীয়তাবাদের কাঠামো তৈরি করেছিল। সেদিনের জাতীয় কংগ্রেস 'ভারতের' হলেও আদর্শের সন্ধানে 'ভারতীয়' ছিল না। বিপ্লববাদের আহ্বান তো দূরের কথা, ভারতীয় প্রমূল্যে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলাও সেদিনের কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

বিবেকানন্দই একথা প্রবল কণ্ঠে সর্বপ্রথম ব্যক্ত করেন যে, পাশ্চাত্যের রাজনীতির আদর্শ ভারতের জাতীয়তাবাদের উৎস বা আবেদন হতে পারে না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হলো

ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও মূল্যবোধের ঐতিহাসিক উপাদান। বিবেকানন্দ একথা প্রবল কণ্ঠে ব্যক্ত করেন যে, রাজনীতিবোধ বা রাজশাসন কোনদিন ভারতের জাতীয় একাত্মবোধ সৃষ্টি করে নি। পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছে রাষ্ট্র ও শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতির আবেদনে; কিন্তু ভারতে ভারতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতার আত্মিক আবেদনে। বিবেকানন্দই ভারতের জনমানসে সর্বপ্রথম এই সচেতনতা সৃষ্টি করে বলেন যে, সাংস্কৃতিক বা আত্মিক ঐক্যবোধই ভারতীয় জাতীয়বাদের মূল আবেদন ও উৎস। এই আত্মিক ভারতীয়তাবোধের সঙ্গে আধুনিক কালের রাজনীতির সমন্বয় ঘটিয়েই গড়ে তুলতে হবে ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তাবাদ বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যালিজম। বিবেকানন্দের ভারতীয় দর্শনই ভারতের জনমনে অপূর্ব ভারত-গবের প্রবল জোয়ার এনে দেয়, আর এই জোয়ারেই আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের উপাদানের অবলম্বনে 'জাতীয় শিক্ষা' ও জাতীয় পুনর্গঠনের জীবনদর্শন গড়ে তোলে। রাজনৈতিক তাৎপর্যে দেশপ্রেম বা পেট্রিয়োটিজমের যে সংজ্ঞা, বিবেকানন্দের ভারতপ্রেমের মর্মার্থ তার চেয়ে অনেক গভীর এবং এই গভীরতার জন্যই ভারতের দেশপ্রেমের আদর্শ মুক্তিসংগ্রামীদের মধ্যে সর্বত্যাগের আমন্ত্রণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

বিবেকানন্দের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল্য আরো একদিক থেকে সুগভীর। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কল্পনায় দেশ ও দেশপ্রেমের সঙ্গে জনতা ও জনসেবার আদর্শকে অঙ্গাঙ্গী করে গড়ে তুলে বিবেকানন্দই বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে ভারতীয়তাবাদকে অবিচ্ছিন্ন গ্রন্থিতে আবদ্ধ করেন। ভবিষ্যৎ ভারতের ব্যাপক জনআন্দোলন এবং সমাজবাদের ঐতিহ্যও বিবেকানন্দের এই জনসেবাভিত্তিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ থেকেই উৎসারিত হয়েছে পরবর্তীকালে।

১৮৮৫-১৯০৪ সাল এই যুগে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের বাহন বা হাতিয়ার ছিল সম্পূর্ণরূপে বৈধানিক বা কনষ্টিটিউশন্যাল। পরবর্তী-কালের গান্ধীযুগে বৈধানিক পন্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অহিংস

অসহযোগের সত্যাগ্রহ নীতি। কিন্তু ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৯ সাল এবং ১৯২৩-১৯২৮, ১৯২৮-১৯৩৪ এবং সর্বশেষ ১৯৪২-১৯৪৬ সালে ভারতীয় স্বাধীনতাসংগ্রামে প্রাধান্য লাভ করে সশস্ত্র বিপ্লববাদ।

নিরুপদ্রব আইনানুগ আন্দোলন বা গান্ধীবাদী অহিংস সত্যাগ্রহবাদের জন্ম ভারতীয় বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অহিংসা ও শান্তিবাদে। গান্ধীজীর জৈনধর্মী বংশগত ঐতিহ্যই তাঁকে শান্তি ও অহিংসাবাদের পন্থানুসারী করে গড়ে তোলে। বুদ্ধদেব বৈদিক কর্মবাদ অস্বীকার করে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে ব্রাহ্মণ্য বন্ধনীর কুক্ষি থেকে মুক্ত করে জনমানসের সমীপবর্তী করে দেন,—কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অহিংসা ও শান্তিবাদের আতিশয্য বর্জন করে যুগধর্মী আহ্বান জানান। ভারতীয় ইতিহাসের গতিধারা বিশ্লেষণ করে বিবেকানন্দ দৃঢ় কণ্ঠে একথা ঘোষণা করেন যে, শান্তি ও অহিংসাবাদের আতিশয্যপূর্ণ আচরণবাদ ভারতে যে ক্লীবতা ও কূপ মণ্ডূকী মনোবৃত্তি সৃষ্টি করেছিল, তারই পরিণামে ভারত বহিরাক্রমণের পরাক্রমের সামনে বারবার পরাজিত হয়ে নিস্তেজ ও নির্বীর্য হয়ে পশ্চাদগামী হয়ে পড়ে। বিবেকানন্দ তাই নবজাগ্রত ভারতের সামনে শক্তিবাদী জীবনধর্মকে প্রবল ও প্রধান করে তুলবার প্রয়াসে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। বিবেকানন্দের অভিযানী শক্তিবাদের উৎসেই জন্মলাভ করে বাংলা তথা ভারতের বিপ্লববাদ। এই অর্থে সশস্ত্র বিপ্লবীদের দার্শনিক-গুরু বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ আরেক দিক থেকেও বিশেষভাবে সৃজন-ধর্মী। তিনি সমন্বয়ের দর্শনকে যুক্ত করেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে, প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিচিত্র প্রমূল্যের কোনোটিকেই তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি এই বহু প্রমূল্যের যুগধর্মী সমন্বয় সাধনা করেই জীবনদর্শন গড়ে তোলার অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

অতএব ভারতীয় রাষ্ট্রীয় বিপ্লববাদের ক্ষেত্র তৈরী করেন বিবেকানন্দ বললে ভুল হবে না। সেই ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক বীজ বপনের কাজে অগ্রণী

ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ভগ্নী নিবেদিতা। বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির কথা বলেন নি—কিন্তু তাঁর সমস্ত কর্ম ও বাণীর অন্তরালে যে বিপ্লবের মন্ত্র সুপ্ত ছিল সুযোগ ও ক্ষেত্রের অপেক্ষায় ভগ্নী নিবেদিতা সেকথা সুস্পষ্টভাবে জানালেন। ভারতের মুক্তি ব্যতীত যে বিবেকানন্দের স্বপ্ন সার্থক হওয়া সম্ভব নয়—এবং অগ্নিমন্ত্রের পথই যে বিবেকানন্দের পথ, সে সম্বন্ধেও নিবেদিতা ছিলেন সুনিশ্চিত। এজন্যই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-অনুরপ্রাণা নিবেদিতা সাশ্রু নয়নে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করেও ভারতের মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষ প্রেরণাদাত্রী রূপে এগিয়ে আসেন। শুধু যে এগিয়ে আসেন তাই নয়—আইরিশ বংশজাত এই অগ্নি-কন্যা বিপ্লববাদের পথকে ভারতের মুক্তির পথ রূপেও নির্দেশ করেন। অনুশীলন সমিতির সদস্যদের আলোচনা বৈঠকে তিনি যোগ দেন, ক্রপটকিনের যে রচনাবলী তাঁর কাছে ছিল তা দান করেন এই সমিতিকে ও বরোদার গাইকোয়াড়ের বিপ্লবীদের সাহায্য করার জন্য প্রেরণা দেন এবং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগ স্থাপন করেন বৈপ্লবিক কাজ কর্মে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে।

ভগ্নী নিবেদিতার কাজ ছিল বিবেকানন্দের তৈরী ক্ষেত্রে বিপ্লবের বীজ ছড়ানো। এই কাজটি তিনি করেন ভারতীয় বিপ্লববাদীদের প্রেরণাদাত্রীরূপে। বিবেকানন্দ ভারতীয় বিপ্লববাদের যে যজ্ঞবেদী রচনা করেন—ভগ্নী নিবেদিতা তারই বুকে জ্বালিয়ে দেন বিপ্লবের হোমাগ্নি শিখা।

ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামে বিপ্লববাদ ও অহিংস অসহযোগিতাবাদ চলেছে পাশাপাশি এবং পরস্পরের সম্পূরকরূপে। গান্ধীজী বিপ্লববাদকে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন অহিংসাবাদ দ্বারা। বিপ্লববাদীদের হাত থেকে তিনি নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ১৯২০ সালে। কিন্তু ত্রিপুরীর পরে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা দীক্ষিত বিপ্লববাদের অনুসারী সুভাষচন্দ্রের হাতে এই নেতৃত্ব হস্তান্তরিত হয় এবং এই

বিপ্লববাদের চরম অভিব্যক্তি রূপেই সুভাষচন্দ্র পূর্ণ মূর্ত হয়ে ওঠেন মহানায়ক নেতাজীরূপে।

বিবেকানন্দ-নিবেদিতার আবির্ভাব না হলে এবং তাঁদের অবদানে ভারতের শক্তিবাদী জীবনদর্শন গড়ে না উঠলে ভারতের মাটিতে বিপ্লববাদ প্রসার লাভ করতো কিনা সন্দেহ। প্রথম পর্যায়ে বৈধানিক আন্দোলন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে গান্ধীবাদী অহিংস সত্যাগ্রহ—হয়তো এই হতো ভারতের মুক্তিসংগ্রামের অভিব্যক্তি। আজাদ হিন্দের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য হয়তো থাকতো সম্ভাবনার বাইরে। বিবেকানন্দ যজ্ঞক্ষেত্র তৈরী করেছিলেন—সেই ক্ষেত্রে হোমশিখা জ্বালিয়েছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা—এবং অবর্তমানে অগ্নিহোত্রীর ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করে সুভাষচন্দ্র মহানায়ক নেতাজীরূপে ভারতের বিপ্লববাদী ঐতিহ্যকে সার্থক করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা শেষ আঘাত হেনেছিল শুধু ভারতে নয়, সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার ব্রিটিশ ও অন্যান্য পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের উপর।

'শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেছে জানো? পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাজ্য জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যা মন্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে তাদের এমন করে তুলেছে যে, আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে উঠে ভাবে—এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল'।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পথের দাবী)

জাতীয়তাবাদের পুনরুদ্ধার

লীলা রায়

প্রখ্যাত দেশনেত্রী। বৈপ্লবিক সংঘ শ্রীসংঘের পরিচালিকা। দীপালী সংঘ এবং নারীশিক্ষা মন্দির, শিক্ষাভবন ইত্যাদি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা। **জয়শ্রী** এবং পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকার সম্পাদিকা। বর্তমানে পরলোকগতা।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলা বিভাগ করেছিলেন হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যকে নষ্ট করবার জন্য। যদিও সেই চাপানো বঙ্গভঙ্গ টিকে নাই, তবু স্বীকার করতে হবে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে! আজ বাংলার হিন্দুদের মধ্যে অনেকে বাংলাকে ভাগ করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। এই বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ—(১) এটলীর ঘোষণা। (২) বাংলার লীগ গভর্নমেন্টের তীব্র সাম্প্রদায়িকতা ও সহানুভূতিহীন জুলুম, (৩) ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানের অনুরূপ হিন্দুস্থান স্থাপনে হিন্দুসভার উৎসাহ, (৪) বাংলার বর্তমান কংগ্রেসের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব এবং হিন্দুসভা থেকে আলাদা ভাবে কোনও কিছু করার অক্ষমতা অথবা অনিচ্ছা, (৫) বাংলার জাতীয়তাবাদীদের লীগ গভর্নমেন্টের অত্যাচারকে বাধা দেবার মনোভাবের অভাব।

ক্ষমতা হস্তান্তরিত (?) হবার প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িকতা এই তীব্ররূপ ধারণ করবার মূলে রয়েছে নিশ্চিতভাবে এটলীর ঘোষণা। মন্ত্রী মিশন পাকিস্তানকে অবাস্তব ও অসম্ভব প্রস্তাব বলেও

খিড়কী দরজা দিয়ে তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন যখনই প্রদেশগুলিকে বিভাগের (sections) অন্তর্বর্তী হওয়া বাধ্যতামূলক করেছেন। নানা ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যার আবর্তনের পর সর্বশেষ ২০শে ফেব্রুয়ারীর ইস্তাহারে পাকিস্থানকে শুধু স্বীকার নয়, সর্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্যকে আহ্বান জানিয়ে নিরপেক্ষতার চূড়ান্ত করেছেন। কিন্তু এ্যাটলী সাহেবকে দোষ দিই না—আশ্চর্য্য হই শুধু দুইশত বৎসরের অত্যাচার, শোষণ ও ধাপ্পাবাজী আমরা ভুলি কি করে!

এ্যাটলী সাহেবের ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে আজ দিকে দিকে চেষ্টা চলেছে প্রমাণ করবার, আমরা পরস্পর থেকে পরস্পর কতভাবে আলাদা—যাতে আমাদের হাতে আলাদা করে শাসন ক্ষমতা আসে। এহেন ঘোষণার ফলে বাঙ্গলাদেশে মুস্লিমলীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়াটা প্রায় নিশ্চিত হ'য়ে পড়ায় স্বভাবতঃই জাতীয়তাবাদীরা এবং বিশেষভাবে বাংলার হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং পাকিস্তানের আধিপত্য এড়াবার জন্য আলাদা "আবাসভূমির" আন্দোলন সুরু করেন।

এই আন্দোলন জনপ্রিয় হ'য়ে উঠলো অতি সহজে, কারণ লীগ সরকারের জুলুম প্রতিদিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে—ধন, মান জীবন সবই অতি সস্তা হয়ে উঠেছে এদের হাতে। কলকাতার বুকের উপর নারীর অত্যাচার, নির্বিকার মানুষ হত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য প্রতিকার কিছু না পেয়ে হিন্দু জনসাধারণ হিন্দুদের জন্য আলাদা আবাসভূমির আন্দোলন সুরু করলো—ঐ আলাদা আবাস-ভূমিতে অন্ততঃ বেশীরভাগ হিন্দু নিশ্চিত নিরুপদ্রব জীবন যাপন করতে পারবে এই আশায়। তা'ছাড়া লীগ সরকার শাসনবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ ও অন্যান্য সকল বিভাগকেই হিন্দু ছোঁয়াচ বর্জিত মুস্লিম কৃষ্টিদ্বারা পরিশুদ্ধ করে নেবার জন্য আইনের পর আইন গঠন করে বা না করে—হিন্দুদের পক্ষে হয় দেশছাড়া, না হয় মুসলমান হওয়া, না হয় সংগ্রাম করা ছাড়া তৃতীয় পথ রাখলেন না।

এই অবস্থার সম্পূর্ণ সুযোগ নিলেন হিন্দু-মহাসভা—সবচেয়ে

যেটি সহজতম পথ, সেটি বেছে নিলেন এবং পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের হিন্দুদের সম্পর্কে আত্মরক্ষার কোনো উপায় নির্দ্ধারণ না করেই বিপদকালে "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" সগর্বে এই নীতির সারবত্তা প্রমাণ করতে লেগে গেলেন। অত্যাচারের মাত্রা বাড়বার অনুপাতে তাঁদের যুক্তির অকাট্যতা প্রমাণ হ'তে লাগলো—নোয়াখালি থেকে যতই দুঃসংবাদ এলো, অতি অকাট্য যুক্তির দ্বারা প্রমাণ হতে লাগলো পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুদের আবাসভূমি হ'লেই নোয়াখালীর হিন্দুদের দুঃখ ঘুচবে। কলকাতায় ধর্ষণ ও হত্যার সংবাদে যতই আবহাওয়া উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলো, ততই এঁরা বলতে লাগলেন "আলাদা হওয়া ছাড়া এ অত্যাচার বন্ধ করা অসম্ভব।"

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা হিন্দুত্ব সংরক্ষণ করবার নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করলে কি ভাবে যে পাকিস্থানী এলাকার সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুর দুঃখ মোচন হবে তা নিয়ে মাথা যে ঘামাতে গেল, সে নিশ্চিত প্রমাণ হ'ল—হয় লীগের চর, নয়তো হিন্দুবিদ্বেষী। আর কলকাতা যদি পশ্চিম বা পূর্ব কোনও বঙ্গেরই অধিকারে না গিয়ে নিজস্ব রাজকীয় মহিমার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে, তবে তার উপর পশ্চিম-হিন্দুরাজ্যের প্রভাব কার্যকরী হবে কিভাবে এই অসুবিধাজনক প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মত লোকাভাব ঘটাতে, এবং উত্তর দেবার দায় থেকেও রেহাই পাওয়া গেল।

এই অবস্থাকে যথার্থ বিশ্লেষণ দ্বারা একে উপযুক্ত পটভূমিকাতে দেখে জনমতকে গঠন করতে পারত জাতীয় কংগ্রেস। কিন্তু সর্বসাধারণের উপরে বাংলার কংগ্রেসের প্রভাব সীমাবদ্ধ হওয়ার দরুণ প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত হিন্দু সমর্থনের উপর নির্ভর করবার জন্যই হিন্দু-মহাসভা থেকে আলাদাভাবে কোন মত বা পথকে সবলভাবে অবলম্বন করতে আমরা দেখিনি, বরং যাতে হিন্দু-মহাসভার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কোন সংঘর্ষ না হয়, তার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে থাকেন বলেই আমরা বহু প্রমাণ পেয়েছি।

কংগ্রেসের এই মনোভাবের জন্য বাংলার সাম্প্রদায়িকতা সবল ও

সুদৃঢ় বাধা পায়নি কোনদিন। হিন্দুমহাসভা ও মুস্লীম লীগ এই দুয়েরই সাম্প্রদায়িকতার বাইরে তৃতীয় মত বা পথ বাংলার জনসাধারণ কংগ্রেসের নিকট পেয়েছে বলে আমরা প্রমাণ পাইনি। তারপর এ্যাটলী ঘোষণাকে তার সমস্ত সংকীর্ণতাসহ গ্রহণ করে কংগ্রেসও পাকিস্তানের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। গত ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লীর বৈঠকে পাঞ্জাব বিভাগে মত দিয়ে ও বাংলা বিভাগের যৌক্তিকতাকে প্রায় স্বীকার করে কংগ্রেসও ভারতবর্ষ ও প্রদেশগুলির সম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভাগ স্বীকার করে নিয়েছেন। এতদিন ধরে ভারতের অখণ্ডত্ব প্রচার ও ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগকে বাধা দিয়ে যখন বাস্তব ভাবে তাকে বাধা দেবার প্রয়োজন ঘটলো, তখন কংগ্রেস তাকে স্বীকার করে নিলেন। এটা একটা বিস্ময়কর এবং দূরপ্রসারী ঘটনা। আমাদের জাতীয় জীবনের ভবিষ্যত পরিকল্পনায় এতদিন যে রূপ ছিল, তা সম্পূর্ণ এতে বদলে যাবার উপক্রম হয়েছে।

পণ্ডিত নেহেরু সম্প্রতি দেশীয় রাজ্য-প্রজা-সম্মেলনে বলেছেন যে, সমস্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যদি আমরা অর্জন করতে না পারি, তবে যতটা বেশী পরিমাণ স্বাধীন করতে পারি, তার চেষ্টা আমরা করবো। ক্রমশঃ অন্য জায়গাগুলোকে স্বাধীন করা যাবে এবং স্বাধীনতাও আবার সর্বস্থানে একই অনুপাতে আসবে না। যেমন দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের তিনি বলেছেন যে, রাজাদের মত ব্যতীত প্রজাদের প্রতিনিধিদের নেয়া সম্ভব হবে না, কারণ এ্যাটলী ঘোষণাতে ব্যবস্থা এইরূপই। কাজেই এতদিন ধরে কংগ্রেস যা প্রচার করেছেন এবং দেশ বুঝেছে, স্বাধীনতা যখন আসবে, সর্বভারতের জন্যই আসবে এবং সর্বলোকের জন্য আসবে, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল তা একেবারেই হল না এবং কংগ্রেসও সে অবস্থা মেনে নিলেন। কাজেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবং বাংলায় কংগ্রেস যে নীতি এতদিন অবলম্বন করেছিলেন তা থেকে শুধু সরে দাঁড়ালেন তাই নয়, সম্পূর্ণ তার বিপরীত নীতিকে স্বীকার করলেন।

এতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নৈতিক দুর্বলতা ও

বিহ্বলতা দেখা দিয়েছে। যাকে ইংরেজীতে বলা হয় **morale**, সেই রাজনৈতিক **morale** বা আদর্শের আনুগত্যের স্থানে সুবিধাবাদ এসে দাঁড়ালো। সংঘর্ষ ও সমস্যা যে সব জায়গায়, সেখানে আদর্শকে ত্যাগ করা অতি সহজ এবং রাজনৈতিকজ্ঞানও বাস্তবতার নামে চলতে লাগল। এর ফলে আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখা বা ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে বর্তমানকে বিশ্লেষণ করা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিক্রিয়াশীলতা (!), দুর্বল ভাবপ্রবণতা, রক্ষণশীলতা ইত্যাদি। ভারতবর্ষের সর্বত্র সর্ব শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মীদের উপর এর প্রভাব হতে বাধ্য।—এতদিনকার মানদণ্ড আজ অচল—অভিজ্ঞতার অগ্নিপরীক্ষায় নূতন মানদণ্ডও তৈরী হয়নি—এই অবস্থায় জাতীয়তাবাদীদের বলিষ্ঠ মনোভাব ও আদর্শবাদ আজ দুর্বল হয়ে পড়েছে বলেই মনে হয়।

বাংলাদেশ-এর জ্বলন্ত উদাহরণ। দিনের পর দিন অত্যাচার অনাচারের কাহিনী বাংলার বাতাসকে ভারী করে তুলেছে, সংঘবদ্ধভাবে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বাংলার যুবকদের আজ দেখছি না। "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই ভীরু যুক্তির আশ্রয়ে দুর্বলতম স্থানগুলোকে সানন্দে সবলের কবলস্থ করে নিরাপদ আবাসভূমি বাঁচাতে তাদের দ্বিধা দেখা যায় না। জাতীয়তাবাদ আজ সাম্প্রদায়িকতার কাছে হার মেনেছে—কারণ জাতীয়তাবাদ তার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য কোন মূল্যই দিল না।

এ বিষয়েও আমাদের জাতীয় নেতৃগণ অনেকাংশে দায়ী। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার চিত্র তাঁদের কাছে এতই লোভনীয় হয়ে উঠেছে যে, আপাত শান্তির জন্য তাঁরা ভবিষ্যতের অশান্তি এবং হানাহানি কিংবা প্রদেশ বিভাগের আনুষঙ্গিক অসহ্য অপমানকর অবস্থার বিষয়ে চিন্তা করলেন না। কেন্দ্রে যদি কিছুটা ক্ষমতা শান্তিপূর্ণভাবে হস্তান্তরিত হয় তবেই তাঁরা সন্তুষ্ট। শুধু আমাদের সুবিধানুসারেই বাস্তব ঘটনা ঘটে না; কাজেই অশান্তিকে এড়াবার জন্য আজ ভারতবর্ষ ও প্রদেশকে বিভাগ করবার যে মনোভাব

ও আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে—শুধু জাতীয়তাবাদীর নয়, যথার্থ বাস্তববাদীর দৃষ্টিতে তাকে বিশ্লেষণ করে সর্বদিক দিয়ে তার অযৌক্তিকতা, সারবত্তাহীনতা ও অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ।

এই আন্দোলন আজ হিন্দুসাধারণের জনপ্রিয় হওয়া অস্বাভাবিক বা বিস্ময়কর কিছুই নয়—কিন্তু জনপ্রিয়তাই নির্ভুলতার একমাত্র বা প্রধান মাপকাঠি নয়। পাকিস্তান আন্দোলন মুসলমান জনসাধারণে আজ অত্যন্ত জনপ্রিয়, কিন্তু তার জন্য তাকে সমর্থনযোগ্য আমরা বলিনা। কারণ সাময়িক জনপ্রিয়তার উপরে জাতির স্থায়ী কল্যাণের মাপকাঠি নির্ভর করতে পারেনা। ঠিক একই কারণে বঙ্গ বিভাগ করে হিন্দু বাংলাস্থান গঠন করাকে সমর্থন আমরা করতে পারি না।

কারণ (১) সাম্প্রদায়িক বিভাগ বর্তমান জগতের রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারেনা। বিশ্বের পারিপার্শ্বিক শক্তি আজ এর বিপরীত দিকে চলেছে। আজ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সংহতির দিকে জগৎ চলেছে। সেখানে আমাদের দেশকে খণ্ডিত করে তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও উন্নতিকে ব্যাহত ও ক্ষুণ্ণ করতে দিতে আমরা কিছুতেই চাই না। আজকের সাম্প্রদায়িকতা যতই আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখুক না কেন, বৃটিশ শাসন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এ নিঃশেষ হতে বাধ্য, সে হানাহানির মধ্যদিয়েই হোক, আর আপোষ রফার মধ্যদিয়েই হোক। কাজেই তাকে ভিত্তি করে আমরা কোনো বিভাগই প্রয়োজন মনে করি না।

(১) তারপর হিন্দু কৃষ্টি রক্ষার কথা। ধর্মের সঙ্গে কৃষ্টির যতটা যোগ, তাছাড়াও কৃষ্টির যেটা বাহ্যিক ও ব্যবহারিক রূপ—যেটা নিয়ে আমাদের বেশী আনাগোনা, সেটা প্রধানতঃ ভাষাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সেখানে হিন্দু-মুসলমান প্রভেদ বিশেষ নেই এবং সেটা সার্বভৌম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাতেই জাতির এবং কৃষ্টির উভয়েরই পোষণ ও সম্প্রসারণ সম্ভব হয়। এরূপ ব্যবস্থাই উন্নতির সহায়ক। কাজেই বাংলার কৃষ্টিকে রক্ষা করতে হলে হিন্দু ও মুসলমানকে আলাদা

হয়ে চারাগাছের মত তাকে বৃহত্তর আকাশের সজীব স্পর্শ থেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখলেই মঙ্গল হবে, এমন কথা ইতিহাস বা সমাজতত্ত্ব কোথাও বলে না। তাছাড়া যদি হিন্দুর আলাদা কৃষ্টি রক্ষা যথার্থই মঙ্গলের হ'য়ে থাকে, তবে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের এককোটির উপর হিন্দুকে হয় মুসলমান হ'তে অথবা সম্পূর্ণভাবে মুস্লীম কৃষ্টি গ্রহণ করতে বাধ্য করেই কী সেই কৃষ্টি রক্ষা হবে? না এর সমর্থনে হিন্দুধর্মের পাণ্ডারা বলবেন—সংখ্যাই একমাত্র বিচার্য বিষয়—একদিকে দেড় কোটি, অপরদিকে এককোটি। নিশ্চয়ই দেড়কোটির স্বার্থই বড়—এককোটির কোন অধিকারই নেই এতে বাধা দেবার এবং দেড় কোটিরও কিছুমাত্র মানসিক অশান্তি ঘটবার কারণ নেই এতে, কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকারই তো অধিকার!

(২) আর এক যুক্তি দেওয়া হয় যে, এই ধরণের দেশ ভাগাভাগিতে 'শান্তি' রক্ষিত হবে। 'শান্তি' রক্ষাটাই সর্বাবস্থায় বড় কথা, নিরপেক্ষ ভাবে এই কথাটি আমরা স্বীকার করি না। তাছাড়া শান্তি রক্ষিত হবে না। কারণ যে সংখ্যালঘিষ্ঠ থেকে যাবে অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে তার উপক্রম হবে এবং সর্বপ্রকারে—আত্মসম্মান রাখতে হলে স্বাভাবিকভাবে তাকে বাধা দিতে হবে, তাতে শান্তি থাকবে না। মান রাখতে, প্রাণ রাখতে, শান্তি প্রতি মুহূর্তে ব্যাহত হবে। শুধু অঙ্কের হিসেব সঙ্গে থাকলো—সর্দারের বা লাভের ও ভবিষ্যতের জনসাধারণ ঐ দিকে মাথা ঘামাবে না, কারণ চুক্তির ফলে সেখানে এ ব্যবস্থা হবে, কাজেই তারপর আর চুক্তি ভঙ্গ করা চলবে না। শান্তি থাকবে না সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর, তবে অন্যদের একটানা শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে, সেটাইতো বড় কথা! সামান্য অংশের জন্য বৃহৎ সমগ্র কেন ব্যতিব্যস্ত হ'তে যায়! তবে যদিই বা তাদের শান্তি ভঙ্গ হল এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের তাঁরা রক্ষা করবার জন্য হাত না লাগান, তবে সশস্ত্র আক্রমণ ছাড়া, কী ইউনিয়ন, কী পশ্চিমী হিন্দু রাজ্য (তার কোন আলাদা সৈন্য থাকবে না বলেই মনে হয়) কারুরই উপায় থাকবে না। তাতে মারামারি হানাহানির বিপুলতা কিছু কম হবে

না। এখনই কেন তবে সে সংগ্রাম সেরে নতুন পাতায় নতুন অধ্যায় আরম্ভ করবার চেষ্টা হোক না?

(৪) অনেকে বলবেন, ওসবের প্রয়োজনই হ'বে না। আবাস-বদল করা হ'বে—অর্থাৎ **transference of population** করলেই চলবে। ইতিহাসে এত বৃহৎ আবাস বদল হয়নি কোথায়ও। তাছাড়া যারা আবাস বদল করবে তাদের ব্যবস্থা কী হবে? পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে ভবঘুরের জীবন তাদের নিতে হবে! পরের দয়ার উপর নির্ভর করে তাদের দিন কাটবে। সে জীবন সুখেরও নয় সম্মানেরও নয়, যদি সম্ভবও হয়। আমাদের হিসেবে সে সম্ভবও নয়। এধরণের প্রস্তাব কাগজে কলমে চলতে পারে। বাস্তবে এর বাধা অফুরন্ত দেখা দেবে।

(৫) বাংলাদেশ আজ একটি উন্নতিশীল ও বিশেষ প্রভাবশালী প্রদেশ। তাকে বিভাগ করবার ফলে বাংলার অস্তিত্ব সর্বভারতে অনুভূতই হবে না এবং তার প্রভাবও ক্ষুণ্ণ হ'বে। পশ্চিম ভারতের প্রভাবে বাংলার বিশিষ্ট কৃষ্টি ও বাঙালীর বিশিষ্ট অস্তিত্ব নষ্ট হ'বে একেবারে। যারা মনে করেন, এটা একটি কাম্য ঘটনা, তাঁদেরকে অবশ্যি কোনো কিছু বলবার নেই, কিন্তু তাঁদের মুখে বাঙালীর বিশিষ্ট কৃষ্টি রক্ষার কথা শোভা পায় না। বাংলাকে খণ্ড খণ্ড করবার অর্থ বাংলাকে হত্যা করা। বাঙালীকে 'প্যারিয়া'র (pariah) মত হয়ে থাকতে হবে চিরকাল।

(৬) কেউ কেউ বলেন, তবে কি মুস্লিম লীগের জিদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হ'বে এবং সর্বভারত থেকে বিযুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানে দুর্বহ জীবন যাপন করতে হ'বে, প্রতিনিয়ত মৃত্যুভয়—তার চাইতেও বড় অপমানের ভয় নিয়ে? কিন্তু এই অবস্থাকে জোরের সঙ্গে অস্বীকার ক'রে এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস যাতে এই অবস্থাকে অস্বীকার করেন, তার চেষ্টা করাই আমাদের মতে প্রধান প্রতিকার। আজ কংগ্রেস এই অবস্থাকে অস্বীকার করুন, এ্যাটলির প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করুন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের যথার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করুন। যারা মানবে না সে ব্যবস্থা, তাদের সঙ্গে সংগ্রাম হ'বেই।

সে সংগ্রাম সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর চাপিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়ানোতে না আছে গৌরব, না সেটা একটা বড় জাতির সমুচিত কাজ। আজ যেমন মুস্লিমলীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হ'বে, তেমনি হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক সমাধান—যা দুর্বলের ও স্বার্থপরের সমাধান—দেশের যুবশক্তিকে তাকেও অস্বীকার করতে হ'বে। পাকিস্তান কিংবা ভারত বা বঙ্গ বিভাগ, এর কোনটাই অনিচ্ছুক জনগণের উপর কি করে চাপান চলে আমরা বুঝি না। জনগণের সেই অনিচ্ছাকে সক্রিয় ও সবল করে তুলতে হবে। আমাদের সমাধান, এই জাতীয়তাবাদকে পুনর্জীবিত ও পুনঃ স্থাপিত করবার মধ্যেই এর সমাধান। সে জাতীয়তাবাদ দুর্বলের নয়, সবলের ও সজীবের।

জয়শ্রী (বৈশাখ, ১৩৫৪ পত্রিকার সৌজন্যে)

'আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে
আমি যে দেখেছি—প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরব নিভৃতে কাঁদে'।

—রবীন্দ্রনাথ

হিসাব মেলেনি

দেবনাথ দাস

[নেতাজীর সহকর্মী। আজাদ হিন্দ সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সেক্রেটারী। বর্তমানে পরলোকগত]

বাংলা তথা ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটা নিজস্ব সত্ত্বা

ছিল। ভারতীয় ভাব ও চিন্তাধারায় পরিস্রুত ছিল যেমন শিক্ষা, তেমনি দীক্ষা ও তপস্যা-আরাধনা। ছিল সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সভ্যতা, ছিল নিষ্ঠা ও চরিত্রবত্তা; আর ছিল নিয়মানুবর্তিতা ও আত্মত্যাগ। সশস্ত্র বিপ্লবের ভিতই ছিল জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি। বিপ্লববাদ যেমন এক নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, সাহিত্য-ও তেমনি বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

'ইম্ফল-অভিযান' পরাধীন ভারতের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। বিপ্লবী ভারতীয় আত্মার মূর্তপ্রকাশ। জাগ্রত ভারতের অবিনশ্বর রূপই ছিল এই মুক্তি-সংগ্রাম। 'আজাদ-হিন্দ্-ফৌজে' এই শাশ্বত সত্য হয়েছিল প্রতিভাত। ইম্ফলের বহ্নিশিখা যদি ভারতের কোনে কোনে ভারতবাসীকে প্রজ্জ্বলিত করত, তাহ'লে সেই বহ্নিতে ভারতীয় চরিত্রের গ্লানি, ত্রুটি, স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা, নিষ্ক্রিয়তা, সংকীর্ণতা ও আত্মকেন্দ্রীকতা সব পুড়ে ছাই হয়ে যেত; ভারতবাসী রক্তস্নাত হয়ে সত্যই মুক্তির আস্বাদ পেত—হৃত-গৌরব অর্জন করতে পারত। আর যুব-সমাজ দেশ বলতেই ভাবত 'ভারত'—ধর্ম বলতেই অনুভব করত 'দেশপ্রেম' ও কর্ম বলতেই অনুসরণ করত 'সেবাধর্ম'—মানবতার কল্যাণে ব্রতী হ'ত তাদের মনপ্রাণ; লক্ষ শহীদের রক্তে ধৌত হয়ে ভারতের মাটি হ'ত পবিত্র—নবভারতে নতুন নতুন তীর্থস্থানের সৃষ্টি হ'ত।

শহীদের রক্তধারায় সিক্ত মাটিতে ভারতবাসী দাঁড়িয়ে ধীর, স্থির ও অবনত মস্তকে প্রণাম জানিয়ে নব-ভারতের এক বলিষ্ঠ ভবিষ্যৎ রূপ-সৃষ্টির সন্ধান পেত; আধুনিক ভাবধারাকে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে মন্থন করে, ভারতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা গ্রহণ করত; আর মুক্তস্নাত বর্তমান সদা জাগ্রত থেকে সৃষ্টি করত সকলের জন্য এক সোনার ভারতবর্ষ—যে ভারতবর্ষে ধনতন্ত্রবাদের অবসান হয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'ত ভারতীয় সাম্যবাদ। সদা প্রবাহিত হ'ত দেশ-প্রেমিক ভারতীয় জনগণের স্নায়ুতে নিয়মানুবর্ত্তিতা। একাত্ম-বোধে আলিঙ্গন করে তারা রাখী বন্ধনে আবদ্ধ হোত ভারতের জনগণের সাথে। ভারতীয়

বিপ্লবীদের এই ছিল আশা—তাঁদের আত্মত্যাগের সঙ্কল্পই ছিল এই। নেতাজীর শিক্ষার এই-ই ছিল মর্মবাণী।

সকল যুগের মনীষীদের ও সকল বিপ্লবীদের আশা-আকাঙ্খা ও সাধনা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল নেতাজীর জীবন সাধনায়। আর তাঁর দীক্ষিত সৈনিকদের আত্মবিসর্জনই ছিল এক নতুন ভারত গড়বার সাধনা—জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল মানবতার মুক্তি। তাইতো আসমুদ্র হিমাচলের শুধু কোটি কোটি জনগণই নয়, ভারতীয় স্থল, নৌ ও বিমান বিভাগের সশস্ত্র বাহিনীও এই নব জাগরণকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর এই আত্মচেতনায় ও ভারতের সেই বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

দুর্ভাগ্য, ভারতীয় নেতৃত্ব ভারতের জাগ্রত বিপ্লবাত্মক মনোভাবে সে সময় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়েছিল। আপোষ রফায় প্রলুব্ধ না হয়ে উপযুক্ত ভারতীয় নেতৃত্ব হ'লে হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যান্ত ভূমিকম্পের সৃষ্টি হ'ত—ধনতন্ত্রবাদ চূর্ণবিচূর্ণ হ'ত—সিন্ধু থেকে গঙ্গার মোহনা পর্যান্ত জলপ্লাবিত হ'ত—ভারতের মাটি হয়ে উঠত মুক্ত ধৌত ও শুদ্ধ। শত শত বৎসরের পুঞ্জীভূত গ্লানি হ'তে শুদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতের বংশধরদের পূর্ণ-জীবন প্রাপ্তির জন্য মাটি তৈরী হ'ত। কতজন বেঁচে থাকতেন সেটা বড় কথা নয়, যাঁরা বেঁচে থাকতেন, তাঁরা জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আগুনে পুড়ে সোনা হয়ে উঠতেন।

চতুর ইংরাজ ভারতীয় নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল। শুধু প্রতিহিংসা সাধনই নয়, চাই তাদের ভবিষ্যত নিরাপত্তা—ভারত বিভাগেই তা সম্ভব। এই বিভাগে ভারতে বিপ্লবের স্রোতস্বিনী বেগ হয়ে যাবে স্তিমিত আর তাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা হয়ে যাবে দেউলিয়া—দিশাহারা হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। কলুষতা দেহ, মন ও সমাজকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। পরম পরিতাপের বিষয় ভারত বিভাগে রাজী হলেন ভারতীয় নেতৃত্ব। ভীরুতা, কাপুরুষতা, ক্ষমতালিপ্সা, নিজ নিজ জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ ও নিরাপত্তার চিন্তাই

হ'ল তাদের মানসিকতার নিকৃষ্টতম নিদর্শন। ভারত-বিভাগ ইংরাজের জয়, আমাদের পরাজয়। এতে স্তব্ধ হ'ল বিপ্লবীদের তপস্যা সাধনা—ম্লান হ'ল ভারতীয় মানবতার সৃজনশক্তির উৎস ধারা।

আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ভারতে নৈরাশ্য দূর করা ও আশার আলোক বর্ত্তিকা হাতে নিয়ে দেশে এক বলিষ্ঠ নেতৃত্বের এগিয়ে আসা। যুব সমাজকে এই নেতৃত্ব দিতে হবে। তাই চাই ভারতের মুক্তিপথ-যাত্রীর দুর্বার অভিযানে আত্মত্যাগ ও বলিষ্ঠ বিশ্বাসের ঐতিহাসিক কাহিনী ও কীর্ত্তিগাথায় যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা।

---

* ফ্রীডম ফাইটার্স এ্যাসোসিয়েশনের সৌজন্যে ডা. সুনীলকুমার মৈত্র রচিত 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থ থেকে ধন্যবাদ সহকারে সংগৃহীত।

'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?'

—রবীন্দ্রনাথ

স্বাধীনতা আন্দোলনের দুটি ধারা

কমরেড শিবদাস ঘোষ

[বৈপ্লবিক সংস্থা অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সদস্য। প্রখ্যাত দার্শনিক ও মার্কসবাদী চিন্তানায়ক। এস. ইউ. সি. আই দলের প্রতিষ্ঠাতা।]

রাজা রামমোহন রায় থেকেই এদেশের রেনেসাঁ আন্দোলনের শুরু বলা চলে। ইউরোপের বুর্জোয়া মানবতাবাদী ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনাগুলিকে ধর্মের মূল সুরটির সঙ্গে মিলিয়ে ধর্মীয় সংস্কারের পথেই তিনি এদেশে রেনেসাঁ আন্দোলনের জন্ম দেন। ফলে, এদেশের

রেনেসাঁ আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের (religious reformation) পথ ধরে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের অভ্যুত্থান রেনেসাঁ আন্দোলনে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা এবং যতদূর মনে হয় বিদ্যাসাগর মশাই-ই প্রথম ব্যক্তি—যিনি ধর্মীয় সংস্কারের পথে রেনেসাঁ আন্দোলনের মধ্যে একটা ছেদ (break) ঘটালেন। তিনিই প্রথম এদেশে যতদূর সম্ভব মানবতাবাদী আন্দোলনকে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও যুক্তির শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে চাইলেন।...

বিদ্যাসাগরকে এদেশের মানুষ বড় মানুষ বলে জানে, শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তাকে বুঝেছে কয়জন? আমাদের দেশের বেশীরভাগ মানুষ বিদ্যাসাগর মশাইয়ের হাঁটুর ওপর কাপড় পরা, মাথায় টিকি রাখা দেখেই তাঁকে একজন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বলেই ভাবেন। একথা ঠিক, বাইরে তাঁর শাস্ত্রকারের মত এবং নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের মত বেশই ছিল। কিন্তু, ভিতরে তিনি ছিলেন তদানীন্তন ভারতীয় সমাজ পরিবেশে একজন খাঁটি হিউম্যানিস্ট। তিনি ভারতীয় সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সভ্যতার একটা যুক্তিভিত্তিক সংযোগ সাধন করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর বক্তব্য ছিল, ছাত্রদের ইংরাজী শেখাও, মিল-এর লজিক পড়াও। সংস্কৃত শিখিয়ে কূপমণ্ডূক করে রাখো। এই জাতির মেরুদণ্ড খাড়া করা যাবে না।...

এই জাতির মেরুদণ্ড খাড়া করতে হলে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে তাকে পরিচিত হবার সুযোগ দিতে হবে। আর, ইংরাজী শিখলে দেশের যুবকরা তার মাধ্যমে ইতিহাস, লজিক ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার সাথে পরিচিত হবে, ইউরোপের বস্তুবাদী দর্শনের সাথে পরিচিত হবে। তাই তিনি ব্যালেন্টাইনের মতের বিরুদ্ধতা করে বলেছিলেন, আমাদের দেশের সাংখ্য ও বেদান্ত যেমন ভ্রান্ত দর্শন, তেমনি ইউরোপের বার্কলের দর্শনের মধ্য দিয়েও ঐ একই ভ্রান্ত ধারণা প্রতিফলিত। আমাদের দেশের মানুষকে এইসব ভ্রান্ত দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও

বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে; তবেই দেশের মানুষ বস্তুজগতকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে সত্যোপলব্ধি করতে এবং তার উপরে মানুষের নতুন জীবনবেদ বা মূল্যবোধ খাড়া করতে সক্ষম হবে। তাই তিনি ঐসব অসার আধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী দর্শন ছাত্রদের পড়াবার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধতা করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করলে অতি সহজেই ধরা পড়বে যে, ধর্মীয় সংস্কারের পথে আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের সময় থেকে যে রেনেসাঁ আন্দোলন শুরু হল—বিদ্যাসাগর মশাই ছিলেন সেই ধারার মধ্যে একটা বলিষ্ঠ ছেদ। তিনি মানবতাবাদী আন্দোলনকে তদানীন্তন পরিবেশে যতদূর সম্ভব ধর্মীয় বিচারবুদ্ধি ও প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এ সত্য তাঁর সমস্ত জীবনের কার্যকলাপ, আচার-আচরণ, কথাবার্তার মধ্য দিয়েই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।...

...বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ভূমিকা বাদ দিলে এবং বিদ্যাসাগর মশাইয়ের যুগটা পার হয়ে এসে আমাদের দেশের রেনেসাঁ আন্দোলন পুনরায় ধর্মীয় সংস্কারের (religious reformation) পথ ধরেই এগোতে থাকল।...ব্রাহ্মধর্মের প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হ'ল হিন্দুসমাজকে সংস্কার করে তাকে দোষ-ত্রুটিমুক্ত করার জন্য ....অপর দিকে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের (revivalism) তুমুল আন্দোলন শুরু হ'ল। হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার ভিত্তিতেই হিন্দু সমাজকে জাত পাত ও কলুষতা থেকে মুক্ত করার জন্য হিন্দুধর্ম সংস্কারকরা এলেন। এবং এই পথেই রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ....

বিবেকানন্দ এই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। তিনি রেনেসাঁ আন্দোলনকে শুধু ধর্মীয় সংস্কারের (religious reformation) গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেন না। তিনি উপাসনা এবং সাধনার পরিবর্তে কর্মযোগের ওপর জোর দিলেন এবং সারা দেশে এক প্রবল জাত্যাভিমান ও দেশাত্মবোধের জন্ম দিলেন। ফলে, এক অর্থে বলতে গেলে বিবেকানন্দই এদেশে জাতীয়তাবাদী মনোভাবনা বা জাত্যাভিমানের জন্মদাতা, যদিও তিনি

নিজে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ছিলেন না, যে জাত্যাভিমান এবং দেশাত্মবোধকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে এদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে সুরু করল। কিন্তু, তিনি যে জাত্যাভিমান ও দেশাত্মবোধের জন্ম দিলেন, তা দিলেন বেদান্তদর্শন ও ভারতীয় অতীত আধ্যাত্মিক গর্বের (spiritual pride) ভিত্তিতে। অনেকটা এই কারণেই পরবর্তীকালে যে দেশজোড়া তীব্র স্বাধীনতা আন্দোলন এদেশে গড়ে উঠল, তা মূলতঃ হিন্দুধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ (hindu religion-oriented nationalism) থেকে গিয়েছে।

এরপর ধীরে ধীরে দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা আন্দোলন, যেটা মূলতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে হটিয়ে দিয়ে এদেশে জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র গঠন এবং গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের আন্দোলন, সেটা, সুরু হল এবং বুর্জোয়ারা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসল। কিন্তু, ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ গড়ে তোলার আকাঙ্খায় যে সময়ে এই স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হল, ইউরোপে ততদিনে পুঁজিবাদের প্রগতির চরিত্র নিঃশেষিত হয়েছে। সামন্ততন্ত্র ভেঙে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করার পর বিপ্লব এবং সমাজ অগ্রগতির রথের চাকার দ্রুত গতির সাথে তাল রেখে চলতে চলতে সে তখন ক্লান্ত এবং জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, ধর্মের সঙ্গে আপোষ করেছে, পলায়নমুখী (escapist) হয়েছে এবং 'সিনিসিজম্'-এর (cynicism) জন্ম দিয়েছে। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের এই সময়েই যেহেতু ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদ গড়ে তোলার আকাঙ্খায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সৃষ্টি হল এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এই স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিল, সেইহেতু আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াশ্রেণীর অংশ হিসাবে তাদের মধ্যে ইউরোপের সেই জরাগ্রস্ত মানবতাবাদের ধারণাটাই প্রধান ধারা হিসাবে এল—যেটা তখন আপোষমুখী হয়েছে।

অতীতের বিশ্বপুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগের বুর্জোয়াদের মত বিপ্লবী মনোভাব তাদের ছিলনা। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তারা যাই করুক,

তাদের চরিত্র সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের প্রতি আপোষমুখী হয়ে পড়ল এবং বিদেশী লগ্নী পুঁজি ও এখানকার সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপোষরফা করেই তারা এখানে পুঁজিবাদ গড়ে তুলতে চাইল। ফলে, এরা হয়ে পড়ল সংস্কারপন্থী বিরুদ্ধবাদী (**reformist oppositional**) বুর্জোয়া।

আবার, আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল বলে এবং ভারতীয় নবজাগৃতিটা জ্ঞানবিজ্ঞানের মারফত ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সংস্রবের ফলে এদেশে এল বলে ইউরোপে প্রথম যুগের রেনেসাঁর যে বিপ্লবাত্মক মূর্তি ছিল, সেই দিকটিও আমাদের দেশে একই সাথে এসে গেল। কিন্তু, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত আমাদের দেশের বুর্জোয়ারা যেহেতু বুর্জোয়া মানবতাবাদের এই বিপ্লবাত্মক সুরকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছে···সেইহেতু বুর্জোয়া মানবতাবাদের এই বিপ্লবাত্মক ধারাটা এদেশে এসে গেল এবং প্রকাশিত হল পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের মধ্য দিয়ে। এই পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের মধ্য দিয়েই এদেশে বুর্জোয়া বিপ্লববাদের প্রথম যুগের সেই যৌবনোদ্দীপ্ত, বিপ্লবাত্মক, আপোষহীন, 'সেকুলার' মানবতাবাদ, নারী স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, ধর্মের সাথে আপোষহীন দৃষ্টিভঙ্গীর সেই বলিষ্ঠতা, স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে নিরঙ্কুশভাবে এক বিপ্লবাত্মক ভিত্তিতে ইংরেজবিরোধিতা, ইংরেজের বিরুদ্ধে আপোষহীন দৃষ্টিভঙ্গী—এগুলো রূপ পেল।

যদিও স্বাধীনতা আন্দোলনটা সুরু হয়েছে বাংলার বিপ্লববাদে, লালা লাজপত রায়, তিলক থেকে—কিন্তু শেষপর্যন্ত তা দু'টি ধারায় পরিণতি লাভ করেছে এবং তা প্রতিফলিত হয়েছে একদিকে সুভাষ বোস, আর একদিকে গান্ধীজীর মধ্যে। গান্ধীজী প্রতিনিধিত্ব করেছেন এদেশের বুর্জোয়া ভাবধারার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিরুদ্ধবাদী আপোষমুখী ধারাটিকে—যেটা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছে, কিন্তু তা সবসময় থেকেছে আপোষমুখী—বিপ্লবাত্মক নয়।

আবার এরই পাশাপাশি বাংলার বিপ্লববাদ, পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্রের বিপ্লববাদকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ আপোষহীন সংগ্রামের আর একটি ধারাও আমাদের দেশে এসে গেল, যার পুরোধায় ছিলেন—অর্থাৎ যে ব্যক্তি, যে নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে সেটা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্র। প্রধানতঃ সুভাষ বোসের নেতৃত্বের মধ্য দিয়েই এই বিপ্লববাদের স্ফুরণ ঘটেছে এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গান্ধীজীর আপোষমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন মনোভাবের জায়গাটায় গান্ধীজীর সাথে তাঁর বিরোধ প্রস্ফুটিত হয়েছে।

এই ধারাটিকেই আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে আমি বলছি বুর্জোয়া বিপ্লববাদ বা পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের ধারণা—সেটা হল সত্যিকারের বিপ্লবী মানবতাবাদ বা সত্যিকারের কম্যুনিজমের আন্দোলনের ধারা। অথচ, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব মূলতঃ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে, পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতিভূদের হাতে থাকার ফলে এই ধারাটি আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রধান ধারা হিসাবে রূপ নিতে পারেনি। আমাদের মনে রাখা দরকার, ভারতবর্ষে সঠিক সর্বহারা সংস্কৃতি, যেটা সমাজের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনতে চাইছে, সেটা এই বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদী ভাবধারার ধারাবাহিকতার পথেই আসবে।

ফলে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে আমরা বুর্জোয়া মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে দুটি পরস্পরবিরোধী ধারা দেখতে পাই। একটা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপোষমুখী ধারা এবং গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনে এইটিই মুখ্য (dominant) ধারা ছিল। অপরটি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের ধারা। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর চিন্তাধারায় আমরা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর এই উদারনৈতিক, সংস্কারপন্থী ও আপোষকামী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্যই দেখতে পাই। আর এই পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের প্রকাশ

ঘটেছে শরৎচন্দ্র, নজরুল ও সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ও কর্মধারার মধ্য দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর ভাবধারায় যারা আজও জীবনকে ঢেলে সাজাতে চাইছেন, তাঁরা এঁদের মানবতাবাদী ভাবনাধারণাগুলি যে ভারতীয় পুঁজিবাদের পরিপূরক ভাবনাধারণা—এ বিশ্লেষণ করে দেখতে চাইছেন না। অর্থাৎ, তাঁদের ভাবনাধারণা ও উপলব্ধির শ্রেণীগত দিকটা কি—বিচারের ক্ষেত্রে সেটাকে এরা কোন মূল্যই দিতে চান না। কারণ, যেহেতু 'শ্রেণী সংগ্রাম', 'শ্রেণী চিন্তা', 'শ্রেণী ভাবনা-ধারণা' এগুলি মার্কসবাদী তত্ত্ব, সেইহেতু এদের মতে এগুলি কিছুই নয়! এরা মনে করেন, শ্রেণী-ফ্রেণী আসলে কিছুই নয়—ব্যক্তি ও ব্যক্তিচিন্তাই আসল। অথচ, এরা জানেন না যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে (আমাদের সমাজও একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজ) যে কোন ব্যক্তির চিন্তাই, আমরা চাই বা না চাই, আসলে কোন না কোন শ্রেণীর চিন্তা হতে বাধ্য।

এ বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করলে একজন তার নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি যে শ্রেণীকে 'সার্ভ' (সেবা) করতে চান না—সেই শ্রেণীচিন্তারই 'ভিক্‌টিম' (বলি) হয়ে পড়তে পারেন। গান্ধীজীর মত মানুষের ক্ষেত্রেও এরূপ ব্যাপারই ঘটেছে বলে আমার ধারণা। তাই প্রায় সমস্ত মার্কসবাদীরা যখন একসুরে গান্ধীজীকে 'হিপোক্রিট' (ভণ্ড) বলেছেন, আমি তাঁদের সাথে একমত হতে পারিনি। গান্ধীজী সম্বন্ধে এরূপ বিশ্লেষণের সংগে আমার বিরোধ ছিল। গান্ধীজী সম্বন্ধে আমি সবসময়ই মনে করতাম এবং আজও মনে করি, 'হি ওয়াজ এ্যান অনেষ্ট ম্যান এণ্ড এ ভেরি পাওয়ারফুল পারসনালিটি' (তিনি একজন সৎ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন)। তা না হলে বহু 'অনেষ্ট', 'ডেডিকেটেড', লোক—তাঁরা কেউ বাজে লোক ছিল না, যারা সর্বস্ব দিতে পারতো—আমরা নিজের চোখে দেখেছি, তারা সব দলে দলে গান্ধীজীর শিষ্য হয়েছে। 'হিপোক্রিট' হলে এভাবে গোটা দেশকে তিনি তাঁর পেছনে জড়ো করতে সক্ষম

হতেন না। গান্ধীজীর ভূমিকার এমন সহজতর ও সরল রূপ, 'ওভার-সিম্পলিফায়েড' (অতি সরলীকৃত) ব্যাখ্যা সেদিনকার বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের তত্ত্বগত ও আদর্শগত নেতৃত্বের দেউলিয়াপনারই প্রমাণ। গান্ধীজীর শ্রেণী চরিত্রের এমনতর সহজ ও সরল ব্যাখ্যার দরুণই সেদিন আমরা গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও ভাবাদর্শের প্রভাব থেকে দেশকে ও জনসাধারণকে রক্ষা করতে পারি নি। এইভাবে অযথা তাঁকে ছোট করতে গিয়ে জনসাধারণের সামনে আমরা নিজেদেরই ছোট করেছি, গান্ধীজীর গায়ে এতটুকু আঁচড়ও কাটতে সক্ষম হই নি। গান্ধীজীর আদর্শে দেশের সর্বনাশ হয়েছে, ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ 'কনসোলিডেটেড' (সংহত) হতে সুযোগ পেয়েছে—এ সবই সত্য কথা। কিন্তু, গান্ধীজী জেনে শুনে ইচ্ছা করেই পুঁজিপতিদের দালালি করেছেন এরূপ বিশ্লেষণকে আমি 'ওভার-সিম্পলিফায়েড' ও ভুল বলে মনে করি। আমি মনে করি গান্ধীজী তাঁর নিজস্ব ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী শ্রেণীস্বার্থের অনেক ঊর্ধ্বে থেকে এবং সাধারণভাবে—অর্থাৎ, 'উইদআউট এনি স্পেসিফিক রেফারেন্স টু ক্লাস'। (শ্রেণী-সম্পর্ক ও শ্রেণীস্বার্থের অস্তিত্বের উল্লেখ না রেখে)—দেশ ও জনসাধারণের কল্যাণের কথা ভেবে, তাঁর অজ্ঞাতসারেই তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে তিনি আসলে যে শ্রেণীর চিন্তা ও স্বার্থ প্রতিফলিত করেছেন, তা হচ্ছে ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণী।

পুঁজিপতিরা কিন্তু তাদের 'ক্লাস ইনস্টিংক্ট' (শ্রেণীপ্রবৃত্তির) দ্বারা সহজেই তা ধরতে পেরেছিল। তাই তাঁকে তারা "ব্যাক" (পৃষ্ঠপোষকতা) করেছে, আশীর্বাদ করেছে, সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। পুঁজিপতিরা ঠিক বুঝতে পেরেছিল যে, এখানে তাদের ক্ষতি নেই, বরঞ্চ মঙ্গল আছে। অথচ, এতবড় একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি হয়েও গান্ধীজী নিজে তাঁর মননক্রিয়ার শ্রেণীগত দিকটি ধরতে পারলেন না। শ্রেণী সচেতন না হলে যে কোন প্রতিভাবান ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটা অসম্ভব নয় এবং গান্ধীজীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

প্রত্যেক মানুষ যেভাবে কথা বলে, যে রুচিতে আচরণ করে—

সমাজের অভ্যন্তরে যে দার্শনিক চিন্তাভাবনাগুলি রয়েছে, তা 'ফোর্সেস অব হ্যাবিটস্' ও সংস্কারের রূপে সেই আচরণগুলিকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করছে। তাই মানুষ না জানলেও প্রত্যেকটি লোকের প্রতি-মুহূর্তের ক্রিয়াকলাপ ও ভাবনাধারণা কোন না কোন দর্শনের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। আর, দার্শনিক চিন্তামাত্রই শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কোন না কোন শ্রেণীর চিন্তা। তাই শ্রেণীগত চিন্তাকে বাদ দিয়ে আমরা চলতে পারি না। একথা একজন দার্শনিকের পক্ষেও সমান সত্য।

তাই গান্ধীবাদ সম্বন্ধে তখন আমি বলেছিলাম, **"Gandhism is a sublimatic transformation of bourgeois class instinct, originated through the process of fusion between the senses of bourgeois moral values and fear-complex of revolution of Gandhi"**—অর্থাৎ, সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের নিয়মটিকে অস্বীকার করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সর্বমানবের কল্যাণ (অর্থাৎ, উভয় শ্রেণীর একই সাথে কল্যাণ) সাধন করতে চেয়েছিলেন বলেই একদিকে বুর্জোয়া 'মরাল ভ্যালুজ'-এর (নৈতিক মূল্যবোধগুলির) আবেদন তাঁর মধ্যে জনতার প্রতি অশেষ মমত্ববোধ সৃষ্টি করেছিল, অপরদিকে পুঁজিপতিশ্রেণীর বিপ্লবভীতিও একই সাথে তাঁর চিন্তাধারায় অজ্ঞাতসারেই কাজ করে চলেছিল। ফলে, নিষ্ঠা ও সততার সাথে জনগণের কল্যাণের কথা চিন্তা করলেও যে মতাদর্শের অর্থাৎ "গান্ধীবাদে"র, জন্ম তিনি দিলেন—তা বাস্তবে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থকেই রক্ষা করেছে ও আজও করে চলেছে।

গান্ধীজী মনে করতেন, শোষণ, অত্যাচার ও মানুষের সমাজের সমস্ত অকল্যাণের মূল কারণ হল, লোভ, হীনমন্যতা, কাপুরুষতা, সর্বোপরি মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার অভাব। তাই 'উদারতা', 'সৎসাহস', 'মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমের আদর্শ' ও 'নিঃশঙ্ক সত্যাগ্রহী' মনোভাবের দ্বারা সমাজের অভ্যন্তরের মানুষগুলিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই এ সমস্যার সত্যিকারের সমাধান সম্ভব।

এমনই একটি মেয়ে প্রীতিলতা জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১১ সালের মে মাসে চট্টগ্রামে। পিতা জগবন্ধু, মা প্রতিভাময়ী।

পাঁচ বছরের মেয়েটি অতি ভোরে উঠেই বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ খানা নিয়ে মায়ের মাথার কাছে গিয়ে বসত। মা পড়াতেন। মেয়েটিকে একটু বড় হলে দেখা গেল চট্টগ্রামের খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ের এক মনোযোগী ছাত্রী। ইংরেজী, বাংলা এবং সংস্কৃত সব বিষয়েই তার দখল স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

আই. এ. পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ড থেকে তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন ১৯৩০ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩২ সালে তিনি ডিস্টিংসনে বি. এ. পাস করেন। সে সময়ে বিপ্লবী কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য ইংরেজী অনার্স তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়।

কলেজ-জীবনে তিনি ঢাকায় লীলা নাগের দীপালী সঙ্ঘ এবং কলকাতায় কল্যাণী দাসের ছাত্রী সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত হন। এখানে তাঁর মনে একটা রাজনৈতিক ছাপ পড়ে। অবশেষে তিনি সূর্য সেনের বিপ্লবী দলে যোগদান করেন।

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর এবং জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধের পর আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের গোপনীয় খবর আদান-প্রদান এবং চট্টগ্রাম ও কলকাতার বিপ্লবীদের সংযোগ-রক্ষার একটা ভার এসে পড়ল প্রীতিলতার উপর।

তখনো প্রীতিলতার সঙ্গে মাস্টারদা সূর্য সেনের সাক্ষাৎ হয় নি, কিন্তু মাস্টারদার আদেশেই তিনি পুলিশ ইন্‌সপেক্টর তারিণী মুখার্জীকে হত্যা করার অপরাধে ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে প্রায়ই আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে যেতেন। জেল-কর্তৃপক্ষ তাঁকে রামকৃষ্ণের বোন বলে মনে করত।

একদিন সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রীতিলতা শুনলেন, সেদিন প্রত্যূষে চারটায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি হয়ে গেছে। হঠাৎ সে কথা শুনে তিনি এমন অস্থির হয়ে উঠলেন যে,

দেলের দরজায় একটা প্রচণ্ড ঘা খেয়ে কপালটা তাঁর ফুলে উঠল, সে আঘাত তিনি জানতেও পেলেন না। কিছুদিন পর্যন্ত এমন অন্য-মনস্ক রইলেন যে খাওয়া-দাওয়া, পড়াশুনা, ব্যক্তিগত সব কাজই তাঁর তুচ্ছ হয়ে দূরে পড়ে রইল। কিছু না করে আর তিনি থাকতে পারলেন না।

১৯৩২ সালে তিনি চট্টগ্রামে ফিরে যান এবং সেখানে নন্দন-কানন গার্লস স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন। মাত্র তিনমাস তিনি এ কাজ করতে পেরেছিলেন।

ধলঘাট গ্রামে সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে তখন সূর্য সেন, নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন আত্মগোপন করেছিলেন। পুরুষের বেশে গিয়ে প্রীতিলতা সূর্য সেনের সঙ্গে দেখা করে এলেন এই তাঁর মাস্টারদাকে প্রথম দেখা। মাঝে মাঝে এখানে এসে প্রীতিলতা মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতেন। ধলঘাট মিলিটারী ক্যাম্প নিকটেই অবস্থিত ছিল।

১৯৩২ সালের ১২ই জুন রাত্রি ৮টায় মিলিটারী ও পুলিশ এসে ঐ বাড়ি ঘিরে ফেলে। সূর্য সেন, নির্মল সেন, অপূর্ব সেন ও প্রীতিলতা তখন সে বাড়িতে রয়েছেন। তাঁরা সবাই নীচের ঘরে খেতে বসেছিলেন বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে খাওয়া ফেলে রেখে তৎক্ষণাৎ তাঁরা দোতলায় উঠে যান।

ক্যাপটেন ক্যামেরণ ধাক্কা দিয়ে নীচের ঘরের দরজা খুলে ফেলে। তারপর বাঁশের সিঁড়িটা বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। বিপ্লবীরা তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছিলেন। দোতলায় ঢুকবার মুখেই নির্মল সেনের গুলিতে ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ নিহত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়।

প্রায় আধঘণ্টা কোন সাড়াশব্দ নেই। সব নিস্তব্ধ। বিপ্লবীরা অন্ধকারে বেরিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। মিলিটারী বেষ্টনীর ব্যবস্থা বুঝে নেওয়া দরকার।

নির্মল সেন তাদের অবস্থান লক্ষ্য করবার জন্য অতি সাবধানে টিনের বারান্দায় গেলেই শব্দ হয়। সেই মুহূর্তেই গুর্খা সৈন্যরা গুলি চালায়।

নির্মল সেন সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন। মাস্টারদা, প্রীতিলতা ও অপূর্ব সেন তখন অন্ধকারে নেমে আসেন। অতি ধীরে ধীরে পূর্বদিকের একটা গড় পার হয়ে পাটিপাতার ঝাড়ের মধ্য দিয়ে তাঁরা চলতে থাকেন। পাটিপাতার খস্ খস্ শব্দ লক্ষ্য করে গুর্খারা গুলি করতে থাকে। অপূর্ব সেন গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মাষ্টারদা ও প্রীতিলতা মিলিটারী ব্যূহ ভেদ করে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন।

আশ্রয়দাত্রী সাবিত্রী দেবী ও তাঁর পুত্র রামকৃষ্ণকে পরদিন সকালে গ্রেপ্তার করা হয়। ধলঘাট গ্রাম থেকে ছেঁকে গ্রেপ্তার করা চলতে থাকে। পুলিশ ও মিলিটারীর অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সহিত সাক্ষাৎ মানে প্রীতিলতার একটি লেখা যাবার সময় তাঁরা ভুলবশত ফেলে দিয়ে যান। সেটি পুলিশ পেয়ে যায়।

পরদিন প্রীতিলতা ফিরে এসে ভালমানুষটির মত নিজের বাড়িতে বসে ছিলেন। হঠাৎ পুলিশ বাড়ী ঘিরে ফেলে। থানাতল্লাশী ও নানা প্রশ্নে জর্জরিত করে পুলিশ চলে গেল। তারপর থেকে ঘন ঘন বাড়ী তল্লাশী। প্রীতিলতা বুঝলেন, বাড়ীতে থেকে কাজ করা যাবে না। তিনি মাষ্টারদার কাছ থেকে আত্মগোপন করবার অনুমতি চাইলেন। মাষ্টারদার নির্দেশে তিনি তাঁর কাছেই চলে গেলেন।

প্রায় তিনমাস তিনি মাস্টারদার সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। মরিয়া হয়ে উঠলেন প্রীতিলতা। মাস্টারদার কাছে বিশেষ কোন একটা কাজ করবার আদেশ চাইলেন তিনি। অবশেষে অনুমতি মিলল।

১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। প্রীতিলতার সঙ্গে আছেন আরো দশ-বারো জন বিপ্লবী। নেত্রী প্রীতিলতা। পাহাড়তলী

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করলেন তাঁরা বোমা ও রিভলবার নিয়ে। ক্লাবের একজনের মৃত্যু হয় এবং কয়েকজন আহত হয়। কর্ম সমাধা হয়ে যাবার পর অক্ষতদেহে সকল বিপ্লবীরা প্রীতিলতারই নির্দেশে মাস্টারদার কাছে ফিরে যান। কিন্তু প্রীতিলতা আর ফিরলেন না। তিনি দেহত্যাগ করেন পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত পাহাড়তলী পুলিশ তছনছ করে ফেলে।

অসংখ্য রকমের তদন্তের পর প্রীতিলতার দেহ ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাঁর বাবার কাছে। শহীদ প্রীতিলতার পুণ্যদেহ সেদিন অজ্ঞাত, অখ্যাত ভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ভয়ে কেউ সেদিন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেনি। বয়স তখন তাঁর মাত্র একুশ বছর।

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের আগের দিন, অর্থাৎ মৃত্যুর আগের দিন প্রীতিলতা তাঁর মাকে এই চিঠিখানি লিখে গিয়েছিলেন।

'মাগো, তুমি আমায় ডেকেছিলে? আমার যেন মনে হল তুমি আমার শিয়রে বসে কেবলি আমার নাম ধরে ডাকছ, আর তোমার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে। মা, সত্যিই কি তুমি এত কাঁদছ? আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না—তুমি আমায় ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে চলে গেলে। স্বপ্নে একবার তোমায় দেখতে চেয়েছিলাম—তুমি তোমার বড় আদরের মেয়ের আবদার রক্ষা করতে এসেছিলে। কিন্তু মা, আমি তোমার সঙ্গে একটি কথাও বললাম না। দুচোখ মেলে কেবল তোমার অশ্রুজলই দেখলাম। তোমার চোখের জল মুছাতে এতটুকু চেষ্টা করলাম না।

মা, আমায় তুমি ক্ষমা কর—তোমায় বড় ব্যথা দিয়ে গেলাম। তোমাকে এতটুকু ব্যথা দিতেও তো চিরদিন আমার বুকে বেজেছে। তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। আমি স্বদেশ-জননীর চোখের জল মুছাবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছি। তুমি আমায় আশীর্বাদ কর, নইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না।

একটিবার তোমায় দেখে যেতে পারলাম না। সে জন্য আমার হৃদয়কে তুমি ভুল বুঝো না। তোমার কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলি নি মা। প্রতিনিয়তই তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। আমার অভাব তোমাকে যে পাগল করে তুলেছে, তা আমি জানি। মাগো! আমি শুনেছি, তুমি ঘরের দরজায় বসে সবাইকে ডেকে ডেকে বলেছ—"ওগো, তোমরা দেখে যাও—আমার রাণীশূন্য রাজা দেখে যাও।" তোমার সেই ছবি আমার চোখের উপর দিনরাত ভাসছে। তোমার এই কথাগুলি আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কান্নার সুর বাজায়।

মাগো, তুমি অমন করে আর কেঁদো না। আমি যে সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি—তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না? কি করবে মা? দেশ যে পরাধীন। দেশবাসী যে বিদেশীর অত্যাচারে জর্জরিত, দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, উৎপীড়িতা!

তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে? আর কেঁদো না মা। তুমি আর চোখের জল ফেলো না।

যাবার আগে আর একবার তুমি আমায় স্বপ্নে দেখা দিও। আমি তোমার কাছে জানু পেতে ক্ষমা চাইব। আমি যে তোমার মনে বড়ই ব্যথা দিয়ে এসেছি মা। তোমার সঙ্গে আমি যে দুর্ব্যবহার করে এসেছি, সে-কথা নিয়তই আজ আমার বুকে শেলের মত বিঁধে। ইচ্ছে হয় ছুটে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি। তুমি আমায় আদর করে বুকে টেনে নিতে চেয়েছ—আমি তোমার হাত ছাড়িয়ে চলে এসেছি—খাবারের থালা নিয়ে আমাকে কত সাধাসাধিই না করেছ—আমি পেছন ফিরে চলে গেছি।

না, আর পারছি না। ক্ষমা চাওয়া ভিন্ন আর আমার উপায় নেই। আমি তোমাকে দুদিন ধরে সমানে কাঁদিয়েছি—তোমার কাতর ক্রন্দন আমাকে এতটুকু টলাতে পারে নি। কি আশ্চর্য মা!

তোমার রাণা এত নিষ্ঠুর হতে পারল কি করে? ক্ষমা করো মা। আমায় তুমি ক্ষমা করো।'

বিজয়া

সূর্য সেন

[চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের মহানায়ক [illegible] সহকর্মীদের বিদায় ব্যথা যে সেদিন তাঁর মনে কি তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, সে সবকিছুই তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন 'বিজয়া' নামে একটি প্রবন্ধের মধ্যে [illegible]। এই প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন [illegible] আত্মবিসর্জনের ঠিক দশদিন পরে। সেদিন ছিল বিজয়া

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কত বিজয়াই তো এসে গেছে! কিন্তু আজকের বিজয়া আর অন্য বিজয়ার মধ্যে কত প্রভেদ—এবারকার বিজয়া যেন সব চেয়ে বেশী মূল্যবান!

জীবনে যা দেখি নি, জীবনে যা পাই নি, জীবনে যা শিখি নি, এমন কত অভিনব জিনিষ নিয়েই বিজয়া এসে আজ আমার কাছে! কত নূতন অভিজ্ঞতাই সে নিয়ে এল।

গত দু'মাস যেন আমার জীবনের অভিনব, অভূতপূর্ব অধ্যায়। এই দু'মাসের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আনন্দ, বিষাদ, জ্বালা আমার জীবনের খুব বড় সঞ্চয়ই হয়ে রইল।

আজ বিজয়ার দিনে মার কাছে প্রার্থনা করছি, যেন এই অমূল্য সঞ্চয়টুকু আমার জীবনকে ঐশ্বর্যময় করে তোলে। এই দু'মাসের সব কিছুর মধ্যে আনন্দই সবচেয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। এত আনন্দ জীবনেও পাইনি, বিষাদ আর জ্বালা আনন্দকে আরও মধুময় করে

তুলেছে। আমার দুর্ভাগ্য – একান্ত দুর্ভাগ্য যে, এমন প্রাণমাতান আনন্দের মধুর স্মৃতিই আজ আমায় অহরহঃ ব্যথা দিচ্ছে।

আড়াই বৎসরের মধ্যে তিনটি বিজয়া এলো, এর মধ্যে কত অন্তরঙ্গ বন্ধু, কত আদরের ভাইবোনের জীবনের বিজয়াই চোখে দেখলাম—আর পূর্ণ দায়িত্বই ঘাড়ে নিলাম—আজ একে একে সব কথা মনে পড়ছে।

আজ মনে পড়ছে, কত সুন্দর অমূল্য রত্নরাজি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য সব তুচ্ছ করে হাসতে হাসতে মাতৃযজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়ে চলে গেছে, একটু দ্বিধা করে নি, একটু সঙ্কোচ করে নি, আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে স্বেচ্ছায় মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আজ এমন পবিত্র দিনে তাদের কথা মনে করে আমার মত কঠিন হৃদয়ের চোখেও জল আসছে—তাদের বীরত্বের কাহিনী মনে করে আমার গৌরবে বুক ফুলে উঠছে।

নরেশ, বিধু, টেগরা, ত্রিপুরা, মধু, অর্দ্ধেন্দু, প্রভাস, নির্ম্মল, পুলিন, মতি, শশাঙ্ক, জিতেন, আন্দু, অমরেন্দ্র, মনা, রজত, দেবু, স্বদেশ, মাখন, রামকৃষ্ণ, ভোলা সবারই কথা আজ একে একে মনে পড়ছে। আর স্মৃতির মধ্যে দিয়ে তাদের বিজয়ার সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

কত জীবনের বিজয়ার নিমিত্তই হলাম—কত স্নেহময়ী জননীর বুক শূন্য করে তাঁর সোনার পুতুলকে স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিয়েছি—কতজনকে অন্তরীণে, কারাগারে, নির্ব্বাসনে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছি, ঘরে ঘরে হাহাকারের সৃষ্টি করেছি—দেশের উপর গভর্নমেন্টের অত্যাচার নির্যাতন টেনে এনেছি। এ সবের দায়িত্ব থেকে নিজেকে বাদ দেই কি করে?

মা, আনন্দময়ি মা আমার, আজ তোমার বিসর্জ্জনের দিনে তোমায় একান্ত ব্যাকুল হয়েই জিজ্ঞাসা করছি—আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি?

পনের বৎসর আগে অনেক ভেবে চিন্তে, ভাল মন্দ বিচার করে জীবনের যে লক্ষ্য, যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম, আজও তাই আঁকড়ে ধরে আছি।

দুর্ব্বলতা কি আসতে চায় নি? কত রকমের দুর্ব্বলতা আসতে চেয়েছে, কিন্তু তবুও নিজের লক্ষ্যটিকে তো ছাড়ি নি। আজও মনে হচ্ছে, খুব নিঃসন্দেহেই মনে হচ্ছে, আমি যে পথে চলেছি দেশের অনেক লোক ভুল বুঝলেও সেই পথটাই ঠিক

এ বিশ্বাস এখনও আমার অটুট আছে যে, আমি অন্যায় করছি না, পাপ করছি না, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার দেশে যে হাহাকার, অত্যাচারের সৃষ্টি হয়েছে, এর চেয়ে আরও অনেক বেশী—সব দেশেই তাই হয়েছে। আমার আদর্শের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই আমার পথে আমি চলেছি—এখনও কোন দ্বিধা আসে নি।

মা, তোমায় মিনতি জানাচ্ছি, যদি আমার ভুল হয়, আমার ভুল ভেঙ্গে দিও, আর যদি ঠিক পথেই আমি চলে থাকি, তা হলে আমার বিশ্বাসকে আরও শক্ত করে দাও, আমাকে শক্তিমান করে দাও—আমার মধ্যে যেন কোন রকমের দুর্ব্বলতা না আসে, আমি যেন আমার পথ থেকে কোন দিন এক চুলও না সরি

আমি যেন বড় নিষ্ঠুর ছিলাম, কিন্তু গত দু'মাসের পথচলা যেন আমার নিষ্ঠুর হৃদয়ের মধ্যে মমতা এনে দিয়েছে, করুণার সৃষ্টি করেছে; তাই অতি আদরের ছেলে, মেয়ে, ভাইবোনকে হারিয়ে তাদের যে সব আত্মীয়স্বজন আজ বিজয়ার দিনে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন, তাঁদের কথা মনে করে আমার মনে আজ ভীষণ লাগছে।

হয়ত তাঁরা আমাকে তাঁদের বুকের ধন হারাবার নিমিত্ত মনে করে আমায় অভিশাপ দিচ্ছেন—সেজন্য আমি চিন্তা করছি না, কিন্তু তাঁদের বুকভাঙ্গা ক্রন্দন, মর্ম্মভেদী হাহাকার যে আমার বুকে ভীষণ বাজছে!

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কত স্নেহময়ী জননী তাঁর আদরের সন্তানকে হারিয়ে কি মর্মান্তিক কান্নাই কাঁদছেন! কি অসহ্য বেদনায় তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে উঠেছে—বিজয়ার এমন আনন্দের দিনটি তাঁর কাছে কত যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে!

বাপ তাঁর আদরের দুলালকে হারিয়ে বিজয়ার দিনে সমস্ত উৎসবকে বিষাদময় করে তুলেছেন! ভাইবোন তাদের স্নেহের ভাইবোনকে হারিয়ে আজ কত অসহনীয় যাতনাই ভোগ করছে! কত বড় অভাববোধ তাঁদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করছে! এ সব ভেবে আমার মত পাষাণও আজ গলে যাচ্ছে।

আবার তোমায় জিজ্ঞাসা করছি মা, আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি? এত মায়ের চোখের জল, এত বাপের বুকফাটা কান্না, এত ভাইবোনদের হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস, এ সবের কারণ হয়েছি বলেই আমি কি অন্যায় করছি?

যদি তাই হয়, তুমি আমার ভুল ভেঙ্গে দিও, আমায় ঠিক পথে চালিও। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি ঠিক পথে চলেছি। তাই চারদিকে শ্মশান সৃষ্টি হচ্ছে দেখে মনে ব্যথা পেয়েও আমি লক্ষ্যটিকে বুকে চেপে ধরে আছি—এই আশায় যে, এ সকল পবিত্র শ্মশান-ভূমের উপর একদিন স্বাধীনতার সৌধ নির্মিত হবে।

পনের দিন আগে যে নির্ভীক পবিত্র, সুন্দর প্রতিমাটিকে এক হাতে আয়ুধ, অন্য হাতে অমৃত দিয়ে বিসর্জন দিয়ে এসেছিলাম, তার কথাই আজ সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে। তার স্মৃতি আজ সবকে ছাপিয়ে উঠেছে।

যাকে নিজ হাতে বধূর সাজে সাজিয়ে সমরাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুমতি দিয়ে এসেছিলাম, তার স্মৃতি যে আজ পনের দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত ভুলতে পারলাম না। সাজিয়ে দিয়ে যখন করুণভাবে বললাম, "তোকে এই শেষ সাজিয়ে দিলাম। তোর দাদা তো তোকে জীবনে আর কোনদিন সাজাবে না", তখন প্রতিমা একটু হেসেছিল।

কি করুণ সে হাসিটুকু! কত আনন্দের, কত বিষাদের, কত অভিমানের কথাই তার মধ্যে ছিল।

সে নীরব হাসিটুকুর ভিতরে অধুরন্ত কথা আমার সারা জীবন ভাবলেও শেষ করতে পারব না—শেষ করতে চাইও না। তা যেন আমার জীবনে নিত্য নূতন চিন্তার উপকরণ যুগিয়ে আমার জীবনকে ঐশ্বর্য্যময় করে তোলে, দিন দিন উন্মত্ত করে তোলে।

সে তো নিজ হাতে অমৃত পান করে অমর হয়ে গেছে। কিন্তু মরজগতে আমরা তার বিসর্জ্জনের ব্যথা যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

আজ বিজয়ার দিনে, সে দিনের বিজয়ার করুণ স্মৃতি যে মর্মে মর্মে কান্নার সুর তুলছে—চোখের জল যে কিছুতেই রোধ করতে পারছি না—"চাপিতে গেলে উঠে দু'কূল ছাপিয়া।"

সে যে আমার আনন্দের উৎস—নির্দোষ, নিষ্পাপ ছিল সুন্দর পবিত্র মহান্ ছিল। তার মধ্যে একাধারে যত গুণ দেখেছি, আর কোন মানুষের মধ্যে আমি তত গুণ দেখি নি।

তার অন্তরের সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ করেছিল। তার মনের জোর, দৃঢ় সংকল্প, সাহস, বীরত্ব কারও চেয়ে কম দেখি নি। তার সরলতা, বাধ্যতা খুব সুন্দরই ছিল। তার শিক্ষা, আদর্শের অনুভূতি, সুন্দর ব্যবহার কিছুরই অভাব ছিল না।

সর্বোপরি কঠোর বিপ্লবী মনোভাবের মধ্যে ভগবানের উপর অটুট ভক্তি, বিশ্বাস, সে যেভাবে বজায় রেখেছিল, তা দেখলে বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়।

এত গুণের আধার ছিল বলে তাকে খুবই স্নেহ করতাম—হৃদয়ের সমস্ত উজাড় করে তাকে দিয়েছিলাম—প্রতিদানে অসীম আনন্দই পেয়েছি, এত আনন্দ জীবনে পাই নি।

এত স্নেহের, এত আদরের প্রতিমাকে নিজ হাতে বিসর্জ্জন দিয়ে চলে এলাম। তাই সে দিনের কথা আজ কেবলই মনে হচ্ছে, মনে পড়ছে সেই প্রতিমাটিকে।

যে এত অফুরন্ত আনন্দ আমায় দিল, এত গুণ দেখিয়ে গেল, এত মহৎ আত্মদান করে গেল, দেবতার মত শ্রদ্ধা আমায় দিল, সে সব কথা মনে করে আজ আনন্দ না পেয়ে তাকে সরাবার ব্যথাই আমার প্রাণে এত বেশী বাজছে—আজ আমার এই একমাত্র দুঃখ।

অসুরদলনী মা আমার! আজ বিজয়ার দিনে তোমার কাছে এই কামনা, তুমি আমায় এই বর দাও—যেন তার স্মৃতি আমাকে আনন্দ দেয়, তার গুণের কথা মনে হলে যেন আমি গৌরব অনুভব করি।

তার অপূর্ব আত্মদান আমার প্রাণে যেন আনন্দ দেয়, আমাকে যেন আরও শক্তিমান করে তোলে, তার শ্রদ্ধা যেন আমাকে তার শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে তোলে—তাকে হারাবার ব্যথাটা এত আনন্দকে ছাপিয়ে যেন কিছুতেই না ওঠে।

আমার স্নেহের প্রতিমাকে বলছি—রাণী, তোকে আমি কতদিন কত ব্যথাই দিয়েছি; আজ বিজয়ার দিনে তোর দাদার সব দোষত্রুটি ভুলে যা, আমার উপর আর অভিমান রাখিস্ না।

তোকে হৃদয় উজাড় করে স্নেহ করেছি, তোর গুণ দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি—তোর ভগবৎ ভক্তি দেখে তোকে শ্রদ্ধা করেছি; তোর সঙ্গে প্রাণ খুলে নিঃসঙ্কোচে মিশেছি।

এত আপনার করে নিয়েছিলাম বলেই হয়ত তোকে সামান্য দোষে অথবা বিনা দোষে কত গাল দিয়েছি, হয়ত কোন সময় ভুল বুঝে তোর মনে ব্যথা দিয়েছি, তোকে খুব স্নেহ করতাম বলে তোকে গাল দিতে কোনদিন ইতস্ততঃ করি নি, মনে করতাম তোকে হাজার গাল দিলেও তুই আমার উপর রাগ করবি না, কোনদিন রাগ করিস্ও নাই।

শেষ মুহূর্তে তোকে ভুল করে আমি একটু গাল দিয়েছিলাম বলে তুই হয়ত অভিমান নিয়ে গেছিস্। আজকের দিনে তুই যেখানে আছিস্, সেখান থেকেই আমার সব দোষত্রুটির জন্য আমায় ক্ষমা করে যা।

শেষ মুহূর্ত্তে তোকে একটু কষ্ট দিয়েছি বলে আমি যে দিনরাত অশান্তির দহনে দগ্ধ হচ্ছি তা তো তুই দেখছিস্। তোর দাদা যেন শান্তি পায়, তার ব্যবস্থা তুই করে দে।

তোর কি মনে নাই, তুই তোর দাদার দুঃখ একটুও সহ্য করতে পারতিস্ না? তাই আবার বলছি, আজকের এই পবিত্র দিনে আমার দোষক্রুটি সব ভুলে গিয়ে হাসিমুখে তোর দাদার বিজয়া-সম্ভাষণ গ্রহণ কর। আমার স্নেহের সম্ভাষণ—শ্রদ্ধার সম্ভাষণ তোকে জানাচ্ছি।

আজ মিলনের দিন, ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার দিন, বিবাদ-বিসম্বাদ, দোষক্রুটি সবই ভুলে যাওয়ার দিন। আজ তুই আমার পাশে থাকলে যে আনন্দ আমি পেতাম, দূর থেকেও সে আনন্দ তুই আজ আমাকে দে।

এমন সুন্দর দিনে মায়ের নামটি নিয়ে প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, তোর মত নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক কাউকে আমি পাই নি। বাস্তবিক ফুলেরই মত তুই সুন্দর, পবিত্র ও মহান্ ছিলি। তোর অপূর্ব আত্মদান তোকে আরও সুন্দর, আরও মহনীয় করে তুলেছে।

বরদাত্রী মা আমার—আমায় আশীর্বাদ কর যেন আমার স্নেহের প্রতিমার মধ্যে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ দেখেছি, তা যেন আমার এবং আমার প্রিয় ভাইবোনেরা জীবনে প্রতিফলিত করবার জন্য চেষ্টার ক্রুটি না করে।

* চট্টগ্রাম [illegible] নাথ গুহ সম্পাদিত 'চট্টগ্রাম বিপ্লবের [illegible] সংগৃহীত।

'If icy hands of death give you a touch before the goal is reached, then give the charge of your further pursuit to your followers as I do to-day.

Onward, my Comrades, onward—never fall back.'

—Surya Sen.

ডালহৌসী স্কোয়ার ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত

যতীশচন্দ্র ভৌমিক

[illegible]

২৫শে আগস্ট, ১৯৩০ সাল। সেদিন দুপুরের একটু পর কলকাতা মহানগরীর বুকে একটা খবর বোমার মত ফেটে পড়ল। কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের গাড়ির ওপর বোমা পড়েছে—ডালহৌসি স্কোয়ারে। সেই কুখ্যাত টেগার্ট, ব্রিটিশ-শাসনের ভয়ঙ্কর স্তম্ভ, বহু কুকীর্তির নায়ক, বিপ্লব আন্দোলনের শত্রু, [illegible] স্যর চার্লস টেগার্ট।

খবরটা একরকম মুখে মুখেই কলকাতার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু বিপ্লবী মহলেই নয়, দেশপ্রেমিক বহু মহলেও একটা হর্ষের ঢেউ বয়ে গেল। আর সরকারী মহলে, বিশেষ করে ইউরোপীয় কর্মচারী ও পুলিশ মহলে একটা উদ্বেগ ও আতঙ্কের ছায়া। আর সেই সঙ্গে সাজ-সাজ রব।

বিপ্লবী মহলেও সাজ সাজ রব। কার, কোথায় কি আছে—বোমা, পিস্তল, রিভলবার, নিষিদ্ধ পুস্তক পত্র পত্রিকা সরাও নিরাপদ জায়গায়। খবর দাও এখানে ওখানে সব আড্ডায়। গা-ঢাকা দাও চিহ্নিত কর্মীরা, বেরিয়ে পড় পুরানো আবাস ছেড়ে নতুন আবাসের সন্ধানে।

আমরাও কয়জন আগস্টের সেই বর্ষামেদুর সন্ধ্যায় চিহ্নিত আবাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে। জানতাম কঠিন কাজ—টেগার্টের 'ফাঁদ পাতা ভুবনে'।

সে দিনের এ কাহিনী লিখতে গিয়ে আমাকে ফিরে যেতে হবে কয়েক বছর আগে।

বিপ্লবী নেতাদের প্রায় সকলেই ১৯২৮ সালের মাঝামাঝি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। ভবিষ্যত বিপ্লব কর্মের প্রস্তুতি তখন থেকেই আবার চলল। সেবার ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন হয়, বাংলার বিপ্লবীরা সুভাষচন্দ্রকে জি-ও-সি নির্বাচিত করে কংগ্রেস উপলক্ষে সামরিক কায়দায় ট্রেনিং দিয়ে একটা বৃহৎ ভলান্টিয়ার দল গড়ে তুললেন।

তাঁদের লক্ষ্য ছিল দ্বিবিধ: প্রথমত, বাংলার যুবসমাজের মধ্যে একটা সামরিক চেতনা ও শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করা, দ্বিতীয়ত, এদের মধ্য থেকে বেছে বেছে বিপ্লব আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ করা। এই দুই উদ্দেশ্যই অনেকখানি সফল হয়েছিল

'২৮ সালের কংগ্রেসের পর পরিষ্কার বোঝা গেল, ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে একটি অনিবার্য সংগ্রাম আসন্ন। কংগ্রেসের নেতৃত্বেই এই সংগ্রাম একটি দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের রূপ নেবে। 'যুগান্তর গ্রুপস' বলে পরিচিত বিভিন্ন বিপ্লবী সংস্থা স্থির করলেন, এ সংগ্রামের সঙ্গে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান যুক্ত করে ভারতে ব্রিটিশ শাসন অচল করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে।

তখন থেকে চলল তারই প্রস্তুতি। এর সঙ্গে অতি গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ ও বোমা তৈরির প্রস্তুতি চলল। অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে রিভলবার, পিস্তল ও কার্তুজই প্রধান।

তখনকার দিনে এসব জিনিস পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা ছিল খুব কঠিন। অনেক রকমের অসুবিধা। প্রথমত বহু টাকার দরকার। আবার টাকা দিয়েও সব সময় ঠিক জিনিসটি পাওয়া যেত না। এই অবস্থায় ঠিক করা হল, শুধু রিভলবার পিস্তল ইত্যাদির ভরসায়

বসে থাকা ঠিক হবে না। যথোচিত সতর্কতা বজায় রেখে পিস্তল, রিভলভার ইত্যাদি যতটা সম্ভব সংগ্রহ করার চেষ্টা চলবে। তাছাড়া চেষ্টা চলবে শক্তিশালী বোমা তৈরির।

১৯২৯ সালের কোন এক সময় যুগান্তর দলের শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ ও ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের আলোচনা হয় শ্রীযোগেন দে-সরকারের সঙ্গে আসন্ন বিপ্লব প্রচেষ্টা সম্বন্ধে। দে-সরকার ছিলেন পুরনো বিপ্লবী, যতীন মুখার্জীদের সঙ্গে কাজ করেছেন। ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত হয়ে অরুণচন্দ্র গুহদের সঙ্গে জেলে ছিলেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে দে-সরকার বললেন, তখনকার দিনের সবচেয়ে শক্তিশালী বোমা—টি-এন-টি বোমা, যা মিলিটারী ব্যবহার করে—তা প্রস্তুত করতে তিনি সাহায্য করতে পারেন। পুলিশ যাদের এখনও সন্দেহ করে না এরকম কয়েকজন বিপ্লবী কর্মী যোগাড় করতে হবে। তারা কেমিস্ট, ডাক্তার বা ডাক্তারী ছাত্র হলেই ভাল হয়।

বছর খানেক আগে আজকের দিনের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ অমিয় কুমার বসু বিদেশ যাবার পূর্বে শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে কয়েকটি ছেলের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এদের আপনাদের কাজে লাগাতে পারেন।

ডাক্তার বসু মেডিকাল কলেজে একটি বিপ্লবী গ্রুপ গঠন করেছিলেন, এরা হল সেই গ্রুপের লোক। ডালহৌসী স্কোয়ার ষড়যন্ত্র মামলার ডাঃ নারায়ণ রায় এবং সীতাংশু সরকার এই গ্রুপেরই কর্মী ছিলেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ভ্রাতা উমাপ্রসাদ মুখার্জীর সংযোগ ছিল এই গ্রুপের সঙ্গে।

বোমা তৈরী শেখবার জন্য যাদের নির্বাচিত করা হল, তার মধ্যে ডাঃ নারায়ণ রায় ও সীতাংশু সরকার ছিলেন। স্থান—প্রথমে ৭১নং মীর্জাপুর স্ট্রীটের মেস, পরে অন্য দু-এক জায়গায়। দে-সরকার বোমার ফরমুলা ও তৈরির পদ্ধতি সম্বন্ধে তালিম দিতেন। শিক্ষকের নাম-ধাম-পরিচয় শিক্ষার্থীরা কিছু জানত না, এবং তাদের জানানোও হয়নি। তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে—কখনও অরুণচন্দ্র গুহ, ভূপেন দত্ত

বা কালীপদ ঘোষের মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। বলা বাহুল্য, বৈপ্লবিক কাজকর্মে এ ধরনের সতর্কতা অত্যাবশ্যক। বোমা তৈরীর ব্যাপারে দে-সরকারের সংযোগের কথা পুলিশ কোনদিনও জানতে পারেনি।

এরপর ডাঃ নারায়ণ রায় তাঁর খুড়তোতো ভাই গোবিন্দ রায়, সীতাংশু সরকার প্রভৃতিকে নিয়ে বোমার মাল-মশলা তৈরির পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। কখনও নিজের ল্যাবরেটরিতে, কখনও নিজের বাড়িতে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলতে লাগল।

এদিকে বোমার খোল সংগ্রহের চেষ্টাও চলছে।

১৯২৭ সালে শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত যখন বামার বেসিন জেলে বন্দী ছিলেন, তখন সেখানে তাঁর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কেসের হরিনারায়ণ চন্দের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল বোমার খোল সম্বন্ধে। দক্ষিণেশ্বরে ওঁরা খাঁজ-কাটা লোহার শেল দিয়ে বোমা তৈরি করেছিলেন। সেই শেলের সন্ধান পেলে তার নমুনা থেকে শেল তৈরি করা যেতে পারে।

হরিনারায়ণবাবু বললেন, সেই শেলের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারেন হুগলীর হামিদুল হক সেই শেলের কোন সন্ধান দিতে পারেন কিনা। এবার যখন বোমার খোলের খোঁজ পড়ল, হামিদুল হক অনেক খুঁজে-পেতে সে সময়কার একটা লোহার শেল যোগাড় করে দিলেন।

শেলটা ছিল বেশ ভারী। দে সরকার শেল দেখে বললেন, এত বড় ও ভারী শেল পকেটে করে তু'তিনটা বয়ে নেওয়া যাবে না। প্রায় লোহার শেলের মতই শক্ত, অথচ অনেকটা হাল্কা, এরকম শেলের দরকার। এলুমিনিয়াম বা মিশ্র এলুমিনিয়াম দিয়ে অপেক্ষাকৃত একটু ছোট সাইজের শেল তৈরি করলে সুবিধা।

এ ব্যাপারে পরে ডাঃ ভূপালচন্দ্র বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ডাঃ বসু নিজেও তখন একটা বিপ্লবী গ্রুপ গড়েছিলেন। তাঁর কিছু কারখানার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, তিনি চেষ্টা করতে রাজী হলেন। পরে ডাঃ বসুর মাধ্যমে অনেকগুলো খাঁজ-কাটা

এলুমিনিয়ামের শেলের যোগাড় হয়। এগুলি প্রধানত নীলাদ্রি বলে একটি ছেলের বাবার কারখানায় তৈরী হয়। এগুলো যে বোমার খোল, তা তারা বা কারিগররা জানত না। তাদের বলা হয়েছিল, এগুলো একরকম পাইপের 'পিনিয়ন' বা খাঁজকাটা চাকা, যা স্পিনিং মিলে ব্যবহৃত হয়।

এদিকে টি-এন-টি বোমার মশলা আমাটোল তৈরী হয়ে গিয়েছে। এবার ডাঃ রায়ের পরিচালনায় এসব শেল আমাটোল দিয়ে ভর্তি করে ফিউজ লাগিয়ে বোমা তৈয়ারী সম্পূর্ণ হল। ভারতীয় বিপ্লবীদের হাতে এই প্রথম জন্ম নিল টি এন-টি বোমা।

এই টি-এন-টি বোমাই চারটি কালীপদ ঘোষের কাছ থেকে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু নিজে সঙ্গে করে চট্টগ্রাম নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানকার বৈপ্লবিক কাজের জন্য এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দীদের জেল ভেঙে মুক্ত করবার কাজে লাগাবার জন্য। শ্রীবসু তখন অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় অনন্ত সিংহের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। শ্রী বসুর সঙ্গে অনেকদিন থেকেই বিপ্লবী দলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

এবার বি-ভি ও বরিশাল, যশোর, খুলনা, হুগলী, ২৪-পরগণা ফরিদপুর, ময়মনসিং, রংপুর প্রভৃতি বিভিন্ন যুগান্তর গ্রুপের প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত নিলেন অবিলম্বে নানাভাবে আঘাত হানার। বোমা পিস্তল নিয়ে আক্রমণ, যেভাবে যতটা পাবা যায় ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে অচল করে দেবার চেষ্টা। জেলায় জেলায় যাদের যেখানে সম্ভব, নিজেদের প্ল্যান ঠিক করে কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। কলকাতা থেকে সংকেত পাবা মাত্র শুরু হবে আঘাতের পর আঘাত।

প্ল্যান নেওয়া হয়েছিল যে টেগার্টের উপরই প্রথম আঘাত হানা হবে।

বলা বাহুল্য, টেগার্ট সাহেব তখনকার দিনে অত্যধিক সতর্কতার সঙ্গে চলা-ফেরা করতেন। তিনি নিশ্চিত জানতেন, সুযোগ পেলেই তিনি বিপ্লবীদের লক্ষ্যবস্তু হবেন।

টেগার্ট সাহেবের গতিবিধি লক্ষ্য করার ব্যবস্থা হল। বিভিন্ন দলের কয়েকজন বাছা বাছা কর্মী একাজে নিযুক্ত হলেন। একদিন শ্রীশৈলেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী (যিনি টেগার্টকে আক্রমণকারী দলের অন্যতম ছিলেন) কিছু সংবাদ দিলেন। তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝে লালবাজারে যেতেন। তিনি জানালেন, টেগার্ট সাহেব প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে, সকাল ১১টা আন্দাজ, একটা মোটরে করে লালবাজারে আসেন। পাগড়ীধারী এক ড্রাইভার তাঁর গাড়ি চালায়। গাড়ীর নম্বর কিন্তু প্রায়ই পালটানো থাকে। কয়েকটা নম্বর কয়েকদিন অন্তর উল্টে-পাল্টে ব্যবহার করে।

এরপর অনুজা, দীনেশ প্রভৃতি কয়েকজন ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্টে দাঁড়িয়ে টেগার্টের গাড়ী লক্ষ্য করতে লাগলেন। শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্তও একদিন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে টেগার্টের গাড়ির নম্বর ও বিবরণ সংগ্রহ করে আনলেন।

তারপর এল সেই দিন ১৯৩০ সালের ২৫শে আগস্ট। বেলা এগারোটার কিছু পূর্বেই, অনুজা সেনগুপ্ত, দীনেশ মজুমদার, অতুল সেন, শৈলেন নিয়োগী এবং কালীপদ ঘোষ ডালহৌসী স্কোয়ার স্ট নির্দিষ্ট ব্যবধানে স্থান গ্রহণ করলেন। কালীপদ সঙ্কেত দেবেন টেগার্টের গাড়ি আসার, তার পরেই শুরু হবে আক্রমণ।

একটু পরেই পর পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চল। সচকিত সন্ত্রস্ত পথিকরা ছুটল দিগবিদিকে।

এরপর এই ঘটনা সম্বন্ধে টেগার্ট সাহেবের নিজের বর্ণনা কিছু তুলে দিচ্ছি—সে দিনই বাংলা গভর্নমেন্টের কাছে টেগার্ট সাহেব যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তার থেকে :

'বেলা এগারোটায় সময় ডালহৌসী স্কোয়ার ইস্ট দিয়ে গাড়ি করে লালবাজার যাচ্ছিলাম। গাড়ি যখন হ্যারল্ড কোম্পানির কাছাকাছি, হঠাৎ গাড়ির কাছে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ

শুনতে পেলাম। এ নিশ্চয় বোমার আওয়াজ ধারণা করে আমি আমার পায়ের কাছে রাখা রিভলবার তুলে নেবার জন্য নীচু হলাম। তখনই গাড়ির অপর পাশে আর একটি বোমা ফাটল। আমি ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বললাম, প্রায় গজ দশের মধ্যে ঘুরিয়ে নেওয়া হল। আমি দেখলাম ডালহৌসী স্কোয়ারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ঘুরে হেয়ার স্ট্রীটের দিকে লোকজন দৌড়াচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে আমি তাদের অনুসরণ করলাম। দেখলাম যে প্রায় ৬০ গজ দূরে একজন বাঙালী যুবক রক্তাপ্লুত অবস্থায় রাস্তার উপর পড়ে গেল।'

টেগার্ট সাহেবের রিপোর্ট এবং দীনেশের মামলার বিবরণী থেকে জানা যায়, প্রথম বোমাটি টেগার্টের গাড়ির বাঁদিকে একটু পেছনে রাস্তার ওপর পড়ে। ওখান থেকে দশ গজ দূরে যেখানে অনুজা দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে চাপ চাপ রক্ত দেখা যায়। দ্বিতীয় বোমাটি অনুজা নিক্ষেপ করেন, সেটা টেগার্টের গাড়ির ডানদিকে মাটির কিছু ওপরে ফাটে।

অতিরিক্ত রক্তপাতের দরুন অনুজা রাস্তার ওপর যেখানে পড়েছিলেন, সেখানেই মারা যান। ডাক্তারী পরীক্ষায় অনুজার দেহে দশটি গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়, তার মধ্যে নয়টি দেহের বাঁদিকে, একটি বুকের ওপর। সাতটি ক্ষতস্থান থেকে এলুমিনিয়ামের বোমার টুকরো বের করা হয়। দীনেশের ডান হাতে তিন জায়গায় বোমার আঘাত লাগে, এক্স-রে করে বাহুতে দুটো বোমার টুকরা দেখা যায়।

দীনেশ পালাতে গিয়ে রিভলবারসহ ধরা পড়ে।

সেদিন বিকেলেই ডাঃ নারায়ণ রায়ের বাড়ি সার্চ হল এবং তিনি গ্রেপ্তার হলেন। ২৬শে আগস্ট জোড়াবাগান থানায় পড়ল আর একটি বোমা, এবং আর একটি ২৭শে আগস্ট ইডেন গার্ডেন পুলিশ আউটপোস্টে। কয়েকদিনের মধ্যেই আর একটি বোমা পড়ল খুলনায় পুলিশ লাইনে।

ইতিমধ্যে খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তারের হিড়িক চলেছে। ব্যাপক তল্লাসীর ফলে আবিষ্কৃত হল কয়েকটি তাজা বোমা, বহু বোমার খোল, কার্তুজ ইত্যাদি। মাস দুইয়ের মধ্যে ডালহৌসী স্কোয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার হলেন তিরিশ-চল্লিশ জন।

শ্রীরসিকচন্দ্র দাস গ্রেপ্তার হলেন ১৫ই সেপ্টেম্বর। রসিক দাসের গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পর সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর ডি. পেট্রি তাঁর উপরস্থ কর্তার কাছে নোট দিলেন—এই একজন প্রথম শ্রেণীর ফেরারীর গ্রেপ্তার 'ভেরি গ্র্যাটিফাইং'।

কিছুদিন পূর্বেই টেগার্ট সাহেব কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন—এবার যদি মনোরঞ্জন গুপ্ত ও রসিক দাসকে ধরা যায়, কলকাতার অবস্থা অনেকখানি আয়ত্তে আনা যাবে।

ডালহৌসী স্কোয়ারের ঘটনা এবং তার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের অনেককে পুলিশ প্রমাণাভাবে কেসে জড়াতে না-পেরে দীর্ঘদিনের জন্য বিনা বিচারে আটকে রেখে দিয়েছিল।

বলা বাহুল্য, ধৃত ব্যক্তিদের উপর কয়েক দিন ধরেই নির্মম নির্যাতন চলেছিল। পুলিশ লক্-আপে আর লর্ড সিংহ রোডের গোয়েন্দা দপ্তরে। গালাগাল, মারধোর, স-বুট পদাঘাত, আঙুলের গায়ে পিন ফোটানো ইত্যাদি মামুলি নির্যাতন তো চলতই, তার ওপর কয়েক দিন ধরে খেতে ও ঘুমোতে না দিয়ে তাদের মনোবল ভাঙবার চেষ্টা চলত।

এ অবস্থায় পুলিশের লোকেরা এসে পালা করে নন-স্টপ জেরা করে চলত। একটু চোখ বুজেছে কি ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিত। তার ওপর ছিল মা-বাবাদের নিয়ে এসে চাপ দেবার চেষ্টা, ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের প্রয়াস।

অবশেষে একদিন বন্দীদের নিয়ে এল বিচার-কক্ষে—স্পেশাল ট্রাইবিউনালের সামনে। এইচ. সি স্টর্ক চেয়ারম্যান, একজন

হিন্দু ও আর একজন মুসলমান মেম্বর—আশুতোষ ঘোষ এবং আদিত্যুল্লমান খান।

প্রথমে ১৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। তার মধ্যে মনোরঞ্জন গুপ্ত ও গোবিন্দ রায় তখন ফেরারী। গোবিন্দ কোনদিনই ধরা পড়েন নি। মনোরঞ্জন গুপ্ত কয়েক মাস পরে ধরা পড়ে বিনা বিচারে আটক থাকেন। নীলাদ্রি চক্রবর্তীর—যার বাবার কারখানায় বোমার খোল তৈরি হত, তাকে কেস থেকে ছেড়ে দিয়ে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হয়। সীতাংশু সরকার এবং ব্রজদুলাল সেন রাজ-সাক্ষী হওয়ায় সরকারের প্রার্থনা অনুসারে কোর্ট তাদের ক্ষমা করে।

অপর দশ জনের বিরুদ্ধে কেস শুরু হল। চার্জ হচ্ছে বে-আইনী অস্ত্র-শস্ত্র ও বিস্ফোরক রাখা, ইয়োরোপীয়ান ও পুলিশ কর্মচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র, স্যর চার্লস টেগার্টের ওপর এবং জোড়াবাগান পুলিশ-স্টেশন ও ইডেন গার্ডেন পুলিশ আউটপোস্টের ওপর বোমা নিক্ষেপ ইত্যাদি।

মামলার সুদীর্ঘ বিবরণ ও সুদীর্ঘ রায় সংক্ষেপিত করলে দাঁড়ায়: —জজরা রায়ে বলছেন, ৭১ নং মীর্জাপুর স্ট্রীট ও সরস্বতী প্রেস হচ্ছে মলকেন্দ্র, যেখান থেকে এই ষড়যন্ত্রের অনুপ্রেরণা এসেছে এবং যার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণ গুহ, ভূপেন দত্ত প্রভৃতি।

সরকার পক্ষ প্রায় শ'খানেক সাক্ষী দাঁড় করিয়েছিলেন। সরকারী উকিল ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সকলের চরম দণ্ড দাবি করলেন। জজরা প্রধানত পুলিশ সাক্ষী, রাজ-সাক্ষী, কয়েকজন বন্দীর স্বীকারোক্তির (যা পরে কোর্টে প্রত্যাহার করা হয়) ওপর নির্ভর করে আটজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বেআইনী অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি রাখার অভিযোগ প্রমাণিত হল বলে সিদ্ধান্ত করেন।

এই আট জনের মধ্যে ডাঃ নারায়ণ রায় ও ডাঃ ভূপাল বসুর ২০ বছর দ্বীপান্তর, সুরেন দত্ত ও রসিকলাল দাসের ১৫ বছর দ্বীপান্তর,

যতীশ ভৌমিক, অম্বিকা রায় ও অদ্বৈত দত্তর ১২ বছর দ্বীপান্তর এবং রোহিণী অধিকারীর ১০ বছর দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়।

পরে এই মামলায় আপীল হয়, তাতে ডাঃ রায় ও ডাঃ বসুর ১৫ বছর, সুরেন দত্তর ১২ বছর, রোহিণী অধিকারীর ৫ বছর ও যতীশ ভৌমিকের ২ বছর কারাদণ্ড বহাল থাকে। রসিক দাস, অম্বিকা রায় ও অদ্বৈত দত্ত ছাড়া পান। এবং ছাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গে জেল-গেটেই গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে আটক থাকেন।

যাঁদের নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়নি, অথচ তাঁদের মধ্যে যাঁরা অল্পবিস্তর ডালহৌসি স্কোয়ার সম্পর্কিত ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু এই কেসে পড়েন নি, তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম মনে পড়ছে, তাঁরা হলেন—কমলা দাশগুপ্ত, সুধীর ঘোষ, মনোরঞ্জন রায়, সুধী প্রধান, সুধীর সেন, ময়মনসিংহের মহেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, গোবিন্দলাল ব্যানার্জী এবং শিবশঙ্কর মিত্র।

ডালহৌসি স্কোয়ার ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত ঘটনাবলী সেদিন দেশে অনেকখানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। দুজন বিশিষ্ট ডাক্তার, আর একজন ডাক্তার নারায়ণ রায়, বিশিষ্ট নাগরিক ও কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণী, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রভৃতি এ সমস্ত ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িত থাকায় এই কেসটির মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল। বিপ্লব-প্রচেষ্টার শিকড় যে কিভাবে নানাদিকে দেশের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল, এসব ঘটনায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

সার্থকতার সাধারণ মাপকাঠিতে এসব ঘটনার ফলাফল হয়তো তেমন কিছু মনে হবেনা, কিন্তু সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোর যথাযথ স্থান ও মূল্য নিশ্চয়ই আছে। প্রচেষ্টার ব্যাপকতায়, পুলিশের অত্যাচার ও অমানুষিক নির্মমতায়, বহু দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে এবং কয়েকটি তরুণ জীবনের আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে ডালহৌসি ষড়যন্ত্র মামলা স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে

একটি দুঃখবরণ ও দুঃসাহসিকতায় সমুজ্জ্বল, রক্তমাখা অধ্যায়রূপে স্থান লাভ করেছে।

শহীদ অনুজাচরণ সেন

রসিকলাল দাস

[যুগান্তর দলের বিশিষ্ট নেতা। বিশেষ করে ডালহৌসী স্কোয়ার মামলায় তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে পরলোকগত।]

দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে যে সব আত্মভোলা তরুণ-প্রাণ স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মাহুতি দেবার জন্য বিপ্লববহ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, অনুজাচরণ সেন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটি গ্রামের বিমলাচরণ সেনের পুত্র অনুজাচরণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৩১২ সালের ৭ই আষাঢ় ইং ১৯০৫ সালের জুন মাসে। বাল্যে লেখাপড়া করতেন তিনি পিতার কর্মস্থান কলকাতায়। স্কুল জীবনের শেষের দিকে তিনি স্বগ্রাম সেনহাটির স্কুলে গিয়ে ভর্তি হন।

সেনহাটিতে তখন যুগান্তর বিপ্লবীদলের সংগঠন দৃঢ়ভিত্তিতে দানা বেঁধে উঠেছে। মহৎপ্রাণ সংস্বভাবের যুবকগণ একে একে এসে তাতে যোগ দিচ্ছে, আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছে। অনুজাচরণেরও সেই দলে যোগ দিতে বিলম্ব ঘটল না। এই দলের ছেলেরা তখন নিয়মিত শারীরিক ব্যায়ামচর্চা, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও উচ্চ আদর্শমূলক বইপত্র সংগ্রহ করে নিজেদের মধ্যে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা এবং আলোচনা বৈঠকের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বৈপ্লবিক জীবনের প্রস্তুতির কাজে উৎসাহের সঙ্গে আত্মনিয়োগ

করেছে। এ ছাড়া, মহৎপ্রাণের যা স্বভাব, দরিদ্র দুঃস্থদের নানাভাবে সাহায্য ও রোগীর সেবার কাজেও গ্রামের মধ্যে তারা অগ্রণী।

কোন পাড়ায় কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী লাগলে মন যখন ভয়ে আড়ষ্ট, এই দলের ছেলেরা তখন রোগীর সেবার জন্য এগিয়ে গিয়ে লোকের মনে ভরসা জুগিয়েছে, সাহস সঞ্চার করেছে। অনুজাচরণও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে রাতের পর রাত অকাতরে রোগীর সেবা করে সেই অল্প বয়সেই তাঁর মহৎপ্রাণের পরিচয় দিয়েছেন।

এরপর তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। এখানে বৃহত্তর বৈপ্লবিক পরিবেশে এসে তাঁর আত্মপ্রস্তুতিও সম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলল। তাঁর অমায়িক মধুর স্বভাবের গুণে ও আকর্ষণে তাঁর পুরনো এবং নতুন পরিচিত বন্ধুদের অনেকেই বিপ্লবী দলে এসে ভিড়তে লাগলেন। এই সময়ে তাঁর সংগঠনী শক্তির পরিচয় দলের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৯২৪ সালে তাঁকে রংপুর জেলার গাইবান্ধায় পাঠানো হয় সংগঠনের কাজে। সেখানে তিনি বছর দুই ছিলেন এবং সেই সময়ে তিনি গাইবান্ধার যুবকদের মনে যে দেশাত্মবোধের বীজ বপন করেছিলেন, তারই পরিণতিতে পরবর্তী কালে সেখানে রাজনৈতিক কার্যকলাপের উল্লেখযোগ্য অবদান সম্ভব হয়েছিল।

সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি আবার এখানকার দলের কাজে নিজেকে সঁপে দিলেন। এই সময়ের একটি ঘটনা। একজন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী (শৈলেশ্বর বসু) টি. বি. রোগে ভুগছিলেন। একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি সেখানে একাই থাকতেন এবং নিজেই স্টোভে রান্না করে খেতেন। হঠাৎ তাঁর অসুখটা বেড়ে যায়, রক্তবমন করতে করতে উত্থানশক্তিরহিত হয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় শয্যায় পড়ে থাকেন—ছোঁয়াচে রোগ বলে কোন আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে তিনি ডেকে পাঠান নি।

খবরটা জানতে পেরে অনুজাচরণ আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর বিপ্লবী বন্ধু দীনেশ মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে পালাক্রমে

অসীম মমতায় সেই টি বি. রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। এমনি ছিল তাঁর সেবাব্রতী মহৎপ্রাণ। সেবায়, মমতায়, আন্তরিকতায়, আদর্শ নিষ্ঠায় এমনি হীরের টুকরো ছিলেন বিপ্লবীরা।

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়ে গেছে। চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে ও অন্যান্য স্থানে শত্রুর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে বিপ্লবীদের অপূর্ব বীরত্বকাহিনী এবং তরুণ তাজা প্রাণগুলির অবলীলাক্রমে নৈবেদ্যের মত উৎসর্গ করার প্রাণমাতানো খবরগুলি সারা বাংলাদেশের বিপ্লবীদের চঞ্চল করে তুলেছে।

অনুজাচরণ ও তাঁর বন্ধুদের কাছেও বিপ্লবের ডাক এল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট তখন বিপ্লবীদের কাছে মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তাকে ইহলোক থেকে চিরতরে সরিয়ে দেবার ভার পড়ল অনুজাচরণ সেন, দীনেশ মজুমদার, অতুল সেন ও শৈলেন নিয়োগীর উপর।

১৯৩০ সালের ২৫শে আগস্ট। দুপুরবেলায় সশস্ত্র চার বন্ধু ডালহৌসী স্কোয়ারে উপস্থিত। নিত্যকার মত নির্দিষ্ট সময়ে টেগার্টের গাড়ী এসে হাজির। গাড়ি লক্ষ্য করে দীনেশ প্রথমে বোমা ছোঁড়েন। গাড়ীটা থেমে যায়। অনুজাচরণ অপর দিক থেকে দ্বিতীয় বোমা নিক্ষেপ করেন। অনুজার বোমা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার পূর্বেই ফেটে যায় এবং তাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে রক্তাক্ত দেহে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কিছুদূর গিয়ে তিনি স্কোয়ারের রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়েন। অজস্র রক্তক্ষরণের ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঘটনাক্রমে টেগার্ট বেঁচে গেল বটে, কিন্তু অনুজাচরণের বুকের যে রক্তধারা সেদিন ডালহৌসী স্কোয়ারকে রঞ্জিত করেছিল, তা বৃথা যায়নি। দেখতে দেখতে সারা বাংলাদেশের বিপ্লবীদের ধমনীর রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। তাদের যেন মরণের নেশায় পেয়ে বসল, যেন 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি'। এক হাতে অস্ত্র আর এক হাতে প্রাণ নিয়ে তারা যেন শত্রুর সঙ্গে গেরিলা

যুদ্ধে মেতেছে। দীর্ঘ চারিটি বছর ধরে এই গেরিলা যুদ্ধ তারা চালিয়েছে অক্লান্তভাবে। এই স্বাধীনতা সংগ্রামে কত অমূল্যপ্রাণ বলি দিয়ে দেশ ও জাতিকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ রেখে গেছে, তা কি আমরা কখনো ভুলতে পারি?

'মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবেনা দেখা দেবতার অপার মহিমা'?

—রবীন্দ্রনাথ

শহীদ দীনেশ মজুমদার

কল্যাণী ভট্টাচার্য (দাস)

[সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে যেভাবে প্রাণ সেদিন দিয়েছে ছেলেরা। শহীদ দীনেশ মজুমদার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সেকথাই এখানে ব্যক্ত করেছেন সুভাষচন্দ্রের শিক্ষাগুরু আচার্য বেণীমাধব দাসের কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য। সম্পাদককে লেখা তাঁর একটি চিঠি এখানে হুবহু তুলে দেওয়া হল।]

নিউ দিল্লী

স্নেহের ভাই শৈলেশ—

আপনি শহীদ দীনেশ মজুমদার সম্বন্ধে কিছু লিখতে বলেছেন। নিশ্চয়ই লিখব। সেই মহান বিপ্লবীর কথা মনে হলে আনন্দ, বেদনা ও গর্বে আজো যেন মাথাটা বারবার নুয়ে আসে।

দীনেশবাবু সাত নম্বর রামমোহন রায় রোডের তেতালায় থাকতেন। আমরা থাকতাম দোতালায়। আমরা বলতে বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই। আর থাকত আমার ছোট বোন বীণা দাস।

তখন আমাদের ছাত্রী সঙ্ঘ বিরাট রূপ নিয়েছে। সুলতা কর (লেখিকা), আভা দে, সুহাসিনী গাঙ্গুলী (পুঁটু) সুহাসিনী দত্ত, কমলা দাশগুপ্ত, শান্তিসুধা ঘোষ, প্রভাতনলিনী দেবী, সুরমা মিত্র, লীলা কামলে (মারাঠি) ইত্যাদি আরো অনেকেই তখন এসে ছাত্রী সঙ্ঘকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

সেখানেও দীনেশবাবুর অবদান কম ছিল না। তিনিই আমাদের সবাইকে লাঠি খেলা শেখাতেন। একসঙ্গে এতগুলো মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া সোজা পরিশ্রমের কাজ নয়, অথচ এ ব্যাপারে কোনদিনও তাঁর এতটুকু ক্লান্তি ছিল না। শিক্ষাগুরু হিসাবে সত্যিই তিনি ছিলেন আমাদের গর্বের বস্তু।

এমনি একদিনের কথা। হঠাৎ সেদিন আমাকে দীনেশবাবু খবর দিয়ে ডেকে পাঠালেন হোস্টেলের ভিজিটার্স রুমে। বরাবরই তিনি স্বল্পভাষী। সেদিনও মাত্র সামান্য কয়েকটি কথাই তিনি বললেন। বললেন—'এবার থেকে আরো কাছে এসে কাজ করতে হবে। কেন একথা বললাম, তা দু'-একদিনের মধ্যেই বুঝতে পারবেন।'

সেদিন ঐ কথা ক'টির কোন অর্থই খুঁজে পাইনি। পেয়েছিলাম পরদিন। তারিখটা ছিল ১৯৩০ সনের ২৫শে আগস্ট। মেয়েদের নিয়ে বড়বাজার গিয়েছিলাম পিকেটিং করতে। সেখানেই শুনলাম —কিছুক্ষণ আগেই নাকি ডালহৌসী স্কোয়ারে কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের উপর বোমা পড়েছে। দীনেশবাবু ঘটনাস্থলেই আহত হয়ে ধরা পড়েছেন আর নিহত হয়েছেন বন্ধু অনুজা সেন,—নিজের হাতেই বোমা বিস্ফোরণের ফলে।

কিছুদিন আগেই আমরা রামমোহন রায় রোড ছেড়ে বালিগঞ্জের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। খবর পেয়ে আর দেরী করলাম না। সঙ্গে

সঙ্গেই পা বাড়ালাম বাড়ির দিকে। কিন্তু তার আগেই টেগার্ট বিরাট একদল পুলিশ নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেছে—আমাকে ধরবে বলে।

বাবা তখন বাড়ি ছিলেন না। ছিল বীণা। সে সঙ্গে সঙ্গেই রুখে দাঁড়াল দীপ্ত ভঙ্গীতে। বাবা বাড়ি নেই, এ অবস্থায় কাউকেই সে ভেতরে ঢুকতে দিতে রাজী নয়, তা তিনি পুলিশ কমিশনারই হোন, আর যেই হোন।

আশ্চর্য, এতবড় দুর্ধর্ষ অফিসারের মুখ থেকে আর একটি কথাও শোনা গেল না। বাবা না আসা পর্যন্ত দিব্বি তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন দলবল নিয়ে। যথাসময়ে বাবা ফিরে এলেন। তারপর সার্চ করতে গিয়ে বাড়িঘর একেবারে তছনছ। যাক, শেষ পর্যন্ত টেগার্ট সেদিন ফিরে গেলেন আমাকে না পেয়ে।

সে মামলায় দীনেশবাবুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তার প্রায় বছর দুয়েক বাদের কথা। সবে মাত্র আট মাস জেল খেটে ফিরেছি। হঠাৎ একদিন শুনলাম—দীনেশবাবু নাকি মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়েছেন। কোথায় আছেন তার কোন সন্ধান নেই।

সন্ধান পেলাম আরো কিছুদিন বাদে। তিনি তখন চন্দননগরে। সঙ্গে রয়েছেন আরো দুজন পলাতক বিপ্লবী। নলিনী দাস আর বীরেন রায়। সুলতা আর আমি অনেকদিন গিয়েছি শাঁখা পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে, কনে বউ সেজে। শ্যামনগর গিয়ে ওখান থেকে নৌকো করে ওপারে যেতাম। কোন কোন দিন আর ফেরা সম্ভব হত না। সারারাত মিটিং করে ফিরে আসতাম পরদিন ভোরে। বাবা জিজ্ঞেস করলে বলতাম—দূরের একটা স্কুলে প্রাইজ দিতে গিয়েছিলাম।

তারপর একদিন চন্দননগরে সংঘর্ষ হল। সে সংঘর্ষে দীনেশবাবুর গুলিতে ওখানকার পুলিশ কমিশনার মসিয়ে কুঁ্যা নিহত হলেন। বীরেন রায় ধরা পড়লেন। পালাতে গিয়ে নলিনী দাস বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন অন্যদিকে। দীনেশবাবু চলে এলেন কলকাতায়।

এদিকে ছাত্রীসঙ্ঘে তখন অনেক মেয়ে এসেছে। আমার মা'র প্রতিষ্ঠিত সরলা পুণ্যাশ্রমেও বেশ কিছু মেয়ে তৈরী করেছি। যখন প্রয়োজন ডাক দিলেই হয়।

টালিগঞ্জে একটা বাড়ি ঠিক করাই ছিল। একটি ঘর, আর রান্নাঘর। আশ্রমের একটি মেয়েকে জানালাম—বোন সেজে একজন পলাতক বিপ্লবীকে নিয়ে তোমাকে থাকতে হবে। তক্ষুণি সে জামা কাপড় নিয়ে চলে এল। একবারও ভাবলনা যে—কতবড় ঝুঁকি সে নিতে চলেছে।

নিজে খৃষ্টান বড়দিদি সাজলাম। প্রশ্নের উত্তরে জানালাম—ভাইয়ের যক্ষা হয়েছে। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এনেছি। সঙ্গে ছোট বোন থাকবে। পরে যখন শুনলাম—দীনেশবাবুর সত্যই যক্ষা হয়েছে, তখন যে মনে কি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম, তা ভাষায় বোঝাবার নয়।

টালিগঞ্জে বেশী দিন থাকা গেল না। এবার তাঁকে নিয়ে আসা হল মুসলমান পাড়া লেন-এ। দিনের আলোতে যাওয়ার উপায় ছিল না। যেতাম সন্ধ্যার পরে, বৌ সেজে।

তারপর হল গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্কের ব্যাপার। পার্টির প্রয়োজনে সেদিন সই জাল করে গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক থেকে সাতাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে বসেই টাইপ-সই করা —টাকা তুলে জমা রেখে যাওয়া—সব হল। দীনেশবাবুর নির্দেশে টাকাটা মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে রাখা হল। সুহাসিনী সেন একটি খাঁটি হীরে, তার কাছেই বেশী রাখা হল। ১৯৩৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ও সব গচ্ছিত টাকা এনে দিল

যাদুদার চিঠি নিয়ে তার প্রেরিত লোক এসে মাঝে মাঝে টাকা নিয়ে যেতেন। বৌদি শ্রীমতী সুধা দাসও নিজেকে বিপন্ন করে স্নেহের দাবিতে কিছু রক্ষা করেছিলেন। দীনেশবাবু বালিগঞ্জেও কিছুদিন রইলেন এখানে ওখানে। মহারাষ্ট্র দেশীয় বোন লীলা কামলে

সমস্ত শক্তি দিয়ে বিপ্লবীদলকে সমৃদ্ধ করল। দীনেশবাবুকে কি শ্রদ্ধার চোখেই না সে দেখেছিল।

অমিয়া আমার সঙ্গেই জেল থেকে বেরিয়ে এসে যোগ দিল আমাদের দলে। আবার ধরা পড়ল গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক-এর কেসে। লীলাকেও ধরল। শেষ পর্যন্ত ওকে বহিষ্কারই করে দিল বাংলা দেশ থেকে। সুলতা আটমাস জেল খাটল, আবার গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক-এর ব্যাপারে ধরা পড়ল। প্রভাতনলিনীদিকে; নিয়ে এলাম আগুনের পাশে, ধরা পড়লেন। ফিরে এসে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে অন্তিম শয্যা নিলেন। কমলা দাশগুপ্তও বাদ গেল না। তাকেও একদিন ধরে নিয়ে গেল লেডিজ হোস্টেল থেকে।

শোভারাণী বার্জ মার্ডার কেসে ধরা পড়ল—ফিরল সেই রাঁচীর পাগলাগারদ থেকে। কি যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই না ওর জীবন শেষ হল।

এমনি আরো কত মেয়েই না এল। বিভা-বনলতা-শান্তি রায় —এমনি আরো কতজন। বনলতা বিভলবার সহ ডায়োসেসন কলেজ হোস্টেলে ধরা পড়ল।

এদিকে দীনেশবাবুকে তখন রাখা হল কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের একটা বাড়ীতে। সঙ্গে রইলেন অন্য তুজন পলাতক বিপ্লবী নলিনী দাস ও জগদানন্দ রায়। দীনেশবাবুকে তখন সত্যই তুরারোগ্য রোগে ধরেছে। গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্কের সেই টাকা থেকে এক পয়সাও তিনি নিজের জন্য খরচ করতে রাজী নন। তাই ভয়ে ভয়ে নিজে থেকেই একপোয়া করে তুধের ব্যবস্থা করলাম। বীণা-কমলা তখন জেলে। মা বাবাকে লুকিয়ে টিউশানী করি। তাই থেকে তুধের ব্যবস্থা।

কতদিন গিয়ে দেখেছি জ্বরে বেহুঁশ। মাথার কাছে সাবুর বাটি পড়ে শুকিয়ে উঠেছে। একদিন গিয়ে দেখি গম্ভীর মুখ। বললেন —তুধের ব্যবস্থা আপনি করেছেন? আমার মত যেখানে যত পলাতক রয়েছে—পারবেন সবার জন্য ব্যবস্থা করতে? তা যদি

না পারেন, তাহলে কাল থেকে আর এসব আনতে যাবেন না। তারপর একটু থেমেই বললেন—সমস্ত টাকা রাঁচী গিয়ে যাদুদাকে দিয়ে আসুন।

তারপর আবার সেই কনে বৌ সেজে রাঁচী চলে গেলাম, কিন্তু যাদুদা সে টাকা গ্রহণ করলেন না। সহকর্মীকে বললেন—পুলিশের লোক বাড়ি পাহারা দিচ্ছে, এখুনি ফিরে যান। বুকে করে সেই হাজার হাজার টাকা নিয়ে ফিরে এলাম সোজা দীনেশবাবুর কাছে। তার নির্দেশে আবার সেই টাকা মেয়েদের কাছে রাখা হল ভাগ করে। দীনেশবাবুর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

একদিন সকালে বাবা দেখি উত্তেজিত। দীনেশবাবু নাকি কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সেই বাড়িতে ধরা পড়েছেন। যতক্ষণ গুলী ছিল, যুদ্ধ করেছেন, তারপর সবাই ধরা পড়েছেন একে একে। বাবা-মা সবাই সেদিন কেঁদেছিলেন দীনেশবাবুর খবর শুনে। একদিন আমিও ধরা পড়লাম। একই সঙ্গে লালবাজারে থাকি। ঝনঝনাৎ শব্দে তাঁকে কোর্টে নেওয়া হচ্ছে শুনতে পাই।

বড়দাদা অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মামুষের বাড়ির হকে গুয়ে গুয়ে ভাইয়ের জন্য মামলা চালাতেন। সে কি দুঃসহ অবস্থা তখন। আশ্রয় বলতে কিছু নেই। তবু তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্কের সেই টাকা থেকে একটি পয়সাও খরচ করা হয়নি মামলার জন্য। দীনেশবাবুই মানা করেছিলেন।

লিখতে বসে আজ কত কথাই না মনে পড়ছে। দীনেশবাবু ধরা পড়ায় আমরা মেয়েরা সেদিন সবাই কেঁদেছিলাম, ঠিক যেমন করে আপন ভাইয়ের জন্য মানুষে কাঁদে। অভাগা বহরমপুর জেল থেকে বেরিয়ে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ল। কি ভীষণ জীবন সংগ্রাম, তবু গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক-এর টাকা আগলে রেখেছিল যক্ষের মত। আমি জেল থেকে ফেরার পরে আর দেখা হল না। জীবনদীপ নিভে গেল। প্রভাত নলিনীদিকেও আর দেখতে পেলাম না।

হিজলী জেলে ছোটবোন বীণা, শান্তি ও কল্পনাকে নিয়ে এল। বীণা আমাদের ইতিহাস পড়াত। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস। সেখানেই ডেপুটি জেলার একদিন এসে বললেন—'আপনাদের দীনেশবাবুর যে আজ ফাঁসি হয়ে গেল। আগেই হত, এত বেশী জ্বর, কাল জ্বরটা একটু কমতেই আজ ভোরে শেষ করে দিল।'

বীণা, আমরা সেদিন কি মুহ্যমানই হয়ে গেলাম। দীনেশবাবুই জিতে গেলেন। বীণাও অমন করে প্রাণ দিতে চেয়েছিল, তার সে সাধ পূর্ণ হল না। আবার যেন সেই শোক নতুন করে দেখা দিল। বেদনায় বুক তার ভরে গেল। দীনেশবাবুর সহকর্মী (কমলা দাসগুপ্ত) বীণাকে রিভলবার দিয়েছিল সেই গর্বভরা মুখ মনে পড়ল। সেই রিভলবার নিয়েই বীণা কনভোকেশন হলে গভর্নরকে লক্ষ্য করে সংহার মূর্তি ধারণ করেছিল। তারজন্য দীনেশবাবুর কত গর্ব ছিল বীণাকে নিয়ে। চন্দননগরে কত কথাই না আমাকে বলেছিলেন এই নিয়ে।

যেদিন বসিরহাটে দীনেশবাবুর মর্মর মূর্তি স্থাপিত হল, সেদিন বাবার কি আগ্রহ। বারবার বলতে লাগলেন—আমি যাব, আমি যাব। তাঁর সে সাধ পূর্ণ করতে পারিনি। বাবা তখন খুবই অসুস্থ ছিলেন। তা ছাড়া গাড়িরও কোন ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি। তাই তাঁকে রেখে আমরাই সেদিন গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে এলাম সেই মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ দীনেশ মজুমদারকে। আজও শ্রদ্ধা জানাই।

—আপনাদের কল্যাণীদি

'ফাঁসির মঞ্চে কারার বেড়ে ইহারা যে চির-চেনা।
ভাবিয়াছ, কেহ শুধিবেনা এই উৎপীড়নের দেনা'?

—কাজী নজরুল ইসলাম

এরূপ মনে করার কারণ, 'আনলাইক ক্রিশ্চিয়ানস্' গান্ধীজী গোড়াতেই ধরে নিয়েছিলেন, মানুষ 'ওরিজিন্যালি গুড' (শুভবুদ্ধি নিয়েই মানুষের জন্ম)। কিন্তু, মানুষের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত এই শুভবুদ্ধিকে শয়তান আচ্ছন্ন করেছে। শয়তান আচ্ছন্ন করার ফলে শোষণ, অত্যাচার, লোভ, হীনমন্যতা মানুষের সমাজে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। এটা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। মানবতাবাদী মূল্যবোধের সাথে ঈশ্বরতত্ত্বের সংমিশ্রণের ফলেই গান্ধীজীর এরূপ বিভ্রান্তি।

যাই হোক, আমাদের মনে রাখা দরকার, বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের যুগে বিশ্বপুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদ এবং চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে প্রবেশ করেছে, তখন সমস্ত দেশে, এমনকি ঔপনিবেশিক দেশগুলিতেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে যে বুর্জোয়ারা রয়েছে, তারাও আজ আর অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়াদের মতন বিপ্লবী নয়। তাই, যদিও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে এই জাতীয় বুর্জোয়ারা অনেক সময় থাকবে, একই সাথে তারা আবার বিপ্লবভীতির জন্য সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপোষরফা করবে এবং এদের হাতে এ যুগে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা স্বাধীনতা আন্দোলন তার নির্ধারিত লক্ষ্য (logical culmination) পৌঁছুতে পারবে না। ফলে, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে বুর্জোয়া, শ্রেণীর এই যে অস্থিরতা—অর্থাৎ, কখনও সে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করছে, আবার তার বিরুদ্ধে লড়াই করছে; কখনও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলছে, আবার তার সঙ্গে আপোষ করছে; এই সে লড়াইয়ের ময়দানে নামছে, আবার এই পিছন দরজা দিয়ে 'ডায়ালগ' (dialogue) করছে, আপোষ করছে, কখনও জনগণের সঙ্গে থেকে তাদের 'র‍্যাডিকাল' (radical) স্লোগানগুলোকে সমর্থন করছে, কখনও সরাসরি তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে—বিশ্ব প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াশ্রেণীর অংশ হিসাবে তার এই অস্থিরতা (instability) এবং দুমুখো নীতিকে পরাস্ত (paralyse) করে যদি শ্রমিক-

শ্রেণী নেতৃত্ব দিতে পারে, তবেই এ যুগে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন তার যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে।

তা না হলে এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া দেশগুলোতে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন যদি সফলও হয়, তাহলে সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্ধপথে সমাপ্ত হবে, স্বাধীনতাও আসবে, অথচ স্বাধীনতার যে মূল লক্ষ্য তা অর্জিত হবে না, সাম্রাজ্যবাদী গোলামীর নাগপাশ থেকে দেশকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা সম্ভব হবে না এবং সামন্ততন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করে কৃষিঅর্থনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা যাবে না। তাই এ যুগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলিকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে—প্রথমতঃ, এগুলোকে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্গ মনে রাখতে হবে; দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এগুলোকে সফল করার চেষ্টা করতে হবে।

* এস. ইউ. সি. আই. দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনক্রমে কমরেড ঘোষের বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা থেকে সনতারিখ সহকারে সংগৃহীত।

"…If to die, don't die begging, don't die humiliating yourself, when to die, die with honour and you have got only one surest way to live and die with honour, that is, taking active part in revolutionary struggle of the masses in bringing about a revolutionary transformation of the society…."

(Tasks Ahead of the Students and Youths)

অগ্নিযুগ

[কবি সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কদের দৃষ্টিতে]

'Spread ideas—go from village—to village from door to door, then only there will be real work—go to hell yourself—buy salvation for others. There is no Mukti on earth to call my own.'

—Swami Vivekananda

ওরা আসে বিপ্লবের ধ্বজা হাতে

অধ্যাপক হরীশ দেবনাথ

রাতে পেঁচকের শব্দ দিনে কুকুরের ডাক
পাতাল গহ্বর থেকে অসুরের পৃথিবীতে আসে ;
ফুলের কুঁড়িরা ঝরে যায়—কোয়েল শ্যামারা ভোলে গান
বসন্ত আসতে গিয়ে শীতের ক্রোড়েতে মুখ ঢাকে।
বাতাস মন্থর হয় ক্রমেই বাধার ভার বয়ে
আকাশের নক্ষত্র শুধু চেয়ে থাকে বিমূঢ় বিস্ময়ে

ওরা চোখে স্বপ্ন আর বক্ষে বহ্নি নিয়ে
এ আতঙ্ক পাণ্ডুর ছায়ায় অমৃত পুত্রের জন্ম নেয়,
মৃত্যুপুরী অন্ধকার থেকে আলোকের রশ্মি গায়ে মেখে
নাচিতে নাচিতে মত্ত সচকিত পুলকিত করে চতুর্দিক।
পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন হয়, শোষণ শাসন দণ্ড
ভেঙে পড়ে, দাসত্বের অবসান—মুক্তি নারী নরের।
শিশু নব কিশোরের কচি ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে,
বালকের লাল চক্ষে ফুর্তির বিজলী খেলা করে।
বুকের সমুদ্র পারে ভেসে ওঠে জীবন জাহাজ,
প্রকৃতির মানুষের যেন এক নবজন্ম—নবীন সমাজ।
প্রতিটি লোক আর জনতা বয়ে নিয়ে আসে
যৌবনের আহ্বান—বাক্ কর্ম চিন্তা স্বাধীনতা
বিবেকবোধসম্পন্ন সাম্যসংস্থা দিন
শান্তি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না প্লাবী রাত্রির গরিমা।
যুগে যুগে ওরা আসে সম্রাটের, শোষকের, অসুরের
মৃত্যুবাণ বিপ্লববাদের ধ্বজা হাতে
গৃহে গৃহে শোষিতের প্রাণে প্রাণে আগুন জ্বেলে দিতে।

বাবার কথার পাশে লগ্নভ্রষ্ট ধ্রুবতারা

রামসিংহাসন মাহাতো

একদিন বাবার কাছে শুনেছিলাম—তাঁদের সময় নাকি
বুকের সমস্ত ভয়ার্ত শব্দ, অন্ধকার আঁতুড়েই
ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিত দুরন্ত ছেলেরা ;
একবুক প্রতিজ্ঞা নিয়ে—লাইনের ধারে
সময়কে উড়িয়ে দিত বৃদ্ধ আকাশের বুকে।
আর নাকি রাত-বিরেতে পাহাড়ের ধাপে ধাপে
জমে থাকা প্রতিবাদী জঞ্জাল সরিয়ে
রাস্তা খুঁজতো আকাশের চাঁদ— আড়ষ্ট স্বাধীনতা।
শুনেছিলাম জলের তলার রাঙা মাটি, আর
মুক্তো খুঁজতে ডুবুরীরা ডুব দিত নীল রক্তের সমুদ্রে ;
তাই নক্ষত্ররাও চমকে যেত পলাশের পাপড়ি মেলার শব্দে।

কাঁচের ভাঙাচোরা স্তূপে দাঁড়িয়ে
আমি বিশ্বাস করিনি এইসব—
তারপর কত রাত ভোর হয়ে গেছে, সূর্য উঠেছে কতবার.
বাবাও কোনো একদিন হারিয়ে গেলেন নতুন পথ খুঁজতে খুঁজতে…

আমি শুধু আজও সূর্যাস্তের সময় দেখতে পাই,
ব্যস্ত সময়ের বেড়া টপকিয়ে
বেরিয়ে পড়েছে কিছু সন্ধানী মানুষ।
ক্লাসে ইতিহাসের পাতা ওল্টাতেই
চোখে পড়ে রক্তের ফোঁটা ফোঁটা কালচে দাগ—

মনে হল গল্পটা তাহলে মিথ্যে নয়।
কেননা আমি এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি
বাবার গল্পের সমস্ত নায়কেরা মিছিল করে এগিয়ে যাচ্ছে
কোনো এক লগ্নভ্রষ্ট ধ্রুবতারার দিকে।

তার পরিচয়

[ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লচাকী স্মরণে]

নীরদ রায়

তার পরিচয় তারই মতো, আমরা জানি স্বাধীনতা
রক্তশূন্য শব্দের তপস্যার ফসল—কাঁড়া কবিতা
নিরক্ষায় অন্ধকার প্রদেশে বিজয়ী আলোর মিছিল
তার পরিচয় তারই মতো, আমরা জানি স্বাধীনতা,
কুয়াশাময় রাস্তায় আগুন জ্বেলে দূরে দেখা সকালের পানে
সমস্ত প্রাণের তাদের গলাটিপে—'ক্ষুদিরামে'র
নির্দিষ্ট লক্ষ্যভেদী চোখ—চোখের দু-ধারে বিস্তীর্ণ আকালে
বন্ধ্যা সনাতনী আকাশের বুক চিরে উথলে ওঠা প্রতিশোধী আগুন,
শুধু অর্থহীন স্বভাবী ফেস্টুনে নয়—বরঞ্চ
চাই রক্তের বদলে আরো জমাট রক্ত—
তার পরিচয় তারই মতো আমরা জানি স্বাধীনতা,
উচ্ছল ঝরনার দিকে পায়ে পায়ে ছুটে যাওয়া অর্থবহ দিন—
স্পষ্টতর গোলাপের স্বপ্ন 'প্রফুল্লচাকী'র মতো মুহূর্তে মৃত্যুকে
তুড়ি মেরে জয় করা, শুধু প্রাণহীন জালের চৌবাচ্চার জলের
যন্ত্রণায় নয়—নয় সার্কাসের খাঁচায় বন্দী বৃদ্ধ সিংহের
ভয়ার্ত গর্জনে—বরং অনেক দুর্ভোগ দুশ্চিন্তা কাটিয়ে সারিবদ্ধ
পাখীদের ঘরে ফেরা অনাবিল আনন্দ উল্লাসে—:
তার পরিচয় তারই মতো, আমরা জানি স্বাধীনতা।

জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তশপথ

সলিল লাহিড়ী

বরফ গলে নদী, রুক্ষ মাটি শ্যামল করে।
মনকে ভাসায়—সবুজ প্রাণের দীপ্তি আনে।
রক্ত ঝরেই বন্ধ্যামাটি প্রাণকে জাগায়,
স্পর্দ্ধা আনে পরাধীনের শিকল ভাঙার।
স্বাধীনতার খোলা বাতাস স্পর্শ করে—
গর্বভরে যখন তাকাই তৃপ্ত চোখে,
স্পর্দ্ধিত সব অঙ্গীকারের রক্তঝরা অমৃত প্রাণ,
স্মৃতির পাতায় সূর্য্য হয়ে ঝলসে ওঠে।
বীর শহীদের রক্তঝরা জালিয়ানওয়ালার পুণ্যভূমি,
তোমায় আমি সেলাম করি, সেলাম করে ধন্য আমি॥

বন্দী প্রাণের স্পর্দ্ধা থেকেই রক্ত ঝরে।
রক্ত ঝরেই রক্তচূড়ায় রাঙা আকাশ। কণ্ঠ যখন
নীরব থাকে, শাসন ভয়ের শঙ্ক ত্রাসে,
সমুদ্রেরি ঝঞ্ঝা—তুফান, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে—
বুকের মাঝে সত্যি হবার স্পর্দ্ধা নিয়ে উঁকি মারে
এমনি বেলায় সময় আসে—শিকল ভাঙার,
উনিশ শ—সেই উনিশ সালের তপ্ত বেলায়
এপ্রিলেরি তেরই যখন জালিয়ানের রুক্ষ মাটি
কঠিন হয়ে, কঠোরভাবে স্পর্শ করে॥

সেই তো সুরু শঙ্কা ভাঙার। রক্তে তখন উদ্বেলিত
ঘৃণার পাহাড়। পঁচিশ-হাজার গুপ্ত-বারুদ ধূম্রায়িত জ্বালামুখি।
পরাধীনের ঘৃণ্য জ্বালায় ঝলসে ওঠে, স্ফূর্ত্ত আগুন চল্‌কে পড়ে।
উন্মিষিত কণ্ঠ তখন ভারত হয়ে ভরে আকাশ।

প্রাণকে যখন তুচ্ছ করে কণ্ঠ জাগে, তূর্য্যনাদে,
জালিওয়ানের রুক্ষ প্রাচীর তুচ্ছ তখন।
শঙ্কা-ত্রাসের বিভীষিকাও ধূলো হয়ে শূণ্যে মিলায়।
বুকের আগুন ভরল আকাশ, দেদিপ্য এক দৃপ্ত আভায়।
সেই আগুনে রাজার জাতের ঠুনকো সাহস ক্লিন্ন হল।
সভ্যতারি মুখোশ খুলে জাগল পশু,—
হিংস্র ডায়ার হাঙ্গর হয়ে ভারতেরি রক্ত ঝরায়॥

রক্ত ঝরেই বন্ধ্যা-মাটির স্পর্দ্ধা জাগে।
রক্ত টিকায় সিংহশিশুর বুকে জ্বলে একটি আগুন।
ধীরে ধীরে সেই আগুনই বজ্র হল, একুশ বছর ক্রান্ত করে,
উধম সিং-এর কঠিন কঠোর মূর্তি ধরে,
উনিশ-শ-সেই চল্লিশেতে সাগরপারে, সন্ধ্যাবেলায়।
সূর্য্য তখন অস্তমুখী। ক্যাক্সটনেরই বিলেত-সভা।
সমাগত রাজার সেবক, হাজার মানুষ।
হাঙ্গর-মুখী ডায়ার তাদের গর্বিত এক মধ্যমণি।
মার্চ-মাসেরই তেরই তখন শেষ বিকেলের রক্ত-ছড়ায়।
এমনি সময় বজ্রনাদ উঠল জেগে। চকিত-ঝলক
সিংহ তখন গর্জে ওঠে, উধম-সিং-এর গুলির প্রখর ঝনৎকারে।
রক্তধারায় হিংস্র ডায়ার নতজানু মাটির কাছে।
রক্ত নিয়েই বজ্র তখন রক্তঝরার দুঃখ মোছায়॥

রক্তঝরে এমনি করেই বন্ধ্যামাটির স্পর্দ্ধা জাগে,
রক্তমেখেই ভারত জাগে শিকল ভাঙার শপথ নিয়ে।
সেই শপথের রক্তধারায় জালিয়ানওয়ালা তীর্থভূমি,
তোমায় আমি সেলাম করি, সেলাম করে ধন্য আমি॥

বিনয় বাদল দীনেশ

সুশান্ত আচার্য

তোমাদের ভাবলেই আমার সামনে সেই
গোটা পৃথিবীটা চলে আসে—যার
সারা দেহের বিষাক্ত ঘা শুকোয় নি এখনো,
বিশ্বাস করো এ নিয়ে পদ্য লেখার
ইচ্ছে ছিল না কোনদিন।

তোমাদের চিঠিগুলো স্মৃতি বিস্মৃতির মেঘের আড়ালে
যেন এক ঝাঁক ঘোলাটে ঈগল।
কি এমন ভালবাসা—যার জন্য
সর্বত্যাগী হওয়া যায়, ত্যাগের মহিমা জানো?
বৈরাগ্য কাকে বলে? সে কি চরম ভোগের
পরবর্তী নির্বেদ উপদ্বীপ? এই সব ভাবলেই
জীবনের নীল মর্ত্ততায় ছিঁড়ে যায়
পৃথিবীর যাবতীয় রোমশ উচ্ছ্বাস।

ক্ষুদের বুকে উদ্দাম যৌবন—সমুদ্রের উন্মাদ ঢেউ
কাল বোশেখের পর আনন্দের পাগল করা সকাল
ওদেরো ত এখানে মিছিল করে আসার কথা ছিল।

তোমাদের ইচ্ছেরা দূরের নক্ষত্রের দিকে
পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে যাচ্ছে যেন উন্মত্ত শকুন।
আমাদের উঠোনে এখন অনুকম্পা ঝিঁঝি
রাহুগ্রস্ত চাঁদ কালো জামা গায়ে হাজির হয়েছে
ভালো করে ভাবাও হয়নি—এই চাঁদ
কি ভাবে পাওয়ার কথা ছিল—কি ভাবে পেলাম
আমরা শুধু অবিচারের প্রতারিত নকল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

সেই অসামান্য রমণী, মৃত্যুকে কতদূর ফেলে যায়

[প্রীতিলতা স্মরণে]

অধ্যাপিকা তৃপ্তি চক্রবর্তী

সে সব আশ্চর্য দিন ছিল,
যখন জন্মভূমি উচ্চারণেই
বুকের মধ্যে ঝলসে যেত তীব্র নীল রেখা।
দেশ বললেই
ঋতুরা পবিত্র হয়ে সারাদেশে বয়ে যেত,
আকাশ থেকে ঝক ময়ূরের মত
ঝরে পড়তো রৌদ্র বিন্দু ॥
তখন
অবিচ্ছিন্ন বন্দনায় সূর্য প্রণাম জানাতো
এক দলবদ্ধ মানব মানবী।
সেই দিনমান সূর্য আর কিছু নয়
উচ্ছ্বসিত স্বাধীনতা —
সেই দলবদ্ধ মানব মানবী,—এক দীর্ঘতর রৌদ্রের মিছিল ॥

যখন ঋতুরা বড় পবিত্র ছিল,
ধ্রুবতারার নিশ্চিন্ত চাহনী ছিল,
তখনই পদ্মপাতা, শাপলার লতা ছিঁড়ে
প্রীতিলতার রাইফেল কি যে কঠিন ধমকে বেজে যায়
বেজে যায় আসমুদ্র হিমাচলে ॥
লক্ষ্মীর পায়ের পাতা, ধানছড়া আঁকা নরম উঠোন,
অথবা সমুদ্র পর্বত ঘেরা চট্টল, তখুনি মিশে যায়
স্পেন, গ্রীস, আফ্রিকার, রক্তাক্ত মাটিতে ॥

নীলবিষ হওয়া সেই অসামান্য রমনী শরীর,
মৃত্যুকে কতদূর ফেলে যায়।
আকাশের সব আলো, বাতাসের প্রাণবার্ত্তা,
নিশ্চিত ধ্রুবতারার প্রতিজ্ঞায়,—
উচ্চারিত হয়— স্বাধীনতা
বিবস্বান সূর্য্যের প্রণাম ॥

বাতাসে বারুদের গন্ধ

[মাষ্টারদা স্মরণে]

স্বপন মজুমদার

দিন যায় রাত আসে আবার
আবার ফিরে আসে রক্তিম সকাল
মুষ্টিবদ্ধ একতারে বলিষ্ঠ ফসল
তার কাঁধে ভর দিয়ে চরম আবেস এনে
বড় কষ্ট হয় মাষ্টার দা—তখন,
এ জন্যই কি তোমার ডাকে
আকাশে বাতাসে বারুদের তাজা গন্ধ ভেসে এসেছিল ?
শৌর্য-বীর্যভরা ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলে।

হয়তো তারপরই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যেতো
অনুভব করা যেতো উর্বর নক্ষত্রের আলো—
অথচ জানিনি তখন কিছু কিছু দুঃখের বীজ
এখানে ওখানে বোনা হয়েছিল রক্তাক্ত হৃদয়কে অন্ধকার রেখে—

এখন আবার সেই অমানবিক সময় মাষ্টারদা
সর্বত্র অপুষ্টি জনিত চিৎকার
মনুষ্যত্বের অধিকার স্বাভাবিক স্বীকৃতি চায়
আবার সেই রক্তিম সকাল সংঘবদ্ধ হওয়ার মিছিল
তাই, আজ তোমাকে বড় প্রয়োজন মাষ্টারদা
অনাবিল স্বপ্নের সময়
হারিয়ে যায় না যেন কোন কালেও।

রক্তাক্ত গোলাপ

শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা স্মরণে

হরি চৌধুরী

যখন তুমি ভারতবর্ষের নরম মাটিতে ধুলোমাখা
স্বপ্নের কাঁধে হাত রেখে আপোষহীন আন্দোলনের নখরে
অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর ইস্পাত মুঠিতে
মেদিনীয়ার নীলরক্তে হোলি খেলো।
ঝলসে ওঠা আলোর তরঙ্গ এক একটি লক্ষ্য ভেদে
অনর্গল সরিয়েছো পরাধীনতার শৃঙ্খল,
আর তখনই কিছু অনুভূতিহীন দুঃস্বপ্নের কাক
হঠাৎ ই ডেকে উঠেছিল কিছু পরগাছা রাজার স্বার্থে
নৃত্য করেছিল এখানে সেখানে
অথচ চারপাশে চড়াই উৎরাই পেরিয়ে
মেঘাচ্ছন্ন আকাশ-টাকে পেছনে ফেলে

দু-হাতে সূর্যকে ছুঁয়ে
বুকের রক্তে ভেঙেছো অহরহ শৃঙ্খলিত মায়ের পায়ের শেকল
অন্ধকার পাগড়ীতে মুখ ঢেকে গোল চোখ কপালে তুলে
নিষ্কলুষ গোলাপের টুটি চেপে যারা খুঁজে বেড়াচ্ছিল
তরুণের তাজা রক্ত
তুমি তো তখন তাদের মুখে রুখে দাঁড়াবার মতো
সন্ত্রাসী ঝড় নীড় ভাঙা পাখীকে ঘরে ফেরার মতো
বিবাগী গান তাইতো স্বাধীনতা পাশাপাশি
নবীন প্রভাত উদয়ের পথে রক্তাক্ত গোলাপে
আজো তুমি উজ্জ্বল অনুভবে বেঁচে আছো।

নেতাজী, ফিরে এসো

শ্রীকান্ত

নেতাজী, তুমি ফিরে এসো
শত সহস্র হতভাগ্যের চোখের জলে
অসহায় মানুষের বেদনাহত দৃষ্টি
তোমার স্বপ্নের দেশ, ভারত গো
এখনো সুপ্ত ফল্গুর মত বয়ে চলে দুঃখের সাগরে

নেতাজী, একবার ফিরে এসো।

দেশের ঘরে, আমাদের আঙিনায়
ত্রিশ বছরের মানুষটার চোখে বিভীষিকা
অসহ্য দুর্বিনীত যন্ত্রণার বিবরে
শীর্ণ শিশুর ঠোঁটে অব্যক্ত ব্যথা
অপুষ্ট জননীর চাতক জিজ্ঞাসা
স্বপ্নাতুর যুবক যুবতীর চোখে আতঙ্কের সুবিস্তীর্ণ ছায়া
জীবনের আলপথে শোষণের লৌহ সাঁড়াশিতে
দুর্গত মানুষের আর্ত ক্রন্দন
আমরা সব দিকহারা যাত্রী, পতনোন্মুখ

তুমি কি পার না, নেতাজী
একবার ফিরে আসতে, শুধু একবার আমাদের কাছে
আমরা, যারা তোমায় দেখিনি
তাদের মুখে উজ্জ্বল হাসি ফোটাতে
রোগগ্রস্ত দেহে নতুন করে প্রাণ দিতে
দেখবে
আমরা তো আবার বেঁচে উঠতে পারি পরিচ্ছন্ন তাজা রক্তে

শহীদ স্মরণে

অধ্যাপিকা ব্রততী ঘোষ রায়

সীমান্তে পাহারা ভেঙ্গে চুরমার
রেণুরেণু হয়ে যায়, কারার প্রাচীর,
হাতের শিকল ভেঙ্গে খান খান॥
রক্তে আগুন জ্বলে, ধমনীতে তীব্র বিষ জ্বালা,
প্রতিদিন প্রতিরাত সে কিশোর কি বিষম বিষাণ বাজায়!

সুতীক্ষ্ণ হ্রেষা রবে সে এক বিজয়ী অশ্ব
পার হয় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নীল নদ, আমাজন গঙ্গার
দুরন্ত কল্লোল।
মেকং-মেচির তটে কে আজো সযত্নে বোনে
ঘাসের শিকড়ে ভালোবাসা?
কার বুকে ফুল ছিল? অথবা সে ফুলের কোরক?
সে কোরক তীব্র মধু তীব্র বর্ণ বুকে ভরে
কখন আগুন জ্বায় পলাশের বনে?

গৃহস্থ কূজন ছিল, ছায়া মাখা পুকুরের জল
কোথায় যে ছুঁড়ে দিল সে কিশোর বিষম কৌতুকে।
এখন দুহাতে তার রুক্ষ দিন চারপ্রান্তে রক্তরেখা আঁকা,
সূর্য্যের সংলাপে ভরা কঠিন ক্যানভাস, মৃত্যুর রঙিন ঝুমঝুমি॥

জীবন তো জীবন ছাড়িয়ে চলে যায়।
প্রাণের গভীরে থাকে প্রাণ, প্রাণের প্রত্যেক বিন্দু
অলক্ষ্যে অদৃশ্যে বোনে প্রাণ বীজ,
প্রাণের মিছিলে ঢালে প্রাণরেখা, প্রতিদিন প্রতিরাতে
বিষম বিষাণে কাঁপে জলতল, নদীতীর,
অরণ্য পর্ব্বত প্রাণবায়ু॥

সিপাহী বিদ্রোহ না বিপ্লব?

সত্যেন চৌধুরী

ভারতমন্দিরে বঙ্গ প্রতিমার সামনে বীরাচারের মঙ্গলঘট স্থাপন করেছিলেন মঙ্গল পাণ্ডে ১৮৫৭ সালে। শৌর্যসাধন ভূমি বাংলা-দেশের শৌর্য্যের প্রজ্বলিত আভায় মঙ্গল পাণ্ডে একটি রূপ দেখতে পেলেন। যে রূপে রয়েছে—

"লোহার চাইতে বেশী শক্ত
ভক্ত বীরের মাংস রক্ত
তাদের বুকের অস্থি দিয়া
বজ্র তৈরী হয়" (গোবিন্দ দাস)

এই ভক্ত বীরের কাছে দেশ হচ্ছে "মা". তার কাছে দেশের অকল্যাণকারীর সঙ্গে সংগ্রাম বিদ্রোহ নয়—তা হচ্ছে বিপ্লব শাশ্বত ভারত চিন্তায় ভাবিত মানুষ মাত্রেই তা জানেন

আমরা যারা বিদ্যার্থী, 'সিপাহী বিদ্রোহ' সম্বন্ধে পাই—ইংরেজের যে সমস্ত সেনাবাহিনী ছিল, তন্মধ্যে বেঙ্গল আর্মির স্থান ছিল সকলের ওপরে। এই আর্মিকে বৃটিশ তাদের জাতীয় স্বার্থে পৃথিবীর যে কোন দেশে পাঠাতে পারতো না লর্ড ক্যানিং বড়লাট হওয়ার পর আদেশ হল, অন্যান্য আর্মির মত প্রয়োজনে এই দলকেও সর্বদেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এতে বেঙ্গল আর্মি হল বিক্ষুব্ধ. কিন্তু তারা তখন কিছুই প্রকাশ করল না।

প্রকাশিত হল সেদিন, যেদিন চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুরের

পদাতিক বাহিনীর ৩৪ নম্বরের রেজিমেণ্ট-এর তেওয়ারী এবং ১৮ নম্বর রেজিমেণ্ট-এর মঙ্গল পাণ্ডে শুনতে পেলেন,—বন্দুকে যে কার্তুজ বা টোটা তাঁরা ব্যবহার করেন, সেই টোটার ওপরের একটা কাগজ, যা অত্যন্ত শক্ত করে আঁটা থাকে, এবং যে কাগজ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে বন্দুকে টোটা ভরতি করে থাকেন, সেই কাগজটি শক্ত করার জন্য গরু ও শুকরের চর্বি দেওয়া হত। এখানে ইংরেজের এক অপকৌশল ছিল। একরকম চর্বি দিলে যেখানে কাজ হয়, সেখানে দু'রকম চর্বি দেওয়ার কারণ হচ্ছে, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই যাতে জব্দ হয়।

গোলা-বারুদের কারখানার কর্মী রামধারীর কাছে এই কথা শোনার পর মঙ্গল পাণ্ডে বজ্রের মত ফেটে পড়লেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান সমস্ত সিপাহীদের বললেন, "আমাদের কাছে পর পর অনেক খবর এসেছে। স্থির হয়েছে, আমাদের মুক্তি সংগ্রামে নামতে হবে। ইংরেজদের ভারতভূমি থেকে বহিষ্কার করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত বিদেশী দখলকারী এদেশ থেকে না চলে যায়, ততদিন সংগ্রাম চলবে এবং এই সংগ্রাম হবে সশস্ত্র। তোমরা সকলে প্রস্তুত থাকবে—দিন অতি নিকটে। আমাদের একতা আছে—তার প্রমাণ স্বরূপ তোমরা আজ প্যারেডে যাওয়া বন্ধ করবে। কেউ যাবে না।" কোন সিপাহী গেল না প্যারেডে।

ভারতবর্ষের সর্বত্র এই খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্র সিপাহী বিদ্রোহ আলোচনায় লিখল "বিষ্ণু এবং মহম্মদের সেবকদিগকে উচিত শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহারা যেমন পশু, আমরা তাহাদিগকে পশুর ন্যায়ই বধ করিব।" বাংলা-দেশের সংবাদ প্রভাকরেও এ খবর পাওয়া গেল।

ইংরেজ শাসক ভয় পেয়ে বলল, "কার্তুজে কোন প্রকার চর্বি থাকে না। যদি ইচ্ছে না হয়, তবে দাঁত দিয়ে কার্তুজের কাগজ না ছিঁড়ে হাত দিয়ে ছিঁড়ে বন্দুকে পরালেই তো পারে।" এতে সিপাহীদের মনে অবিশ্বাস ও ক্ষোভ আরো তীব্র ভাবে দেখা দিল।

ইংরেজগণ বুঝতে পারল, এসব কথায় কাজ হবে না। তারা ১৯ ও ৩৪ নম্বরের পদাতিক বাহিনী ভেঙ্গে দেবে স্থির করল, কিন্তু সেটা আর সম্ভব হল না। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের বহু সহরে সিপাহীদের মধ্যে সংগ্রামের প্রস্তুতি চলছিল।

১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে চির অম্লান ঐতিহাসিক দিন স্থাপন করলেন বীর বিপ্লবী মঙ্গল পাণ্ডে। মঙ্গল পাণ্ডে নিজের বন্দুকে টোটা পূর্ণ করে নিলেন, পাশে আছেন ৩৪ নম্বর রেজিমেন্টের সিপাহী তেওয়ারী। ময়দানে গিয়ে মঙ্গল পাণ্ডে সিপাহীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আজ থেকে তোমরা তোমাদের মিলিত শক্তি দিয়ে ইংরেজদের আঘাত কর, ইংরেজের শক্তি চূর্ণ কর।" মঙ্গল পাণ্ডের তেজোদৃপ্ত ঘোষণা শুনে রেজিমেন্টের সকল সিপাহীগণ কি এক মন্ত্র বলে স্থির হয়ে গেল।

পদাতিক বাহিনীর মেজর হগ্‌সন এই অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখে কালবিলম্ব না করে আদেশ দিলেন, মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু সে আদেশ একজনও গ্রহণ করলেন না। মেজর হগ্‌সন্‌ ক্ষিপ্ত হয়ে অন্য কিছু চেষ্টা করার পূর্বেই পাণ্ডে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি নিক্ষেপ করলেন।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের দেওয়া অস্ত্র তাদেরই বিরুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডের প্রতি প্রথম গুলি নিক্ষেপ করা হল।

বুলেটের আঘাতে মেজর হগ্‌সন পড়ে গেলেন। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার শুনে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে লেফটেন্যান্ট 'বাও' ক্ষিপ্ত গতিতে ঘোড়ায় চেপে মঙ্গল পাণ্ডের কাছে আসতেই মঙ্গল পাণ্ডে গুলি ছুঁড়লেন। ঘোড়া শুয়ে পড়লো, 'বাও' মাটিতে পড়ে গেলেন। তিনি কোন প্রকারে দাঁড়িয়ে উঠেই পিস্তল থেকে গুলি নিক্ষেপ করলেন কিন্তু দৈবযোগে সে গুলি মঙ্গল পাণ্ডের দেহ স্পর্শ করল না। 'বাও' তলোয়ার বার করে আক্রমণ করার পূর্বেই মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্যুৎ গতিতে নিজের তলোয়ার দিয়ে 'বাও'কে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।

অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর দেখে কর্ণেল হুইলার তৎক্ষণাৎ জেনারেল

হিয়ারস্‌কে খবর দিলেন। হিয়ারস্‌কে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ইংরেজ সৈন্য নিয়ে আসতে দেখেই মঙ্গল পাণ্ডে উপস্থিত সকল সিপাহীদের জোর গলায় বললেন, "তোমরা মাতৃভূমির জন্য জীবন দিও, ইংরেজের গোলামীর জন্য জীবন দিও না।" এ ক'টি কথা বলার পর তিনি নিজেই নিজের বুকে বন্দুকের গুলি ছুঁড়লেন। এতে তাঁর মৃত্যু হল না।

চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হলেন। এর পর ইংরেজের বিশেষ বিশেষ অফিসারগণ মঙ্গল পাণ্ডের প্রতি নানা প্রলোভন, অনুনয়, বিনয় ক'রে জিজ্ঞেস করলেন, 'মঙ্গল, তোমার এই বিদ্রোহ পরিকল্পনার মূলে কে আছে, বা কোন্ দল আছে বল।' মঙ্গল পাণ্ডে নিজের দেহ দেখিয়ে বললেন, 'এই দেহ একটু একটু করে আগুনে নিক্ষেপ করলেও তোমরা একটি কথাও বের করতে পারবে না।'

ব্রাহ্মণ্যতেজের কাছে অস্ত্র সজ্জিত ইংরেজ হেরে গেল। ইংরেজ মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসির হুকুম দিল। হুকুম তামিল করার জন্য জহ্লাদ প্রথমে পাওয়া গেল না। অবশেষে বহু চেষ্টায় জহ্লাদ পাওয়া গেল।

১৮৫৭ সালের ৮ই এপ্রিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক মঙ্গল পাণ্ডে ফাঁসির রজ্জু মায়ের দেওয়া মালা রূপে প্রথম গ্রহণ করলেন। ধীরে ধীরে বাংলার মাটি থেকে সঙ্গীত উঠলো।

"শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা অভয়া চরণে নম্র শির।
ডরিনা রক্ত ঝরিতে ঝরাতে দৃপ্ত মোরা ভক্ত বীর
আবাহন মার যুদ্ধ ঝরণে তৃপ্তি তপ্ত রক্ত ক্ষরণে
পশুবল আর অসুর নিধনে মায়ের খড়গ নাগ্র বীর
মায়ের অরাতি নাশনে পদে অঞ্জলি বাঞ্ছা পূরণ
শত্রু রক্তে মায়ের তর্পণ জবার বদলে ছিন্ন শির।"

বন্দে মাতরম্

ডঃ রমা চৌধুরী

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সত্যই গর্ব করবার বস্তু আছে অসংখ্য—তার দর্শন, তার ধর্ম, তার নীতিতত্ত্ব, তার সাহিত্য, তার শিল্পকলা এমন কি, তার প্রযুক্তি-বিদ্যা পর্যন্ত জগতে অতুলনীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, সুমহান দেশ ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, সর্বোত্তম গৌরব, সর্বাদ্ভুত মাধুর্য হল—"মাতৃভাব"। সর্বত্রই মাতৃদর্শন, সর্বত্রই মাতৃসেবা, মাতৃপূজা। এ কথা বললে কোনো-ক্রমেই অত্যুক্তি হবেনা যে, ভারতবর্ষের শাশ্বত সভ্যতা ও সংস্কৃতি, দর্শন ও ধর্ম, আদর্শ ও অনুপ্রেরণা হল এই অনুপম, অভিনব, অপরূপ, অত্যাশ্চর্য "মাতৃপ্রেম"।

কিন্তু "মাতা" [illegible] ভারতবর্ষের আরেকটি মধুরতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই সাম্যভূমি, ঐক্যভূমি, প্রীতিভূমি, মৈত্রীভূমি, ত্যাগভূমি, সেবাভূমি অনাদি কাল সমন্বয়বাদী। সেজন্য ভারতবর্ষ সর্বদা মাতৃত্রয়কে একত্রে প্রণতি নিবেদন করেছে—জগন্মাতা, গৃহমাতা, দেশমাতা—উপরে রয়েছেন সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী ষড়ৈশ্বর্যবিলাসিনী, অনন্ত-অচিন্ত্য-গুণশক্তি ধারিণী জগজ্জননী, এবং তিনিই ত স্বয়ং ভেতরে গৃহপরিবারে মূর্তি ধারণ করেছেন, গৃহজননীর কোমল মধুর, করুণাঘন সেবা ত্যাগপরায়ণ অনুপম রূপে। বাইরে বিশ্ব প্রকৃতিতে একই ভাবে প্রকটিত হয়েছেন দেশজননীর শ্যামল বরণে, [illegible], নিঃস্বার্থ প্রতিচ্ছবিতে। প্রভেদ কোথায়—সত্যই, তাকিয়ে দেখুন, এই তিনের মধ্যে বৈষম্য কোথায়? জগজ্জননী যেরূপ অনন্ত অসীম—অপরিসীম স্নেহ প্রেম দয়া মায়া—মমতা দ্বারা জীবনজগৎকে সৃষ্টি ও লালন পালন করছেন; ঠিক সেই একই ভাবে ত গৃহজননীও "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"—

এই সুপ্রসিদ্ধ ভারতবাণীর সত্যতা প্রমাণিত করে সমগ্র পরিবারের কেন্দ্রস্বরূপা, প্রাণ স্বরূপা, অনুপ্রেরণাস্বরূপা হয়ে, বহু বিবিধ বিচিত্র ব্যক্তি, পরিবেশ, ঘটনাবলীর মধ্যেও তার ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রেখে তার সুখশান্তি, সাফল্য সৌভাগ্যের চিরন্তন কারণ হচ্ছেন।

সেই একই ভাবে ত দেশজননীও অতুলমাতৃস্নেহে সন্তানগণের কল্যাণকামনায় বিস্তৃত করে' রেখেছেন তার স্বীয় স্নিগ্ধ শ্যামল বনাঞ্চল, প্রবাহিত করে রেখেছেন প্রান্তরে প্রান্তরে তাঁর অপূর্ব বাৎসল্যরসের প্রতীকস্বরূপ অসংখ্য হাস্যমোহন, নৃত্যশীল নদনদী; ধাবিত করে রেখেছেন দিগ্‌বিদিকে সর্বসন্তাপহারী শুচিশীতল বায়ুপ্রবাহ।

সত্যই প্রভেদ কোথায়? সেই একই সন্তানস্নেহ সর্বত্র, সেই একই সন্তান সেবা সর্বত্র, সেই একই সন্তানপালন সর্বত্র। সেজন্য, আপাত দৃষ্টিতে জড়-প্রকৃতিরূপা হলেও, কে দেশজননীকেও জননীরূপে পূজা ও নিবেদন করতে দ্বিধা বোধ করবেন? এই কারণেই, পরমকৃপাময়ী ভারত জননীর সন্তানসন্ততিরাও উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেন না যে—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

"জননী ও জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষাও অধিকতর গৌরবমণ্ডিতা।"

এই প্রসঙ্গে, সুবিখ্যাত অথর্ববেদের "পৃথিবী-সূক্ত" (১২।১) নামে পরিচিত মন্ত্রসমূহ অথবা শ্লোক গুচ্ছের উল্লেখ করা চলে। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে এরূপ সুললিত সুমধুর সুবিমল রচনা অতি বিরল। ভাবের সৌন্দর্যে, ভাষায় মাধুর্যে, পরিকল্পনার ঐশ্বর্যে, দৃষ্টিভঙ্গীর গাম্ভীর্যে, প্রকাশের শৌর্যে, গতির বীর্যে—এই সূক্তটি নিঃসন্দেহে তুলনাবিহীনা।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এই সুবৃহৎ সূক্ত থেকে কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করছি:

"সত্য-ন্যায়-শক্তি-আত্মদান

জ্ঞান-যজ্ঞ-নিত্য তপোবল।

ঐ পুণ্যভূমি করে ধারণ
চিরন্তন কাল অবিরল ॥
সর্বদেশের সর্বকালের
মহারাণী তিনি সুমোহিনী।
দান কর, মাতঃ দয়াময়ী
মুক্তভূমি ফলপ্রসবিনী ॥ (১২।১।১)

এই মাতৃবক্ষে নির্বিবাদে
সবে করে বাস অনুক্ষণ।
অত্যাচারের না করি ভয়
মধুর এই মাতৃমিলন ॥

উচ্চ-নীচ-সমতল-ভূমি
যাঁর দেহে শোভে সুমহান।
শ্যামলা তিনি হোন বিস্তৃতা
করুন চিদানন্দ দান। (১২।১।২)

করেছ তুমি আশ্রয় দান
এক গৃহমাঝে কৃপা ভরে।
বহুভাষাভাষী-বহুধর্মচারী
বিবিধ জনে সদা সাদরে।

কামধেনু যথা স্নেহকুলা
দান করে পয়ঃ আত্মহারা।
সেই মত তুমি স্থিরা, মাতঃ
দানকর কর তব ধন ধারা।
বন্দে মাতরম্ (১২।১।৪৫)

অশ্বিনীকুমার দত্ত

জলধর সেন

১৮৮৬ অব্দের শেষভাগে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা নগরীতে জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেসের) দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে আমি গোয়ালন্দের জনসাধারণ কর্তৃক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে যাই। তখনও কিন্তু আমার মধ্যে ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডির আদর্শ লোপ পায়নি। ১৮৮৫ অব্দে বোম্বাইতে প্রথম কংগ্রেস হয়। আমাদের দেশপূজ্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Banerji) সেই কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনিই দ্বিতীয় বৎসরের কংগ্রেসকে কলিকাতায় আহ্বান করেন।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন সর্বজনমান্য দাদাভাই নৌরজী মহাশয়, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়। দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই কংগ্রেসে যোগদান করেন, এমন কি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় পর্যন্ত এই কংগ্রেসে বক্তৃতা করেন। আমি গণ্যমান্য না হলেও, আমার প্রবাস স্থানের প্রতিনিধি হয়ে এই কংগ্রেসে যোগ দিই।

প্রথম দিনের কংগ্রেসের অধিবেশন হয় টাউন হলে। সেদিনের সভা শেষ হওয়ার পূর্বেই সুরেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেন যে, পরদিন টাউন হলে আবার কংগ্রেসের অধিবেশন হবে।

পরদিন যথাসময়ের পূর্বেই টাউন হলে গেলাম। পূর্ব দুই দিন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম, তার জন্যই সভারম্ভের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে টাউন হলে উপস্থিত হয়েছিলাম। আর সেই জন্যই প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট আসনের প্রথম শ্রেণীতেই স্থান সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। তাতে আমার পক্ষে দেখা-শোনার যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল।

প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হবার আধ ঘণ্টা পূর্বেই দেখতে পেলাম—একটি গৌরবর্ণ যুবক মঞ্চের উপর এবং মঞ্চের চারিপাশে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। যুবকটি দেখতে যেমন সুন্দর, তার পরিচ্ছদও তেমনি পরিপাটী; দেখলেই বুঝতে পারা যায় তিনি খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান। চোখে সোনার চশমা, গায়ে লম্বা একটা কোট, গলায় একটা আলোয়ান জড়ানো—সেই আলোয়ানের উপর দু-দুটো ব্যাজ—একটি অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যের, আর একটি প্রতিনিধির। আর তিনি যে ভাবে বড় বড় নেতাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতদিগকে অভ্যর্থনা করছিলেন, তা দেখে বুঝতে পারলাম যে, তিনি যুবক হলেও কংগ্রেসের একজন বড় নেতা।

আমার পাশে যে বাঙ্গালী প্রতিনিধিটি বসে ছিলেন, তাঁকে ঐ যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে তিনি অবাক হয়ে বল্লেন, সে কি মশায়!—ওঁকে আপনি চেনেন না? উনি বরিশালের অশ্বিনীবাবু। আমি বিনীতভাবে বল্লাম, ওঁর নাম অনেক শুনেছি, কিন্তু পাড়াগাঁয় থাকি, তাই চিনতে পারি নি।

আর একটি যুবক সেদিন সভা সমেত আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিলেন। একটি প্রস্তাব সমর্থন করবার জন্য যখন তিনি মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন, তখন সমবেত প্রতিনিধিরা অবাক হয়ে সেই মূর্তির দিকে চেয়ে রইলেন। যুবকের বয়স তখন পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর। পায়জামা-পরা, গায়ে লম্বা সাদা চাপকান, একখানি সাদা চাদর গলায় জড়িয়ে তার দুই প্রান্ত বুকের উপর দুইপাশে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, মাথায় পাগড়ী, কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। সত্যসত্যই অপূর্ব-দর্শন মূর্তি! তিনি এসে দাঁড়াতেই আমি পাশের সেই ভদ্রলোকটিকেও তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম,—তিনি বল্লেন—চিনি নে মশায়, বোধ হয় পাঞ্জাবী কেউ হবে।

যুবকটি গম্ভীর স্বরে টাউন হলের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যান্ত প্রতিধ্বনিত করে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আর বক্তার কি উদাত্ত স্বর!—এই বৃদ্ধ বয়সেও সে দৃশ্য যখন মনে করি, তখন আমি

অতুল আনন্দ উপভোগ করি। এই যুবকের নাম অধুনা বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মহাশয়।

ডিসেম্বর মাসের শেষে কংগ্রেস হয়ে গেল। জানুয়ারীর প্রথম ভাগে একদিন বিকেল বেলা আমার একটি প্রিয় ছাত্র আমার কাছে এসে বললেন যে, তিনি বরিশালের অশ্বিনীবাবুর কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়েছেন। আমার এই ছাত্রটির নাম শ্রীমান পঞ্চানন ব্রহ্মচারী। এঁর বাড়ী বরিশালে এবং ইনি অশ্বিনীবাবুর অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। সে সময়ে একটি ব্যাপার দেখতে পেতাম, অশ্বিনীবাবুর ছাত্র, বন্ধু ও শিষ্যেরা যেখানেই যেতেন, সেখানকারই আবহাওয়ার একটি পরিবর্তন সাধিত করতেন—এমনই তাঁদের চরিত্রবল ছিল—এমনই উচ্চ আদর্শে তাঁরা গঠিত হয়েছিলেন।

পঞ্চানন আমাকে বললেন যে, অশ্বিনীবাবু কংগ্রেসের মত প্রচারের জন্য অতি শীঘ্রই ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলে আসবেন। তাঁর ইচ্ছা যে গোয়ালন্দে একদিন সভা করে' কংগ্রেসের বার্ত্তা প্রচার করেন। তিনি লিখেছেন যে, গোয়ালন্দে তাঁর পরিচিত কেউ নেই, তবে বিগত কংগ্রেসে গোয়ালন্দ থেকে আমি প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলাম—কংগ্রেসের কাগজপত্রে এ-কথা তিনি দেখেছেন। আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি কি না, এই কথা তিনি জিজ্ঞাসা করে' পাঠিয়েছেন এবং একদিনের জন্য তাঁর অবস্থানের কি সুবিধা হবে, সে কথাও পঞ্চাননের কাছে জানতে চেয়েছেন।

এ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় ব্যাপার। যে অশ্বিনীকুমারকে কংগ্রেসমণ্ডপে দেখে তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার বাসনা আমার মনে উদিত হয়েছিল, সেই অশ্বিনীকুমার অযাচিতভাবে আমার আতিথ্য গ্রহণ করতেও উৎসুক!

তার পাঁচ ছয় দিন পরে এক বুধবারে অশ্বিনীবাবুর পত্র পেলাম। তিনি পরবর্ত্তী শনিবার প্রাতঃকালে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে উপস্থিত হবেন, আমি যেন সেইদিন অপরাহ্নে সভা করবার ব্যবস্থা করি এবং তাঁকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসি।

শনিবার প্রত্যূষে সত্যসত্যই ষ্টেশনে লোকারণ্য হয়েছিল। গোয়ালন্দের গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলেই সেই শীতেও ষ্টেশনে সমবেত হয়েছিলেন। আড়তদার, দোকানদার, মুটে-মজুর সবাই বরিশালের অশ্বিনীবাবুকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল, আর আমাদের স্কুলের আড়াই শত ছেলে লাল নিশান হাতে করে' ষ্টেশনের সম্মুখে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল।

যথাসময়ে গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিলে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে নামবার পূর্বেই যাদববাবু গাড়ীর ভিতর উঠে তাঁর গলায় মালা দিয়ে অভ্যর্থনা ক'রে প্লাটফরমে নামালেন।

অশ্বিনীকুমার গাড়ী থেকে নামলে সম্মুখে যাঁরা ছিলেন, যাদববাবু তাঁদের সঙ্গে অশ্বিনীবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। শিষ্টাচার-বিনিময়ের পর অশ্বিনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কই, জলধর কই?" এ সমস্ত ব্যাপারে আমি কোনদিনই এগিয়ে দাঁড়াই নে—তখনও দাঁড়াতাম না, এখনও না। আমি সে সময়ে কতকগুলি লোকের পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম।

অশ্বিনীবাবুর প্রশ্ন শুনে যাদববাবু এদিক্-ওদিক্ চেয়ে দেখলেন যে, আমি পিছন দিকে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি তখন দৌড়ে গিয়ে আমাকে টেনে অশ্বিনীবাবুর সম্মুখে এনে বললেন—"এই নিন আপনার জলধর।"

অশ্বিনীবাবু সহাস্যবদনে বললেন—"কথাটা ঠিক হল না—বলুন, এই নিন "আমাদের জলধর।" সকলে আনন্দধ্বনি করে উঠলেন। আমি তাঁর পায়ের ধূলো নিতে গেলাম। তিনি হো-হো করে হেসে বললেন—"পায়ে কি আর এখন ধূলো আছে ভাই" এই বলেই আমাকে কোলের ভিতর জড়িয়ে ধরলেন—প্রণাম আর করা হল না।

• 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক রায় জলধর সেন বাহাদুর শুধু সাহিত্যিক নন, অগণিত সাহিত্যিকও তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন নিজের জীবনে। প্রবর্তক সংঘের সৌজন্যে তাঁর আত্মজীবনী থেকে (লিপিকার—নরেন্দ্রনাথ বসু) এ অধ্যায়টি ধন্যবাদ সহকারে প্রকাশ করা হল।

স্বদেশী যুগে বাংলায় গণসংযোগ

অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বদেশী আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আন্দোলন বাংলায় নতুন জাগরনের জোয়ার নিয়ে আসে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রবাহ ব্যাপকতর হয়। বাঙালী নবোদ্যমে জেগে ওঠে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলন প্রাণসঞ্চার করে জনগণের মনে। এই আন্দোলনের ধারা প্রধানতঃ তিনটি খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। এক—জাতীয় বা স্বদেশী বিনিয়োগ ও উৎপাদন এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন। দুই—জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠা। তিন—বৈপ্লবিক আন্দোলন—সরকারী রিপোর্টে যাকে আখ্যা দেওয়া হয় 'টেররিজম' বা সন্ত্রাসবাদ বলে।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিকতা বা ভিক্ষানীতির বিরোধীগোষ্ঠী হিসাবে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ পথ নির্দেশিত গোষ্ঠী আত্মশক্তির সাথকরূপে স্বদেশী আন্দোলন, তথা জাতীয় আন্দোলনে নতুন পথের নির্দেশ দেয়। এই গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ও আরও অনেকে। স্বদেশী যুগে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ভগিনী নিবেদিতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী যুগের নতুন চিন্তাধারার অনুসরণেই ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস দুই শিবিরে বিভক্ত হয়—নরমপন্থী ও চরমপন্থী।

একথা সর্বজন বিদিত যে মহাত্মাগান্ধীই সাধারণ মানুষের সঙ্গে

জাতীয় কংগ্রেসের সংযোগ ঘটান। একথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জনসংযোগের বিশেষ প্রচেষ্টা চলে, যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। একদিকে নানা পত্রিকা পুস্তিকা ও সাময়িকপত্রের প্রকাশ, অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলার স্থানে স্থানে জনসভা, পথসভা, আবার তার সাথে সাথে গঠিত হতে থাকলো নতুন নতুন সংগঠন—যেগুলি এ্যাসোশিয়েশন বা সভা এবং সমিতি নামে খ্যাত।

ইতিপূর্বে বাঙলাদেশে কিছু কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হতো। কিন্তু তার ত্রুটি হলো এই যে, বেশীর ভাগ প্রকাশের ভাষা ছিল ইংরাজী। ফলে অশিক্ষিত ও ইংরাজী না-জানা মানুষের কাছে তার কোন মূল্য ছিল না। প্রথমেই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলির নাম করা যেতে পারে। যথা—'ষ্টেট্‌সম্যান', 'এ্যাম্পায়ার' 'ইংলিশম্যান' 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ'। বলাই বাহুল্য এগুলির সবই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকার ঘেঁষা। দেশীয় পত্রিকার মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী', শিশিরকুমারের অমৃতবাজার পত্রিকা (স্বদেশী যুগে তাঁর ভাই মতিলাল এই পত্রিকার সম্পাদনা করতেন) শিক্ষিত মহলে কদর পেত। তাছাড়া ছিল নগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' 'ইণ্ডিয়ান নেশন', নরেন্দ্রনাথ সেনের 'দি ইণ্ডিয়ান মিরর' ও বিপিনচন্দ্র পালের 'নিউ ইণ্ডিয়া'। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা 'বন্দে মাতরম'। এগুলি সবই ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা। ফলে তা ছিল ইংরাজী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই সীমিত।

বাংলা দৈনিকের সংখ্যা স্বদেশী যুগে খুবই অল্প ছিল। 'দৈনিক হিতবাদী' ও সান্ধ্য পত্রিকা 'সন্ধ্যা' রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'হিতবাদী' ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা'র সম্পাদনা করতেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে 'সন্ধ্যা'-র প্রাঞ্জল হৃদয়গ্রাহী গ্রাম্য ভাষা, রূপকথা, ছড়া, প্রবন্ধ, হেঁয়ালি সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করে। তারা প্রতি সন্ধ্যায় 'সন্ধ্যা'র জন্য আগ্রহী হয়ে বসে থাকতেন।

দৈনিকের তুলনায় বাংলায় সাপ্তাহিকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের সরকারের নেটিভ পত্রিকার রিপোর্টে জানা যায় যে, সারা বাংলায় বাংলা সাপ্তাহিকের সংখ্যা ছিল ৫৭। বিপ্লববাদ প্রচারে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদিত 'যুগান্তর'-এর দান অপরিসীম। এর দাম ছিল এক পয়সা। এই পত্রিকার প্রথম আবির্ভাব ঘটে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। প্রথমে অল্প হলেও দিনের পর দিন এর প্রচার বাড়তে থাকে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারের সংখ্যা ছিল ৭০০০ কপি, পরে তা ২০,০০০ কপিতে দাঁড়ায়। 'যুগান্তর'-এর ভাষার মধ্যে ছিল অগ্নিছটা। অরবিন্দ ঘোষের লেখনী সম্মোহিত করেছিল যুবশক্তিকে। তাঁর 'বিপ্লবতত্ত্ব' প্রবন্ধমালা 'যুগান্তর'-এর বিশেষ সম্পদ।

প্রত্যেকটি পত্রিকার বিবরণ ক্ষুদ্র নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে মফঃস্বলের বিশেষ কয়েকটি পত্রিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্থানীয় উকিল বৈকুণ্ঠ সোম ময়মনসিংহে 'চারুমিহির' পত্রিকা দ্বারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। 'বন্দে মাতরম' উল্লেখ করেছে যে, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে একসময় এই পত্রিকায় লিয়াকত হোসেন এক ব্রিটিশ বিরোধী আবেদন রাখায় পুলিশ পত্রিকা অফিস তল্লাশী করে। দুর্গামোহন সেন সম্পাদিত ও অশ্বিনী কুমার দত্তের বান্ধব সমিতির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত 'বরিশাল হিতৈষী' মফঃস্বল পত্রিকা হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাছাড়া 'রংপুর বার্তাবহ' 'পূর্ববাংলা' (ঢাকা) 'খুলনাবাসী' ও জিস্পাতি কাব্যতীর্থ কর্তৃক প্রকাশিত 'হাওড়া হিতৈষী' প্রভৃতি অনেক পত্রিকা বেশ সমাদর লাভ করেছিল।

সাপ্তাহিকের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল 'ডন' 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড' 'মডার্ন রিভিউ' 'বঙ্গদর্শন' 'ভাণ্ডার' প্রভৃতি ইংরাজী ও বাংলা সাময়িকী। তাছাড়া 'কার্জনের কাছে খোলা চিঠি' পৃথিশ রায়ের 'দি কেস এগেনষ্ট দি ব্রেক আপ অফ বেঙ্গল', রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' গনেশ দেউস্করের 'দেশের কথা', যোগেন্দ্রনাথ সরকারের 'জাতীয় সমস্যা'।—এই বিভিন্ন ধরনের পুস্তিকার প্রচার বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

তবে এর গতি ছিল আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের দুয়ার পর্যন্ত সীমিত। দেশের অগণিত নিরক্ষর মানুষের হৃদয় আঙিনায় তা প্রবেশ করতে পারতো না। কেশবচন্দ্র সেন, লালমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ বাগ্মীরা ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। তা জনমনে কতটা পৌঁছত অনুমেয়। বাংলার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করেছিলেন। পরে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অনেক প্রচেষ্টার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাবনায় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ বাংলায় রেখে মাতৃভাষাকে সম্মানের আসনে বসালেন।

রাখীবন্ধন ও অরন্ধনের ব্রত পালন সর্বস্তরের মানুষের মনকে দোলা দেয়। বাঙালীর মধ্যে আত্মিক যোগ প্রতিষ্ঠার প্রবল চেষ্টা হয়। রবীন্দ্রনাথ রাখীর মধ্য দিয়ে তা করতে চান। দেশের মাটিকে প্রণাম জানিয়ে আপামর বাঙালী এক হোক, এই সাধনা, এই ব্রত। মহিলাদের আন্দোলনের সামিল করার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অরন্ধনের ব্রতের কথা বলেন। দেশ জননীর নিপীড়নের সামিল হবে ঘরে ঘরে মা-বোনেরা। তাদের আত্মিক চেতনায় ফুটে উঠবে সংগ্রামের কঠোর মনোভাব। প্রতিটি সংসারে তৈরী হবে বিপ্লবী। মুসলমানদের মধ্যে রাখী বন্ধনে উৎসাহী বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন মৌলবী লিয়াকত হোসেন। প্রতি বৎসর ৩০শে আশ্বিন তিনি স্বদেশ সেবক ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে মহাসমারোহে রাখীবন্ধন উৎসব করতেন। বঙ্গভঙ্গ বাতিল হওয়ার অনেকদিন পর পর্যন্ত তিনি এই জাতীয় উৎসব রক্ষা করেছেন।

স্বদেশী যুগের পূর্ব থেকেই প্রচুর দেশাত্মবোধক গান রচিত হতে থাকে। স্বদেশীযুগে তার সংখ্যা ও প্রচার অনেক বাড়ে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মুকুন্দ দাস, সৈয়দ আবু মহম্মদ ইসলাম হোসেন সিরাজী ও আরও অনেক জনগনকে মাতিয়ে তোলেন। বাঙালীর প্রাণগঙ্গায় দেশপ্রেমের জোয়ার আসে। শুধু গান নয়, গণশিক্ষার বাহনরূপে ঐতিহাসিক নাটক আলোড়িত করলো বাঙালীকে। তবে

থিয়েটার ছিল কেবলমাত্র সহরের লোকেদের মধ্যে সীমিত। সহরের গণ্ডীর বাইরে তার যাতায়াত ছিল না। কিন্তু গ্রামের মানুষরাও একেবারে বাদ যায়নি। তাদের জন্য ছিল যাত্রার ব্যবস্থা। গ্রামবাসীর মুখে মুখে মুকুন্দদাসের গান শোনা যেত। দেশের পরাধীনতার গ্লানি তাদের অনেকেই অনুভব করত। তারা চাইত স্বদেশী জিনিয।

গণসংযোগের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের আলোচনাও প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে (১৮৯৩) মহারাষ্ট্রে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় গুপ্তসমিতির বীজবপন করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড হয়। মহারাষ্ট্রে সশস্ত্র অভিযানের নায়ক ছিলেন তিলক। মহারাষ্ট্রের গুপ্ত সমিতির বীজ বাংলাদেশে আসে অরবিন্দের প্রচেষ্টায় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই সমিতির প্রথম কেন্দ্র স্থাপিত হয় পি. মিত্রকে কেন্দ্র করে সুকিয়া ষ্ট্রীট থানার কাছে ১০২নং সার্কুলার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। ইতিপূর্বে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পি. মিত্রের মধ্য দিয়েই অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সঙ্গে সরলা দেবীর যোগ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন প্রবন্ধ থেকেই নামটা নেওয়া।

আত্মিক ও দৈহিক চর্চা দ্বারা মানুষ গড়ার সংস্থা হিসাবে অনুশীলন সমিতির উদ্ভব। যার মূল লক্ষ্য দেশের মুক্তির উদ্দেশ্যে আত্মবলিদান। বাংলায় বিপ্লবাত্মক কার্যধারাকে সংগঠনের পথে বাস্তব রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা হয় অনুশীলন সমিতিতে। কলকাতা ছিল এই সমিতির কেন্দ্র, পরে ঢাকায় বিস্তৃত হয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এর শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে। সিডিসন কমিটির রিপোর্টে দেখা গেছে কেবলমাত্র ঢাকার সহর ও গ্রাম মিলিয়েই এই সমিতির শাখা ছিল ৫০০। অনুশীলন ছাড়া আত্মোন্নতি ও যুগান্তর সমিতিও প্রসারিত হয়েছিল। অনেকেই মনে করেন—যুগান্তর দল ও অনুশীলন সমিতি দুই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল না। এরা উভয়েই একই কেন্দ্রীয় সংস্থার শাখা—একটির মূল উদ্দেশ্য, শরীরচর্চার আড়ালে রাজনৈতিক শিক্ষাদান ও অন্যটির প্রধান লক্ষ্য, বিপ্লবের আদর্শ প্রচার ও প্রসার।

বিপ্লববাদের সাথে সাথে বয়কট, জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন এবং

স্বদেশীর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংকল্প সত্যই বাঙালী জাতিকে জাগিয়েছিল। দেশের মুক্তি আন্দোলনে এক বিরাট অধ্যায় হিসাবে নতুন পদক্ষেপ রূপে, বীরদের বীরত্বে গাথা শহীদদের রক্তে রঞ্জিত স্বদেশী আন্দোলন নতুন ইতিহাস সৃষ্টিতে অদ্বিতীয়।

'বঙ্গভঙ্গ সেটেল্ড ফ্যাক্ট (settled fact) একদিন আনসেটেল্ড (unsettled) হয়েছিল—সে এই বাংলা দেশে। সেদিন বাইরে থেকে কেউ ভার বইতে আসেনি, আন্দোলন পরিচালনার পরামর্শ দিতে বাইরে থেকে কর্তা আমদানি করতে হয়নি। বাংলার সমস্ত শক্তি সেদিন বাংলার নেতাদের হাতেই ন্যস্ত ছিল।
—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মরণ সাগর পারে

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

—তুমি বাঙালী হয়ে আমাকে ধরিয়ে দিলে।

প্রচণ্ড ঘৃণার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ল তার চোখ দিয়ে। মুহূর্তের মধ্যে একটা বিরাট বিস্ফোরণ হল যেন। যুবকের চোখের পলক নিমেষহীন। মুখ রক্তহীন। সে চিৎকার করে বলল, তুমি বাঙালী হয়ে আমায় ধরিয়ে দিলে?

নন্দলাল কিছুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সম্বিৎ ফিরে পেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। আরে, আসামী পালাচ্ছে যে! দারোগা নন্দলাল ক্ষণিকের জন্য প্রমোশনের যে স্বপ্ন দেখেছিল, সে স্বপ্ন বুঝি মিলিয়ে গেল। সে চিৎকার করে উঠল—ধর-ধর-ধর

জনাকীর্ণ স্টেশন। সেখানে আগে থেকেই ওৎ পেতে ছিল নন্দলালের সাঙ্গোপাঙ্গরা। সাদা পোশাকের কনস্টেবলরা। বিদেশী প্রভুর খিদমতগারের দল সব। একটা দুটো নয়, সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য জুডাস, হাজার মীরজাফর। আসামী পালাচ্ছে দেখে নেকড়ের মত তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

পিস্তল বের করল যুবক। সামাল বেইমান! সামাল নন্দলাল!

দুম, দুম! গুলি ছুটল। এক ঝলক অগ্নিবৃষ্টি। মাথা নীচু করে বেঁচে গেল নন্দলাল।

এবার নেকড়েরা এসে পড়েছে কাছে। বাঁচার আর উপায় নেই। পিস্তলের নল নিজের দিকে ফেরাল যুবক। দুম দুম। দুটো গুলি। তারপর সব শেষ। শুধু একবার বন্দে মাতরম্ বলতে পেরেছিল সে। মরণজয়ের অভয়মন্ত্র।

১লা মে, ১৯০৮। বিশ শতকের স্বাধীনতা-যুদ্ধে বাংলার প্রথম শহীদের রক্ত ঝরল মোকামা ঘাট স্টেশনে। নাম তার প্রফুল্ল চাকী। তার আরও কয়েক মাস পরে ১১ই আগস্ট আরও একজন শহীদ মাথা এগিয়ে দিল মজঃফরপুর কারাগারে ফাঁসীর মঞ্চে! সে ক্ষুদিরাম।

—তুমি ভয়ানক বিপদের মুখে পা বাড়িয়েছ! সব সময় সাবধান হয়ে চলাফেরা কর তো?

এক প্রবীণ বলছিলেন নবীন প্রফুল্লকে। বগুড়ার ছেলে প্রফুল্ল চাকী তখন মুরারিপুকুর বাগানে এসে গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়েছে।

—উদ্দেশ্য কি?

—দেশের মুক্তি।

—এ মুক্তি আসবে কি ভাবে?

—আসবে মাতৃপূজার দ্বারা। আমরা অন্য মা মানি না। আমাদের মা জননী জন্মভূমি—যে জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়—স্বর্গাদপি গরিয়সী। এ মাতৃপূজার জন্য বলি চাই। চাই অন্তরের ভক্তি। আমরা গীতার অর্জুনের মত নিষ্কাম কর্মযোগী। যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

—তুমি ভয়ানক বিপদের মুখে পা বাড়িয়েছ। প্রফুল্লকে বললেন প্রবীণ।

হাসল প্রফুল্ল। বিপদ? মরণকে যে ভয় করে না তার আবার বিপদ কিসের? বালিশের তলা থেকে একটি রিভলবার বার করে দেখালো প্রফুল্ল।

দেশের মুক্তির জন্য হিংসাকে মেনে নিয়েছে প্রফুল্ল। কিন্তু মেনে

নিয়েছে নিষ্কাম কর্মযোগীর মত। মাত্র ২০ বছর বয়সে দীক্ষা নিয়েছে। গীতা প্রায় মুখস্থ। ক্লাস নাইনে উঠেই পড়ায় ইস্তফা দিয়ে রংপুর থেকে কলকাতা চলে এসেছে দেশের মুক্তি-যুদ্ধে নিজেকে আহুতি দিতে।

মুরারিপুকুরের গুপ্ত সমিতিতে সে সময় দেশের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের সমাবেশ। সবাইকে সেখানে বোমা তৈরি শেখানো হচ্ছে। শেখানো হচ্ছে পিস্তল-চালনা। আর সেই সঙ্গে গীতার মর্মবাণী।

—প্রফুল্ল কোথায় রে? কে একজন জিজ্ঞাসা করল। তাকে তো দেখছি না ক'দিন।

—সে বিষ্ণু ভাস্কর লেলের শিষ্য হবে বলে তাঁর সঙ্গে চলে গেছে। সে বলেছে, সাধক হবে। বৈরাগ্য-সাধনেই আমার মুক্তি।

বিষ্ণু ভাস্কর লেলে অরবিন্দ আর বারীনের গুরু। মারাঠী সন্ন্যাসী তিনি। সর্বত্যাগী। তাঁর কাছে ধর্মকথা শুনে সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প করেছে প্রফুল্ল।

—ধর, ধরে আন তাকে। দেশের মুক্তি আগে, না নিজের মুক্তি আগে?

হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠতে যাচ্ছিল প্রফুল্ল। বিপ্লবীরা তাকে ফিরিয়ে আনল।

অরবিন্দ তাঁকে বললেন, তোমার যে অনেক কাজ বাকী। তোমাকে যে দার্জিলিং যেতে হবে।

—দার্জিলিং? কেন?

—ছোটলাট স্যর এনড্রু ফ্রেজারকে সরিয়ে দিতে হবে পৃথিবী থেকে। যতীন যাবে তোমার সঙ্গে। ৬১নং বিডন স্ট্রীটের যতীন্দ্রনাথ বসু। যার বাড়িতে গিয়ে তুমি রোজ ঘোড়ায় চড়া শেখ।

যতীনের সঙ্গে প্রফুল্ল গেল দার্জিলিংয়ে।

—এ কী, তোমার গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই কেন?

প্রফুল্ল উত্তর দিল, রাণা প্রতাপের মত আমিও সঙ্কল্প করেছি, যতদিন না দেশ স্বাধীন হবে, সব রকমের বিলাসিতা বর্জন করব।

—না না, দার্জিলিংয়ের এই ঠাণ্ডায় এভাবে যাবে কি করে? তাছাড়া এভাবে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। যতীন বলল।

অনেক বোঝানোর পর জামা-জুতো পরতে রাজী হল প্রফুল্ল। কিন্তু দার্জিলিং-অভিযান ব্যর্থ হল। ছোটলাটের সঙ্গে সব সময় সশস্ত্র পাহারা। সুবিধা হল না। যতীন ও প্রফুল্ল আবার ফিরে এল মুরারিপুকুরে।

—ঠিক আছে। একবার ব্যর্থ হয়েছ বলে আবার কেন চেষ্টা করবে না? সাহেব কি শুধু একজনই? এনড্রু ফ্রেজারকে না পার মজঃফরপুরে যাও। সেখানে কিংসফোর্ড আছে। তার রক্তে তর্পণ করে এস। অরবিন্দ বললেন প্রফুল্লকে।

কিংসফোর্ড তখন বাংলাদেশে এক ঘৃণিত নাম। অত্যাচারী চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। স্বদেশী পেলেই বিচারের নামে প্রহসন করত সে। লঘু পাপে আকছার গুরুদণ্ড দিত। শুধু তাই নয়, ষোল বছরের ছেলে সুশীলকুমার সেনকে হাত-পা বেঁধে পনেরো ঘা বেত মারার আদেশ দিয়েছিল। সুশীল এক ইংরাজ পুলিশকে ঘুসি মেরেছিল এই তার অপরাধ।

কলকাতা ধিক্কার দিল কিংসফোর্ডকে। মান বাঁচাবার জন্য তাকে মজঃফরপুরের দায়রা জজ করে বদলি করা হল। সেই কিংসফোর্ডকে খুন করতে হবে। এসেছে আদেশ। প্রফুল্ল রাজী। সঙ্গে যাবে কে? আর একজন কিশোর। নাম তার ক্ষুদিরাম বসু।

সাহেব-নিধনে উল্লাসকরের দারুণ উল্লাস। কাঠের হাতল দেওয়া একটি বোমা তৈরি করেছেন তিনি।

৩২নং গোপীমোহন দত্ত লেনে একটি ব্যাগের ভিতর বোমাটা পুরে প্রফুল্লের হাতে তুলে দিল বারীন। নাও, মাতৃপূজার অর্ঘ্য নাও। আর নাও তিনটে পিস্তল। যদি বোমা নিষ্ফল হয় তো এই রইল পিস্তল। এবার জয়ী হয়ে ফিরে এস তোমরা। কিংসফোর্ডের রক্তে পবিত্র হোক মজঃফরপুরের মাটি।

সে বোমা ফাটল (১৯০৮, ৩০শে এপ্রিল)। লোকও মারা

পড়ল। কিন্তু কিংসফোর্ড নয়। মজঃফরপুর আদালতের উকিল মিঃ কেনেডির বউ আর মেয়ে।

কিন্তু কে মারা পড়ল তা আর দেখার সময় নেই তাদের। বোমার ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার। গাড়িটা ছিন্ন-ভিন্ন। বিরাট বিস্ফোরণের শব্দে লোকজন ছুটে আসছে। প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম ছুট লাগাল।

সারারাত ধরে হাঁটছে দুজনে। খালি পা। সারারাত চোখে ঘুম নেই। খাওয়া নেই। পথশ্রমে ক্লান্ত। পা আর চলে না।

ভোরবেলা দুজনে এসে পৌঁছল ওয়েনী স্টেশনে। এখন যে স্টেশনের নাম পুসা রোড।

দুজনের খুব ক্ষিদে পেয়েছে। প্রফুল্ল বলল, যাও, দুটো মুড়ি কিনে নিয়ে এস। আর যে চলতে পারছি না। কিন্তু মুড়ি কিনতে যাওয়াই কাল হল। ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হল।

ক্ষুদিরাম ফিরল না। প্রফুল্ল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে একাই চলল সমস্তিপুরে। শ্রান্ত দেহ, উসকো-খুসকো চুল।

—এদিকে শোন।

ডাকছে একজন রেল-কর্মচারী। বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। পেটে অসহ্য ক্ষিদে। প্রফুল্ল এগিয়ে গেল।

—এস আমার সঙ্গে।

না, পুলিশ নয়। সত্যিই দরদী মানুষ। বোধহয় বুঝতে পেরেছে পলাতক বিপ্লবী। তাই আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে। নতুন কাপড়-জামা কিনে দিয়েছে। তারপর ইন্টার ক্লাসের টিকিট কিনে তাকে কলকাতার গাড়িতে তুলে দিয়েছে।

প্রফুল্ল ট্রেনে উঠে প্রণাম জানাল সমস্তিপুরের সেই অনামা রেল-কর্মচারীকে। এদেরই মত দেশপ্রেমী হাজার হাজার বিপ্লবীর অন্তরে প্রেরণা জুগিয়েছে। আড়াল থেকে বিপ্লব-যজ্ঞের সমিধ সংগ্রহ করে দিয়েছে তারা।

কিন্তু কামরায় উঠে দেখা হয়ে গেল নন্দলালের সঙ্গে। বাঙালী হয়ে

বাঙালীর মহা সর্বনাশ করেছিল যে। সেই জুডাসের নাম নন্দলাল ব্যানার্জী।

পুলিশের সাব-ইনসপেক্টর নন্দলাল। মজঃফরপুরের সরকারী উকিল, ইংরেজের খয়ের খাঁ শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র। ছুটি কাটিয়ে কলকাতা ফিরছে। আর মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে সে ভাবছে, হায় হায়, যদি আসামীদের ধরে দিতে পারি, প্রমোশন ঠেকায় কে।

কিন্তু তার সামনে নতুন জামা-কাপড় পরা ছেলেটি কে? ঘুনো দারোগা নন্দলালের সন্দেহ হচ্ছে। হত্যাকারীদের কেউ নয় তো?

যেচে আলাপ জমাল নন্দলাল। এমন অভিনয় করতে লাগল যেন একজন দেশহিতব্রতী। বিপ্লবীদের দুহাতে তুলে আশীর্বাদ করতে লাগল। মুণ্ডপাত করতে লাগল ইংরেজদের।

নিশ্চয়ই কোন দেশকর্মী। মনে মনে ভাবছে প্রফুল্ল। মনের কথা সে-ও অকপটে বলছে। আর যত শুনছে, ততই উল্লসিত হচ্ছে নন্দলাল। না, সন্দেহ আমার ঠিকই। একটু একটু জেরা করছে নন্দলাল।

—এত জেরা করছেন কেন? কি রকম ভদ্রলোক আপনি? প্রফুল্ল রেগে গেল। রেগে সে কামরা থেকে অন্য কামরায় গিয়ে বসল।

শিকার বুঝি হাতছাড়া হয়ে যায়। নন্দলাল উঠে গেল পাশের কামরায়।

—তুমি রাগ করছ মিছিমিছি।

—করব না? আপনি আমাকে বড্ড বিরক্ত করছেন।

—আচ্ছা ক্ষমা চাইছি। এস, আমার কামরায় বসবে এস। দেশকে ভালবাসি কিনা, তাই আর একজন দেশহিতব্রতীর দেখা পেয়ে নিজেকে সামলাতে পারছি না।

আহা, এমন মানুষও হয়! প্রফুল্লর রাগ জল হয়ে গেল। সে ভাবছে ক্ষুদিরাম ধরা পড়েছে, কিন্তু তাকে বাঁচাতেই হবে। নিজের

জন্যে বাঁচতে চায় না প্রফুল্ল, বাঁচতে চায় দেশের জন্যে—তার কাছে বেঁচে থাকা মানে দেশের কাজে আরও অনেক দিন লাগতে পারা। আর দেশের মুক্তি না এসে পারে না—সে তো শুধু একা নয়, তার সহযাত্রী নন্দলালবাবুর মত আরও কত না মানুষ আছে তার পিছনে।

—কুলি, কুলি! মোকামা স্টেশনে নেমে কুলি ডাকছে নন্দলাল।

প্রফুল্ল বলল, কুলি লাগবে না, আমায় দিন আপনার বাক্স। আমি বয়ে নিয়ে যাব।

—না, না, তুমি কেন?

—তাতে কি হয়েছে? আমার হাতে তো কিছু নেই। মনে মনে ভাবছে প্রফুল্ল, আহা, এমন দেশব্রতীর কাজে লাগব, সে তো আমার ভাগ্য।

—তাহলে আমার জিনিসপত্র দেখ তুমি। আমি একটু আসছি।

নন্দলাল চলে গেল স্টেশন-মাস্টারের ঘরে। সমস্তিপুর ট্রেন ছাড়ার আগেই সে দারোগাকে মজঃফরপুরে তার করেছে—একটি ছেলেকে সন্দেহ হচ্ছে। তাকে গ্রেপ্তারের অনুমতি চাই।

মোকামায় এসে নন্দলাল দেখল এস. পি.-র অনুমতি এসে গেছে। শিগ্গীর ধর ছেলেটিকে।

মোকামা পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। আর পায় কে? নন্দলালের তখন মুখোশ খুলে গেছে। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে জুডাস—যে ধরিয়ে দিয়েছিল যীশুকে।

সে ক'জন পুলিশের লোক নিয়ে এগিয়ে চলেছে প্রফুল্লর দিকে—যে প্রফুল্ল তখনও তার সুটকেস আর বেডিং পাহারা দিচ্ছে মোকামা স্টেশনের প্ল্যাটফরমে। প্রফুল্ল তখনও সুটকেস পাহারা দিচ্ছে আর ভাবছে, এমন দেশহিতব্রতী মানুষ! আহা, তার জিনিস পাহারা দিয়ে নিজেই ধন্য হচ্ছি।

—তুমি বাঙালী হয়ে আমায় ধরিয়ে দিলে?

প্রফুল্ল ভাবতেও পারেনি নন্দলাল কখনও এমন কাজ করতে পারে।

বাঙালী কখনও বাঙালীর এমন সর্বনাশ করতে পারে? বিশ বছরের কিশোর। জীবনের অভিজ্ঞতা তার কতটুকুই বা। তা না হলে সে জানত জুডাসেরা মরেনি— মরে না, ভগবানের মত জুডাসরাও যুগে যুগে জন্মায়। নতুন নামে। নতুন পরিবেশে। কিন্তু একই চরিত্র তাদের সকলের।

'পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে মুক্তিসংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা দেশের মানুষদের সঙ্গেই মানুষকে বেশি লড়াই করিতে হয়। এই লড়াইয়ের প্রয়োজন যেদিন শেষ হয় শৃঙ্খল আপনি খসিয়া পড়ে।'

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পথের দাবী

শ্রীঅরবিন্দকে যেমনটি দেখিয়াছি

সুকুমার মিত্র

[লেখক সে-যুগের বহুখ্যাত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার স্বনামধন্য কৃষ্ণকুমার মিত্রের যোগ্য পুত্র। একদা এই পত্রিকা অগ্নিম বিপ্লবযজ্ঞের কেন্দ্রপীঠ ছিল। শ্রীমিত্রের নির্বাসন দণ্ড হবার পর পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক দুশো টাকা মঞ্জুর হয়। সুকুমারবাবু সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। লেখকের বর্তমান বয়স প্রায় ৯০ বছর]।

অনুমান আমার যখন দশ-বারো বৎসর বয়স, তখন শ্রীঅরবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও আমার মাসতুতো ভ্রাতা এবং বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ তাঁহাকে আমাদিগের কলিকাতার বাসস্থান ৬নং কলেজ স্কোয়ারে লইয়া আসেন। তখন তাঁহার মাথায় পিরাণী পাগড়ী ছিল।

সাত বৎসর বয়সে অরবিন্দ ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সপরিবারে অরবিন্দের দুই ভ্রাতা ভগ্নীসহ ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। অরবিন্দ সাত বৎসর বয়সে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় পদ্য লিখিতেন যেমন অনর্গল ফরাসী বলিতে পারিতেন, তেমনি জার্মান।

তৎকালে ভারতীয় ছাত্রদিগের আই. সি এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একাদশ স্থান অধিকার করেন। তাঁহাকে এই কঠিন পরীক্ষায় সাহায্য করিতে কোনও গৃহশিক্ষক ছিলন., বা বয়স্ক কোন আত্মীয় বা বান্ধব ছিল না। একলা নিজে পড়িয়া তিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইংলণ্ডে থাকার সময়ে তথাকার ইণ্ডিয়ান মজলিসে তিনি যোগদান করেন। পরে উহার সেক্রেটারী হন। লণ্ডনে থাকার সময়ে তাঁহার বন্ধুদিগের সহযোগিতায় এক বিপ্লবী দল গঠন করেন। উহার নাম ছিল "লোটাস এণ্ড ডেগার" (পদ্ম ও ছোরা)।

অরবিন্দ আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু ঘোড়া চড়ার পরীক্ষায় উপস্থিত হইলেন না, গৃহে বসিয়া রহিলেন। ঘোড়া চড়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া ধরা হয় না। তাঁহার ইংরাজের অধীনে কার্য করিবার ইচ্ছা ছিল না।

এক প্রতিভাবান ভারতীয় যুবক আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও চাকুরীতে যোগ দিলেন না শুনিয়া বরোদার মহারাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের পরে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা দেখিয়া আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার রাজ্যে চাকুরী করিতে আহ্বান করেন। তিনি রাজী হইলে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন।

যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় নামে বর্ধমান জিলার এক যুবক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ভারতের নানা স্থানে দরখাস্ত করিয়াও কোন স্থানে সৈনিকের চাকুরীতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কোনও ইংরাজ

কর্মচারী তাঁহাকে সৈন্যদলে গ্রহণ করিলেন না। তাহার কারণ, তিনি বাঙালী। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তিনি নিজে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়া আরও অনেক বাঙালীকে ঐ বিদ্যাদান করিয়া একটি দল গঠন করিবেন এবং তাহাদের সাহায্যে দেশের স্বাধীনতা লাভ করিবেন। তিনি অবশেষে বরোদা রাজ্যে যাইয়া নিজের পদবী বদলাইয়া উপাধ্যায় পদবী গ্রহণ করিয়া বরোদার সৈন্যদলে যোগদান করিলেন।

পরে শুনিতে পাইলেন, বরোদার উচ্চপদে একজন বাঙালী নিযুক্ত আছেন। এই কথা লোকপরম্পরায় শুনিতে পাইয়া তিনি অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইঁহার উদ্দেশ্য, আদর্শ জানিয়া অরবিন্দ ইঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ হ'ন। পরে ইনি কলিকাতা আসিয়া ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করিয়া সক্রিয় কার্য করিতে থাকেন।

বরোদা থাকার সময়ে অরবিন্দ নিজের নাম না দিয়া বোম্বাইয়ের "ইন্দুপ্রকাশ" নামক পত্রিকায় অনেকগুলি রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সকল প্রবন্ধে ভারতবর্ষের পরাধীনতা, ইংরাজের শোষণ, অবিচার, দেশের দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করেন।

প্রথমে অরবিন্দ তাঁহার মাতামহ বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর বৈদ্যনাথের গৃহে ছুটির সময়ে কিছুকাল বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে ছুটিতে আমরা সকলেই তথায় অতিবাহিত করিতাম। কলিকাতা আসিলে এই কলেজ স্কোয়ার গৃহে আপন তৃতীয় মাসীর বাড়ীতে থাকিতেন। বিবাহের পরে তিনি প্রথমে স্কটস্ লেনে ও তাহার কিছুদিন পরে (১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে) গ্রে স্ট্রীটের পশ্চিম অংশে এক গৃহের দ্বিতলে বাস করিতে যান। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ মাসীমা, ভগ্নী সরোজিনী এবং তাঁহার নববিবাহিতা পত্নী। ঐ বাড়ীর নীচের তলায় "নবশক্তি" নামক ছাপাখানা ছিল।

২রা মে (১৯০৮খৃঃ) শেষ রাত্রি ৪॥ ঘটিকার সময়ে একদল পুলিশ ঐ বাড়ীর দরজার কড়া ঘন ঘন নাড়িতে আরম্ভ করে। প্রথমবার

কড়া নাড়ায় কেহ দরজা খুলে নাই, সকলেই নিদ্রিত। আবার কড়া নাড়িতে নাড়িতে প্রায় কুড়ি মিনিট পরে, যেই দরজা খোলা হইল, অমনি সকল পুলিশ একসঙ্গে বাড়ীতে দ্রুত ঢুকিয়া পড়িল। পুলিশ কর্মচারীর হস্তে উন্মুক্ত রিভলভার ছিল। গৃহের স্ত্রীলোকগণ একদল সশস্ত্র পুলিশকে শেষ রাত্রের অন্ধকারে এইভাবে দৌড়াইয়া প্রবেশ করিতে দেখিয়া আতঙ্কিত হইল।

ইন্সপেক্টর বিনোদ গুপ্ত ও কয়েকজন ইংরাজ পুলিশ কর্মচারী দ্বিতলে উঠিয়া অরবিন্দের ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থায় বিছানা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি চক্ষু উন্মোচন করিয়া অর্দ্ধ অন্ধকারে এই ঘটনা দেখিলেন। বিছানাতেই গ্রেপ্তার করিয়া হাতকড়া লাগান হইল। এই সময়ে এক ইংরাজ পুলিশ কর্মচারী অরবিন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি একজন আই. সি. এস., মাটিতে মাদুরে শুইতে তোমার লজ্জা করে না!" তাহার পর তাঁহার গৃহ তল্লাস করা আরম্ভ হইল। ইহাকে তল্লাস না বলিয়া গৃহ তোলপাড় হইল বলিলেই ঠিক হয়। তিন ঘণ্টা ধরিয়া এই তল্লাসী চলিল।

ঐ স্থানের কোনও সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি, সেই শেষ রাত্রির অন্ধকারে তথা হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে কলেজ স্কোয়ার বাড়ীতে আমার পিতা কৃষ্ণকুমার মিত্র—জননেতা ও "সঞ্জীবনী"-পত্রিকার সম্পাদকের নিকট আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, অরবিন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই কথা শুনামাত্র তিনি অরবিন্দের গৃহে চলিয়া গেলেন। তিনি গ্রে স্ট্রীটের বাড়ীতে যাইলে তাঁহাকে দেখিয়া অরবিন্দ বলিলেন, "দেখ মেশো, আমাকে হাতকড়া দিয়েছে।"

কৃষ্ণকুমার মিত্র বিনোদ গুপ্তকে হাতকড়া খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিলে পুলিশ ইন্সপেক্টর সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। কৃষ্ণকুমার বাবু গৃহের স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। ইন্সপেক্টর বলিলেন, বেলা তিন ঘটিকার পূর্বে তাহা করিতে দিবেন না। অগত্যা কৃষ্ণকুমারবাবু তাঁহার বন্ধু, জননেতা এবং সলিসিটার ভূপেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে যাইয়া সমস্ত ঘটনা বলিলেন এবং কি করা

উচিত তাহা জানিতে চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ ভূপেন্দ্রবাবু গ্রে স্ট্রিটে যাইয়া পুলিশকে অনুরোধ করিলে, পুলিশ তাহা রক্ষা করিল না। অবশেষে লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের নিকট যান।

এদিকে ঐ গৃহের নীচের তলার নবশক্তি ছাপাখানার অবিনাশচন্দ্র ও শৈলেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া, তাহাদের কেবল হাতকড়া পরাইয়া দেওয়া হয় নাই, কোমরে দড়ি বাঁধিয়া রণক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের বাঁধিয়া রাখার মত করা হইয়াছিল। ভূপেন্দ্রবাবু পুলিশ কমিশনারের নিকট যাইয়া দেখা করিলেন এবং আসামীদের জামিনে খালাস করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পুলিশ কমিশনার জানাইলেন যে, অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্র সব স্বীকার করিয়াছে এবং সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইয়াছে। ইহাতে পুলিশ কমিশনার মিঃ হ্যালিডে ও ভূপেন্দ্রবাবুর মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়।

কলিকাতার নানা স্থানে ঐ রাত্রে একই সময়ে খানাতল্লাস করা হয়। তন্মধ্যে মানিকতলার বাগানবাড়ীতে তল্লাস করিয়া বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর দত্ত, বিভূতি প্রভৃতি প্রায় ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বহু বোমা এবং উহা তৈয়ারী করার সাজসরঞ্জাম পুলিশ হস্তগত করে। তাঁহাদিগকে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করা হয়।

আদালতে কয়েক মাস শুনানী চলে, তাহার পরে বিচারের জন্য জেলা জজ মিঃ বীচক্রফ্‌টের এজলাসে তিনমাস শুনানী হইয়া থাকে।

এই মামলা চলিতে থাকাকালে যে সকল কৌসুলী নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা আদালতে আসিলেন না। তাহাতে সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় আমার পিতা তাঁহার বন্ধু-পুত্র মিঃ সি. আর. দাশের নিকট গেলেন। তিনি তখন সবেমাত্র ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহাকে বলিলেন অরবিন্দের মামলা চালাইতে ও বলিলেন যে, আমাদের অর্থ ফুরাইয়া আসিয়াছে, সামান্য কিছু আছে। তুমি তাহা লইয়া এই

মামলা চালাইয়া যাও, এমন কি হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা চালাইয়া যাইতে হইবে। মিঃ সি. আর. দাশ তাহাতেই রাজী হইলেন।

এই ব্যবস্থা করিবার কয়েকদিন পরেই ভারত গভর্নমেন্ট আমার পিতাকে বিনা বিচারে নির্বাসন দণ্ড দিয়া আগ্রা জেলে একাকী একঘরে আটক রাখিলেন। তিনি তথায় সংবাদপত্রও পাইতেন না। ১৯১০ সালে আমার পিতা যখন মুক্তি পাইলেন, তখন মিঃ সি. আর. দাশ ডুমরাই মামলায় নিযুক্ত। তথা হইতে আরা ষ্টেশনে আসিয়া যে ট্রেনে আমার পিতা কলিকাতা ফিরিতেছিলেন, সেই ট্রেনে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া জানাইলেন, "আপনার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়াছি। অরবিন্দ খালাস হইয়াছে।" এই প্রথম আমার পিতা জানিলেন, অরবিন্দ বৃটিশের কবল হইতে খালাস পাইয়াছে।

জেল হইতে খালাস পাইয়া শ্রীঅরবিন্দ সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া এক ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আলিপুর জেল হইতে কলেজ স্কোয়ারের তাঁহার মাসামার গৃহে আসিলেন। তথায় ১৯০৯ সালের মে মাস হইতে ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কিছুদিন পর্যন্ত ছিলেন। আমার পিতা নির্বাসন হইতে মুক্তি পাইয়া ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ১১ তারিখ কলিকাতা পৌঁছান। কলেজ স্কোয়ারের গৃহে অরবিন্দকে দেখিয়া আনন্দিত হন।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে এক গুজব উঠিল যে, অরবিন্দকে গভর্নমেন্ট পুনরায় গ্রেপ্তার করিবেন। একদিন প্রাতে রামচন্দ্র মজুমদার তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, অরবিন্দকে পুনরায় এক মামলায় যুক্ত করা হইবে অথবা নির্বাসিত করা হইবে। কোন দুশ্চিন্তা না করিয়া অরবিন্দ যথারীতি আহারাদি সমাপনান্তে তাঁহার শ্যামপুকুরের "কর্মযোগীন" কার্যালয়ে চলিয়া গেলেন। তাঁহার কর্মস্থলের সম্মুখে গোয়েন্দা পুলিশ-দল যথারীতি বসিয়াছিল, যেমন থাকিত কলেজ স্কোয়ারের সম্মুখে গোলদীঘিতে দিবারাত্রি অপর এক দল গোয়েন্দা।

ঐ দিন বৈকালে কর্মযোগীন অফিসের পিছনের দিকে দেওয়াল টপকাইয়া অরবিন্দ প্রভৃতি কয়েকজন শোভাবাজারের রাজগৃহের

ভিতর দিয়া আহিরীটোলার গঙ্গাঘাটে যাইয়া নৌকা ভাড়া করিয়া সারারাত্রি নৌকা বাহিয়া রাত্রিশেষে অন্ধকারের মধ্যে চন্দননগর পৌঁছিয়া ডুপ্লে কলেজের প্রফেসার চারু রায়ের নিকট আশ্রয় চাহিয়া লোক পাঠাইলেন। প্রফেসার রায় মানিকতলা বোমার মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন। তিনিও বেকসুর খালাস পাইয়াছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি আশ্রয় দিতে পারিবেন না।

শেষরাত্রে এই সংবাদ প্রবর্তক আশ্রমের মতিলাল রায়ের নিকট পৌঁছিল। তিনি ঐ শেষরাত্রের অন্ধকারে গঙ্গাতীরের গভীর কাদা ভাঙিয়া খুঁজিয়া নৌকা বাহির করিলেন এবং অরবিন্দকে লইয়া তাঁহার গৃহে তক্তা রাখার ঘরে স্থান দিলেন। তাঁহার স্ত্রীকেও তিনি জানিতে দেন নাই যে, তিনি একজনকে গৃহে স্থান দিয়াছেন। অপর স্থান হইতে সকালে ও রাত্রে আহার্য আনিয়া দুইবেলা অরবিন্দকে খাইতে দিলেন। মতিলাল রায়ের সহিত এই প্রথম পরিচয়, পরে ঘনিষ্ঠতা হয়।

একদিন মতিলাল রায়ের পত্নী অনেকদিন তক্তা রাখার ঘর পরিষ্কার করা হয় নাই বলিয়া গামছা পরিয়া ঝাঁটা হস্তে ঐ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন যে, একজন অজানা ব্যক্তি সেখানে বসিয়া আছেন, অমনি জিব কাটিয়া দ্রুত ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

দ্বিপ্রহরে আহার্য লইয়া মতিলাল রায় ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেই অরবিন্দ উত্তেজিত হইয়া মতিলাল রায়কে বলিলেন, "Moti, Moti, I have seen Kali!" এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া মতিলাল রায় আমাকে বলিলেন, "কি সরল মানুষ!"

এইস্থানে প্রায় একমাস কাল তিনি ছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানে আমরা যত না চিন্তিত হইয়াছিলাম, গোয়েন্দা পুলিশ তাহা অপেক্ষা অধিকতর চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল। পরে খবর পাই যে, তিনি চন্দননগর গিয়াছিলেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯১০) অরবিন্দ আমাকে পেন্সিলে লেখা এক পত্র লোক মারফৎ পাঠাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল "তুমি আমাকে

ভারতবর্ষের বাহিরে পাঠাইয়া দাও, ট্রেনে যাইব।" আমি উত্তর দিলাম "ট্রেনে যাইলে, আধ ঘণ্টার মধ্যে ধরা পড়িবে।" পরে পণ্ডিচেরীর ফরাসী রাজ্যে যাইতে চাহিলেন।

আমাদের গৃহের সম্মুখে গোলদীঘির এক প্রান্তে দিবারাত্রি আমাদের গৃহের উপর নজর রাখিতেছিল একদল গোয়েন্দা। ইহা দেখিয়া আমি তিন মাস বাড়ীর বাহির হইলাম না। আমার বিশ্বস্ত দুই যুবক নগেন্দ্রকুমার গুহরায় এবং সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীকে নিযুক্ত করিলাম। নিজে আর গৃহের বাহির হইলাম না। একজন কি করিতেছে তাহা অপরজন জানিল না। কখনও দুইজনকে একই সময় ডাকি নাই। দুইজনকে দুইরকম কার্যভার দিলাম।

সংবাদপত্রে পড়িলাম মার্সাই নামক একটি ফরাসী জাহাজ প্রিন্সেপঘাটে আসিয়াছে; উহা পণ্ডিচেরী, কলম্বো, গোয়া প্রভৃতি স্থানে যাইবে। অরবিন্দ ও তাঁহার সহযাত্রীর জন্য কলম্বোর দুইখানি টিকিট জাহাজ কোম্পানী হইতে না কিনিয়া সকল স্থানের টিকিট যাহারা বিক্রয়ের ব্যবসায় করে, তাহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিলাম। অরবিন্দ ও সহযাত্রী যাইবেন পণ্ডিচেরী কিন্তু পুলিশ যদি খোঁজ করে তবে কলম্বোতে তাঁহাদের খোঁজ করিবে, এদিকে উঁহারা পথে নামিয়া পড়িবেন।

টিকিট ব্যবসায়ীরা যাত্রীদের নাম ও ঠিকানা চাহিল। সত্য নাম ও ঠিকানা হওয়া চাই। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার গ্রাহকদের তালিকা খুঁজিয়া ভুটানের সীমান্ত স্থানের এক চা বাগানের কর্মচারীর এবং ঐরূপ নাগাভূমির সীমান্তের একজন কর্মচারীর নাম ও ঠিকানা দেওয়া হইল। যদি পুলিশ খোঁজ করে তবে ঐ সীমান্তে হাটিয়া পৌঁছাইতে চারি পাঁচ দিন সময় লাগিবে। ততদিনে ফরাসী জাহাজ আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে পড়িবে। অর্থাৎ, কোন বিদেশী জাহাজ অন্য কোন দেশে যাইয়া যদি তথাকার যাত্রী বহন করে, তবে সেই জাহাজ সেই দেশের উপকূল হইতে তিন মাইল সমুদ্রে যদি অগ্রসর হয়, তবে ঐ জাহাজের যাত্রীগণ যে দেশের জাহাজ, সাময়িকভাবে সেই দেশের

ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। কি করে নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করতে হয়, কি করে সরকারী সাক্ষী তৈরী করা যায়, কি করে মিথ্যা মামলাকে সত্য বানিয়ে বাঙলার দামাল ছেলেদের শাস্তি দেওয়া যায়, এ সব চিন্তা ছিল তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। এ হেন আশু বিশ্বাসকেই একদিন এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেন শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

কিশোর চারু বসুর ডান হাতখানা ছিল অশক্ত। হাতের পাতা ও আঙুলগুলো জন্মাবধি নেই। কিন্তু অন্তরে ছিল তাঁর আগুন। প্রেরণা ছিল স্বয়ং যতীন মুখার্জীর।

এই চারু বসু-ই তাঁর পঙ্গু ডান হাতে শক্ত করে রিভলবারটি বেঁধে নিয়ে বাঁ হাতে ট্রিগার টেনে সুবারবন কোর্টের সামনে ১০-২-১৯০৯ তারিখে আশু বিশ্বাসকে গুলিবিদ্ধ করে নিহত করেন।

আদালতে চারু বসু মাত্র কয়েকটি কথাই বলেছিলেন: "সেসনের বিচার অবান্তর। কালই আমাকে ফাঁসি দেওয়া হোক। সবই ভবিতব্য। এটা ঠিকই ছিল যে আশুবাবু আমার বুলেটে মরবেন এবং আমি ফাঁসির দড়ি গলায় পরব। দেশের শত্রু বলেই আমি তাঁকে নিধন করেছি।"

বিচারে চারু বসুর ফাঁসির আদেশ হয়। ১৯০৯ সালের ১৯শে মার্চ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে চারু বসু শহীদলোকে উত্তীর্ণ হন।

এবারে সাম্‌সুল আলমের কথা।

আলিপুর বোমা-ষড়যন্ত্র মামলার তদ্বিরের ভার ছিল এই আলম সাহেবের-ই উপর। সরকারী কৌঁসুলী মিঃ নর্টনের তিনি ছিলেন দক্ষিণ হস্ত। "মামলা সাজানো, মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো, মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করে তাকে কাজে লাগানো, রাজবন্দীদের মধ্যে যাঁরা কচি ও কাঁচা, তাঁদের দুর্বলতা খুঁজে পেতে বের করে তা মামলার সুবিধার্থে প্রয়োগ করা, গড়ে পিটে বাজে সাক্ষী রূপে কাউকে চালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় নিকৃষ্ট কাজে তিনি উৎকৃষ্ট ছিলেন। সাম্‌সুল আলম মানে, আলিপুর মামলার একটি জীবন্ত নথিপত্র। তাঁর অভাব মানে, মামলা খুঁড়িয়ে চলা।" (ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব)

কাজেই আশু বিশ্বাসের মত সামসুল আলমের দিনও ঘনিয়ে এলো।

সেদিন ২৪শে জানুয়ারি, ১৯১০ সাল। সরকারী উকিলদের মামলার কাগজপত্র সেদিনকার মত বুঝিয়ে দিয়ে সামসুল আলম হাইকোর্টের উপর তলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন। সঙ্গে সশস্ত্র দেহরক্ষী। বেলা তখন প্রায় ৫টা। ঠিক তখনই ঘটনাটি ঘটে গেল। ১৯ বছরের কিশোর শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্তের গুলিতে সামসুল আলম ধুলায় গড়িয়ে পড়লেন।

বিচারে বাঘা যতীনের সুযোগ্য শিষ্য বীরেন দত্ত গুপ্ত কোনো উকিল ব্যারিস্টারের সাহায্য নেন নি। বলেছিলেন, "আমি ওকে হত্যা করেছি। বাস, আর কিছু বলার নেই।"

১৯১০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী 'অরবিন্দ যুগের শেষ অগ্নিশিষ্য' বীরেন দত্ত গুপ্ত ফাঁসির রজ্জু চুম্বন করে শহীদ হন।

ইংরেজের স্নেহধন্য সরকারি "শহীদ" নন্দলাল ও সামসুল আলমের স্মৃতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থা ইংরেজ সরকার করেছিল কিনা তা ঠিক জানা নেই। তবে ভবানীপুর অঞ্চলে ইংরেজের অপর প্রিয় পাত্র এবং 'সরকারী শহীদ' আশু বিশ্বাসের নামে একটি রাজপথ স্বাধীনতা অর্জনের ৩০ বছর পরেও দিব্যি সগৌরবে বিরাজ করছে।

রাস্তাটির নাম বদলে শহীদ চারু বসু রোড করা কি উচিত নয়? শহীদ বীরেন দত্ত গুপ্তকেই বা আমরা ভুলে যাই কি করে? তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করাও যে আমাদের একটি জাতীয় কর্তব্য

'রক্ত এখনও দিতে হবে ঢের
দিতে হবে আরো প্রাণ
মৃত্যুর তীরে জীবনের ধ্বজা ওড়াতে'।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

খবর মেলেনি

তপনকিরণ রায়

ইনি! বিশ্বাস হয় না। মনে হয়, এ যেন এক সমৃদ্ধ ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। সেই ১৯১৪ সালের কথা। তারপর কত গ্রীষ্ম, কত বর্ষা, কত কান্না হাসির মালা গাঁথা দিন গড়িয়ে গেছে জীবনের উপর দিয়ে। আজকের এই জরাজীর্ণ মানুষটির মধ্যে সেদিনের সেই ঐতিহাসিক পুরুষটিকে খুঁজতে চাওয়াও যে বৃথা।

'কাকে চাই'! পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন সুরেন বর্ধনের স্ত্রী।

বন্ধু জয়নারায়ণ সাহা বললেন—আমরা সুরেনবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

—ঐ তো বসে আছেন ওখানে। তবে আপনাদের একটু জোরে কথা বলতে হবে। কানে বড্ড কম শুনতে পান আজকাল।

এগিয়ে গিয়ে আমি তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে জোরে জোরে বললাম—'আমরা রায়গঞ্জের 'অভিযান' পত্রিকা থেকে এসেছি সেদিনের কাহিনী কিছু শুনবো বলে'।

—বলুন কি বলতে চান! হাতজোড় করে নমস্কার করলেন সুরেনবাবু।

—আমরা রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের ঐতিহাসিক কাহিনী জানি। বিপ্লবী নায়ক শ্রীশ পাল কিভাবে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলেন, সবই আমরা ইতিহাসের পাতায় পড়েছি। কিন্তু এ ব্যাপারে নিজের উপর সব চাইতে বেশি ঝুঁকি যিনি নিয়েছিলেন, সেই হাবু মিস্তিরের কি হল?

হাবু ভাই! একটা আর্ত চীৎকারের মতই কথাটা বেরিয়ে এল সুরেনবাবুর মুখ থেকে। সর্বস্ব হারালে মানুষের চোখে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে, সেই ব্যাকুল বিভ্রান্তি দৃষ্টিই ফুটে উঠল তাঁর চোখের তারায়।

কয়েকটা নিঃসীম মুহূর্ত। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন সুরেনবাবু:

"আমি বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের দলের সদস্য। ১৯০৫ সালে এই দল প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি প্রতিষ্ঠাতা সভ্যদের একজন। তখন আমি রংপুর জেলার নাগেশ্বরীতে থাকতাম। পেশায় চিকিৎসক। হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে সিগন্যাল পেলাম—কিছু একটা ঘটতে চলেছে, আমি যেন প্রস্তুত থাকি

দিন কয়েক পরের কথা। খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই হঠাৎ দুজন কুলি আমার এখানে এসে হাজির। ভাল করে লক্ষ্য করতেই চিনতে পারলাম—একজন শ্রীশ পাল, অন্যজন হাবু ভাই। সব কথাই শ্রীশদা খুলে বললেন আমাকে। ভাবনা হাবু ভাইকে নিয়ে। সে ঐ রডা কোম্পানীরই মালবাবু। আর কাউকে না পেলেও পুলিশ হাবু ভাইকে ছেড়ে কথা বলবে না। তাই আমার এখানেই তাকে কিছুদিন লুকিয়ে রাখতে হবে অতি সংগোপনে।

হাবু ভাইকে আমার কাছে রেখে পরদিনই শ্রীশদা ফিরে গেলেন কলকাতায়। উচ্ছল, প্রাণচঞ্চল ছেলে হাবু ভাই। চুপ করে থাকা তার স্বভাব নয়। প্রথম কয়েকদিন একটু সতর্ক ছিল, তারপরই তার চোখ পড়ল আমার ঘোড়াটার দিকে। সব সময় ছুটাছুটি করত ঘোড়াটা নিয়ে। নিষেধ করলেও শুনতো না।

একে নতুন ছেলে, তার উপর মুখে কলকাতার ভাষা, তাই স্বভাবতঃই সে লোকের নজরে পড়ে গেল।

ইতিমধ্যে খবর পেলাম, রডার ব্যাপারে কলকাতায় অনেককেই নাকি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অনুকূল মুখার্জী, কালিদাস বসু, গিরিন ব্যানার্জী, নরেন ব্যানার্জী, ভুজঙ্গধর দত্ত, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, সতীশ দে,

উপেন সেন, প্রভুদয়াল হিম্মৎ সিঙ্কা, অনুকূল রায়—এমনি অনেকেই।

এখানে হরিদাস দত্তর কথা একটু বলা দরকার। ওকে নিয়ে এক কালে গারো হিলে আমি অনেক ঘুরেছি। ওর ইচ্ছা ছিল—আধ্যাত্মিক জগতে যাবার, কিন্তু আমিই ওকে নিষেধ করে বলেছিলাম যে, পরাধীন দেশে আধ্যাত্মিকতার কোন মূল্য নেই। রডা অস্ত্র লুণ্ঠন কালে ও সেজেছিল ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান। ওকেও ধরেছে। মূল নায়ক শ্রীশদা ধরা পড়েছিলেন অনেক পরে—১৯১৬ সালে। প্রমাণের অভাবে তাঁকে ষ্টেট প্রিজনার করে রাখা হয়েছিল হাজারীবাগ জেলে।

এদিকেও বিপদের পদধ্বনি শুনতে পেলাম। ডাক্তার বলে থানার ছোট দারোগাবাবু আমাকে একটু খাতির করতেন। হঠাৎ তিনি একদিন জানালেন—আমি যেন একটু সতর্ক থাকি। কলকাতা থেকে দু-এক দিনের মধ্যেই নাকি আই. বি-র লোক আসছে, আমার বাড়ি সার্চ করবে বলে।

খবর পেয়ে সেদিনই আমি হরিদাস দত্তর ছোট ভাই যামিনী আর আমার একান্ত বিশ্বাসী নীলকমল দাসের সাহায্যে হাবুভাইকে আসামের 'রাভা'দের মধ্যে পাঠিয়ে দিলাম। ওরা আমার খুব অনুগত ছিল।

পরদিনই পুলিশ এসে হাজির। জানতে চাইল, হাবু মিত্র নামে নতুন ছেলেটি কোথায় ?

বললাম—হাবু মিত্র বলে কাউকে আমি চিনিনে। চাকুরির খোঁজে আমার এক মাসতুতো ভাই এসেছিল। কদিন আগেই সে চলে গেছে এখান থেকে।

দিনকয়েক বাদেই ধরা পড়লাম। ছাড়া পেলাম দীর্ঘদিন বাদে। ফিরে এসেই হাবু ভাইয়ের খোঁজ করলাম। আশ্চর্য, রাভাদের মধ্যে কেউ কিছু বলতে পারলেনা। সে নাকি বহুদিন ধরেই ওখান থেকে নিরুদ্দেশ।

কোথায় গেছে, কেউ জানেনা। তবে তাদের ধারণা—সে নাকি জনৈক রাভা সঙ্গীসহ পাহাড়ের দিকে গিয়েছে, ফ্রন্টিয়ার পাড়ি দিয়ে পায়ে হেঁটে চীনদেশে যাবে বলে।

—তারপর আর কোন খবরই কি পাননি?

—না, কোন খবরই পাইনি। দীর্ঘকাল আটক ছিলাম বলেই হাবুভাই এভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল। দুঃখ! না, দুঃখ কিসের! এইতো বিপ্লবী জীবনের ভাগ্যলিপি।

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন সুরেনবাবু। এই ফাঁকে শৈলেশ দে-র 'রক্তের অক্ষরে' বইটি হাতে তুলে দিয়ে বললাম —'দেখুনতো এই ফটোটা চিনতে পারেন কিনা?

হরিপদ রায় এগিয়ে গিয়ে চশমাটা পরিয়ে দিলেন সুরেনবাবুর চোখে। পরম আগ্রহে বইটি কাছে টেনে নিয়ে সলজ্জভাবে বললেন —'হ্যাঁ, চিনেছি। আমারই ফটো। অনেকদিন আগে তোলা'।

বিদায় নিয়ে তিনজনেই উঠে দাঁড়ালাম। অনেকদূর পর্যন্ত এসে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, ঝড়ের মুখোমুখি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা বিশীর্ণ বনস্পতির মত একদৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন সেই ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের একমাত্র জীবিত অংশীদার বিপ্লবী নায়ক সুরেন বর্ধন।

'আমি বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই—পাপপুণ্য আমার কাছে মিথ্যে পরিহাস। ওসব ভাল কাজ আমার কাছে ছেলে খেলা। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটি মাত্র সাধনা। এই আমার ভাল—এই আমার মন্দ,—এছাড়া এ জীবনে আর আমার কোনও কিছু নেই'।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পথের দাবী)

সত্য যে কঠিন

ঋণ.ঝা দাস

১৯১৫ সাল। চারিদিকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের রণ-দামামা বেজে চলেছে। এদিকে সারাদেশে তখন বৈপ্লবিক আগুন জ্বলে উঠেছে। ব্রিটিশের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা শুরু হয়েছে। শুধুই কি ব্রিটিশের রক্ত? না। সেই সঙ্গে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের দলও আছে বৈকি। ওদের মুখ দেখাও যে পাপ।

কিন্তু রাধাচরণ নামের ঐ ছেলেটি? সেও তো বিশ্বাসঘাতক রাধাচরণ শুনেছেন সেদিন বিপ্লবীদের এমনি সব ধিক্কার ধ্বনি। তবু তিনি নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। কারণ, কথাটাতো মিথ্যে নয়। তিনি পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, এতো সত্য কথা। অতএব লাঞ্ছনা, অবমাননা, ধিক্কার এসবই তো তার প্রাপ্য।

কিন্তু সত্যিই কি তাই! না, মন্ত্রগুপ্তির শপথ ভঙ্গ করে সেকথা প্রকাশ করা চলবেনা কোনদিনও। সুতরাং একটা মিথ্যাকেই চরম সত্যে পরিণত করে বাকি জীবনটা নিঃশব্দে সবার ঘৃণা আর অপবাদ কুড়িয়ে তাকে পার করতে হবে। এই তার নিয়তির অমোঘ নির্দেশ।

সত্যকে জানতে হলে আর একটু পিছিয়ে যেতে হবে আমাদের। ১৯১৪ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ভারতবর্ষের বিপ্লবী দলগুলিতে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হেনে আরব সাগরের জলে ভাসিয়ে দেবার এই তো অপূর্ব সুযোগ। বিপ্লবীদের সঙ্গে জার্মান সরকারের এক চুক্তি হয়েছে। আর এ চুক্তির ফলে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ আসবে ভারতে। ভারতীয় বিপ্লবীরা সশস্ত্র হয়ে উঠবে জাহাজ ঘাটে লাগলেই।

১৯১৫ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ ঘোষিত হবে। নেতৃত্ব

করবেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও বাংলার সর্বদলীয় নেতা বাঘা যতীন। সব ব্যবস্থা প্রস্তুত। এবার চাই টাকা। জাহাজ থেকে মাল খালাস এবং অন্যান্য কাজের জন্য বেশ কিছু টাকা চাই। ঠিক হ'ল, বিখ্যাত বার্ড কোম্পানির টাকা লুঠ করা হবে। এবং কাজেও তাই করা হ'ল।

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫। প্রখর সূর্যের আলোকে ঘটে গেল এক অভূতপূর্ব ডাকাতি। টাকা হাতে এল। কিন্তু ধরা পড়লেন নরেন ভট্টাচার্য ও রাধাচরণ প্রামানিক।

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বাঘা যতীন। মাত্র ন'দিন পর বিদ্রোহ ঘোষিত হবে। এসময় নরেন ছাড়া তার চলবে না। যে কোন মূল্যের বিনিময়ে নরেনকে তাঁর চাইই।

অথচ হাজার চেষ্টা করেও বন্দী নরেনকে বাইরে আনা যাচ্ছে না। বিপদের ঝুঁকি নিয়েও শেষ পর্যান্ত বাঘা যতীন দেখা করলেন পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধুর সঙ্গে। এবং তারই পরামর্শে আদালতে দাঁড় করান হ'ল একটি তরুণকে, যিনি সব অন্যায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে নরেনের জামিনের পথ পরিষ্কার করে দেবেন।

দলনেতা পূর্ণদাসের আদেশ শিরোধার্য্য করে আদর্শহীনতার চরম লজ্জাকর মুকুট মাথায় পরে নিলেন বিপ্লবী তরুণ। আদালতে দাঁড়িয়ে স্বীকার করলেন—"হ্যাঁ, সব দোষ আমার। আমিই করেছি একাজ। নরেন নামে আমি কাউকে চিনিনে। শুনিনি ও নাম কোনদিন।"

আর কি চাই। এইটুকুই তো যথেষ্ট। জামিনে খালাস পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নরেন বিপ্লবের প্রয়োজনে সি. মার্টিন সেজে চলে গেলেন বাটাভিয়ায়। সেদিনের নরেন বা সি. মার্টিন পরবর্তীকালে পৃথিবীখ্যাত বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র রায় হতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই বিপ্লবী তরুণ? যে নিজে আদর্শচ্যুত হয়ে, বিপ্লবী থেকে দেশদ্রোহী হয়ে, নিঃশব্দে নেতার আদেশ পালন করে, নরেনের মুক্তির পথ খুলে দিলেন, সেই রাধাচরণ প্রামানিক কি পেলেন? কিছুই না। অগ্নিযুগের ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম নেই। নেই তাঁর কোন পরিচয়।

বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে মহান আত্মত্যাগ করেও তিনি অন্ধকারেই রয়ে গেলেন সারা জীবন।

'মানুষকে ভালোবেসে অন্ধকার ভেঙে
সূর্য আনে কেউ
দু'চোখে তার স্বাধীনতা—স্বাধীনতা
যেন এক অতলান্ত স্বপ্নের ঢেউ'।

— নীরেন রায়

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ

মানবেন্দ্রনাথ রায়

[স্বদেশে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য॥ বাটাভিয়াতে সি মার্টিন। আমেরিকা যাবার পথে—হরিসিং। সবশেষে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিপ্লবীনায়ক এম. এন. রায়, যাঁর বিস্ময়কর কার্যকলাপ ও চিন্তাধারা সেদিন প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল সারা বিশ্বে। বর্তমানে পরলোকগত।]

তাঁকে আমরা শুধু দাদা বলেই ডাকতাম। দাদাদের কালে তিনি ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয়। আধুনিক শিল্পচর্চার মত আমাদের অপক্ক রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রেও এই দাদাবাদ অন্ধ অনুরাগমিশ্রিত শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই পরিমণ্ডলে স্নেহের ছদ্মনামে ছিল তোষামুদে আচরণ, ঋষিসুলভতার অন্তরালে কুৎসিৎ ঈর্ষাকাতরতা,

আর আনুগত্যের ভেকধরা এলোপাতাড়ি বীরপূজার অদ্ভুত কায়দা; কিন্তু যতীনদা এসবের প্রবক্তা কিংবা ধারক বাহক ছিলেন না।

অস্পষ্ট আদর্শবাদের এক পরিবেশের মধ্যে ছিলাম আমরা। অনেকেরই জীবনের পথ ও পাথেয় সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, ছিল না নির্দিষ্ট কোন দার্শনিক মতবাদ। কেবল আমাদের চেতনার মধ্যে যে বাসনা সর্বোচ্চ ছিল, তা হল—ইতিহাসের পাতায় বীর হিসেবে স্থান পেতে হবে এবং কালের বালুকাবেলায় পদচিহ্ন এঁকে যেতে হবে।

কবি সাদে (Southey)-এর রচনা কলেজে আমাদের পাঠ-ক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বারীন ঘোষ সে সময় অস্পৃয়ক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আবির্ভূত হলেন; তাঁর কথা আমাদের কল্পনার রঙীন ফানুস-গুলো নিষ্ঠুরভাবে ছিন্ন ভিন্ন করে দিত। তথাপি অন্তরঙ্গ অনুগামী হিসেবে আমরা বীরবন্দনায় আস্থাবান ছিলাম, যদিও একসময় কোন এক পুরোগামী আমাদের গুরুবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে-ছিলেন। বারীন প্রায়ই বলতেন, ঘৃণ্যতম কাপুরুষও ফাঁসির দড়ি গলায় পড়তে পারে, যদি সে জানতে পারে—সমস্ত দেশ তাকে সহর্ষ প্রশংসা করছে, হাততালি দিচ্ছে। বারীনের এই টিপ্পনী আমার মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল; সম্ভবত কালক্রমে আমি যে পথের অনুসরণ করেছি, তারই দিক্‌-নির্ণায়ক ছিল ঐ কথাগুলো।

আমাদের জীবনাদর্শ, অর্থাৎ আত্মাহুতি দেবার উদগ্র কামনা কি স্বার্থপরতারই ভিন্ন নাম, উত্তরপুরুষের দৃষ্টিতে সম্মানিত ও স্মরণীয়রূপে চিহ্নিত হবার বাসনা মাত্র? এই প্রশ্ন অহর্নিশ আমার মনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। উচ্ছল যৌবনাবেগ কোন প্রকারেই অবদমিত হয় না; বারীনও এটা চাইত বলে আমার মনে হয় না। খুব সম্ভব বারীন চাইত, আমরা মানুষ হিসেবে মহৎ হই; ইতিহাস-খ্যাত নায়ক নাই বা হলাম।

যতীন মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে একটা সহজ আকর্ষণী শক্তি ছিল, যা অন্যান্য দাদারা অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করতেন।

যতীনদা এ বিষয়ে অনন্য এবং একটি উদাহরণযোগ্য ব্যতিক্রম বিশেষ। অতএব, যতীনদা তাঁর প্রতিপক্ষের কাছে যেমন প্রহেলিকা, তেমনি আবার হতাশার কারণও ছিলেন। যতীনদা কখনো অনুগামী সংগ্রহের চেষ্টা করতেন না। যতীনদাকে সকলে ভালোবাসতো, এমন কি অন্যান্য দাদাদের অনুগামীরাও।

একবার কোন দু'জনার আলোচনার কিছু অংশ আমার কানে এসেছিল। তখনও আমি অন্য দাদার ছত্রচ্ছায়ায়। শুনলাম, দাদা তাঁর শিষ্যকে দ্বিধাগ্রস্ত আনুগত্যের অভিযোগে তিরস্কার করছেন শেষ পর্যন্ত সন্দেহভাজন শিষ্যটি তিতি-বিরক্ত হলেও মৃদু কণ্ঠে বলল, "তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বারণ করছেন কেন? আপনাকে ছেড়ে তাঁর দলে ভিড়তে তিনি তো বলেন নি; উপরন্তু তাঁর কোন দলই নেই।"

কে সেই অদ্ভুত দাদাটি তা জানতে কৌতূহলী হয়ে রইলাম। তিরস্কৃত ভাইটি ছাড়া পেতেই আমি তাকে ধরে পড়লাম। সমস্ত কাহিনী শুনলাম। পরদিনই সে আমাকে সেই অসাধারণ দাদাটির কাছে নিয়ে গেল। আগেই বলেছি, তিনি অনুগামী সংগ্রহের ভূমিকা গ্রহণ করেন নি কোনদিনও, কিন্তু আমি চিরকালের মতো তাঁর কাছে ধরা পড়ে গেলাম।

তখনো তাঁর আকর্ষণী শক্তির রহস্য ভেদ করতে পারিনি আমি দৃশ্যতঃ শারীরিক দিক থেকে সাধারণ মানুষের মতো হলেও তিনি একজন দক্ষ মল্লবীর ছিলেন। তাঁর দৈহিক শক্তির কাহিনী কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর শরীরগত গঠন থেকে এর আভাসমাত্রও পাওয়া যেত না। তাঁর আচার-ব্যবহারে আত্মম্ভরিতার প্রকাশ ছিল না এতটুকুও। যতীনদার বক্তব্যের মধ্যে এমন কিছু থাকত না, যা থেকে বোঝা যেত যে, ভাবীকালে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার জন্য বিপুল অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য তাঁর বিস্তৃত সংগঠন আছে।

পরবর্তীকালে আমি উপলব্ধি করেছিলাম, কোন্ শক্তি দিয়ে তিনি আমাকে আকৃষ্ট করেছিলেন। সেই অদৃশ্য শক্তি—তাঁর ব্যক্তিত্ব।

তখন থেকে আমি সমকালীন বহু অসাধারণ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য-সুখ পেয়েছি। এঁরা সকলেই স্বনামখ্যাত মানুষ, আর যতীনদা ছিলেন যথার্থই ভালো মানুষ। তাঁর চেয়ে ভালো মানুষ আজ অবধি পেলাম না।

যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের যাদুস্পর্শ পাই, তখনো গণ-সংগঠন আর গণ-সম্মোহনের দিন শুরু হয়নি। দাদাদের অনুগামীদের সংখ্যা খুবই কম ছিল এবং তা প্রায় হাতে গোণা যেত। 'আনন্দমঠের' ঢঙে শুধুমাত্র লাঠি হাতে ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করা সেদিন সুদূর কল্পনা মাত্র ছিল। এমন কি গুটিকয়েক অত্যুৎসাহী দেশপ্রেমিক 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি তুললেও ভারতীয় পুলিশ কোডের ১২৪-এ ধারা মোতাবেক বন্দী হওয়ার সম্ভাবনা তাদের থেকে যেতো।

কালচক্র পরিবর্তিত। যে মানুষ একদা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের প্রবলতম বিরুদ্ধাচারী এবং অসম সাহসী সন্ত্রাসবাদী বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি একজন মহান পুরুষ বলে স্মরণীয় হবেন হয়ত। তাঁর জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হবে, জীবনীও লেখা হবে। তাঁর সময় থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বহুলোকের ভিড় হয়েছে, যাঁরা মহামানব হিসেবে ঐতিহাসিক স্মরণকক্ষে স্থান না পেলেও ইতিহাসের পাদপ্রদীপে স্থান দাবি করছেন। যতীনদার যথার্থ সাহসিকতাপূর্ণ কার্যকলাপ থেকে লোকপরম্পরায় চলিত কাহিনীগুলি বাদ দিলে তাঁর নাম হয়ত জাতীয় বীরের তালিকায় স্থান পাবে না। যতীনদা নিজেও তাতে হতাশ হতেন বলে আমার মনে হয় না। যতীনদা ছিলেন প্রকৃত আদর্শবাদী পুরুষ, যাঁর জুড়ি মেলা ভার এবং এই আদর্শের জন্যই তিনি প্রশংসার যোগ্য। এধরণের আদর্শবাদী আদর্শকে আঁকড়ে ধরেই বাঁচেন এবং কালের বুকে কোন স্বাক্ষর না রেখেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে, তাঁরা এমন আশার আলোক ধারণ করেন, যা সাধারণের মনোজগতের অন্ধকার ভেদ করে সত্যপথের নির্দেশ দেয়।

ঘটনাবহুল বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীতে পূর্ণ যতীনদার জীবন-পঞ্জী

রচনা করলে মিথ্যা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে। তিনি নিজেও নিশ্চয় স্বীকার করতেন যে, তাঁর জীবনের শেষদিনগুলোর করুণ কাহিনী অক্ষশক্তি পদানত ইউরোপীয় দেশসমূহের প্রতিরোধ আন্দোলনের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বালাশোর জঙ্গলের কাহিনী নিঃসন্দেহে নাটকীয় পূর্ণ: সেই নাটক সংঘটিত হয়েছিল একজন সুনিপুণ শিল্পীর দ্বারা—এবং সেই নাটকে মহাকাব্যের বিশালতাও বর্তমান। কিন্তু এমন নাটকটির উপজীব্য হওয়া উচিত নায়কের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব এবং সম্পূর্ণ মানুষটিকে ঘিরে—তাঁর লক্ষ্যভেদের নিপুণতা, সফলতার সঙ্গে আত্মরক্ষা করা এবং কয়েকটি মাত্র কার্তুজ দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা দিয়ে নয়।

যতীনদাকে গোপন-আবাস থেকে বন্দী করে আনতে যে রাজপুরুষেরা গিয়েছিল, তাদের দলপতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা জ্ঞাপনের ছলে বলেছিলেন, "তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি অস্ত্রধারণ করে মৃত্যুবরণ করেছেন।" মনে হচ্ছে ভারতীয় বলতে তিনি সন্ত্রাসবাদীদের কথাই বলেছিলেন। নতুবা একথা বললে ভুল হবে না যে, যতীনদার প্রতি এই সপ্রশংস উক্তি দ্বারা ভারতীয় যুবশক্তির অবমাননাই করা হয়েছিল। সে যাই হোক, যতীনদার জীবনকে যদি নাটকীয় করার চেষ্টা করাও হয়, তবে তা একজন পুলিশের অসঙ্গত উক্তি দিয়েই যেন তাঁর শেষকৃত্য সমাধা না হয়।

মানুষ হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে—এমন লোকেরা প্রায়ই মহান্ পুরুষদের তালিকাভুক্ত হন না। এব এই ধারার কখনো ব্যতিক্রম হবে না, যতদিন না একথা স্বীকৃত হচ্ছে যে সততাই মানবতার মানদণ্ড। যতীনদা মধ্যযুগীয় যুদ্ধ-লিপ্সা তথা বীরত্বের ধ্বজাবাহক ছিলেন না। তিনি কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধও নন—তাঁকে সর্বকালীন বলা যায়। তাঁর মূল্যবোধ ছিল মানবিক, তাই তা স্থান ও কালোত্তীর্ণ। তিনি যেরূপ সাহসী এবং অনমনীয় ছিলেন, ঠিক ততটুকুই ছিলেন দয়ার্দ্র ও সত্যান্বেষী। তাঁর বীরত্বব্যঞ্জনার মধ্যে

নিষ্ঠুর প্রবৃত্তির প্রকাশ ছিল না, তাঁর অনমনীয়তা তাঁকে অসহিষ্ণুও করে তোলেনি।

সমকালীন শিক্ষিত যুবকদের মতো তিনিও স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মসংস্কারের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও মানবিক কল্যাণকামী যে ধর্ম স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করে গেছেন তাই তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন।

যতীনদা নিজেকে 'কর্মযোগী' বলে মনে করতেন, এবং কর্মযোগের আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরতেন। 'কর্মযোগী' শব্দটি থেকে সমস্ত রকমের অস্পষ্টতা বাদ দিলে কর্মযোগী হলেন প্রকৃত মানবতা-বাদী, যে মানুষ বিশ্বাস করেন মানবিক কার্যকলাপের মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি সম্ভব। তিনি অতি অবশ্যই মানুষের সৃজনী শক্তিতে আস্থাবান, অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানুষ নিজেই তার ভাগ্য-বিধাতা। এটাও মানবতাবাদের মূল কথা।

যতীনদা একজন মানবতাবাদী পুরুষ, সম্ভবতঃ আধুনিক ভারতে তিনিই সর্বপ্রথম। যতীনদাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেই তাঁর স্মৃতির প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া' (পরে 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট') পত্রিকায় ২৭. ২. ৩৯ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবাদ। ফি. এন. সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং উক্ত পত্রিকার অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

অনুবাদিকা—বনপ্রতিমা দাশগুপ্ত।

'বাঙালীর রণ দেখে যা রে তোরা রাজপুত, শিখ, মারাঠা, জাট!
বালাশোর—বুড়ি বালামের তীর—নব ভারতের হলদিঘাট।'

—কাজী নজরুল ইসলাম

হাসে অন্তর্যামী

রাণী দেবী

'রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম—
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব'—হাসে অন্তর্যামী' ॥

অন্তর্যামী বুঝি সত্যই হেসেছিল সেদিন। নইলে কবিগুরুর এই কথাগুলো হঠাৎ সেদিন এমন অর্থবহ হয়ে ধরা দেবে কেন আমার চোখের সামনে?

তারিখটা ছিল ১৫ই আগষ্ট, স্বাধীনতা দিবস।

অনুষ্ঠান শেষে গল্পে গল্পে ফিরে আসছিলাম আমরা ক'জন। আমি, শিপ্রা, জলি, মলি আর মাধবী। মাধবী এ পাড়াতেই থাকে। ওকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে তারপর আমরা সবাই ফিরে যাব নিজেদের বাড়িতে।

আনন্দে উচ্ছ্বাসে আমরা সবাই তখন ভরপুর। পার্কে অনুষ্ঠিত উৎসবটি সত্যিই খুব মনোগ্রাহী হয়েছিল। নাচ, গান, বাজনা—কিছুই বাদ ছিলনা।

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—জনৈক তরুণ নেতার উপস্থিতি। অবশ্য তাঁর পক্ষে বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব ছিলনা। সময়ও ছিলনা। কারণ, এর পরেও নাকি আরো বাইশটি অনুষ্ঠানে তাঁকে ভাষণ দিতে হবে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি যে সময় করে আসতে পেরেছেন—তাইতো আমাদের পরম সৌভাগ্য।

—কোথায় গিয়েছিলে দিদিভাই! হঠাৎ মাধবীকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন রোয়াকে উপবিষ্ট জনৈক সদানন্দ বৃদ্ধ।

—ফাংশনে গিয়েছিলাম। আপনি গেলেন না দাতু?

—না দিদিভাই। বৃদ্ধের সারামুখে ম্লান বিষণ্ণ হাসি, কি হবে গিয়ে! আমি তো কবেই হারিয়ে গেছি।

—উনি কে রে! যেতে যেতে প্রশ্ন করলাম মাধবীকে

—আমাদের সবার দাতু। নাম—পঞ্চানন চক্রবর্তী।

পরের কাহিনী মাধবীর মুখ থেকেই আমার শোনা। বেশ মনে আছে, শুনতে শুনতে সেদিন দেহের সমস্ত রক্ত বুঝি হিম হয়ে গিয়েছিল আমার। বার বার মনে হচ্ছিল—এ ও কি সম্ভব! সর্বাগ্রে এ ইতিহাসকে প্রণাম না করে কিসের আনন্দে আমরা মত্ত হয়ে ছিলাম এতক্ষণ?

১৯২১ সালের শেষভাগের কথা। পঞ্চানন চক্রবর্তী তখন বন্দী-জীবন যাপন করছিলেন ফরিদপুর জেলে

এখন কি হয় জানিনে, তবে তখনকার দিনে জেলখানায় একটা গ্লানিকর নিয়ম চালু ছিল, যাকে বলা হত—'সরকার সেলাম' কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী জেল পরিদর্শনে এলেই জমাদার উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিত—'সরকার'! লাইন করে দাঁড়িয়ে কয়েদীদের তখন মাথা নুইয়ে বলতে হত—'সেলাম'।

এছাড়া প্রতি রোববার সকালে আরো একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত, যা রীতিমত বীভৎস। কাজটা হল—সবসমক্ষে একটা তেপায়ায় ঝুলানো বন্দির বস্তার গায়ে চাবুক মারার মহড়া প্রদর্শন। ভাবটা এই যে—খুব সাবধান। অবাধ্য হলে ঐ বন্দির বস্তার জায়গায় তোমাদেরই ঝুলানো হবে, তা মনে থাকে যেন।

গোল বাধল এই সরকার সেলাম নিয়ে। সেদিন ভোরে শ্বেতাঙ্গ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হগ্ এসেছেন জেল পরিদর্শনে। অমনি সাজ সাজ রব পড়ে গেল প্রভুভক্ত সেপাই মহলে। লাইন লাগাও! লাইন লাগাও! জলদি!

তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন পঞ্চানন চক্রবর্তী। এ হুকুম আমরা মানিনে, মানব না। বিপ্লবী কোনদিনও শাসকদের কাছে মাথা নোয়ায় না। বন্ধুগণ, তোমরা সবাই চলে এস লাইন ছেড়ে।

দেখতে দেখতে লাইন ফাঁকা। সবার মুখে এক কথা—এখন থেকে আমরা এই সরকার সেলাম আইন মানব না।

আহত জন্তুর মত ফুঁসে উঠলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হগ! এতবড় সাহস ঐ বিপ্লবীদের! দেখা যাক।

—হুজুর মা বাপ, আমাদের কোন দোষ নেই। সাফাই গাইল সেপাইয়ের দল, ঐ পঞ্চাননবাবু সব কোইকো বিগাড় দিয়া।

ইন্ধন যোগালেন ডেপুটি জেলার কার্ত্তী সাহেব,—ওরা ঠিকই বলেছে হুজুর। যত নষ্টের শনি ঠাকুর হল ঐ পঞ্চানন চক্রবর্তী।

বটে? নিমেষে লাল মুখ আরো লাল হয়ে উঠল হগ সাহেবের—আভি উসকো সেল্‌মে বন্ধ করো। জলদি! কুইক!

হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দশ বারো জন সেপাই ছুটে এসে পঞ্চানন চক্রবর্তীকে কাঁধে তুলে নিয়ে সেলে ঢুকিয়ে দিল জোর করে।

এদিকে তখন শুরু হয়েছে অবিশ্বাস্য তাণ্ডব। প্রথমেই প্রায় ত্রিশ-বত্রিশজন বন্দীকে জোর করে এক পাশে ঠেলে নিয়ে বসানো হল লাইন করে। এরাই নাকি দলের রিং লীডার। সুতরাং এদের শিক্ষা দেওয়া দরকার।

লাইনের প্রথমেই ছিলেন সুরেন সিংহ। এবার তাঁকে লক্ষ্য করে শোনা গেল মিঃ হগের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার: কি, সেলাম দেবে?

—আমি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক। বলতে চাইলেন সুরেনবাবু, আমাকে এভাবে—

—ড্যাম ইওর শিক্ষক! সেলাম দেবে কি না বল?

—নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে—

—ড্যাম ইওর নেতা। তেলেবেগুনে জলে উঠলেন মিঃ হগ, নেতা বলতে এখানে কেউ নেই। সব ক্রিমিন্যাল। ঠিক আছে, ওকে ঐ তেপায়ার সঙ্গে বাঁধো। তারপর গুনে গুনে লাগাও পনেরো ঘা চাবুক।

গোটা জেলখানায় মৃত্যুপুরীর মত স্তব্ধতা। একমাত্র হতভাগ্য বন্দীর আর্ত চিৎকার ছাড়া আর কারো মুখে কোন কথা নেই।

তবু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই বন্দীর। প্রতিটি কশাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ থেকে শোনা যেতে লাগল একটি মাত্র কথা—'তোমরা কেউ ভয় পেও না। সাহস হারিও না। আমরা স্বাধীনতার সৈনিক। এ তো আমাদের প্রাপ্য।'

মিঃ হগের নির্দেশে এবার নিয়ে আসা হল পঞ্চানন চক্রবর্তীকে।—বল, সেলাম দেবে কি না?

—কাকে! চোখে চোখ রেখে পাল্টা প্রশ্ন করলেন পঞ্চানন চক্রবর্তী।

—কেন, আমাকে! আমি রাজ-প্রতিনিধি—

—রাজ প্রতিনিধি! বিদ্রূপে ঝলসে উঠলেন পঞ্চানন চক্রবর্তী, রাজাই মানিনে, তা আবার রাজ-প্রতিনিধি! তাও কিনা তোমার মত লোককে?

—বটে! গর্জে উঠলেন মিঃ হগ, বাঁধো ইসকো। তারপর লাগাও জোরসে চাবুক। দেখি সেলাম আদায় হয় কি না।

—ঠিক আছে, তাই দেখ। বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন পঞ্চানন চক্রবর্তী, নিরস্ত্র বন্দীর প্রতি পৈশাচিক অত্যাচার করার ক্ষমতা তোমার আছে স্বীকার করি, তা বলে আমাকে আমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করবে এমন ক্ষমতা তোমার নেই। দেখা যাক, কি করে তুমি আমার কাছ থেকে সেলাম আদায় কর?

প্রথমেই পঞ্চানন চক্রবর্তীর পায়ে লোহার বেড়ী এঁটে দেওয়া হল শক্ত করে। তারপর হাত-দুটি ঊর্ধ্ববাহু করে বেঁধে দেওয়া হল ডেপায়ার হাতকড়ার সঙ্গে। কোমরে শক্ত করে বাঁধা হল চামড়ার বেল্ট। নগ্ন উরুদ্বয়ে লাগানো হল এক টুকরো বিষ-প্রতিষেধক ন্যাকড়া। ওদিকে শক্ত চাবুক নিয়ে ঘাতক তখন প্রস্তুত। শুধু আদেশের অপেক্ষা মাত্র।

জেলখানার অভ্যন্তরে এই চাবুক মারাটা যে কি জিনিস তা চোখে

না দেখলে ঠিক বোঝানো যাবে না। এদিকে অসহায় বন্দী তখন তেপায়ায় বাঁধা অবস্থায় দণ্ডায়মান। শক্ত বাঁধুনী। কোন রকমেই নড়চড় করার উপায় নেই।

অন্যদিকে তেলমাখানো শক্ত চাবুক নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে দণ্ডায়মান ঘাতক। ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই সে চাবুক উঁচিয়ে দৌড় শুরু করবে দৈত্যের মত। তারপর যথাস্থানে এসেই সেই ভয়ঙ্কর চাবুক তীক্ষ্ণ শিশ দেবার মত শব্দ করে আছড়ে পড়বে হতভাগ্য বন্দীর উরুদ্বয়ের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান থেকে এখানে ওখানে রক্ত মাংস ছিটকে পড়বে অজস্র ধারায়।

পরক্ষণেই নরদানব আবার ফিরে যাবে সেই আগেকার জায়গায়। আবার সেখান থেকে দৌড় শুরু করবে সেই একই ভাবে। আবার সেই তীক্ষ্ণ চাবুক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করবে বন্দীর উন্মুক্ত দেহের উপর। এমনি করে বারবার।

বড়জোড় দু-তিন ঘা। তারপরই বন্দী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে নির্মম কশাঘাতের ফলে। তাতেও রেহাই নেই। ডাক্তার তৈরিই থাকে। জ্ঞান ফিরে এলেই আবার সেই চাবুকের ঘা।

এবারও দেখা গেল সেই একই দৃশ্য। বন্দী প্রস্তুত। উদ্যোগ আয়োজনেরও কোথাও কোন ত্রুটি নেই। এখন শুরু করলেই হয়।

—বল, সেলাম দেবে কিনা। শেষবারের মত প্রশ্ন করলেন মিঃ হগ।

—না, দেব না।

—ঠিক আছে, গো অন্।

বলতে না বলতেই সপাং করে শক্ত চাবুক এসে আছড়ে পড়ল পঞ্চানন চক্রবর্তীর উন্মুক্ত দেহের উপর। সাহেব নিজেই গুনতে লাগলেন ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর···

—এখনো বল সেলাম দেবে কি না?

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন পঞ্চানন চক্রবর্তী। ফিনকি দিয়ে রক্ত

ছুটছে। অসংখ্য মাংসের টুকরো ছিটকে পড়েছে এখানে ওখানে। তবু কোন কথা নয়। কোন কাতর শব্দও নয়।

—জবাব দেবে না! অলরাইট, গো অন। ফাইভ সিক্স-সেভেন-এইট-নাইন-টেন…এই লাস্ট চান্স। এখনো বল যে, সেলাম দেবে কি না?

পঞ্চানন চক্রবর্তী নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। দেহ অবশ, কিন্তু মন তখনো জাগ্রত। না, কোন কথা নয়। কোন রকম নতি স্বীকারও নয়। ক্ষমতালোভী এই নরপিশাচটা দেখুক যে, সত্যিকা'র বিপ্লবী বরং ভাঙে, তবু মচকায় না।

—বটে! এখনো তেজ দেখানো হচ্ছে! ঠিক আছে, জোরসে লাগাও আউর পাঁচ ঘা। ইলেভেন-টুয়েলভ-থারটিন-ফোরটিন-ফিফটিন। রাইটলী সার্ভড্। আশা করি চিরদিন মনে থাকবে। আভি ছোড় দো।

কিন্তু এ কি! চলে যেতে যেতে সহসা কি দেখে থমকে দাঁড়ালেন মিঃ হগ। কে! কে! কে এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে এই মুহূর্তে!

আশ্চর্য! সত্যই আশ্চর্য! তেপায়া থেকে ছাড়া পেয়ে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে তার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে কি না সেই পঞ্চানন চক্রবর্তী।

কিন্তু কেন! কি বলতে চায় মাদারীপুরের এই বেপরোয়া লোকটা?

—দাঁড়াও মিঃ হগ। আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও খুব তো বড়াই করেছিলে আমার কাছ থেকে সেলাম আদায় করবে। আদায় করতে পেরেছ কি? Have you got your salam?

স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন মিঃ হগ। তারপরই আড়ালে চলে গেলেন মাথা নিচু করে। দুর্দান্ত শাসক বলে এতকাল নিজের মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয় গড়ে উঠেছিল, আজ বাংলাদেশের এক পঞ্চানন চক্রবর্তী কি না তাকে খান্খান্ করে ভেঙে দিয়েছে! এ লজ্জা, এ পরাজয় তিনি রাখবেন কোথায়?

অভিনন্দন পাঠালেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। দেশবন্ধুকে তিনি

লিখলেন, কে এই পঞ্চানন চক্রবর্তী আমি জানিনে। আমি শুধু তাকে একবার দেখতে চাই। কলিকাতায় তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলে আমি খুশি হব।

আর গান্ধীজী। এ ঘটনার উল্লেখ করে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় তিনি যা লিখেছিলেন, তার ভাবার্থ হল: জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার সময় জেনারেল ও ডায়ারের নির্দেশ ছিল, প্রতিটি পথচারীকে লাঠির উপরে রক্ষিত একটা টুপিকে সেলাম দিতে দিতে হামাগুড়ি দিয়ে পথ চলতে হবে। পাঞ্জাবের অধিবাসীগণ বিনা প্রতিবাদে তাই মেনে নিয়েছিল। এই প্রথম বাংলাদেশ দেখাল যে, কি করে প্রতিবাদ জানাতে হয়!

পঞ্চানন চক্রবর্তী আজো বেঁচে আছেন সবার অগোচরে। কিন্তু আজকের এই স্বাধীন দেশের ক'টা মানুষ তাঁকে জানে। কে-ই বা তাঁকে চেনে। আমিই কি কোনদিন চিনতে পেরেছিলাম এর আগে?

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পরাধীন আমলে আর কিছু না থাকলেও গর্ব করবার মত আমাদের একটা চরিত্র ছিল। আজো সেই দেশ আছে। সেই সমাজ আছে। কিন্তু কোথায় সেই আদর্শ চরিত্র! কেন এমন হল! কেন সেই মূল্যবোধ এমন করে হারিয়ে গেল আজকের এই স্বাধীনদেশে?

সেই রাত্রে মোটেই ঘুম হলনা। শুধু কানের কাছে একটানা বাজতে লাগল এক ইতিহাস পুরুষের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর—আমি হারিয়ে গেছি……আমি হারিয়ে গেছি……আমি হারিয়ে গেছি।

'যায় যাবে জীবন চলে
জগৎ মাঝে তোমার কাজে 'বন্দে মাতরম্' বলে,
বেত মেরে কি মা ভোলাবি,
আমরা কি সেই মায়ের ছেলে'?

—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

প্রশ্ন

রেখা বক্সী

৩০শে জানুয়ারী।

সেদিন অন্যমনস্কভাবে হেঁটে যাচ্ছিলাম রাজপথ দিয়ে। যেতে যেতে চোখে পড়ল—ফুলে ফুলে সজ্জিত বেশ কিছু শহীদ বেদী।

হঠাৎ খেয়াল হল—আজ শহীদ দিবস। স্বাধীনতার শহীদদের প্রতি আজ আমাদের শ্রদ্ধা জানাবার দিন। যদিও সে সব রক্তাক্ত ঘটনা আজ অতীতের স্মৃতিমাত্র, তবু ইতিহাস তাকে বুকে করে রেখেছে ভবিষ্যতের জন্য।

অজ্ঞাতেই কখন মনে পড়ে গেল ক্ষুদিরামের কথা। কানাই, সত্যেন, চারু, বীরেন—বিশেষ করে গোপীনাথের কথা। গোপীনাথও সেদিন ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দিয়েছিলেন দেশের জন্য, কিন্তু দুর্ভাগ্য, নিন্দা এবং অপযশ ছাড়া সেদিন আর কিছুই জোটেনি তাঁর কপালে।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারী।

গোপীনাথ সেদিন কুখ্যাত চার্লস টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে হত্যা করেছিলেন আর্নেষ্ট ডে কে। একজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করার জন্য অনুশোচনাও তিনি কম করেননি। তবু বিচারে তাঁকে সাজা দেয়া হয়েছিল—মৃত্যুদণ্ড, এবং সে আদেশ কার্যকরী করা হয়েছিল ১৯২৪ সালের ১লা মাচ।

সেই বছরই মে মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসেছিল সিরাজগঞ্জে। সেখানে এই মর্মে এক শোক প্রস্তাব গৃহীত হল—যদিও গোপীনাথের পথ ভ্রান্ত, তবু তাঁর এই আত্মদান প্রশংসার যোগ্য।

খবর শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন জাতির নেতা গান্ধীজী। গোপীনাথ অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী নয়। তারজন্য আবার শোক প্রস্তাব কেন?

ফলে পাল্টা প্রস্তাব আনা হল আমেদাবাদ কংগ্রেসে। সেখানে শোক প্রস্তাব গৃহীত হল আর্নেষ্ট ডে-র জন্য। আর প্রচুর নিন্দা করা হল গোপীনাথকে।

পাশাপাশি আর একটি ছবি। সেটা ছিল ১৯৩১ সাল। স্যাণ্ডার্স-কে হত্যা করার অপরাধে পাঞ্জাবের ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেব তখন ফাঁসির অপেক্ষায়।

ওদিকে গান্ধীজী তখন একটা চুক্তি করতে চলেছেন বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে। জনগণের দাবী, চুক্তির শর্ত হবে—ভগৎ সিং শুকদেব ও রাজগুরুর প্রাণদণ্ডাদেশ রদ। অন্যথায় এ চুক্তি অর্থহীন।

৫ই মার্চ চুক্তি স্বাক্ষর করে গান্ধীজী এক বিবৃতিতে জানালেন—তিনি আশা করেন যে, এই চুক্তির ফলে সহিংস কার্যাবলীর জন্য যাদের ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়েছে, তারাও মুক্তি পাবেন।

দুঃখের বিষয় গান্ধীজীর এই উক্তি ঐ তিনজনের ক্ষেত্রে কার্যকরী হলনা, তাই ২৩শে মার্চ সবাইকে প্রাণ দিতে হল ফাঁসিমঞ্চে।

ফল হল মারাত্মক। করাচী কংগ্রেসে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হল গান্ধীজীকে। কালো পতাকা, কালো ফুলের মালা কিছুই বাদ গেলনা।

বিক্ষোভের প্রচণ্ডতা দেখে শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী নিজে থেকেই এক প্রস্তাব আনলেন করাচী কংগ্রেসে। প্রস্তাবে বলা হল—যদিও কংগ্রেস অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী, তবু ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর গভীর দেশপ্রেমকে আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তাদের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

মহান বিপ্লবী ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরু সম্বন্ধে গান্ধীজীর সেদিনের সেই প্রস্তাব নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে,—তাহলে গোপীনাথ সাহার অপরাধটা কোথায়? তাঁর বিরুদ্ধে কেন নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হল আমেদাবাদ কংগ্রেসে?)৮

পরিশেষে স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি এ কাহিনীর ইতি টানছি।

'১৯৪৬ সালের এক সন্ধ্যা। ঠিক সন্ধ্যা নয়, সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে।

দমদম সেন্ট্রাল জেলের একটি সেল-এ বসে গুন গুন করে একা একা সুর ভাঁজছিলেন অনিলবাবু। বন্ধুরা তখন বক্সা ও প্রেসিডেন্সি জেল থেকে দমদম জেলে এসে গেছেন। এখান থেকেই মুক্তি দেওয়া হবে সবাইকে ছোট ছোট ব্যাচে।

সকাল বেলা বন্দীরা সমবেত হয়ে গোপীনাথের ফাঁসির দিবস পালন করেছেন। কারণ, সেদিন ছিল ১লা মার্চ। সন্ধ্যায় এলেন দুটি বন্ধু অনিলবাবুর সেলে। তাঁরা ঢুকতেই গানের সুর থামিয়ে হাসিমুখে অনিলবাবু বললেন—'কি খবর'?

বলবার কিছুই নেই। গান শুনবো।

শুনবে? আচ্ছা, একটি মাত্র গান শোনাবো, তারই সুর ভাঁজছিলাম এতক্ষণ।

ঠিক আছে।

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর শুরু হল গান। একেবারে অন্য মানুষ। একেবারে অন্য জগতের। গাইছেন—

'রোদন ভরা এ বসন্ত সখী
কখনো আসেনি বুঝি আগে'।

বহুক্ষণ ধরে গেয়ে গেয়ে থেমে গেলেন এক সময়। থমথম করছে বাইরের আকাশ ও পৃথিবী।

গানের রেশ থিতিয়ে এলে বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে এলেন বন্ধুরা। তাঁদের মনে হল, শহীদের বিরহ ব্যথায় পৃথিবীর সমাগত বসন্ত দিন সত্যি কান্নায় ভরে গেছে। সেই কান্নাকে সারাদিন স্পর্শ করা যায়নি। সন্ধ্যার ঐ রমণীয় আঁধারে একজনের কণ্ঠে তাকে ছোঁয়া গেল।'

---

* সেদিনের সেই সঙ্গীত শিল্পীটি হলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা স্বর্গীয় অনিল চন্দ্র রায়।

দেশবন্ধুর প্রতি অর্ঘ্য

সত্যরঞ্জন বক্সী

[বি. ভি-র অন্যতম নেতা। দেশবন্ধুর সহকর্মী। সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সহচর এবং তাঁর অন্তর্ধান পর্বের প্রধান নায়ক। তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত ফরোয়ার্ড ও লিবার্টি পত্রিকার সম্পাদক]।

দেশবন্ধু আজ আর একটি নাম বা একটি দেহের মধ্যে সীমায়িত নহে—শতসহস্র মানবাত্মার মাঝে আজ দেশবন্ধু চিরভাস্বর! শতবর্ষ, হ্যাঁ, শতবর্ষ পরেও দেশবন্ধুর গরিমা ও মহত্ত্ব, বঙ্গভূমি ও ভারতবর্ষের—মর্মস্থলে চির জাগরুক থাকিবে। তাঁহার দেদীপ্যমান জ্যোতি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে এবং সেই অনির্বাণশিখা যুগকালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজিত রহিবে। এক চমকিত মর্য্যাদার মাঝে দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণ! শুধু মরণেই নহে—, দেশবন্ধুর সমগ্র জীবনই মহান আত্মত্যাগের বৈষ্ণবীয় মাধুর্য্যে অণুরণিত।

প্রতিটি চিন্তাধারা ও আচার আচরণে দেশবন্ধু ছিলেন রাজকীয় মর্য্যাদায় মহিমান্বিত; প্রাচুর্য্যের ঐশ্বর্য্য কিংবা সর্বস্বত্যাগের গরিমা—দুইয়ের মাঝেই তিনি ছিলেন সমমর্য্যাদায় রাজকীয়। আগামীকালের মানুষের কাছে বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক ইতিহাস পুরুষ ও যুগের আলোকস্তম্ভ হিসাবে তিনি চিহ্নিত হইবেন—উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবেন মহাকাব্যের প্রাণবন্ত সৌন্দর্য্যস্বরূপ ও আধ্যাত্মিক সুরধারার মহান ধারক হিসাবে।

দেশবন্ধুর জীবন ও কর্মের বহুমুখী তার মধ্যে ছিল মৌলিকত্বের এক দুর্জয় শক্তি। যে কর্মযজ্ঞে তিনি ব্রতী হতেন—নিঃশেষে আহুতি দিতেন নিজেকে। তাঁহার কর্মধারা ছিল উল্কারই মতন—জলন্ত ও গতিময়! তাঁহার সান্নিধ্য সহস্র সহস্র মানুষের প্রাণে জাগাইয়া তুলিত প্রকৃতির অনন্ত ব্যাপ্তি ও অসীমতার উপলব্ধির এক অজানা শিহরণ!

সেক্সপীয়ারের ভাষায় দেশবন্ধুর "নিত্যনূতন সৌন্দর্যেভরা জীবন"ই যে শুধু ছিল তাহা নহে—সর্বোত্তম ঐশ্বর্য্য এক প্রাণবন্ত মানবাত্মায় তিনি ছিলেন ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত।

প্রায়শঃই দেশবন্ধুকে একজন বাস্তবধর্মী আদর্শবাদী দুজ্ঞেয় চরিত্রের পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ আধ্যাত্মশক্তির মূল্যায়ণের পূর্ণচেতনার তিনি ছিলেন দাবীদার। সংস্কারান্ধ গোঁড়ামির তীব্রতার মতনই ছিল তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা ও অভিনিবেশের গভীর একাগ্রতা।

এখানেই আমরা দেখি এক রূপকারের পূর্ণ সচেতনতার দীপ্তজ্যোতি। তাঁহার ভাবধারা ছিল আন্তরিকতায় নিবিড়—ধর্মের মতনই মর্মে মর্মে একাকার। দেশবন্ধুর দেশমাতৃকা ও দেশপ্রেম তাই শুধু মাত্র চিরাচরিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণার মধ্যে সীমায়িত ছিলনা।

দেশবন্ধুর নিকট কোনও বিশেষ আদর্শবাদ বা রীতিনীতির মূল্য ছিলনা। জীবনের সামগ্রিক পরিপূর্ণতায় ও অখণ্ডতায় তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। তাঁহার চিন্তাধারায় স্বাধীনতার রূপ ছিল পূর্ণস্বরাজ, যাহার অভিজ্ঞতা হবে সামগ্রিক ও তাৎক্ষণিক। সে স্বাধীনতা, সে জীবন পূর্ণতা লাভের প্রত্যাশায় বহির্মুখী হয়না—আপন সম্ভাবনায় স্বয়ম্ভুর। সে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীনতায় কোনও আপোষ বন্দোবস্তের স্থান নাই। দেশবন্ধুর সেই ভাবপ্রেরণা কর্মে রূপায়িত হইয়াছে—সেই আদর্শ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে রক্তমাংসের বিগ্রহে। দেশবন্ধু সি. আর. দাসের আদর্শ ও কর্ম ছিল সম্পূর্ণভাবে সংশয়-কুয়াসা মুক্ত।

দেশবন্ধু প্রতিটি মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসাবেই গ্রহণ করিতেন—তাহার কম বেশী কিছু নহে। তাঁহার আদর্শের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র

এক অজানা সম্ভাবনার বিকাশ, এক গঠনধর্মী স্বপ্নায়িত ছন্দ, জীবনের পূর্ণতার এক বলিষ্ঠ ব্যাখ্যা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি পরিচিত বস্তুনিচয়ের মর্মোদ্ঘাটন। তিনি ও তাঁহার সহকর্মীরা ছিলেন যেন ধর্মবিশ্বাসী একটি পরিবারের ভাবশক্তির আধারস্বরূপ জপের মালার এক একটি রুদ্রাক্ষ। স্বরাজ্যবাদ বিপ্লবের অভ্যুত্থানের তাৎপর্য অনুধাবন করিতে হইলে দেশবন্ধুর বিভিন্ন মতবাদের ফলপ্রসূতা সম্পর্কে সংশয়পূর্ণ মনোভাব ও রিডিং চুক্তি আলোচনা এবং চৌরীচোরা ঘটনার চরম ব্যর্থতার পটভূমিকায় দৃষ্টি ফেলিতে হইবে। যে কোনও রূপ আপোষ বন্দোবস্তের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে শুধুমাত্র সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে—তাহার সুদূরপ্রসারী কোনও তাৎপর্য বা মূল্য থাকেনা। দেশবন্ধু উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সংগ্রামের নিরন্তর বৈপ্লবিক রূপায়ণ এবং মতবাদের সুষ্ঠু পুনর্বিন্যাসের মধ্যেই অগ্রগতির বীজ নিহিত থাকে—কারণ অতীতের গতিময় চিন্তাধারা কিংবা কর্মসূচী বর্তমানে শুধুমাত্র নিস্ফলা প্রতিধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। নূতন উদ্যোগ ও শক্তির অভ্যুত্থান, হারিয়ে যাওয়া উচ্চাদর্শ ও ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও নবরূপায়ণ ও সুদৃঢ় বনিয়াদে স্থিতি করাই ছিল স্বরাজ্য বিপ্লবের আহ্বান মন্ত্র। সুগভীর বিশ্বাসবোধ ও জীবন দর্শনের উচ্চমানের প্রতিষ্ঠা, অগ্নিস্রাবী দেশপ্রেমের প্রেরণা এবং রাজনৈতিক কার্যাবলীতে ব্যক্তিত্বের প্রভাব—এরই সাথে নিরন্তর সংগ্রামশীল ছিলেন দেশবন্ধু। দেশবন্ধু রাজনীতির এক নবদিগন্তের উন্মোচন করেন, অনন্তপ্রসারী মহাদিগন্ত—ইতিহাসের এক অজানা ও অপরিমেয় শক্তি। রোমা রেঁালা একদা বলিয়াছিলেন, মানুষের ভাগ্য প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হইতেছে—ভাগ্যের এই ভাঙ্গাগড়ার খেলা চিরন্তন।

দেশবন্ধুর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে জীবন ও কর্মের মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে এক উজ্জিবনী শক্তির প্রেরণা—এক সুগভীর চেতনা; শুধু ইতিহাসের অনুগামী হওয়াতেই আমাদের কর্তব্যের শেষ নহে—ইতিহাসের নবরূপায়ণের ভাবী রূপকার হিসাবেও আমাদের সাধনা। বর্তমানের চিন্তার দৈন্য ও অতীতের ভ্রান্তি জাল হইতে মুক্ত হইয়া

দিগন্তপ্রসারী ভাবধারা ও কর্ম অভিসারের দুর্জয় প্রেরণার সাথে একাত্ম। হইতে হইবে। মসৃণ ও সরল পথে স্বাধীনতা ও শান্তির সন্ধান মেলে না। প্রাত্যহিক লাঞ্ছনা ও নিষ্পেষনের গ্লানি ও ক্ষুদ্রতার তীর্থভূমি হইতে দেশবন্ধু আমাদের মহা উত্তরণের পথে পরিচালিত করেন—সে পথ মহাপথ—অদৃশ্য অজানা অনির্বচনীয় প্রেরণার উৎস—অপরিমেয় শক্তির সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ সে পথ। আমরা কি সেই মাদকতাপূর্ণ জীবনের উত্তেজনার স্বাদ পাই নাই? জীবন কি গৌরবের দীপ্তিতে দীপ্তিময় হইয়া উঠে নাই? জীবনের নবমূল্যায়ণের এক পুলকশিহরণ কি প্রতি ধমনীতে অনুভব করা যায় নাই?

জীবনের পরিপূর্ণতার সম্ভাবনায় আনন্দের জোয়ার, নূতন প্রভাতের আগমনী সুরের মূর্চ্ছনা, গরিমাদীপ্ত প্রতিশ্রুতি পূরণের আলোকাভাষ ও ভাবীকালের ভারতবর্ষের মহান উত্তরণের পথে অর্থবহ ইঙ্গিত—এই সবের মাঝে শিহরণ অভিব্যক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে না নিষ্প্রাণ, নিষ্পন্দ এমন কেহই নাই। বিশাল সৃষ্টিধর্ম্মী মহাবিপ্লবের রূপায়ন ও প্রগতির ছান্দোময় বর্ণন দেশবন্ধুর জীবনের প্রতিটি ছত্রে ছন্দোবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কালজয়ী সুগভীর বিশ্বাস, অদম্য ইচ্ছাশক্তি, দুর্জয় সাহসের সুমহান কাহিনী দেশবন্ধুর জীবনে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষগণের ন্যায় এক বিরাট আদর্শকে আশ্রয় করিয়া দেশবন্ধুর সাধনমন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে, সে আদর্শ উত্তরকালের মহা-ভারত গঠনের স্বপ্নের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অসার স্বপ্ন?—না, কখনও না।

নিরাভরণ বৃক্ষশাখা?—কিন্তু, চিরকালের জন্য নহে।

দেশবন্ধুর জীবন ও কর্ম্মসাধনার বিশদ আলোচনা এস্থানে প্রয়োজন করেনা। ইটস্ লিখিয়াছিলেন যে, পাপের মার্জনাই সকল সুমহান সাহিত্য সৃষ্টির মূলসুর।

মহৎ জীবন সম্পর্কেও সেই কথা বলা চলে। দেশবন্ধু আমাদের সামনে বিশ্বপ্রকৃতির এক অত্যাশ্চর্য্য চমকপ্রদ রূপের উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন—গভীর আশায় উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন

আমাদের ; স্বার্থবুদ্ধির তাড়নায় সৃষ্ট মেকী মানুষ নহে—প্রকৃত মানুষ হইবার শিক্ষা পাই আমরা দেশবন্ধুর নিকট। দেশবন্ধুর প্রেরণায় আমরা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠি ইতিহাসের পুনর্বিন্যাস ও নব ইতিহাস সৃষ্টির সাধনায়—আমাদের দীক্ষিত করেন দেশবন্ধু।

*'বিপ্লবী নিকেতন' পত্রিকার সৌজন্যে। মূল রচনা ইংরেজীতে। ভাষান্তর
—শচীন্দ্রনাথ দে

'If Subhas Chandra Bose a criminal, I am a criminal. If Subhas Chandra Bose is a revolutionary, I am a revolutionary. Why have they not arrested me? I should like to know why, why'?

—Deshbandhu.

ডাক দিয়ে যা

রূপম মজুমদার

গোরখপুর জেলের কনডেমন্ড সেল। লোহার গরাদের রূঢ় বাধা অতিক্রম করে গোধূলিবেলার শেষ রশ্মি ভেতরের ছোট খুপরিটায় বিষণ্নভাবে লুটিয়ে পড়ল।

পরিবেশ ভারাক্রান্ত, নিস্তব্ধ। হঠাৎ ঝরণাধারার মতো উৎসারিত হল মর্মভেদী সুরের লহরী। সে সুর ছড়িয়ে পড়ল সারা জেলখানায়। প্রত্যেককেই সজাগ করে দিল।

"সর্ ফরোশী কি তমন্না অব্ হমারে
দিল্ মেঁ হ্যায়
দেখ্না হ্যায় জোর্ কিত্না বাজুএ
কাতিল্ মে হ্যায়।"

এখন আমার মনে শুধু মরণকে বরণ করার ভাবনা। দেখতে চাই ঘাতকের কতখানি বাহুবল আছে।

মরণকে বরণ? কেন? কার প্রাণে এত উদ্যম, এত শক্তি? এ গান এমন করে কে গাইল?

রামপ্রসাদ বিস্‌মিল। গোয়ালিয়রের উজ্জ্বল মণি বিস্‌মিল। মৃত্যুর জন্য অধীর প্রতীক্ষারত বিস্‌মিল।

...উত্তর প্রদেশের বৈপ্লবিক সংস্থাগুলি ১৯১৫ সনে ভাঙনের মুখ দেখতে শুরু করেছে। মহানায়ক রাসবিহারী সে সময়ে জাপানে। বাঘা যতীন শহীদ হয়ে বিলীন। বহু তরুণ বিপ্লবীই কারারুদ্ধ। কে চালাবে সংস্থা?

কেন? ভাবনা কীসের? রামপ্রসাদ বিস্‌মিল তখন প্রাণশক্তি ও দৃঢ়তায় পূর্ণ এক কেশরী। আবার নতুন করে সংস্থা গড়তে হবে। চাই অর্থ, চাই মনোবল, চাই ধৈর্য্য। অর্থাভাবই বড় অভাব। কলম ধরলেন বিস্‌মিল। দুখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে মূল্য সংগ্রহ করলেন। "আমেরিকার স্বাধীনতা" আর "দেশবাসীর প্রতি আবেদন।" তুফান তুলল বই দুটি। দেশবাসীর কাছ থেকে তাই বিক্রয় অর্থ পাওয়া গেল। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই সরকারী হুকুমে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল বই দুটি। কী বই, কী তার বিষয়বস্তু দেখতে হবে তো। সইবে কেন শ্বেতশত্রু?

বিস্‌মিল ততক্ষণে সেই টাকায় বড় প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে ফেলেছেন। কয়েকটি রিভলবার। এবার নতুন সংগঠনের দিকে অগ্রসর হলেন।

ওদিকে পুলিশ তখন শিকারী কুকুর হয়ে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোথায় বিস্‌মিল?

চিরকাল যা হয়ে এসেছে, সেই নির্মম তামাসাই চালাল পুলিশ।

বিস্‌মিলকে পাওয়া যাচ্ছে না, তো ক্যা হুয়া? ওর বাবার ওপরই হাতের সুখ মেটানো যাক। শুরু হল হামলা। জমি ও যাবতীয়

সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে রাজদ্রোহীর বাবাকে পথের ভিখারী করে দেওয়া হল। তখন ছেলে কোথায়?

১৯২২ সালে প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক যোগেশ চ্যাটার্জির সঙ্গে মিলিত হলেন বিস্‌মিল। দুজনে পরিকল্পনা করলেন, সরকারী টাকা লুঠ করতে হবে।

এর আগেই অবশ্য আর একবার টাকা লুঠের কাজ হয়ে গেছে। মৈনপুরার এক জমিদার বাড়ি থেকে। পার্টির কাজ মানে তো দেশের কাজ। একাজে কেউ যদি স্বেচ্ছায় টাকা না দেয়, তবে বাধ্য হয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় অন্যভাবে।

পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজেও বিস্‌মিলের নাগাল পেল না। ডাকাত ছেলেটা কোথায় যে লুকিয়ে থাকে।

১৯২৫ সালের ৯ই আগষ্ট। হঠাৎ আলমনগর গামী ট্রেনটা থেমে গেল। কাকোরী স্টেশন ছাড়িয়ে মাঝপথে। দশ বারোজন দস্যি ছেলে উঠে পড়ল গার্ডের কামরায়। সেখানে একটা সিন্দুক ভর্তি টাকা আছে। মুহূর্তে লুট হয়ে গেল। দুএকজন অতিসাহসী যাত্রী বাধা দিতে এল। ফলে যা হবার হল। বিপ্লবীদের হাতে মৃত্যুবরণ।

শাসক মহলে হৈ-চৈ। সরকারী টাকা লুট, নরহত্যা, কী বাদ রইল তবে? কড়া হুকুম জারী হল, ডাকাত-ছেলেগুলোকে ধরতেই হবে। দুঃসাহসী স্বদেশপ্রেমী বিপ্লবীরা ওদের চোখে কখনো ডাকাত। কখনো খুনী। কখনো লুঠেরা।

নাঃ, ভাগ্য নেহাতই মন্দ। শাহাজাহানপুরে এমন কয়েকটি নম্বর যুক্ত নোট পাওয়া গেল মাস খানেক বাদে, যা সেই লুণ্ঠিত নোটগুলির নম্বরের সঙ্গে মিলে গেল। আর আবিষ্কৃত হল ইন্দুভূষণ বিশ্বাস নামে একটি বঙ্গ সন্তান। তার নামে কতকগুলি চিঠি পেয়ে শাসকগোষ্ঠীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবার ঘুঘু ফাঁদে পড়বে।

ইন্দুভূষণের নামে এলেও, আসলে সে সব সেই বীর কেশরী বিস্‌মিলকে উদ্দেশ্য করে লেখা। তাতে সরকারী টাকা লুট করার স্পষ্ট নির্দেশ আছে।

তারপরই একটি সংবাদ শুনে দেশবাসী স্তম্ভিত ও চিন্তিত। বিস্‌মিল ধরা পড়েছেন। ১৬শে নভেম্বর শেষ রাতে। তারপরই একদিন পর ধরা পড়লেন যোগেশ চ্যাটার্জি এবং আরও পরে আসফাকউল্লা, শচীন সান্যাল। কী হবে এঁদের? সারা দেশবাসী উৎকণ্ঠিত।

১৯২৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী থেকে শুরু হল কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা। আর রায় বেরোল ১৯২৭ সালের ৬ই এপ্রিল। চারজনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রামপ্রসাদ বিস্‌মিল, আসফাকউল্লা, ঠাকুর রোশন সিং ও রাজেন লাহিড়ী।

তুমুল আন্দোলন চলল উত্তরপ্রদেশ জুড়ে। আর যা শাস্তি হ'ক, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা যেন তুলে নেওয়া হয় মহান বিপ্লবীদের থেকে। মহামান্য বড়লাট, সম্রাট, লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিল সবার কাছেই আবেদন জানানো হল। কিন্তু আদেশ নড়চড় হ'ল না। মাথা খারাপ? এদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব? অসম্ভব!

যে বিস্‌মিল যজ্ঞের প্রধান হোতা, তিনি তখন কী করছেন গবাদের অন্তরালে? তিনি প্রিয় চিন্তায় নিমগ্ন।

কবিগুরু বলে গেছেন, "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান"। আর বিস্‌মিল বলেছেন, "সরফ়রোশী কি তমন্না অব হমারে দিল মেঁ হ্যায়"। শুধু মরণকে বরণ করার বাসনা নয় বিস্‌মিলের আকুল প্রতীক্ষা। মরণ যে তার অতি প্রিয়। বিশেষ করে সে মৃত্যু যদি হয় দেশের কাজ করতে গিয়ে।

মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ছেলেকে শেষ দেখা দেখবার জন্য মা আর বাবা ছুটে এলেন জেলখানায়। মার জন্য বুকটা মুচড়ে উঠল।

—মা, ক্ষমা কর। তুমি দুঃখ পেয়োনা আমার কথা ভেবে।

কিন্তু এতো যে সে মা নয়। যেন দেশমাতার মূর্তরূপ। এই গর্ভধারিণী মাকে বিস্‌মিলও প্রথমে চিনতে পারেন নি।

—"...তুমি আমার বীর সন্তান। দেশের জন্য বীরের মতোই তুমি মাথা উঁচু করে মৃত্যুবরণ করবে। তাই আমি চাই।"

১৯২৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর। ভোর তখনও আলোকিত হয় নি, কিন্তু সারা কনডেমনড সেল কী এক মহামন্ত্রে আলোকিত হয়ে উঠল।

"অব্ না অগ্‌লে ওয়ল্‌লে হ্যায় আউর
না আরমানেকী ভীড়
সির্‌ফ্ মর্ মিট্‌নেকি হসরৎ আপ্
দিলে এ বিস্‌মিল মেঁ হ্যায়।"

সমস্ত কলগুঞ্জন থেমে গেছে। সকল বাসনার হয়েছে অবসান। এখন মৃত্যুকে বরণ করার বাসনা বিস্‌মিলের হৃদয়ে বিরাজিত।

দৃঢ় পদক্ষেপে বধ্যমঞ্চের দিকে এগিয়ে চললেন বিস্‌মিল।

কিন্তু তখনও সেই সংগীত লহরী, যা বিস্‌মিলের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছিল, তা বয়ে চলেছে কয়েদখানা প্লাবিত করে। শেষযাত্রার সময় যে মহামন্ত্রের দীক্ষা দিয়ে গেছেন তরুণ বিপ্লবী, সেই মন্ত্র আজও ভাস্বর। কিন্তু সেই দীক্ষায় দীক্ষিত হতে পেরেছি কি আমরা?

বিস্‌মিল, তোমাকে যে আবার চাই।

'মৃত্যু ওদের কাছে মৃত্যু নয়—
বরঞ্চ ব্যতিব্যস্ত গোলাপের গন্ধে-উজ্জ্বল সত্যে
মাথা উঁচু করে—ওরা মৃত্যুকে করে জয়'।

—নীরদ রায়

আগুনের পাশাপাশি

চোমং লামা

সেদিন একটা নাটক দেখেছিলাম শিলিগুড়িতে। নাটকের নাম—'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন'।

দেশাত্মবোধক নাটক। প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার। পূর্ণোদ্যমে অভিনয় চলছে। মঞ্চে বিচারের দৃশ্য। আসামীর কাঠগড়ায় চোদ্দ বছরের একটি বালক। নাম তার হরিপদ ভট্টাচার্য্য। মাস্টারদার দলের সর্বকনিষ্ঠ বিপ্লবী। ঐ চোদ্দ বছরের বালক বৃটিশের ডান হাত আসানুল্লাকে গুলি চালিয়ে ফুটবল খেলার মাঠে হত্যা করেছে। সেই চোদ্দ বছর বালকের বিচারের দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে।

আমার পাশেই দর্শকের আসনে বসে রয়েছেন একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। সুঠাম—সুদর্শন চেহারা। মার্জিত ও সজ্জনতার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে চোখে মুখে।

সেই প্রৌঢ় লোকটি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন আমাকে,—কি সুন্দর অভিনয়। যেন বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে!

কৌতুকের সুরেই জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন?

প্রৌঢ় ভদ্রলোক হঠাৎ বিচলিত হয়ে উঠলেন। উসখুস্ করলেন। তারপর বললে—হ্যাঁ, তা করেছি বই কি!

—কি রকম? আমার পুনর্বার সেই কৌতূহল।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বললেন—আমি ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। ওই যে ছেলেটির বিচারের দৃশ্য দেখছেন, আমিই সেই হরিপদ ভট্টাচার্য্য!

আমার মনে হল, যেন আমার চোখের সামনে হাজার হাজার

বিদ্যুতের হানাহানি হয়ে গেল। কি ভীষণ চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ ঝলক। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে যেন সুতীব্র আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

হরিপদ ভট্টাচার্য্য বোধ হয় আমার সেই বিহ্বল অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। মৃদু হেসে আমার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিতে দিতে বললেন, বসুন-বসুন! অত উতলা হচ্ছেন কেন?

মঞ্চে হরিপদ ভট্টাচার্য্যের ভূমিকাভিনেতা বালকটি উচ্ছ্বাস আর প্রতিজ্ঞা কঠিন স্বরে বিপ্লবী কার্য্যাবলীর জবানবন্দী দিচ্ছে। কিন্তু আমি আর সে অভিনয় দেখতে পারিনি। আমি সারাক্ষণ তাকিয়েছিলাম বাস্তব চরিত্রের দিকে। সৌম্যদর্শন, সুমার্জিত প্রৌঢ় হরিপদ ভট্টাচার্য্যের দিকে।

অভিনয় শেষে একসঙ্গে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বের হলাম। হরিপদ ভট্টাচার্য্য আমাকে বললেন—আপনার পরিচয়টা জানতে পারলে খুশি হবো।

—আমার পরিচয়? আমার পরিচয় খুব সামান্য। যেটুকুমাত্র পরিচয়, তাইই দিলাম।

হরিপদ ভট্টাচার্য্য উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—আপনি পত্রিকার সম্পাদক? আরে আপনাকেই তো আমি খুঁজছি। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। কবে যাব আপনার বাসায়?

বললাম—যেদিন আপনার ইচ্ছা। যখন সুবিধা হয়।

হরিপদদা আমার বাসায় আসেন। সময় পেলেই আসেন। কাজেও আসেন, আবার শুধু গল্প করতেও আসেন।

সেই হরিপদদার কথা তার নিজের মুখে শুনেছি। বারংবার।

দরিদ্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ছেলে।

ওই বয়সেই দারিদ্র্যের জ্বালা বুঝতে শিখেছেন কিন্তু দারিদ্র্য তার স্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্যকে ম্লান করে দিতে পারেনি পয়সার অভাবে টোলে সংস্কৃত পড়া দিয়ে হরিপদদার প্রথম শিক্ষা সুরু। ওই বয়সে সংসারের নানা খুটিনাটি কাজও করতে হয় তাকে। এমনি একটি নিত্যকার কাজ হল দুধ নিয়ে আসা।

যাওয়া আসার পথে পারুলদের বাড়ী।

হরিপদদার সমবয়সী। তের চৌদ্দ বছরের কিশোরী মেয়ে পারুল। ফুলের মত শুভ্র আর মোমের পুতুলের মত নরম চেহারা।

যাওয়া আসার পথে রোজই দেখা হয় পারুলের সঙ্গে। দু চারটি কথা হয়। পারুল ভাল গান গাইতে জানে। কোন কোনদিন হরিপদদা শুনতে পান, পারুল গান গাইছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনেন, আবার নিজের কাজে চলে যান।

একদিন হরিপদদা শুনতে পেলেন একটা মর্মান্তিক সংবাদ: পুলিশ এসে পারুলদের বাড়ী ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে গিয়েছে। পারুলের বাবা মা-কে প্রহার করেছে, এমন কি পারুলকেও রেহাই দেয়নি।

হরিপদদা এক দৌড়ে চলে গেলেন পারুলদের বাড়ী। কি বীভৎস অত্যাচার। কি সাংঘাতিক নৃশংসতা। পারুলের বাবা সাংঘাতিক ভাবে আহত। পারুল অর্ধ অচৈতন্য ভাবে শয্যাশায়ী।

হরিপদদা বুঝতে পারছেন না, কি এমন অপরাধ পারুলদের, যার জন্য পুলিশের এই উন্মত্ততা! অপরাধ:—পারুল নিজের ঘরে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছিল—

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার।
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার'।

তখনকার দিনে এ গান গাওয়া ভীষণ অপরাধ। সুতরাং এই অপরাধেই পুলিশ পারুলদের বাড়ী তাণ্ডব চালিয়ে গেছে।

এই লেখা যখন হরিপদদাকে পড়ে শোনাই, তখন উনি হেসে বললেন—তুমি এমন ভাবে লিখলে, তাতে মনে হচ্ছে, যেন আমার বান্ধবীর লাঞ্ছনাতেই বোধ হয় আমি বিপ্লবী দলে নাম লেখালাম। কিন্তু তা তো নয়—আমি ওই ঘটনার অনেক আগেই মাস্টারদার সংস্পর্শে এসেছি।

আমি বললাম—তাহলে আপনার এই মন্তব্যটুকুও আমার লেখার মধ্যে জুড়ে দিলাম।

চট্টগ্রাম তখন অগ্নিগর্ভ। বিপ্লবের একটা উত্তপ্ত বাতাস সর্বদাই বহমান। কি ভাবে, কতদিন আগে হরিপদদা মাস্টারদার দলে এলেন—সেটা ইতিহাস নয়। ইতিহাস হল—দুর্ধর্ষ আসানুল্লাকে সরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পৃথিবী থেকে। কে নেবে এ কাজের ভার?

কে আর পারে! নেতা যাকে বলবেন, সেই নেবে এ কাজের ভার। কেননা সব প্রাণই দেশ জননীর পায়ে নিবেদিত।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মাস্টারদা ডাকলেন—হরিপদ! চোদ্দ বছরের বালক উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমি আপনার আদেশ মাথা পেতে নিলাম।

সুতরাং হরিপদদা বেরিয়ে পড়লেন। সুরু হল সুযোগ খোঁজা। শেষ সুযোগ এল ফুটবল খেলার মাঠে। আসানুল্লা সাহেবের নিজের টিম শীল্ড বিজয়ী হল। সেই শীল্ডটি নিয়ে আসানুল্লা সাহেব উঁচু করে ধরে বিশেষ ভাবে নির্মিত মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে নাচতে সুরু করলেন। হরিপদদা এই সুযোগ ছাড়তে নারাজ। পর পর দুবার গুলি চালালেন তিনি আসানুল্লাকে লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ্য। দুটো গুলিই লাগল। মঞ্চের উপরই পড়ে গেলেন আসানুল্লা সাহেব। মুখে তার একমাত্র উচ্চারণ—হায় আল্লা!

দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন হরিপদদা। জনতা আর পুলিশ পিছনে ছুটছে। হরিপদদা পিছন ঘুরে দাঁড়িয়েই গুলি চালালেন। অবশেষে গুলিও ফুরিয়ে গেল। হরিপদদা পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

হরিপদদা ধরা পড়লেন।

ওঁর চোদ্দ বছরের শরীরটা নিয়েই ফুটবল খেলল লোকে। চৈতন্য হারিয়ে ফেললেন তিনি। মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল। পুরো দুদিন অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলেন হরিপদদা।

দুদিন পরে মাঝরাতে জ্ঞান ফিরল। শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। নড়তে পর্যন্ত পারছেন না। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে একা হরিপদদা। আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষিধে। দুদিনে এক ফোঁটা জলও পেটে

পড়েনি। জ্ঞান ফিরেছে দেখে মুসলমান সেন্ট্রি গরাদের ফাঁক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—হুঁস ফিরেছে খোকা?

হরিপদদা সাড়া দিলেন না। সেন্ট্রি কি বুঝল কে জানে। সে একটু সময়ের জন্য চলে গেল, একটু পরেই ফিরে এল সে মাটির সানকিতে ভাত আর মাংস নিয়ে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে হরিপদদার তখন জাত বিচারের সময় নেই, কিসের মাংস তাও জানার অবকাশ নেই। গোগ্রাসে খেয়ে নিলেন তিনি।

ওদিকে পুলিশ হরিপদদার বৃদ্ধ মা বাবাকে বেঁধে রেখে তাদের কুঁড়ে ঘরখানি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিল। যে স্কুলে তিনি পড়তেন, সেই স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকরাও রেহাই পেলনা। সমস্ত সহরের উপর দিয়ে ঘোরানো হল চোদ্দ বছরের বন্দী বালককে। সন্দেহজনক নাগরিকদের ঘরে তল্লাসী চালানোর নামে উজার করে ফেলা হল। হরিপদদার মুখ দিয়ে তবুও একটি শব্দও বের হল না। হরিপদদার বিচার হল।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন মামলা লড়লেন। বিচারে দ্বীপান্তর হল। কম বয়স বলে ফাঁসির হুকুম হল না।

হরিপদদা এখন বলেন—যে স্বাধীনতার স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, স্বাধীন রাষ্ট্র কাঠামোর জন্য মাস্টারদা যে দলিল রেখে গিয়েছিলেন, সেই স্বাধীনতা এখনও আমরা পাইনি।

জিজ্ঞাসা করেছি—আপনি কি নতুন করে কোনও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন হরিপদদা?

হরিপদদা হেসে জবাব দেন—মানুষ তো সময়ের সিঁড়ি বেয়ে বুড়ো হয়। রোগ শোক জরা তার নিত্য সহচর। কিন্তু বিপ্লব চির নতুন, চির তরুণ। প্রতি মুহূর্তেই বিপ্লবের গতিভঙ্গী পালটাচ্ছে। বিপ্লব থেমে থাকে না।

তারপর হরিপদদা বিমর্ষভাবে বলেন—স্বাধীনতাকে আমরা সৌখীনভাবে টবের ফুলগাছ করে কার্নিশে রেখে তাতে ফুল ফোটাবার

চেষ্টা করছি। তাকে মাটিতে পুঁতে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনীশক্তি নিয়ে বেঁচে উঠতে দিচ্ছি না। স্বাধীনতাকে ছাদের কার্নিশ থেকে এনে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে।

এ কথার তাৎপর্য কি জানি না। ব্যাখ্যা চাইতে সংকোচ বোধ করেছি। হরিপদদার একটি কথা ঠিক। বিপ্লব প্রতি মুহূর্তেই তার গতিভঙ্গী পালটাচ্ছে। নতুন করে তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন বিপ্লবের সংজ্ঞা। স্বাধীনতার জীবনী উপাদান নিয়ে হরিপদদা যে তুলনা আমাকে দিয়েছিলেন—তার নতুন রূপ, নতুন চেহারার প্রত্যক্ষ পরিচয়ই হয়তো আবার একদিন আমরা দেখতে পাব আমাদের দেশে।

'সুন্দর বনে দাঁড়িয়ে নিবস্ত্র শান্তির বাণী প্রচার করলে বাঘ ভালুকের খুশি হবারই কথা'। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পথের দাবী)

তোমারই প্রতিমা গড়ি

শ্রীমতী দেবযানী

আনন্দমঠে সন্তানসেনার মাঝে এক অশ্বারোহিণীকে পাই আমরা। রণসাজে সজ্জিতা। সাহসিনী। বীরাঙ্গনা। উপন্যাসকার প্রথমে তাকে এক বীর কিশোররূপে আমাদের সঙ্গে পরিচিত করেন। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি অতিক্রম করে দেখেছি, সে জীবানন্দের স্ত্রী শান্তি। সরল-প্রাণা, পাগলী এক মেয়ে। কিন্তু তার বুকেও সর্বনাশের নেশা জেগেছিল। এক সাহেবকে সে ছলনায় ভুলিয়ে কাবু করতে পেরেছিল। ধন নয়, প্রাণ নয়, শুধু স্বামীর মতো রণক্ষেত্রে অংশ

গ্রহণ করা, শত্রুকে পরাজিত করার যজ্ঞে নিজেও পুরোহিত হওয়া, এই ছিল তার বাসনা।

সেনাদল বহুবলধারিণী সুখদা বরদা দেশমাতৃকাকে প্রণতি জানিয়েছে ভক্তির অর্ঘে, "বহুবলধারিণীং রিপুদলবারিণীং নমামি তারিণীং......বন্দে মাতরম্।" এ প্রণাম শান্তিরও প্রাপ্য ছিল। শান্তি তো মায়েরই অংশ।

বঙ্কিমের যুগ শেষ হয়ে গেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আজ ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাসের পরও ইতিহাস ঘটে। আবার সর্বনাশের নেশায় মেতে রিপুদলবারিণী শান্তির আবির্ভাব ঘটে। একজন দুজন নয়, অগণিত। বাংলার বুকে বহমানা স্নিগ্ধাভাগীরথীর মতো বঙ্কিমোত্তর যুগের আর এক শান্তি বীণা দাস। ভাগীরথীকে পৃথিবীতে এনেছিলেন ভগীরথ। এই বীরাঙ্গনাকে এনেছিল যে, তার নাম—পরাধীনতার দহন।

ভাগীরথীর জলে বাতাসে গড়ে ওঠা নদীর মতো উচ্ছল স্নিগ্ধ একটি মেয়ে। কিন্তু বুকে তার দাবানল তাই তো তার মুখের ভাষা ছিল, "রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা।" এ নেশা সত্যিই বড় উদ্দাম। এ যেন হোলির মাতন। আবিষ্ট না হ'য়ে উপায় নেই। কবির কল্পনায় কোন এক পুরুষ কোন এক প্রকৃতিকে দেখে বীণার তারে ঝঙ্কার দিয়ে বিলাপ করেছিল, "সেদিন চৈত্রমাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।"

চ্যান্সেলার স্ট্যান্‌লি, স্নাতক বীণা দাসের রণোন্মাদনায় উজ্জ্বল চশমা পরা চোখ দুটোতে কি তোমার সর্বনাশের বিন্দুমাত্র আভাষও আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলে? পেরেছিলে কি চিনতে, এ সেই আনন্দমঠের শান্তি? কিংবা তারও বহু আগের সত্যযুগের রক্ষঃকুলবধূ ইন্দ্রজিৎজায়া প্রমীলা? কে বলে নারী অবলা? "বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

......আজ আটাত্তরের যুগশৈলের সোপান অতিক্রম করতে করতে চারিদিকে খুঁজতে থাকি সেই মন্দিরটাকে। ব্যর্থ হই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগেকার সিনেটহল অপসারিত,

পরিবর্তিত। পরিবর্তন ঘটেছে আরও অনেক কিছুর। শিক্ষাধারার পরিবর্তন, শিক্ষক ও ছাত্রের চিন্তাধারার পরিবর্তন।

সমাবর্তন উৎসব আজও চলছে। কিন্তু ক জন ১৯৩২ সালের সমাবর্তন উৎসবের কথা জানে? যাঁরা জানেন, তাঁরাই বা কতটা জানাতে পারছেন আজকের বাংলাকে, তথা ভারতকে?

সেই বছরের ৬ই ফেব্রুয়ারীর শনিবারে সিনেটহল তখন রীতিমতো উৎসবক্ষেত্র। অধ্যাপক রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন স্যার আশুতোষের —মা জগত্তারিণী দেবীর নামাঙ্কিত স্বর্ণপদক পাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার গভর্ণর স্যার স্ট্যান্‌লি জ্যাকসন আপন মর্যাদার আসনে উপবিষ্ট, সস্ত্রীক। উপস্থিত তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন আর উপাচার্য ডক্টর হাসান সারওয়ার্ডি। এছাড়া লেজিস্‌লেটিভ্‌ কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, মেয়র, স্পীকার ইত্যাদি পদস্থ ব্যক্তিরা। লিবার্টি, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, এ্যাড্‌ভান্স ইত্যাদি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ। আছে পুলিশ সিকিওরিটি। অর্থাৎ সব কিছু মিলে যাকে বলে একেবারে জমজমাট ইন্দ্রসভা।

স্ট্যান্‌লি উঠলেন তাঁর মহামূল্য বক্তব্য রাখতে। সবাই দেখছে চেয়ে, ইনিই বাংলার ভাগ্যবিধাতা।

নাকি ভাগ্যহন্তা? কে দিল এই অনধিকার অধিকার? পররাজ্য গ্রাসী ইংরেজ সন্তান, রামায়ণের প্রমীলা, আর আনন্দমঠের শান্তির রক্তবীজ থেকে জন্ম নিয়েছে বাংলার মেয়ে বীণা দাস। যাকে তুমি মানপত্র দিতে এসেছ। তোমার কাছ থেকে সেটা নেবার আগে সে তোমাকে কিছু দিতে চায়।

পরপর দুটো শব্দ। গুলির। না, থামা চলবে না। খরস্রোতা ভাগীরথীর মতো মেয়েটি ছুটে আসছে সভাস্থ সকলের সামনে দিয়ে। হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটা কেমন ঝক্‌ঝক্‌ করছে। কন্‌ভোকেশনের গাউন পরা কে এই দুঃসাহসিনী? সবাই ভীত, সবাই বিস্মিত।

গভর্ণর ওর লক্ষ্য। কিন্তু শেষরক্ষা হোল না। কর্পোরেশনের চীফ্‌ এক্‌জিকিউটিভ্‌ অফিসার জে. সি. মুখার্জী আর উপাচার্য হাসান

সারওয়ার্ডি মিলে ধরে ফেলেছে এই নারীসেনাকে। সমাবর্তন উৎসবে এ কি পাগলামিতে নেমেছে স্নাতক ছাত্রীটি ?

ঈশ্বর করুণাময়! গভর্নর অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন, উনি ঝট্ করে বসে পড়েছিলেন মঞ্চে। লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিতে দীনেশচন্দ্র সেন অল্প আহত। ওঁদের সবার মনে নিশ্চয়ই এই জিজ্ঞাসা ছিল—বিদ্যাপ্রাঙ্গনে এ কোন্ ভয়ঙ্করী অবিদ্যার আবির্ভাব ?

এরপর নিয়মমাফিক যা যা কার্যপ্রণালী, তা হয়ে চলল একের পর এক। জেরা। বাড়ি ও হোস্টেল তল্লাসি।

ডায়োসেসন কলেজের ছাত্রী। হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের হেড্‌মাস্টার বেণীমাধব দাসের মেয়ে। বীণা দাসের দিদি কল্যাণী দাস আইন অমান্য আন্দোলনের আসামী হয়ে তখন কারাবাস করছেন। ইন্‌ভেস্টিগেশন্ দপ্তর এটা আবিষ্কার করতে পেরে মহা খুশি। তাই বল, জাত কেউটে!

বীণা দাসের বাবা, মা, আত্মীয় পরিচিতরাও জেরার হাত থেকে রেহাই পেলেন না। কম দামাল মেয়ে নাকি ?

স্টিভেন্স্ হত্যার দুই আসামী কিশোরী শান্তি ও সুনীতির আদর্শে ও ত্যাগে সে অনুপ্রাণিতা। ওদের মরণজয়ী দীক্ষায় দীক্ষিতা, হোস্টেলের ঘরে পাওয়া গেল শান্তি সুনীতির ছবি, আর তার নীচে বীণা দাসের নিজের হাতে লেখা—"রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা।"

আঠাত্তর সাল! সেদিনের সেই সর্বনাশের সঙ্গে আজকের যুবসমাজের কোন সর্বনাশের নেশাকে মেলানোর ব্যর্থ চেষ্টা কোরনা। প্লীজ্।

স্ট্যান্‌লি হত্যা প্রচেষ্টার নায়িকা বীণা দাসের মনোভাব তখন কী ? তিনি বলেন, বিনা রক্তপাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়ায় তিনি নিশ্চিন্ত। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিকূল মনোভাব যে উনি জানাতে পেরেছেন, বিদেশীর হাত থেকে স্বদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে মানপত্র নেবার জন্য তাঁর হৃদয়-মন যে প্রস্তুত নয়, এটা তো বোঝানো গেল।

মামলায় বীণা দাসের পক্ষে দাঁড়ালেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। সহযোগিতায় এ্যাডভোকেট জে. সি. ব্যানার্জি।

দিকে দিকে তখন একটিই নাম, বীণা দাস। শৃঙ্খলিতা দেশমাতার দামাল মেয়ে বীণা দাস। কাগজে কাগজে লোকের মুখে মুখে সমাবর্তন উৎসবের কাহিনী। খবর পৌঁছল লণ্ডনে।

স্ট্যান্‌লির মহামূল্য প্রাণটা বেঁচে যাওয়ায় সেক্রেটারী ফর্ দ্য স্টেট্ অফ্ ইণ্ডিয়া স্যামুয়েল হোর্ আর হিজ্ হাইনেস্ কিং জর্জ দ্য ফিফ্‌থ্ সহর্ষ অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন।

কুড়ি বছর বয়স্কা ছাত্রী, স্বাধীনতার রণাঙ্গনের রিপুদলবারিণী আত্মাশক্তির প্রতীক বীণা দাসকে নিয়ে বাঘা বাঘা বিচারকেরা তখন কী করছেন?

সম্রাটের পক্ষ থেকে এ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, রায়বাহাদুর এম. এন. ব্যানার্জি, মিস্টার জাস্টিস্ সি. সি. ঘোষ, এম. সি. ঘোষ শিক্ষামন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সবাই উপস্থিত বিচারালয়ে।

নির্ভীক বঙ্গবালা বীণা দাস আসামীর কাঠগড়ায়। একটু মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। বসার জন্য চেয়ার।

রায় যা দেবার দেয়া হয়ে গেল। ন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীর কারাবাস। বলা হোল, আসামীর কোন বক্তব্য থাকলে এই বেলা বলে নিতে পারে।

"গভর্নর স্ট্যান্‌লির বিরুদ্ধে আমার কোন বিদ্বেষ নেই। বিদ্বেষ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে। গভর্নর সেই সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ। অপরাধে অভ্যস্থ নই আমি। কোন অপরাধ করিওনি।

......আমার স্বদেশ আজ উৎপীড়িত। দেশের স্বার্থের খাতিরে আমি সে কাজে উদ্যত হয়েছিলাম। বিনা রক্তপাতে আমার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বলে আমি আজ আনন্দিত।"

দণ্ড রহিত করার কোন আকুল আবেদন নয়। বিচার কক্ষে উপস্থিত মা বাবা ও আপনজনদের দেখে কোন বিদায়ী উচ্ছ্বাস নয়।

সেদিন কিন্তু কাগজে কলমে রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে সম্মানিত করা হোল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হাসান সারওয়ার্ডিকে। মহামান্য স্ট্যান্‌লির জীবন রক্ষক যে! মাননীয় পঞ্চম জর্জের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে "নাইটহুড্" উপাধি দেওয়া হোল। নামের আগে বসল, "স্যার।" এর কিছু দিন পরই স্ট্যান্‌লি জ্যাকসন দেশে ফিরে গেলেন।

সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে। বীণা দাস আজ বীণা ভৌমিক। অধ্যাপক যতীশ ভৌমিকের সহধর্মিণী।

মনে বড় সাধ যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি সমাবর্তন উৎসবে তাঁকে নতুন মঞ্চে বিশেষ আসনে অভিষিক্ত দেখতে। সেদিন হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। আজ হাতে থাকবে ভাগীরথীর পবিত্র জলধারার মতো আশিস্‌ধারা আজকের দিনের যুবসমাজের জন্য। এ আশিসের প্রয়োজন আছে বৈকি।

আটাত্তরের তরুণ তরুণী, তোমাদের হৃদয়ের মন্দিরে মন্দিরে দেশমাতৃকার এই সুযোগ্যা কন্যাটির প্রতিমা কি গড়ে নিয়েছ? এখনও বেলা যায় নি। কলকাতার বুকে সেদিনের বীণা দাস, আজকের বীণা ভৌমিক, তাঁর বুকভরা আশীর্বাদ নিয়ে অপেক্ষমানা। মাথা নত করে সম্মিলিত কণ্ঠে একবার অন্ততঃ বল, "বহুবলধারিণীং রিপুদলবারিণীং নমামি।"

'কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?

—কাজী নজরুল ইসলাম

কোন পথে

রেখা আহমেদ

ঘটনাটা আমি শুনেছিলাম আমার বান্ধবী মণি বেগমের মুখ থেকে। মণি তখন ঢাকার নারায়ণগঞ্জে থাকতো। তাই সেদিনের সবকিছুই ওর পক্ষে দেখা সম্ভব হয়েছিল নিজের চোখে।

সেটা ছিল ১৯৩৪ সাল। চ্যালেঞ্জ জানালেন বাংলার কুখ্যাত গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন,—'বাংলার বিপ্লবীরা কত শক্তি ধরে তা আমি একবার দেখতে চাই'। তারপরই তিনি প্রতিটি গাঁয়ে গুণ্ডা-শ্রেণীর লোকদের নিয়ে গড়ে তুললেন 'ভিলেজ গার্ড' বাহিনী। তাদের প্রধান কাজ ছিল—সন্দেহজনক কোন ছেলে দেখলেই থানায় খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেয়া। অবশ্য পুরস্কারটা ভালভাবেই মিলতো তার বিনিময়ে।

এণ্ডারসনের দমননীতির ফলে বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ একটা তখন জেলের বাইরে ছিলেন না। ব্যতিক্রম শুধু যতীশ গুহ, সুকুমার ঘোষ, মতি মল্লিক, মধু ব্যানার্জী, ভবানী ভট্টাচার্য প্রমুখ বি. ভি-র কয়েকজন তরুণ মাত্র। তারা তখন পলাতক।

পলাতক অবস্থায়ই সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন এই তরুণবৃন্দ। এণ্ডারসনের চ্যালেঞ্জের জবাব আমরা দেবো। জবাব তারা দিয়েছিলেন দার্জিলিং সংলগ্ন লেবং-এর ঘোড়দৌড়ের মাঠে। বিচারে ভবানী ভট্টাচার্য প্রাণ দিয়েছিলেন ফাঁসি মঞ্চে।

কিন্তু তার আগেই একদিন বিস্ফোরণ ঘটল নারায়ণগঞ্জ সংলগ্ন

দেওভোগ গ্রামে। সেদিন রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সুকুমার ঘোষ ও মধু ব্যানার্জী এসেছিলেন দলীয় সদস্য মতি মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে। বিপদ ঘটল ফেরার পথে। আচমকা ভিলেজগার্ড বাহিনীর নেতা রমজান মিয়া তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দলবল নিয়ে। হঠাৎ রিভলবার গর্জে উঠল রাতের নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে রমজান মিয়ার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

রাতের অন্ধকারে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সুকুমার ঘোষ আর মধু ব্যানার্জী। স্থানীয় তরুণ মতি মল্লিক ধরা পড়লেন ঘটনাস্থলেই।

গ্রেপ্তারের পরে হাজার নির্যাতনেও মুখ খুললেন না মতি মল্লিক। তাই ব্রিটিশের চিরাচরিত চাল হিসেবে ডেকে নিয়ে আসা হল তার পিতা রাজকুমার মল্লিককে। তারপরই শোনা গেল বড় সাহেবের দরদ ভরা কণ্ঠ—'এই যে মল্লিকমশাই! বসুন! এক কাজ করুন! মতি শুধু আপনারই ছেলে নয়, আমারও ছেলের মত। ওকে আপনি বুঝিয়ে বলুন যে, ওর সঙ্গে আর কে কে ছিল, তাদের নামগুলি বলে দিতে। কথা দিচ্ছি, মতিকে আমি খালাস করে আনবোই। আর আপনাকে দেবো নগদ দশহাজার টাকা'।

সহজ সরল মানুষ রাজকুমার মল্লিক। প্রায় নিরক্ষরই বলা চলে। নিজের বলতে সামান্য একটি মুদি দোকান মাত্র। অথচ সংসারে পোষ্য কম নয়।

—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন! তাড়া দিলেন বড় সাহেব, ছেলেকে বুঝিয়ে বলুন!

—আমি পারবো না হুজুর।

—পারবেন না! নিজের কানকেই বুঝি বিশ্বাস করতে পারলেন না বড় সাহেব, তার মানে!

—বাপ হয়ে কি করে আমি ছেলেকে বেইমান করতে বলবো হুজুর! অধর্ম হবে যে!

—তাই বুঝি! বিদ্রুপে ঝলসে উঠলেন বড়সাহেব, তাহলে ছেলের ফাঁসির জন্য প্রস্তুত থাকুন।

তাই হল। ১৫ই ডিসেম্বর মতি মল্লিক প্রাণ দিলেন ঢাকা জেলের ফাঁসি মঞ্চে।

পিতা রাজকুমার মল্লিক সর্বক্ষণ সেদিন ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইলেন তার ঠাকুরের সামনে। আমাকে শক্তি দাও ঠাকুর। কোনদিনও যেন আমাকে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করতে না হয়।

সেই পরাধীন দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু রাজকুমার মল্লিকের মত অমন আদর্শবান, ধর্মভীরু লোকগুলোকে আজ আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন! দেশ এগিয়ে চলেছে ঠিকই, কিন্তু কোন পথে?

'একটা জাতি যখন জাগে, তখন হঠাৎ জাগে না। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালিলে হঠাৎ যেমন সমস্ত ঘর আলোকিত হয়, সেইরূপ কোন যাদুমন্ত্রে হঠাৎ কোন সুপ্ত জাতির তমিস্রা রজনীর অবসান হয় না। জাতি জাগে ধীরে ধীরে। তার পিছনে থাকে বহু নীরব নিঃস্বার্থপর কর্মীর বহুদিনের সাধনা'।

—ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ)।

নাইবা মনে রাখলে

ওঁদের কথা কেউ মনে রাখেনি।

শান্তি বা ভোগ-বিলাসের দিনে হয়তো তার ততটা প্রয়োজন নেই। কিন্তু যেদিন সত্যিই ঘরে-বাইরে ঝড় উঠবে, অন্ধকার হয়ে উঠবে আরো সূচীভেদ্য, চোখের সামনে সমস্ত আলো যখন এক এক করে নিভে যাবে, সেদিন কিন্তু ওঁদের কথাই স্মরণ করতে হবে বারবার। তাই সামান্য যে কয়টি নাম আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি, তার একটি তালিকা তুলে ধরছি কেবলমাত্র বাংলাদেশের পক্ষ থেকে।

বলাই বাহুল্য যে, তালিকা অসম্পূর্ণ। লাঠি, গুলি বা অন্যান্য ঘটনায় যারা প্রাণ দিয়েছেন, তাদের কথা এখানে বলা হয়নি। বলতে চেষ্টা করেছি শুধুমাত্র তাঁদের কথা, যাঁরা সেদিন হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি তুলে নিয়েছিলেন নিজেদের গলায়।

নাম	ফাঁসির তারিখ	কোন জেলে
১। ক্ষুদিরাম বসু	১১ই আগষ্ট, ১৯০৮	মজঃফরপুর
২। কানাইলাল দত্ত	১০ই নভেম্বর ,,	আলিপুর
৩। সত্যেন বসু	২১শে নভেম্বর ,,	,,
৪। চারু বসু	১৯শে মার্চ, ১৯০৯	,,
৫। বীরেন দত্তগুপ্ত	২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১০	,,
৬। বসন্ত বিশ্বাস	১১ই মে, ১৯১৫	আম্বালা
৭। নীরেন দাশগুপ্ত	২২শে নভেম্বর, ১৯১৫	বালেশ্বর
৮। মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত	,, ,,	,,

নাম	ফাঁসির তারিখ	কোন জেলে
৯। সুশীল লাহিড়ী	... অক্টোবর, ১৯১৮	উত্তরপ্রদেশ
১০। গোপীনাথ সাহা	১লা মার্চ, ১৯২৪	প্রেসিডেন্সি
১১। প্রমোদ চৌধুরী	২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৬	আলিপুর
১২। অনন্ত হরি মিত্র	,, ,, ,,	,,
১৩। রাজেন লাহিড়ী	১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৭	গোণ্ডা
১৪। দীনেশ গুপ্ত	৭ই জুলাই, ১৯৩১	আলিপুর
১৫। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস	৪ঠা আগষ্ট ,,	,,
১৬। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	২২শে আগষ্ট, ১৯৩২	বরিশাল
১৭। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য	১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৩	মেদিনীপুর
১৮। কালীপদ মুখার্জী	১৬ই ফেব্রুয়ারী ,,	ঢাকা
১৯। মতি মল্লিক	১৫ই ডিসেম্বর ,,	,,
২০। সূর্যসেন	১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৪	চট্টগ্রাম
২১। তারকেশ্বর দস্তিদার	,, ,,	,,
২২। কৃষ্ণ চৌধুরী	৫ই জুন ,,	মেদিনীপুর
২৩। হরেন চক্রবর্তী	,, ,,	,,
২৪। দীনেশ মজুমদার	৯ই জুন ,,	আলিপুর
২৫। অসিত ভট্টাচার্য	২রা জুলাই ,,	শ্রীহট্ট
২৬। ব্রজকিশোর চক্রবর্তী	২৫শে অক্টোবর ,,	মেদিনীপুর
২৭। রামকৃষ্ণ রায়	,, ,,	,,
২৮। নির্মলজীবন ঘোষ	২৬শে অক্টোবর ,,	,,
২৯। ভবানী ভট্টাচার্য	৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫	রাজশাহী
৩০। রোহিণী বড়ুয়া	১৮ই ডিসেম্বর ,,	ফরিদপুর
৩১। সত্যেন বর্ধন	১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩	মাদ্রাজ ফোর্ট
৩২। মানকুমার বসুঠাকুর	২৭শে সেপ্টেম্বর ,,	,,
৩৩। দুর্গাদাস রায়চৌধুরী	,, ,,	,,
৩৪। নন্দকুমার দে	,, ,,	,,
৩৫। চিত্তরঞ্জন মুখার্জী	,, ,,	,,

নাম	ফাঁসির তারিখ	কোন জেলে
৩৬। ফণিভূষণ চক্রবর্তী	১৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩	মাদ্রাজ ফোর্ট
৩৭। নিরঞ্জন বড়ুয়া	,, ,,	,,
৩৮। সুনীল মুখার্জী	,, ,,	,,
৩৯। কালীপদ আইচ	,, ,,	,,
৪০। নীরেন মুখার্জী	,, ,,	,,

* সংকলন শৈলেশ দে।

'দেশের জন্য এরা জীবন উৎসর্গ করেছে, সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে, এরাই দেশের মুক্তির অগ্রদূত। গভর্নমেন্ট এদের ভয় করে, কারণ জানে, এদের তপস্যার মধ্যে রচিত হচ্ছে তাদের ধ্বংসের মন্ত্র। চিরচঞ্চল চিরজীবি চিরতরুণ এরা। দেশের তরুণদের আমি বলি—তোমাদের এতবড় আপনজন, এতবড় জীবন্ত আদর্শ আর কেউ নেই।'

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ পাণ্ডুলিপি

[সংকলন]

তমাল রায়

দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি

'সোমবার শেষ রাত্রিতে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। মঙ্গলবার প্রাতে কলিকাতার প্রতি রাস্তার মোড়ে বহু পুলিশ মোতায়েন দেখা যায়। ইহা হইতেই প্রবল অনুমান হয় যে, ফাঁসি হইয়া গিয়াছে'। [আনন্দবাজার : ৭-৭-৩১]

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি

ভোর পাঁচটায় সব শেষ

'মেদিনীপুর, ১২ই জানুয়ারী। ডগলাস হত্যাকাণ্ড মামলায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি অদ্য প্রত্যূষে পাঁচটার সময় মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে হইয়া গিয়াছে'।

ফাঁসির পূর্বে

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, প্রদ্যোৎ ভোরবেলা স্নান করে। স্নান করিবার পর সে গীতাপাঠ করিতেছিল, এমন সময় ফাঁসির মঞ্চের দিকে যাইবার জন্য তাঁহাকে ডাকা হয়। সে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়।

তাঁহার দুই ভ্রাতাকে যখন জেলের ভিতর লওয়া হইল, তখন তাঁহারা দেখেন যে, প্রদ্যোৎ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে।

অবিলম্বে তাঁহাকে ফাঁসির মঞ্চে উঠিতে বলা হয়। সে অবিচলিত পদক্ষেপে ফাঁসির মঞ্চের উপর গিয়ে ওঠে, তৎপর ফাঁসির রজ্জু চুম্বন করিয়া জহ্লাদের হাতে আত্মসমর্পন করে। [আনন্দবাজার : ১৩.১.৩৩]

কালীপদ মুখুজ্যের ফাঁসি

'ঢাকা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, মুন্সিগঞ্জের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা-প্রসাদ সেনকে হত্যা করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কালীপদ মুখুজ্যেকে অদ্য প্রাতঃ ৬টার সময় ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২৭শে জুন তারিখে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। কালীপদর স্ত্রী একটি শিশুপুত্র প্রসব করিয়া গত ৭ই জানুয়ারী তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কালীপদ পিতাব একমাত্র পুত্র ছিলেন। [আনন্দবাজার : ১৭-২-৩৩]

সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার

'চট্টগ্রাম, ১২ই জানুয়ারী। অদ্য সকালবেলা চট্টগ্রাম জেলের ভিতরে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামী। চট্টগ্রামে এক স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে তাঁহাদের বিচার হইয়াছিল। বিচারে তাহারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

গত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় কলিকাতা হাইকোর্টে উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইলে হাইকোর্ট উক্ত দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছিলেন। [আনন্দবাজার : ১৩-১-৩৪]

তিনজনের প্রাণদণ্ড

মেদিনীপুর, ১০ই ফেব্রুয়ারী, অদ্য স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের কমিশনারগণ বার্জহত্যা ষড়যন্ত্র মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আসামী (১) নির্মলজীবন ঘোষ (২) ব্রজকিশোর চক্রবর্তী (৩) রামকৃষ্ণ রায়—এই তিনজনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

[আনন্দবাজার : ১২-২-৩৪]

দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি

'গত শনিবার শেষ রাত্রিতে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করার চেষ্টা সম্পর্কে (ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলায়) দীনেশের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। দণ্ডভোগকালে সে মেদিনীপুর জেল হইতে পলায়ন করে। অনেকদিন পর কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে এক বাড়িতে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশের সহিত তাহার লড়াই হয়। দীনেশ যে ঘরে ছিল, সেই ঘর হইতে নিক্ষিপ্ত রিভলবারের গুলিতে মুকুন্দ ভট্টাচার্য নামক জনৈক পুলিশ কর্মচারী আহত হয়।

গত ১০ই অক্টোবর আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে দীনেশের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। ১৫ই জানুয়ারী (ভূমিকম্পের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে) কলিকাতা হাইকোর্ট প্রাণদণ্ড অনুমোদন করেন।

[আনন্দবাজার : ১১ই জুন মঙ্গলবার : ১৯৩৪]

'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি, অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?'

—কাজী নজরুল ইসলাম

চারণ কবি মুকুন্দ দাস

অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

আসল নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর।

ছেলেবেলায় যজ্ঞেশ্বর ছিল বাংলা মায়ের দামাল ছেলে। লেখা পড়ায় তার তেমন উৎসাহ ছিল না, আর তার উপদ্রবে পাড়া-প্রতিবেশীরাও অস্থির হয়ে উঠেছিল। অবশ্য, মাঝে মাঝে দুর্বৃত্তের দমনেও এই দুর্দান্ত ছেলেটি কোমর বেঁধে দাঁড়াতো, ভয় কাকে বলে, এই দুঃসাহসী ছেলেটি তা জানতো না!

পরবর্তী জীবনে অবশ্য তিনি মুকুন্দ দাস রূপে নবজন্ম লাভ করেন। তাঁর এই গুরুদত্ত নাম সর্বাংশে সার্থক হয়েছিল, কারণ, তিনি মুকুন্দ দাস রূপেই দেশের ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

মুকুন্দ দাসের পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বানড়ী গ্রামে, কিন্তু তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা হয়েছিল বাংলার বহু বরেণ্যসন্তানের পাদরেণুপূত বরিশাল নগরীতে। সার্থক নাম্নী কীর্তিনাশা নদীর তীরে অবস্থিত বানড়ী গ্রাম নদীর করাল গ্রাসে পতিত হলে তাঁর পিতা গুরুদয়াল সপরিবারে বরিশাল নগরীতে আগমন করেন। শৈশবেই মুকুন্দ দাসের সঙ্গে তাঁর জন্মভূমির সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তাই বরিশাল নগরীকেই তিনি জননী জন্মভূমি বলে মনে করেন। মুকুন্দ দাসের গর্ভধারিণী, জননীর নাম ছিল শ্যামাসুন্দরী।

মুকুন্দ দাসের পিতা শান্তপ্রকৃতির লোক হলেও তিনি ছিলেন কর্তব্যে অনলস। তিনি চাকরি গ্রহণ করেছিলেন ডেপুটির আরদালি-রূপে, সেই সঙ্গে তিনি একটি স্বাধীন ব্যবসায়ও পরিচালনা করেছিলেন। সাধুতার জন্যে তাঁর খ্যাতি ছিল, তাই তাঁর পরিচালিত মুদীর দোকানে যথেষ্ট লাভ হতো।

পুত্র মুকুন্দ দাস যাতে একদিন উচ্চশিক্ষিত হয়ে সমাজে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন, সেদিকে গুরুদয়ালের যত্নের ক্রটি ছিল না, কিন্তু বিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষা গ্রহণে মুকুন্দের কোনো দিনই তেমন আগ্রহ ছিল না। বিধাতা তাঁকে যে মহৎ কাজের জন্যে চিহ্নিত করেছিলেন, মুকুন্দের বাল্যকালে অনেকেই তা বুঝতে পারেন নি।

তাঁর দেহে ছিল অমিত বল, মনে ছিল অসীম সাহস আর সর্বপ্রকার অত্যাচার, অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা। তা ছাড়া, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময়েই তিনি এমন কয়েকজন পূতচরিত্র শিক্ষাব্রতীর সান্নিধ্য লাভ করেন, যার ফলে তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই সব আদর্শবাদী আচার্যগণের মধ্যে লোক নায়ক অশ্বিনীকুমার, ঋষিকল্প জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আর্তের সেবায় সদা অনলস কালীশ পণ্ডিত, সুবিখ্যাত গায়ক ও ভক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিশেষতঃ যজ্ঞেশ্বরের জীবনে যে দিব্য রূপান্তর ঘটেছিল, তার মূলে ছিল দেশ-হিতৈষী ও ভগবদ্-ভক্ত অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রেরণা।

অশ্বিনীকুমার একদিন তাঁকে বলেছিলেন—'যজ্ঞা, তোর ভেতর রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা, তুই তোর সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলে দেশের কল্যাণ কর্মে তাকে নিয়োগ কর।'

মুকুন্দ দাসের মুখে শুনেছি—'আমার জীবনের সবকিছুর মূলে রয়েছেন তিনি (অশ্বিনীবাবু), আমি তাঁর কথাই বলে বেড়াই, তাঁরই গান গাই।' যে সময়ে তিনি এই কথাগুলি বলেছেন, সে সময়ে তাঁর খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ কী প্রগাঢ় ছিল তাঁর গুরু ভক্তি !

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সারা বাংলায়, তথা সারা ভারতে বিক্ষোভ-বহ্নি ধূমায়িত হয়, তখন লোকনায়ক অশ্বিনীকুমারের নির্দেশে মুকুন্দ দাস বিপ্লবী চারণ কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং একটা বলিষ্ঠ জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

মুকুন্দ দাসের রচিত স্বদেশী যাত্রা বা নাটক যে বাংলার জনগণের মানসে এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার প্রধান কারণ হচ্ছে—নাটক-রচয়িতা মুকুন্দ দাস, অভিনেতা মুকুন্দ দাস ও মানুষ মুকুন্দ দাসের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। তাঁর রচিত নতুন ধরণের স্বদেশী নাটকের মধ্য দিয়েই তিনি সুপ্ত জাতিকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন, সমাজের বর্ণ বৈষম্য ও পণপ্রথা প্রভৃতি অনাচারের বিরুদ্ধে এবং বিদেশী অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁদের সচেতন করে তুলেছিলেন, দেশের অর্থ নৈতিক মুক্তি ও বিদেশী বর্জনের জন্যে তাঁদের উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের জড়তা ও তামসিকতাকে আঘাত করে তাদের ভেতর প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন।

দেশ ও জাতিকে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্যে মুকুন্দ দাস সর্বপ্রথম যে নাটকখানি রচনা করেন, তার নাম 'মাতৃপূজা'। মুকুন্দ দাস ও তাঁর দলের লোকেরা যখন এই নাটকটির অভিনয় করেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দের ভেতর প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

এর পর তাঁর খ্যাতি ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি ১৯০৭

খ্রীষ্টাব্দে বরিশালে যখন তাঁর এই পালাগানটি পরিবেশন করেন, তখন যে উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় সহরটি ছিল বিক্ষুব্ধ, সে ইতিহাস তো সকলেই জানেন।

এই সময়ে মুকুন্দ দাসও রাজরোষে পতিত হন। তিনি যেখানেই অভিনয়ের জন্যে গমন করতেন, সেখানেই গোয়েন্দা পুলিশ তাঁর অনুসরণ করতো। এর পর মুকুন্দ দাস রাজদ্রোহের অভিযোগে তিন বৎসরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। শুধু তাই নয়, বাংলার এই দামাল ছেলেকে বাংলা থেকে দিল্লীর 'সেণ্ট্রাল জেলে' স্থানান্তরিত করা হয়। কারামুক্তির পরেও মুকুন্দ দাস অনেক বার অভিনয়ের উদ্দেশ্যে কোন স্থানে গমন করে সেই স্থান থেকে রাজাজ্ঞায় বহিষ্কৃত হয়েছেন, কিন্তু দুঃসাহসী মুকুন্দকে কোনো বাধাবিঘ্নই বিচলিত বা কর্তব্যভ্রষ্ট করতে পারে নি।

'মাতৃপূজা' ভিন্ন মুকুন্দ দাস আর যে কয়খানি নাটক লিখেছিলেন, তা হচ্ছে কর্মক্ষেত্র, পথ, পল্লীসেবা, আদর্শ, ব্রহ্মচারিণী ও সাথী। এই সব 'নাটক বা স্বদেশী যাত্রার ভেতর দিয়েই মুকুন্দ দাস বহু স্বরচিত ও কখনো কখনো কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে অপরের রচিত গান পরিবেশন করতেন। এই সব গানের মধ্যে যে এক উন্মাদিনী শক্তি ছিল, তা যাঁরা তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত সংগীত শোনেন নি, তাঁরা কখনো উপলব্ধি করতে পারবেন না। কখনো তিনি গাইতেন—

'মায়ের নাম নিয়ে ভাসানো তরী
যে দিন ডুবে যাবেরে ভাই
যে দিন ডুবে যাবে,
সে দিন চন্দ্রসূর্য-গ্রহতারা
তারাও ডুবে যাবেরে ভাই
তারাও ডুবে যাবে।'

কখনো বা গাইতেন—

'জাগো গো জাগো জাগো জননী,
তুই না জাগালে শ্যামা কেউ তো জাগিবে না
তুই না নাচালে কারো নাচিবে কী ধমনী।'

কখনো গাইতেন—

'আয় রে বাঙ্গালী আয় সেজে আয়
আয় লেগে যাই দেশের কাজে।'

কখনো বা গাইতেন—

'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর-রঙ্গে ॥'

কখনো গাইতেন—

'শুনি মাভৈ মাভৈ ধ্বনি মাভৈ মাভৈ
আমি অভয় যে হয়ে গেছি ভয় আর কই ॥'

কখনো বা উদাত্ত কণ্ঠে গাইতেন চারণ-কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত প্রসিদ্ধ গান—

'সাবধান—সাবধান—
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দৃপ্ত মূর্তিমান ॥'

আবার কখনো গাইতেন—

'হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে
করিতে হবে মোদের মায়েরই সাধনা,
দেখাতে হবে আজি, জগতবাসী সবে
এখনো ভারতের যায় নি রে চেতনা।'

তিনি একদিকে তথাকথিত শিক্ষাভিমানী মানুষের মিথ্যাচার, কপটতা, স্বার্থপরতা ও বিলাসিতাকে তীব্র কশাঘাত করেছেন, অপর দিকে তথাকথিত ছোট লোক 'চাষাদের' উদ্দেশ্যে বলেছেন—

'ভাইরে ধন্য দেশের চাষা,
এদের চরণধূলি মাথায় পড়লে
প্রাণ হয়ে যায় খাসা।
এরা কপটতার ধার ধারে না
সত্য ছাড়া মিথ্যা কয় না।

প্রাণের কথা গুছিয়ে বলার
নেই কো এদের ভাষা।
প্রাণভরা আনন্দ এদের
বুকটা স্নেহের বাসা,
চিনলে এ সব সোনার মানুষ
মিটতো দেশের সব পিয়াসা।'

তিনি তাঁর নাটকের ভেতর দিয়ে পণপ্রথা ও অন্যান্য সামাজিক দুর্নীতিকে তীব্র কশাঘাত করেছেন। তিনি প্রয়োজন মত সম-সাময়িক অন্যান্য কবিদের রচনাও তাঁর নাটকে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

পণপ্রথা রূপ সামাজিক দুর্নীতি সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্যে নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষও একখানি রচনা নাটক করেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে মুকুন্দ দাসের 'সমাজ' নাটক বা যাত্রা সবচেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং এই নাটকের অভিনয় দর্শন করে অনেকের মনে শুভ বুদ্ধিও জাগ্রত হয়েছিল। যাঁরা সেই অভিনয় দর্শন করেছেন, তাঁদের কর্ণে আজো যেন মুকুন্দ দাসের উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে—

'ভাইরে মানুষ নাই আর দেশে,
আছে কেবল ফাঁকি, কেবল মেকি,
যে যার মৌজে, আপন রসে॥
ছেলের বাপে বসে আছে পাঁচ হাজারের আশে,
মেয়ের বাপের ভাঙ্গা কপাল চোখের জলে ভাসে
ভাইরে মানুষ নাই আর দেশে॥'

মুকুন্দ দাসের অভিনয় যে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছিল, তার মূলে ছিল নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি সীমাহীন সহানুভূতি, স্বার্থপরতা ও কপটতার প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং ভারতের সনাতন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধাবোধ। তিনি সুপ্ত দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য পৌরাণিক যাত্রার পরিবর্তে নতুন ধরণের স্বদেশী যাত্রার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পৌরাণিক যাত্রাগানের মতো

এই সব যাত্রাগানের ভেতর দিয়েও এ দেশের অগণিত মানুষ এই শিক্ষাই লাভ করেছিল—'যতো ধর্মস্তুতো জয়ঃ'।

আমাদের এই সুজলা, সুফলা বঙ্গভূমিতে একদিন যাত্রাগান, কবি গান, কথকতা, সংকীর্তন, রামায়ণ-গান, মনসার ভাসান, জারিগান প্রভৃতির ভেতর দিয়ে লোক শিক্ষার যে বিপুল আয়োজন হয়েছিল, তার ফলভাগী হত জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়। এই আয়োজনের ফলে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে তথাকথিত নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত জনসাধারণ ঈশ্বর বা পরলোকে বিশ্বাসহীন, স্বার্থপরায়ণ আত্মকেন্দ্রিক, দুর্নীতিগ্রস্ত ধর্মধ্বজী বা কপটাচারী হতে পারতো না, তাদের ভাষা হতো ভাবপ্রকাশের বাহন, ভাব গোপন করার বাহন নয়। লোকশিক্ষার বিকিরণের ফলে তারা এই সত্যই উপলব্ধি করতো—

'ভিতর বাহির দুই সমান রেখো ভাই
মানুষ যদি হতে চাও।'

আধুনিক কালে মুকুন্দ দাসও তাঁর বাণী প্রচারের জন্যে লোক-শিক্ষার অঙ্গ হিসাবেই স্বদেশী যাত্রার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

মুকুন্দ দাস ছিলেন জগন্মাতার আদরের সন্তান, তাই তিনি তাঁর জীবনের ব্রত সাঙ্গ করে মায়ের অভয় পদে স্থান লাভ করেছিলেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের কাহিনী শ্রবণ করলে স্বতই তাঁর চরণে আমাদের মস্তক অবনত হয়। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২রা জ্যৈষ্ঠ তিনি বেলেঘাটায় যাত্রাভিনয়ের পর অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করেন। পরদিন তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে মাতৃনাম গান করতে করতে তাঁর নশ্বর দেহ জগন্মাতার চরণে আহুতি দেন।

মুকুন্দ দাসের চরিতকার সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় লিখছেন—

'মুকুন্দ দাস ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ভোর রাত্রে খুবই অসুস্থ বোধ করে উঠে পড়লেন। সিদ্ধ সাধক মুকুন্দ বুঝলেন, মায়ের নিকট হতে ডাক এসেছে—তাঁর অন্তিম সময় সমাগত। তাঁর পরিচারক ও সেবক কালীচরণকে ডেকে বল্লেন, তাঁর জপের মালাটি দিয়ে দরজা বন্ধ করে

চলে যেতে। কেউ যেন তাঁকে এখন ডাকাডাকি না করে। তারপর মায়ের ছবির পদপ্রান্তে বসে শেষ বারের মতো চারণ কবি গাইলেন—

'বড় দয়া তব শুনি কাঙালেতে
নিবেদন করে রাখি চরণেতে,
চরণ যুগলেতে যেন দেখিতে দেখিতে
মুকুন্দের খেলা হয় না ভঙ্গ'।

সকাল হয়ে রৌদ্র উঠেছে। কিন্তু মুকুন্দ আর দরজা খোলেন না। যখন অনেক ডাকাডাকি করেও তাঁর কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন দলের অন্যতম সভ্য শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্তী জোর করে দরজা খুলে দেখেন, মুকুন্দ প্রশান্ত মনে মায়ের ছবির পদপ্রান্তে শুয়ে আছেন—যেন গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন। দেহ তাঁর নিথর, নিস্তব্ধ। মায়ের আদরের ছেলে তাঁর শ্যামা মায়ের কাছে চিরদিনের মতো চলে গেছেন।'

আজ আমাদের দেশে সর্বব্যাপী বিপর্যয়, প্রমত্ততা ও অনাচারের যুগে দেশহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত, জগন্মাতার অভয় চরণে আত্ম নিবেদিত মুকুন্দ দাসের মতো চারণ কবিরই একান্ত প্রয়োজন। তাই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়—

'আবার আসিবে কি মা!'

'পরাধীন জাতির শিক্ষা দীক্ষা-কর্ম সব কিছুই ব্যর্থ, যদি তা স্বাধীনতা লাভের সহায়ক বা অনুকূল না হয়'। —সুভাষচন্দ্র

পূর্ণচন্দ্র দাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গলার বিপ্লব আন্দোলনে এবং ফরিদপুর জেলার ইতিহাসে পূর্ণচন্দ্র দাস একটি অবিস্মরণীয় নাম। পূর্ণচন্দ্র দাস এবং বর্তমান লেখক একই জেলার এবং একই মহকুমার বাসিন্দা, সেজন্য আমি বিশেষভাবে গর্বিত। সেদিনের মাদারীপুর মহকুমা রাজনৈতিক চেতনায় এবং বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতায় অগ্রগামী ছিল। তার আকাশে বাতাসে মাটিতে ও জলে ছিল দেশাত্মবোধের কী এক আশ্চর্য প্রেরণা। আমাদের তখন প্রথম যৌবনকাল, বিচিত্র উন্মাদনার মধ্যে আমাদের দিনগুলি কেটে যেত। পূর্ণ দাস, পুলিন দাস, আশুতোষ কাহালি, প্রতাপ গুহরায় থেকে সুরু করে কত যে নামকরা নেতা ও কর্মীর আবির্ভাব হয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। প্রত্যেকটি সুস্থ যুবকই যেন দেশের একজন বিপ্লব-কর্মী ছিলেন, আজকের দিনের তরুণেরা সেদিনের সেই আশ্চর্য্য রূপের কথা, ভাববন্যার কথা ভাবতেও পারবেন না। পরাধীনতার বিরুদ্ধে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধনের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতির চিত্ত যেন বিদ্রোহ করেছিল। পূর্ণচন্দ্র দাস তরুণ বয়সে এই বিদ্রোহীদের দলে স্বেচ্ছায় নাম লেখালেন এবং স্বেচ্ছায় বিপ্লবের দুঃসাহসিক ব্রতে দীক্ষা নিলেন। অথচ জন্মেছিলেন তিনি নিতান্ত দরিদ্র পরিবারে, যেখানে দু'বেলা উপযুক্ত খাবার জুটতো না। অত্যন্ত রোগাপটকা শিশু হয়ে অসময়ে (মাত্র ৮ মাসে) তিনি জন্মেছিলেন। বাঁচবার আশা ছিল না। কিন্তু সেই রোগাপটকা গরীব ঘরের অসহায় শিশুটিই একদিন বৃটিশ সিংহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে

অবতীর্ণ হলেন। নতি স্বীকার করলেন না, পরাজয় স্বীকার করলেন না, অমিতবিক্রমে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালালেন এবং তা সারা জীবন, অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত কারাবাস, অন্তরীণ ও নির্যাতনের বেদনা বহন করলেন।

আদর্শ ও নীতির প্রতি পূর্ণ দাসের অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল এবং এজন্যই দরিদ্র জীবনে চাকুরীর পথে না গিয়ে তিনি সমগ্র সমাজের দারিদ্র্য মুক্তির প্রথম ধাপ হিসেবে পরাধীনতা থেকে মুক্তির ব্রতকেই হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন। আজকের দিনে এমন আদর্শবাদী, দৃঢ় চরিত্র এবং নীতিবান মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত কমে যাচ্ছে, যেটা সমাজের অধঃপতনের লক্ষণ। এবং দেশ যে অধঃপতনে গিয়েছে তার প্রমাণ এই যে, এত বড় বিপ্লবী দেশপ্রেমিক সমাজকর্মী (উদ্বাস্তুদের সেবা কার্য্য স্মরণীয়) স্বাধীন ভারতে প্রকাশ্য দিবালোকে কলিকাতার রাস্তায় ছুরিকাহত হয়ে মারা গেলেন।

পূর্ণচন্দ্র দাসের বৈপ্লবিক কর্মের বিস্তৃত কোন আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। সারা বাঙলা দেশের জেলায় জেলায় সেই কর্মের স্মরণ চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। শান্তি সেনা বাহিনীর স্থাপনা, সংগঠন, পরিকল্পনা ও পরিবর্দ্ধন তাঁর জীবনের এক ঐতিহাসিক কীর্তির মত। মাদারিপুরের শান্তি সেনা বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ রূপে পূর্ণ দাস যখন জেল থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম তাঁকে স্বাগত জানিয়ে যে দীর্ঘ অভিনন্দন কাব্য রচনা করেছিলেন, আজও তার দুটো লাইন আমাদের স্মরণ আছে :

'স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ
মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মাণিক
মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর.

নজরুল ইসলামের এই বন্দনা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, পূর্ণচন্দ্র দাস সেদিনের জনসমাজে প্রীতি ও শ্রদ্ধার কত শীর্ষস্থানে উঠেছিলেন। "মাদারীপুরের মর্দ্দবীর" এই বিশেষণটি ফরিদপুর

জেলা ও মাদারীপুর মহকুমার যুব সমাজের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সত্যি সত্যি তিনি অকুতোভয় 'মর্দ্দবীর' ছিলেন।

সরল আন্তরিক সৎ ও সাহসী পূর্ণচন্দ্র দাস তাঁর বিপ্লবী জীবনের অক্ষয় কীর্তি ও ঐতিহ্য রেখে গেছেন। কিন্তু এই যুগের ছেলেরা কি সেই ঐতিহ্যের উপযোগী? সেই সুভাষ, সেই চিত্তরঞ্জন, পূর্ণচন্দ্র দাসেরা আজ কোথায়? আজ কোথায় ভারতবর্ষের প্রত্যাশিত বিপ্লবের পূর্ণতা? সুতরাং পূর্ণচন্দ্র দাসের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে যখন শ্রদ্ধা জানাই, তখন দেশের দুর্গতির কথাও না ভেবে পারি না। কবে এই দুর্গতির শেষ হবে?

কালীচরণ মাঝি

বহুরূপী

ভরা বর্ষায় পদ্মা ও মেঘনার ভয়ঙ্কর রূপ আপনারা দেখেছেন কি?

অনেকেই দেখেননি। দেখার কথাও নয়। রাজনীতি ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের অসংখ্য স্মৃতিতে ভরপুর সেই পদ্মা ও মেঘনা আজ আমাদের কাছে চিরদিনের মতই পর হয়ে গেছে। তার সেই অশান্ত রূপকে ভালবাসার কোন অধিকারই বুঝি আজ আর আমাদের নেই।

আমি কিন্তু ফেলে আসা পদ্মা ও মেঘনার সেই ভয়ঙ্কর রূপকে আজো ভুলিনি। বোধহয় ভুলবোও না কোনদিন।

ভরা বর্ষায় সে কি রূপ পদ্মা ও মেঘনার। অবিরাম ঢেউ গড়ছে

আর ভাঙছে। অবিরাম সেই ভাঙার শব্দ চলছে। যেন শেষ নেই এই ভাঙাগড়া মিছিলের।

মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে। দুরন্ত ঝড়। উদ্দাম উচ্ছ্বল পদ্মা ও মেঘনার সে কি তখন বিচিত্র রূপ। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উৎক্ষিপ্ত দুবাহু আকাশে তুলে সে কি তখন তার নাচের ঘটা। একমাত্র প্রত্যক্ষ দর্শী ছাড়া আর কারো পক্ষেই বুঝি সে দৃশ্য কল্পনা করা সম্ভব নয়।

কার সাধ্য তখন পদ্মা ও মেঘনা পাড়ি দেয়? অসম্ভব! সেই পাহাড় প্রমাণ ঢেউ ভেঙে এগিয়ে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। মানুষ তো মানুষ, এমনকি জাহাজ পর্যন্ত এ সময়ে পদ্মা ও মেঘনা পাড়ি দিতে ভয় পায়।

ভয় পায় না শুধু একজন। নাম তার কালীচরণ মাঝি। এমন জাত মাঝি সত্যাই দুর্লভ। কি করে পদ্মা ও মেঘনাকে বশ করতে হয়, তা সে ভাল করেই জানে।

সে অঞ্চলের অধিবাসীরাও তা জানে। জানে বলেই যখন-তখন তাদের কাছে ডাক পড়ে কালীচরণ মাঝির। বড্ড দরকার কালীচরণ। পারবে না তুমি আমাকে ওপারে পৌঁছে দিতে?

—পারুমনা ক্যান। সঙ্গে সঙ্গেই কালীচরণ মাঝি প্রস্তুত, উইঠা আসেন নৌকায়।

—কিন্তু যে ভাবে ঝড় উঠেছে—

—উঠতে দ্যান। আপনেগো বাপ মায়ের আশীর্বাদে যতক্ষণ কালীচরণের হাতে বৈঠা আছে, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকেন।

নিশ্চিন্ত মনে নৌকায় উঠে বসে যাত্রীদল। কালীচরণ মাঝিকে বহুদিন ধরেই তারা জানে। ভরা বর্ষায় পদ্মা-মেঘনা পাড়ি দিতে সত্যিই ওর জুড়ি নেই।

স্থানীয় দারোগাবাবুও এ ব্যাপারে পুরোপুরি একমত। হ্যাঁ, মাঝি বটে কালীচরণ। কতবার সে আমাকে নিয়ে পদ্মা-মেঘনা পাড়ি দিয়েছে। ওর হাতে বৈঠা থাকলে আমি নিশ্চিন্ত।

১৯১০ সাল। বাংলার দিকে দিকে সেদিন নবজীবনের সাড়া। নতুন দিনের সঙ্কেত।

ইতিমধ্যে ক্ষুদিরাম, কানাই-সত্যেন সবাই প্রাণ দিয়েছেন ফাঁসি মঞ্চে। আরো কতজনকে যে প্রাণ দিতে হবে কে জানে!

একদিকে বাংলার মৃত্যু ভয়হীন বিপ্লবীর দল। অন্যদিকে বিভীষণের বংশধররা। বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেবার জন্য তারা বদ্ধ পরিকর। চাকরি জীবনে উন্নতি করতে হলে এর চাইতে সহজ পন্থা আর কিছু নেই।

বিপ্লবীরাও তখন মরিয়া। নির্মমভাবে ওদের শেষ করে দিতে হবে। স্বদেশবাসী হলেও বিশ্বাসঘাতকের কোন ক্ষমা নেই।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯১০ সাল। স্থান-ঢাকার গোয়ালনগর। হেড কনেষ্টবল রতিলাল রায়ের জীবনের সেদিন শেষ দিন।

সেই লোভ। সেই উচ্চাশা। জীবনে বড় হতে হবে। তার জন্য দরকার হলে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে হুজুরের কাছে সে সব যথাযথভাবে নিবেদন করতে হবে। তিনি একটু সদয় হলে উন্নতি আর ঠেকায় কে?

সে সুযোগ এ জীবনে আর হলনা রতিলালের। তার আগেই আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

কে এই আততায়ী? কে সেদিন রতিলালকে শাস্তি দিয়েছিলেন নিজের হাতে?

কালীচরণ মাঝি। যাকে বছরের পর বছর চোখের সামনে দেখেও দারোগাবাবু কোনদিন চিনতে পারেননি, সেই কালীচরণ মাঝি।

কে এই কালীচরণ মাঝি?

বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, তিনি কিন্তু আসলে অগ্নিযুগের এক বিরাট কর্মযোগী সাধক ত্রৈলোক্য মহারাজ ছাড়া কেউ নন।

এ এক আশ্চর্য মহারাজ। হাতীশালে হাতী নেই, ঘোড়াশালে ঘোড়া নেই, রাজপ্রাসাদ বা সৈন্য সামন্তেরও কোন বালাই নেই, তবু

তিনি মহারাজ। রাজ্যের সীমানাও তার বহুদূর বিস্তৃত। এক সঙ্গে এপার বাংলা—ওপার বাংলা—দুইই।

আসল নাম ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, কিন্তু সে নাম বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গিয়েছিল বহুকাল আগে থেকেই। তখন থেকে ছোট বড় সবার কাছেই তিনি 'মহারাজ'।

কোথায় তাঁর এই মহারাজ নামের উৎস?

অগ্নিযুগের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যার পরিধি বিস্তৃত, তাঁর কথা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কার পক্ষে বলা সম্ভব! তাই তাঁর মুখ থেকেই আপনারা শুনুন।

"পুরীতে পালিয়ে গিয়েছিলাম। একটা বড় বাড়িতে ছিলাম। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলা হত,—এ বাড়িতে ময়মনসিংহের মহারাজ থাকেন। তখন থেকেই আমি মহারাজ।

আমি ১৯০৮ সন হইতে ৩০ বৎসর জেলে কাটাইয়াছি। ৪।৫ বৎসর অজ্ঞাত বাসে কাটাইয়াছি।...আমি বহু বৎসর সাধারণ কয়েদীর মত ছিলাম, দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী ছিলাম এবং বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী ছিলাম।

আমি ষ্টেট প্রিজনার ছিলাম, ডেটিনিউ ছিলাম, সিকিউরিটি বন্দী ছিলাম এবং অন্তরীণ বন্দীও ছিলাম। জেলখানার পেনালকোডে যেসব শাস্তির কথা লেখা আছে এবং যেসব শাস্তির কথা লেখা নাই, তাহার প্রায় সবগুলি সাজাই ভোগ করিয়াছি।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলে বেশির ভাগ সময় অসহ্য উৎপীড়নে জীবনের ত্রিশ বৎসর আমার কাটিয়াছে জেলে এবং জেলের বাহিরে ৫৮ বৎসর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছি।

...আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে—ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়াছে, কিন্তু দেশ ও জাতিকে চরিত্র-গৌরবে বড় করিয়া তুলিবার যে আদর্শ ছিল বিপ্লবীর, তাহা সফল হইল কই?

তাইতো স্বাধীনতার পরে দেশকে যেমনটি দেখিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সেই স্বপ্ন আজও বাস্তবে রূপায়িত দেখিতে পাই না।

মানুষকে গতানুগতিকতার গ্লানি ও দুঃখ দৈন্যের ঊর্ধে তুলিয়া লইয়া যাওয়ার মধ্যেই তো বিপ্লবীর সাধনার সিদ্ধি। কিন্তু সেই সিদ্ধি আনিতে পারি নাই ; তাই মর্মান্তিক বেদনা-বোধ করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছি ;—আমার জীবন সফল হয় নাই।"

এই হল মহারাজ, অগ্নিযুগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যিনি নিজেই গোটা একটা ইতিহাস।

আজ আর সেই মহারাজ নেই। সব যেমন ছিল, তেমনই আছে। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। সবই চলছে সংসারের অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে। নেই শুধু সেই মহারাজ। অগ্নিযুগের অগ্নিতাপস চিরদিনের মতই বিদায় নিয়েছেন পৃথিবী থেকে।

'দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যত
এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।'

—কাজী নজরুল ইসলাম

ইতিহাস মনে রাখেনি

শৈলেশ দে

অসম্ভব। এ হয় না। হতে পারে না।

মনে মনে হাসলেন উত্তরপ্রদেশের পুলিশ কমিশনার মিঃ নেদারসোল। যত সব বাজে রিপোর্ট। এসব রিপোর্টের কোন ভিত্তি নেই।

—কিন্তু আমার এই রিপোর্টে কোন ভুল নেই স্যার। সবিনয়ে জানালেন পুলিশ সুপার মিঃ পিলডিচ। এর প্রতিটি কথাই সত্য।

—আর ইউ সিওর?

—সেণ্ট পারসেণ্ট স্যার।

—তুমি বলছ কি পিলডিচ! সজোরে হাতের কলমটাকে কামড়ে ধরলেন মিঃ নেদারসোল। শেষে কিনা মিস এলিস এসব কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

—আমিও প্রথমটাতে বিশ্বাস করিনি স্যার। পরে তদন্ত করে দেখলাম যে, সব সত্য। এ সব কিছুর মূলে রয়েছেন ঐ মিস এলিস। আজ থেকে নয়, অনেকদিন আগে থেকেই।

শব্দহীন মন্থরতায় মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে গেল। কারো মুখে কোন কথা নেই। শুধু দেওয়াল ঘড়িটা একটানা বেজে চলছে টিক্ টিক্ করে।

—স্যার! কুণ্ঠিত ভাবে ডাকলেন পুলিশ সুপার মিঃ পিলডিচ।

—উঁ! যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন পুলিশ কমিশনার মিঃ নেদারসোল।

—মানে—মানে অর্ডার চাইছিলাম। একটা সার্চ ওয়ারেণ্ট নিয়ে তল্লাসী চালালে—

—সার্চ ওয়ারেণ্ট! খসখস করে একটা কাগজে কি লিখে এগিয়ে দিলেন মিঃ নেদারসোল, এই নাও। গো অন্! ইমিডিয়েটলী এ্যাকসান নাও।

—এ কি! কাগজটার দিকে চোখ বুলিয়েই চমকে উঠলেন মিঃ পিলডিচ, এ যে বডি ওয়ারেণ্ট।

—হ্যাঁ, বডি ওয়ারেণ্ট। কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটে উঠল মিঃ নেদার-সোলের, রিপোর্ট সত্যি হলে সঙ্গে সঙ্গেই এ্যারেস্ট করবে মিস এলিসকে। নো মার্সি।

কে এই মিস এলিস?

কেন তাঁর সম্বন্ধে উত্তর প্রদেশের পুলিশের সর্বময় কর্তা মিঃ নেদারসোলের এই কঠোর নির্দেশ?

কি তাঁর অপরাধ?

মিস এলিসকে চিনতে হলে অনেকগুলো দিন পিছিয়ে যেতে হবে আমাদের।

সে এক বিস্মৃতপ্রায় অতীতের কথা।

সেদিন জাফর আলী নামে এক তরুণ ব্যারিস্টারের আকর্ষণে মিস এলিস ভারতবর্ষে এসেছিলেন তাঁকে নিয়ে ঘর বাঁধবেন বলে। কিন্তু দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা থাকলে এক রাগিণীতে আলাপ করা চলে না, তাই বালির ওপর প্রতিষ্ঠিত সে ঘর ভেঙে যেতে দেরী হয়নি।

মিস এলিস বিদ্রোহী আইরিশ কন্যা। ব্রিটিশ তাঁর জাত শত্রু। অন্যজন ব্রিটিশ ভক্ত প্রজা। ব্রিটিশই তাঁর ইহকাল, পরকাল সব কিছু। ফলে স্বাভাবিক কারণেই সম্পর্কচ্ছেদ করে মিস এলিস আবার একদিন ফিরে এলেন তাঁর কুমারী জীবনে।

ঘর ভাঙলেও জীবনে আর কোনদিন ঘরে ফেরা হল না মিস এলিসের। কারণ, ততদিনে তিনি ভীষণ ভাবে ভালবেসে

ফেলেছেন এই পরাধীন ভারতবর্ষকে। তাই দেশে না ফিরে স্থায়ী ভাবেই তিনি বসবাস করতে লাগলেন এলাহাবাদের একটি নিরিবিলি অঞ্চলে।

তাঁর নিজের দেশের মত ভারতবর্ষও যে পরাধীন। এই পরাধীন দেশের লাঞ্ছিত, অবমানিত মানুষগুলোকে ফেলে তিনি যাবেন কি করে?

শুরু হল নিঃসঙ্গ একক জীবন। শুধু পড়া আর পড়া। রাতদিন পড়া। ভারতবর্ষকে ভাল করে জানতে হবে। কোটি কোটি এই হতভাগ্য মানুষগুলোকে নতুন করে চিনতে হবে। বিশেষ করে জানতে হবে হিন্দু দর্শনকে। হিন্দু সভ্যতাকে।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর গড়িয়ে গেল জীবনের ওপর দিয়ে।

হিন্দু দর্শনের প্রভাবে তখন আর তিনি মিস এলিস নন। নতুন জীবনে তিনি তখন সদ্যোজাত। নবজন্ম হয়েছে তাঁর। তাই নিজের এতদিনকার নামটাও তিনি পরিত্যাগ করেছেন অবলীলাক্রমে। নতুন হিন্দু নাম গ্রহণ করেছেন "সাবিত্রীদেবী"।

বয়েস বেড়েছে, তা বলে বুকের আগুন কিন্তু নিভে যায়নি। ব্রিটিশ তাঁর জন্মশত্রু। তাদের সঙ্গে কোনরকম আপস নয়। কোনরকম সহযোগিতাও নয়। শত্রুর সঙ্গে আবার আপস কি?

এই ব্রিটিশ বিদ্বেষের ফলে ইতিমধ্যেই তাঁর একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের সঙ্গে। ঘরছাড়া, কুলহারা বিপ্লবীদের প্রতি মমতার বুঝি আর সীমা পরিসীমা ছিল না তাঁর। তাই মিস এলিস নন, সাবিত্রী দেবীও নন, তাদের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন 'মাদার' নামে।

সত্যিই মাদার। হয়তো কোন পলাতক বিপ্লবী পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আশ্রয়হীন হয়ে। যে কোন সময়ে তিনি ধরা পড়ে যেতে পারেন পুলিশের হাতে। চাই এখন একটা নিরাপদ আশ্রয়।

কিন্তু জেনে শুনে কে আশ্রয় দেবে একজন পলাতক বিপ্লবীকে? অত সাহসই বা কার আছে?

কোন ভাবনা নেই। সোজা চলে যাও মাদারের কাছে। মাদার থাকতে আশ্রয়ের জন্য ভাবনা কি?

রক্ত ঝরা ১৯২৯ সাল। দেশের দিকে দিকে তখন নবজীবনের সাড়া। নতুন দিনের সঙ্কেত।

পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের বিপ্লবীরা তখন মরিয়া, বেপরোয়া। পাঞ্জাব-সিংহ ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়েছে। এর বদলা নিতে হবে। উপযুক্ত বদলা।

শুরু হল আঘাতের বদলে আঘাত। মারের বদলে মার। ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরু ফাঁসির অপেক্ষায় দিন গুণছেন; তা বলে আমরা তো আর মরে যাইনি। দেখিয়ে দেব যে, বদলা কাকে বলে।

লুটিয়ে পড়লেন পাঞ্জাবের গভর্নর মোরেন্সি। লুটিয়ে পড়লেন বঙ্গের গভর্নর স্যার হট্সন। লুটিয়ে পড়লেন সাব-ইন্সপেক্টর চন্নন সিং, রাজসাক্ষী জয়গোপাল, ফণী ঘোষ এবং আরো অনেকেই। বদলা চাই। প্রতিশোধ চাই। শত্রুর কোন ক্ষমা নেই।

কিন্তু না, আর নয়। মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার। তাই ছোটখাট কাউকে আর নয়। খোদ বড়লাট লর্ড আরউইনকেই এবার চাই।

জানা গেছে ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি কোলহাপুর থেকে দিল্লী ফিরে আসবেন ভোরের গাড়িতে। এই সুযোগ! যে করে হোক, তাঁর ঐ স্পেশাল ট্রেনটিকে উড়িয়ে দিতে হবে ডিনামাইট দিয়ে। জান কবুল।

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ সাল।

পূর্ব আকাশে রঙ ধরেছে। অন্ধকার তরল হয়ে আসছে একটু একটু করে।

কি প্রচণ্ড শীত সেদিন। ঠিক তেমনিই কুয়াশা। দু' হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট নজরে পড়ে না।

নিরাপত্তা হিসেবে প্রথমেই পেরিয়ে গেল একটা পাইলট ইঞ্জিন। ঠিক তার পনেরো মিনিট পরেই যাবে সেই স্পেশাল ট্রেন। তাই নিয়ম। তাই হয়ে আসছে বরাবর।

জিরো আওয়ার আসন্ন। পনেরো মিনিট হতে আর কয়েক সেকেণ্ড মাত্র বাকি। যদিও কুয়াশার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তবু স্পষ্ট কানে আসছে গাড়ি আসার শব্দ। আর দেরী নয়। রেডি প্লীজ্। চার্জ ···

সঙ্গে সঙ্গেই কান ফাটানো শব্দ, বুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌···

না, হল না। মাত্র এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হয়ে গেল, তার ফলে দুটো বগী ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আসল বগীটা অক্ষতই রয়ে গেল। স্রেফ কুয়াশাই সেদিন বাঁচিয়ে দিল মহামান্য বড়লাট লর্ড আরউইনকে।

নিমেষে তোলপাড় হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ, গোটা ইংল্যাণ্ড। কি ভয়ঙ্কর কথা! শেষে কিনা মহামান্য বড়লাটের গাড়ি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা! এ যে চিন্তাও করা যায় না!

কে এই ভয়াবহ কাণ্ডের জন্যে দায়ী? যে করে হোক, তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। নইলে মুখ দেখানোও যে ভার হয়ে উঠবে মহামান্য সরকারের পক্ষে।

তদন্তের ফলে কিছুই জানতে বাকী রইল না পুলিশ কর্তৃপক্ষের। এর জন্যে দায়ী হল যশপাল। ভগৎ সিং-এরই ঘনিষ্ঠ সহকর্মী যশপাল। সুতরাং, ধর এবার যশপালকে।

কত বড় সাহস! হাজার হোক, বড়লাটের স্পেশাল ট্রেন। রেললাইন পাহারা দেবার জন্যে পুলিশ প্রহরাও রাখা হয়েছিল বিস্তর। তা সত্বেও কিনা দিল্লী থেকে চারমাইল দূরে কুরুপাণ্ডব দুর্গের সামনে এতবড় ঘটনা!

না, কোন ক্ষমা নেই। যশপালকে এর জন্যে উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে।

কিন্তু কোথায় যশপাল! দিল্লী, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ চষে ফেলা হল, তবু যশপালের কোন পাত্তা নেই। যেন হাওয়ায় মিশে গেছে লোকটা।

অক্ষমতার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল পুলিশ কর্তৃপক্ষের। ইতিমধ্যে ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসি হয়ে গেছে। তারপরও দু'বছর কেটে গেছে। তবু যশপালের কোন সন্ধান নেই। এর চাইতে বড় পরাজয় আর কি হতে পারে সরকার বাহাদুরের পক্ষে।

অবশ্য চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। সত্যি বলতে কি, একটি দিনের জন্যেও পুলিশ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি এই দুই বছরের মধ্যে। গুপ্তচরের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে বিস্তর, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন পাকা খবরই মেলেনি যশপালের।

১৯৩২ সাল। জানুয়ারী মাস।

জনৈক গুপ্তচরের মুখে কি একটা খবর শুনে হঠাৎ সেদিন চমকে উঠলেন উত্তর প্রদেশের পুলিশ সুপার মিঃ পিলডিচ। অসম্ভব! এ হতেই পারে না! হাজার হোক, উনি একজন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা। ওঁর পক্ষে এসব ব্যাপারে জড়িত থাকা সম্ভব নয়। ঠিক আছে, আমি নিজেই এনকোয়ারী করে দেখছি ব্যাপারটা সত্যি কিনা।

দু'দিন বাদে পুলিশের সর্বময় কর্তা মিঃ নেদারসোলের সদর দপ্তরে। ভারতবাসী হলে ভাবনা ছিল না, কিন্তু এ যে একজন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা। দেখা যাক, চীফ কি বলেন!

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩২ সাল।

ভোর চারটে। পূব আকাশটা ফর্সা হয়ে আসছে একটু একটু করে। আলো ফুটতে আর দেরি নেই।

হঠাৎ দরজায় প্রচণ্ড করাঘাত। বাইরে থেকে দরজায় ব্যাটনের গুঁতো দিতে দিতে আদেশ দিলেন মিঃ পিলডিচ, **'Please open the door, Madam'.**

গলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল এলিসের। আলতো ভাবে জানালা ফাঁক করতেই বুঝতে পারলেন যে, খেলা শেষ। বাড়ির চারপাশে পুলিশের বিরাট বেষ্টনী। আজ আর কোন রকমেই রেহাই নেই।

দরজা খুলতেই পিস্তল হাতে নিয়ে সর্বাগ্রে ঘরে ঢুকলেন পুলিশ সুপার মিঃ পিলডিচ, হ্যাণ্ডস্ আপ মিঃ যশপাল। অনেক জ্বালিয়েছ তুমি গত ছু'বছর ধরে। এখন চল আমাদের সঙ্গে। ম্যাডাম, আপনাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

বাড়ি থেকে সোজা পুলিশ হাজতে। একা যশপালকে নয়, ছুজনকেই।

এক ফাঁকে ফিস ফিস করে বললেন যশপাল, 'Mother be firm.'

নিমেষে চোখ ছুটো ধ্বক ধ্বক করে জ্বলে উঠল মিস এলিসের, 'What do you mean by 'be firm'? I was born in Irish jail and brought up in Irish jail.' শক্ত হবার কথা কি বলছ মাই ডিয়ার বয়! আমার জন্মই যে আইরিশ কারাগারে। আমি যে আইরিশ কারাগৃহেরই লালিতা কন্যা।

শ্বেতাঙ্গিনী হলেও সেদিন কম নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি মিস এলিসকে। কিন্তু সব বৃথা। এত নির্যাতন সত্বেও কেউ একটি কথা শুনতে পেল না তাঁর মুখ থেকে। আইরিশ কন্যা হয়ে তাঁর পক্ষে বিশ্বাস ভঙ্গ করা সম্ভব নয়।

বিচারে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হল মিস এলিসকে। তারপরই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দেরাতুন জেলে।

এবার আপীল। কিন্তু লাভ হল না কিছুই। সংবাদপত্রের ভাষায়:

সাবিত্রী দেবীর আপীল

এলাহাবাদ হাইকোর্টে অগ্রাহ্য

'এলাহাবাদ, ৩১শে জানুয়ারী—বিচারপতি মিঃ বাজপেয়ী অদ্য সাবিত্রীদেবী—ওরফে মিসেস জাফর আলির আপীলের রায় দিয়াছেন।

যশপাল নামক জনৈক ফেরারী বিপ্লবীকে আশ্রয় দেওয়ায় দায়রা জজ সাবিত্রী দেবীকে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। বিচারপতি আপীল অগ্রাহ্য করিয়া দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছেন'। [আনন্দবাজার: ১-২-৩৩]

মুক্তি পেলেন ১৯৩৬ সালে।

কিন্তু এ কোন্ মিস এলিস! এ যেন আগেকার দেখা সেই এলিস নয়, সমৃদ্ধ একটা ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

সারাদেহ তাঁর কাঁপছে অসহায় দৌর্বল্যে। পা-দুটো টলছে। সবচাইতে বড় প্রশ্ন আশ্রয়। কিন্তু কোথায় তাঁর আশ্রয়! অন্ন জুটবেই বা কোথা থেকে! না, আজ আর তাঁর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সব হারিয়ে আজ তিনি পথের ভিখারী।

কোন দুঃখ নেই! কোন ক্ষোভ নেই! নালিশও নেই তাঁর কারো বিরুদ্ধে। এতো জানা কথাই। তারজন্য দুঃখ কিসের।

এগিয়ে এলেন এককালের আশ্রিত বিপ্লবী সন্তানগণ। আপনি দুঃখ করবেন না মাদার। আমরা বিপ্লবীরা বড় গরীব। আমাদের ঘর নেই, অর্থ নেই, কিছুই নেই। তবু যেদিন যা জোটে, তাই আমরা ভাগ করে খাব সবাই মিলে।

আর এগিয়ে এলেন তখনকার দিনের প্রখ্যাত নেতা পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন। পথ আলাদা, তবু সবকিছু শোনার পরে তিনিও পারেননি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই মহিয়সী নারীর অবদানকে

অস্বীকার করতে। তাই তিনিও মাঝে মাঝে সাহায্য করে মাদারকে।

তবে আর বেশীদিন নয়। মাত্র কিছুদিন বাদেই মাদার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তাঁর একান্তপ্রিয় ভারতের মাটিতে।

তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু কে মনে রেখেছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ এই আইরিশ মহিলার কথা? মনে রেখেছে কি কেউ?

না, রাখে নি। কবে কোন্ বিস্মৃতপ্রায় অতীতে মিস এলিস নামে একটি আইরিশ মহিলা সবকিছু তুচ্ছ করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, ইতিহাস সে কথা একেবারেই মনে রাখে নি।

'আজিকে তোমার অলিখিত নাম
আমরা বেড়াই খুঁজি—
আগামী প্রাতের শুকতারা সম
নেপথ্যে আছে বুঝি।'

রবীন্দ্রনাথ

স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার কবি ও সাহিত্যিকদের অবদান

সুকমল ঘোষ

যে কোন দেশের জাতীয় আন্দোলনে সে দেশের চিন্তাবিদ—তথা জননেতাদের ভূমিকা কতটুকু, ইতিহাসের দিকে তাকালেই তা আমরা জানতে পারি, কিন্তু শুধু জননেতা বা চিন্তাবিদই নন, দেশে দেশে অনুষ্ঠিত মুক্তিসংগ্রামের পশ্চাতে সে সব দেশের কবি ও কথা-সাহিত্যিকদের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা। রাশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের পশ্চাতে সে দেশের সাহিত্যিক গর্কি এবং চীনের ক্ষেত্রে লু সুনের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকেই জাতীয় আন্দোলনের ভাবধারা এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্লাবিত করেছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। মূলত এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাঁর জাতীয় চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। এর পর কাব্যের মধ্য দিয়ে দেশের জন্য একটা তীব্র মমত্ববোধের পরিচয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত কাব্য 'মেঘনাদ বধ'-এর মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। এই কাব্যের মধ্য দিয়ে আগাগোড়া স্বাধীনতার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আমরা লক্ষ্য করি—রাবণের পুত্র বীর ইন্দ্রজিৎ মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ঐ একই সময়ে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের কাব্যে স্বাধীনতার সোচ্চার জয়গান শোনা গেল :

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে
কে বাঁচিতে চায়।"

উনিশ শতকের পরবর্তী পর্বে জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড় যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন বিদেশী শাসকদের প্রতি দেশীয় মানুষদের ভয় ও অন্ধভক্তির প্রতি কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় তীব্র কটাক্ষ করেছেন। এজন্য তাকে অশেষ লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হয়েছিল। পরাধীনা জন্মভূমির প্রতি তাঁর দুঃখবোধ ছিল তীব্র। এই দুঃখবোধের পরিচয় কবিতার মধ্য ধরা পড়েছে :

"মাগো, ওমা জন্মভূমি আর কতকাল তুমি
এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।"

বাংলা কাব্যক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের পরে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পলাশীর যুদ্ধ'। এই কাব্যগ্রন্থটির মধ্য দিয়ে তাঁর জাতীয় চেতনার পরিচয় ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতার জন্য আকুল আর্তির পরিচয় নবীনচন্দ্রের কবিতায় ধরা পড়েছে :

"চাহিনা স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন
মুহূর্তেক যদি পাই স্বাধীন জীবন।"

গদ্য সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনার সঞ্চার ঘটে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের এই উপন্যাসটির কথা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, কারণ এই উপন্যাসটিকে বাঙালীর স্বাদেশিকতার বাইবেল বলে চিহ্নিত করা হয়। দেশকে বঙ্কিম জননীরূপে কল্পনা করেছেন। তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটির কিছু অংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি যোগ্য : "মহেন্দ্র বলিল, এত দেশ, এত মা নয়। ভবানন্দ বলিলেন, আমরা অন্য মা জানিনা—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রের স্রষ্টা বঙ্কিম শুধু সাহিত্য সম্রাট নন, তিনি জাতির মানসিক ও নৈতিক ভিত্তিকেও দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

বঙ্কিমের পর আমাদের সাহিত্যাকাশ উজ্জ্বল রবির কিরণে উদ্ভাসিত হয়। ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলার সূচনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন

কিশোর মাত্র। ১৮৭৫ সালে তিনি হিন্দুমেলায় 'হিন্দুমেলার উপহার' নামে একটি দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ করেছিলেন।

এই হিন্দুমেলাতেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'মিলে সব ভারত সন্তান' দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর লেখা 'না জাগিলে সব ভারত ললনা' ও মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন সবে দীন' ইত্যাদি বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীতগুলি প্রথম গাওয়া হয়েছিল।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাঙলা দেশকে ভেঙ্গে দু টুকরো করলেন। এর পর সারা দেশে যেন আন্দোলনের জোয়ার এল। নব পর্যায়ের বঙ্গদর্শন পত্রিকার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশের জনগণকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। এই কাজে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং বিপিন পাল প্রমুখরা তাঁকে সহায়তা করেন। স্বদেশীযুগের —প্রস্তুতি লগ্নে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটির কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে স্মরণ যোগ্য। এই ডন সোসাইটির কোন এক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন :

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে"।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

"বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।"

দেশের প্রতিটি ধূলিকণা, আকাশ-বাতাস, নিবিড় শ্যামলিমায় ঢাকা পল্লী প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল :

"সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এ দেশে
সার্থক জনম মাগো
তোমায় ভালবেসে।"

১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসটি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি গঠনমূলক স্বদেশ সেবার আদর্শ ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া আরো রচনার মধ্যে তাঁর দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনার পরিচয় প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার উপরে গুলি চালনার প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া নাইট উপাধি পরিত্যাগ করেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে সব কবির লেখনী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল মুকুন্দ দাস তাঁদের অন্যতম।

এর পর সঙ্গীত কাব্য ও নাটকের মধ্য দিয়ে যাঁরা দেশাত্মবোধ সঞ্চার করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিশ শতকের গোড়ায় শক্তিমান কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আবির্ভূত হন। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের পশ্চাতে তাঁর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠের' মতো তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাস খানিও বিপ্লবীদের জীবন বেদ ছিল। এই উপন্যাসখানি এক সময় সারা দেশে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। উপন্যাসটি ১৯২৬ সালের ৩১শে আগষ্ট প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ সালের ১লা জানুয়ারী সরকার বেঙ্গল গেজেটে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বইটিকে বাজেয়াপ্ত করেন। বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেনের 'বন্যার পর দেউলি' গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত উল্লেখ করেছেন "শরৎচন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন, পথের দাবীর মাল মশলা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া।"

মূলত কথাশিল্পী হলেও রাজনীতি থেকে তিনি সম্পূর্ণ দূরে ছিলেন না। তাঁর তীব্র সমাজচেতনা তাকে রাজনীতির অঙ্গনে হাত ধরে নিয়ে এসেছিল। বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয় ব্রহ্মদেশ থেকে ফেরার পরে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন বিপ্লবীদের পরম শুভানুধ্যায়ী। শরৎচন্দ্রের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম

দেশবন্ধুর বাড়িতেই শরৎচন্দ্র সব গোষ্ঠীর বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হন। শরৎচন্দ্রের প্রতি দেশবন্ধু যেমন সশ্রদ্ধ ছিলেন, দেশবন্ধুর নেতৃত্ব শক্তিকেও শরৎচন্দ্র তেমনি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতেন। ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে দেশবন্ধু কারাগার থেকে মুক্ত হবার পরে দেশবাসী তাকে সম্বর্ধনা জানায়। এই সম্বর্ধনা সভায় দেশবন্ধুকে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়। এই মানপত্রটি রচনা করেন শরৎচন্দ্র। এর অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো। এই অংশের মধ্য দিয়ে দেশবন্ধুর প্রতি শরৎচন্দ্রের মনোভাব বেশ কিছুটা আন্দাজ করা যাবে।

"একদিন দেশের লোকে তোমাকে ক্ষুধিত ও পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল, সে দিন সে ভুল করে নাই......আর একদিন এই বাংলাদেশ তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া বরণ করিয়াছিল, সেদিনও সে ভুল করে নাই......তখন তোমার সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে গিয়া পৌঁছায় নাই, হয়তো কাহারো রুদ্ধ দ্বারে ঘা খাইয়া সে ফিরিয়াছে, কিন্তু পথ যেখানে মুক্ত ছিল, সেখানে সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পারে নাই। আবার আর একদিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার প্রতি পৌঁছাল......সেদিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল্য নির্দেশ করিয়া দিতে সর্বস্ব পণে তোমাকে পথে বাহির হইতে হইল, সেদিন তুমি দ্বিধা কর নাই।"

এই দেশভক্ত কথাশিল্পী মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার কথা খুবই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতেন। স্বাধীনতা লাভের বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে বিপ্লব পন্থার প্রতিই তাঁর অধিক মনোযোগের পরিচয় ফুটে উঠেছে। এই মনোযোগের পরিচয় আমরা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি, বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতা ও রাজনীতি সম্বন্ধে ব্যক্ত মতামতের মধ্যে পেয়েছি। সাধারণত বিপ্লব প্রসঙ্গে অনেক সময় ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ ও রোমান্টিসিজম প্রশ্রয় পায়, শরৎচন্দ্র তাই বিপ্লব প্রসঙ্গে অতি সতর্ক ছিলেন। তাঁর এই সতর্কতার পরিচয় আমরা পাই ১৯২৯ সালের ইস্টারের ছুটিতে রংপুরে বঙ্গীয়

যুবসম্মিলনীর সভাপতির আসন থেকে প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে। এই বক্তৃতার এক অংশে যুবকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন:

"ভারতের আকাশে আজকাল একটা বাক্য ভেসে বেড়ায়—সে বিপ্লব। বৈদেশীক রাজশক্তি তোমাদের ভয় করতে শুরু করেছে, কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলো না যে, কখনো কোন দেশেই শুধু বিপ্লবের জন্যেই বিপ্লব আনা যায় না। অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের চেষ্টায় কেবল রক্তপাতই ঘটে, আর কোন ফল লাভ হয় না। বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য ধরে তার প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাগতিক ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভব।"

বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র, হেমচন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল। বিপ্লবীদের কাছ থেকে শরৎচন্দ্র তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং বিভিন্ন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা সাগ্রহে শুনতেন। বিপ্লবীরা ভ্রান্ত পথের পথিক, শরৎচন্দ্র একথা কখনো মানতেন না। তিনি বলতেন:

"ভারত উদ্ধার নন-ভায়োলেন্সের পথেই হবে, অন্য কোন পথে হবে না—এরই বা নিশ্চয়তা কোথায়? হাসতে হাসতে যাঁরা ফাঁসিতে ঝুলছে, তারা দেশের স্বাধীনতাকে পিছিয়ে দিচ্ছে, এ কথার মধ্যে গোঁড়ামি ছাড়া আর কি থাকতে পারে?" বাঙলার প্রখ্যাত বিপ্লব-গোষ্ঠী বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স সংক্ষেপে বি. ভি-র নেতৃবৃন্দ হেমচন্দ্র ঘোষ ও ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। এই যোগাযোগ এই সংস্থারই পরিচালিত পত্রিকা 'বেণু'-কে কেন্দ্র করে আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের 'চলার পথে' গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন শরৎচন্দ্র। এই গ্রন্থটিও রাজদ্রোহের অপরাধে ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে দেন।

সুভাষচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হবার পরে একদিন সুভাষচন্দ্র ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মেয়রের ঘরে বসে আছেন, এমন

সময় শরৎচন্দ্র সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। নানান প্রসঙ্গে কথা এগিয়ে চলেছে। শরৎচন্দ্র সেই সময় হঠাৎ বলে উঠলেন "আমি তোমাদের কংগ্রেসের সঙ্গে কোন সম্পর্কই আর রাখব না। তোমাদের অহিংসার এই কচকচানি আমার আর ভালো লাগে না সুভাষ। এরা শুধু মুখেই রাজ্য জয় করে, আর মূর্খ দেশবাসীকে ঠকিয়ে দল পাকিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে।"

বীরেন্দ্রনাথ বললেন "আপনারা যদি সরে দাঁড়ান দাদা, তাহলে দেশবাসীর হয়ে কে লড়বে?"

শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন "তাইত তোমাদের এ অহিংসায় আমার বিশ্বাস নেই বীরেন্দ্রনাথ। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ বাইরে গিয়ে আঘাত হানবে, ততক্ষণ এ দেশের মুক্তি আসবে না। এত অত্যাচার এ দেশবাসীর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যে, তোমাদের ডাকে তাদের চেতনা ঠিক মতো সজাগ হয়ে উঠতে পারছে না। তার কারণ কি জানো? তারা এত ক্লান্ত ও শ্রান্ত যে নিজেদের শক্তিকে উপলব্ধির অবকাশ তারা পাচ্ছে না। কিন্তু তোমরা কেউ যদি সেই শক্তির পরিচয় দিতে পার—তাদের নিজেদের শক্তির প্রতি বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।"

সুভাষচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সী জেলে অনশন শুরু করলেন, তখন শরৎ বসু অনেক উপায়ে তাঁর অনশন ভঙ্গ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শরৎচন্দ্রকে এসে ধরলেন। শরৎচন্দ্র জেলে গিয়ে সুভাষচন্দ্রকে বললেন "রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশের নায়ক, শরৎচন্দ্রের পথের দাবীর সব্যসাচী, এই কি তার সাধনা? কোথায় সে শোনাবে ঘুম ভাঙানি গান, ভাঙ্গাবে মোহাচ্ছন্ন দেশবাসীর মোহনিদ্রা, কোথায় করবে রক্তের সাধনা—তার পরিবর্তে একি তুমি করছো সুভাষ? ওঠো, তাজা রক্ত নিয়ে তোমায় করতে হবে খেলা। ভুললে আজ চলবে না, তুমি বীর। বীরের মৃত্যু তোমায় গ্রহণ করতে হবে।" সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে এত শ্রদ্ধা করতেন যে শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুরোধে লেবুর রস পান করে অনশন ভঙ্গ করতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে এই

সুভাষচন্দ্রের মুখ দিয়েই বেরিয়েছে **"Give me blood, I promise you freedom."**

১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্র, বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীরা যখন মান্দালয় জেল থেকে ছাড়া পেলেন, তখন তদানীন্তন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে শরৎচন্দ্র নিজেই বিপ্লবীদের সম্বর্ধনা জানাতে এগিয়ে এলেন। তিনি তখন হাওড়া বি, পি, সি, সি-র প্রেসিডেন্ট। কংগ্রেসের নীরবতায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন :

"দেশের জন্য যাঁরা নিজেদের রিক্ত করেছে, নিঃস্ব করেছে, আজকে তাঁরাই হবে দেশের লোকের ভয়ের পাত্র? দেশ ছাড়া যাঁদের কিছু নেই, দেশ হবে তাঁদের প্রতি বিমুখ? কেন? টিকটিকির ভয়ে? আই, বি, আর স্পেশাল ব্রাঞ্চ এখনো দেশের লোকের মনকে শাসন করবে?"

এর ফলে বিপ্লবী ও বিপ্লবপন্থায় বিশ্বাসী জনগণের অতি কাছের মানুষ হয়ে উঠলেন শরৎচন্দ্র। বাংলার বিপ্লবী কবি নজরুল ইসলাম শরৎচন্দ্রের প্রয়াণের পর একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে তাঁর অন্তরের সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাটি সারা বাংলা শরৎ জন্ম শত বার্ষিকী কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'The Golden book of Sarat Chandra' নামক পুস্তক থেকে এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

"সেদিন দেখেছি আকাশের শোভা
শরৎচন্দ্র তিলকে।
শূন্যগগন বিষাদ মগন
সে তিলক মুছি দিল কে॥
অবমাননার অতল গহ্বরে যে মানুষ ছিল লুকায়ে,
জগতে আজিকে চলে অভিযান তাদেরই তীব্র আলোকে॥
ভীরু গুণ্ঠনতলে যে নারীর প্রাণশিখা ছিল নিভিয়া

স্তিমিত সে প্রাণ উঠিল জ্বলিয়া সে চাঁদের জ্যোতিঃ লভিয়া
সে চাঁদ কোথায়, কোটি আঁখিদীপ খুঁজিয়া ফিরিছে ত্রিলোকে॥
পৃথিবীর চাঁদ অস্ত গিয়াছে, আলো তার প্রতি ভবনে
তেজপ্রদীপ্ত তেমনি জ্বলিছে, নিভিবেনা তাহা পবনে
ঝরিবে তাহার রসধারা চির-অমরাবতীর শ্রীলোকে ॥"

প্রথম বয়সে নজরুল ইসলাম উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালী রেজিমেণ্টে সৈন্য হিসেবে যোগ দেন। যুদ্ধক্ষেত্রের কঠোর পরিবেশের মধ্যেও তাঁর কাব্যসাধনায় ছেদ পড়েনি। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে কাব্য ও সংগীতের ভেতর দিয়ে তিনি গোটা দেশকে মাতিয়ে তোলেন।

১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে নজরুল 'ধূমকেতু' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২২ সালের এই পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় নজরুলের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, যার অংশবিশেষ হলো :

"আর কতকাল রইবি বেটি
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে
অত্যাচারী শক্তি চাড়াল।"

এই কবিতার জন্য ১৯২৩ সালের ৮ই জানুয়ারী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুইনহোর আদালতে তাঁর বিচার হয়। বিচারে রাজদ্রোহের অপরাধে কবিকে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কবি আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বলেন "আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিনি, করেছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে। রাজনিযুক্ত বিচারক কখনো সত্য বিচারক হতে পারেনা, কিন্তু আমি জানি, আমার পিছনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সত্য সুন্দর ভগবান।"

সাজাকালীন সময়ে কবিকে হুগলী জেলে রাখা হয়। সেখানে তিনি কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে অনশন করেন। রবীন্দ্র-নাথ এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে জেলে এই বলে টেলিগ্রাম

পাঠিয়েছিলেন "Give up hunger strike our literature claims you."

শক্তিমান কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রও নজরুল প্রতিভা সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ ছিলেন। তার পরিচয় পাই কানপুর প্রবাসী মহিলা সাহিত্যিক শ্রীমতী লীলা গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর একটি পত্রের মাধ্যমে। এই পত্রে তিনি শ্রীমতী লীলাকে লিখেছিলেন :

"হুগলী জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম উপোস করিয়া মর মর হইয়াছে। বেলা ১টার গাড়ীতে যাইতেছি, দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে সে খাইতে রাজী হয়। নাহলে তার কোন আশা দেখিনা। একজন সত্যকার কবি। রবিবাবু ছাড়া বোধহয় এখন কেহ আর এত বড় কবি নাই।"

কারাগারের লৌহ শৃঙ্খল দেখে নজরুল কখনো ভীত হননি। তাই তিনি নির্ভয়ে বলতে পেরেছেন,

"কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গে ফেল
কররে লোপাট
রক্তজমাট, শিকল পূজার পাষাণ বেদী।"

নজরুলের অগ্নিস্রাবী গান ও কবিতা দেশের মানুষের মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করবার একটা তীব্র মানসিকতা গড়ে তুলতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তার দেশাত্মবোধক কাব্যসংকলন অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙ্গার গান, প্রলয়শিখা, চন্দ্রবিন্দু ও যুগবাণী ইংরেজ সরকার রাজদ্রোহের অপরাধে বাজেয়াপ্ত করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই বিদ্রোহী কবির অবদানের কথা আমরা যেন কখনো বিস্মৃত না হই।

চল্লিশের দশক বাঙলার সত্যিকারের জাগরণের দশক। এই দশকেই আবির্ভূত হন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। ইনি নজরুলের বিদ্রোহাত্মক ভাব ধারার সার্থক উত্তরসূরী। এর কবিতায় পরাধীনতার জ্বালা যেমন আছে, তেমনি তাকে দূর করবার আহ্বানও অশ্রুত নয়। 'অবাক পৃথিবী ১৯৪৬' কবিতায় কবির দীপ্ত আহ্বান শোনা যায়।

"স্বপ্নচূড়া থেকে নেমে এসো সব
শুনেছ? শুনছ উদ্দাম কলরব"

দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাস আগে এই কবি অকালে প্রয়াত হন। সুকান্তের সম সাময়িককালে বা তার পূর্ববর্তী সময়ে বহু কবি ও কথাকার ছিলেন, যাদের লেখনী স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলে উপেক্ষণীয় নয়, কিন্তু একটি নিবন্ধের মধ্যে তাঁদের সবার চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তাঁদের অবদানের কথা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

'মানুষ হয়ে জন্মানোর মর্যাদা বোধবেই মানুষ হওয়া বলে। মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে'।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যে বিপ্লব

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যই জাতির পরিচয়। সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের সামাজিক ও জাতীয় জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ইহা অতীত ও বর্তমান কালের মানুষের বাহিরের ও ভিতরের জীবনের কতকটা ছবি, কতকটা সমালোচনা, কতকটা ঐ জীবন ভবিষ্যতে কিরূপ হইতে পারে, তাহার আভাস ও তাহার দিকে মানুষকে প্রেরণ করিবার শক্তির আধার। বাহিরের আবেষ্টন যেমন এক একজন মানুষের চিন্তা ও ভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার আন্তরিক জীবনকে পরিবর্তিত করে,

তেমনি এক-একটা শ্রেণী-সম্প্রদায়, সমাজ ও জাতির ভাব ও চিন্তাকেও পরিবর্তিত করে।

আবার এক-একজন মানুষের এবং শ্রেণী-সম্প্রদায়ের সমাজ ও জাতির ভাব ও চিন্তার এবং আভ্যন্তরীণ আদর্শের পরিবর্তন ঘটিলে তাহাদের আবেষ্টনও পরিবর্তিত হয়। এবং বাহ্য জীবন আর পূর্বের মত থাকে না। এই প্রকারে আমাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ জীবনে চিরকাল পরিবর্তন ঘটিয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতেও ঘটিবে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা এবং সাহিত্যেও পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতেও ঘটিবে।

আগে আমাদের সাহিত্যে অন্তরের ও বাহিরের যেসব জিনিষ থাকিত, এখন তাহা হইতে স্বতন্ত্র অনেক জিনিষ তাহাতে নিবদ্ধ হইতেছে, সুতরাং ভাষাও তদনুসারে পরিপুষ্ট ও পরিবর্তিত হইতেছে। আগে আমাদের চিন্তা, ভাব, আদর্শ, যাহা ছিল, এখন কেবল যে তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা নয়, বিস্তর নূতন ভাব, চিন্তা, আদর্শ আমাদের মধ্যে আসিয়াছে; সুতরাং সেই সকলকে প্রকাশিত করিবার জন্য ভাষার শব্দ সম্পদ বাড়াইতে হইয়াছে, এবং সাহিত্যেরও আকার-প্রকার বদলাইয়াছে। কতকগুলি লোক যদি সারাটা জীবন নিজেদের গ্রামে থাকিয়াই কাটাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাদের ভাষা সেই গ্রাম্য জীবনের ঘটনা ভাব, চিন্তা, আদর্শ ব্যক্ত করিবার মত হইলেই চলে। কিন্তু যদি সেই গ্রামের মাঝখান দিয়া কেবল একটা রেলের লাইন চালান যায়, তাহা হইলে শুধু সেই একটা পরিবর্তনেই তাহাদের জীবনে নানা পরিবর্তন ঘটে, নূতন নূতন মানুষের চলাচল হয়, তাহাদের মানসিক দৃষ্টি ও কল্পনা গ্রামের সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। তখন নূতন নূতন শব্দেরও আমদানী সেই গ্রামে হইতে থাকে।

এই জাতীয়, কিন্তু বৃহত্তর, একটা পরিবর্তন সকল দেশেই মধ্যে মধ্যে ঘটে। আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ায় এই রকম একটা বিপ্লব ইউরোপের নানা জাতির মনোরাজ্যে আসিয়াছিল, এবং তাহাদের

সাহিত্য পরিবর্তিত, প্রসারিত ও শক্তিশালী হইয়াছিল। আমাদের দেশটি ঠিক একটি প্রাচীর দিয়া ঘেরা গ্রামের মত কখনই ছিল না। সকল সময়েই বাণিজ্য, লুণ্ঠন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে বিদেশী জাতি এখানে আসিয়াছে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি সকলের এদেশে আসিবার পর, এবং তন্মধ্যে ইংরেজের এদেশে প্রতিষ্ঠার পর, যেমন বহু দূরদেশ ও দূরবর্তী জাতিদের সঙ্গে নানাভাবে আমাদের প্রতিবেশিতা, প্রতিযোগিতা, সংঘর্ষ, পরিচয় ঘটিয়া আসিতেছে, আগে এমন হয় নাই।

আগে ভারতে যে সব বিদেশী আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে, তাহারা প্রধানতঃ এশিয়ার মানুষ। এশিয়ার জাতিদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। এইসব প্রাচ্য-বিদেশীদের আগমনেও ভারতবর্ষের পরিবর্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিদের সঙ্গে সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে আমাদের জীবনের মূলে ঘা পড়িয়াছে। আর এক দিক দিয়াও ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। ভারতবর্ষের মানুষকে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি যে সব ধর্ম গড়িয়াছে, সেগুলির পার্থক্য সত্ত্বেও একটি মৌলিক ঐক্য আছে; এমন কি পরে যে মুসলমান ধর্ম আসিয়া দেশকে বিপর্য্যস্ত করে, কয়েকটি খাদ্যাখাদ্য বিচার এবং বাহিরের ক্রিয়াকলাপ বাদ দিলে, তাহার সহিতও ভারতবর্ষের ধর্ম সকলের সাদৃশ্য আছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম এশিয়ায় জন্মগ্রহণ করে, এবং প্রথম প্রথম ইহার সঙ্গে অন্যান্য প্রাচ্য ধর্মের খুব সাদৃশ্য ছিল, এখনও ইহার রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় অনেকটা প্রাচ্য ভাবাপন্ন। কিন্তু আধুনিক খ্রীষ্টধর্ম প্রাচ্য ধর্ম সমূহ হইতে অনেকটা পৃথক।

পুরাকালে প্রাচ্য জাতি ও পাশ্চাত্য জাতি সকলের প্রকৃতি যাই থাক, তাহাদের মধ্যে এখন একটা প্রধান প্রভেদ এই দেখা যায় যে, প্রাচ্যরা পরলোকমুখী, পাশ্চাত্যেরা ইহলোকমুখী; ধর্মমত ও তদনুযায়ী ক্রিয়াকলাপ দ্বারা ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক বিষয়ে প্রাচ্যদের জীবন নিয়ন্ত্রিত, পাশ্চাত্যদের জীবনের উপর ধর্মমত ও তদনুযায়ী ক্রিয়াকলাপের প্রভাব খুব কমিয়া আসিয়াছে। এমন কি, তাহাদের ধর্মের উপরও

পারলৌকিকতা অপেক্ষা ইহলৌকিকতার প্রভাব বেশী লক্ষিত হইতেছে।

এখন আমাদের জগৎ শুধু আমাদের গ্রামটি নয়; শুধু বাংলা নয়, শুধু ভারতবর্ষ নয়, এশিয়া নয়; এখন পৃথিবীর জ্ঞাত সব দেশের কথা বালক-বালিকারাও ভূগোল ইতিহাসে পড়িতেছে, তথাকার অদ্ভুত নানা রকমের প্রাণী আলিপুরের জীবন-নিবাসে দেখিতেছে। সুমেরু ও কুমেরুর নিকটবর্তী পৃথিবীর অজ্ঞাত কোন স্থান আবিষ্কৃত হইবামাত্র তাহার খরচ এক পয়সার বাংলা দৈনিক কাগজে লোকে পড়িতেছে, এবং চারি আনা খরচ করিয়া তথাকার ছবি বায়োস্কোপে দেখিতেছে। প্রাচ্য প্রাচীন পারত্রিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্য নবীন ঐহিকতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়াছে। সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, পরিবারের গঠন এখন ঠিক মনুস্মৃতির ব্যবস্থা মত কিম্বা কোরাণ-শরীফের অনুযায়ী থাকিতে পারিতেছে না; লোকে জানিতেছে, দেখিতেছে যে, অন্য প্রকারের প্রথা, রীতিনীতি, আদর্শও আছে এবং তাহাতেও মানুষের জীবন যাপন অসম্ভব হয় নাই। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে আধুনিককালে একনায়কত্বের চেয়ে সভ্য দেশ সকলে গণতন্ত্রেরই যে প্রাধান্য ঘটিতেছে, তাহাও আমাদের বালক-বালিকারা পর্য্যন্ত পুস্তকে মাসিক পত্রে খবরের কাগজে পড়িতেছে।

মানুষের মনের মধ্যে এত নূতন জিনিষ আসিয়া পড়িলে ভাব, চিন্তা ও আদর্শের, রীতিনীতি ও প্রথার এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও যে পরিবর্তন আসিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? পরিবর্তন কখন কখন ধীরে ধীরে হয়, কখন কখন বা উহা বিপ্লবের আকার ধারণ করে। বিপ্লবের কুফল আছে কিন্তু সুফল নাই, এমন মনে করা মহাভ্রম। ইতিহাস যিনি পড়িয়াছেন; তিনি এমন কথা কখনই বলিতে পারিবেন না।

সাহিত্যক্ষেত্রে বা ধর্মজগতে বা অন্য কোন বিষয়ে যে সব বিপ্লব ঘটে, তাহা বর্ষাকালের নদীর প্রবল বন্যার মত। কূল ছাপাইয়া বন্যার জল মাঠে পথে লোকালয়ে ঢুকিলে ঘরবাড়ী গ্রাম নষ্ট হইতে

পারে বটে, কিন্তু বহুকালের সঞ্চিত ময়লা আবর্জনাও পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে, এবং ক্ষেতে পলি পড়িয়া মাটিতে নূতন জীবন-শক্তির সঞ্চারও হইতে পারে। এরূপ হইয়াও থাকে। নদীর বন্যার মত দৈব ব্যাপারকে মানুষের শক্তির সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিতে এখনও কোন জাতি পারে নাই।

আমেরিকার এঞ্জিনীয়ারিং-এর খুব উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু সেখানেও এখনও বন্যায় প্রচুর ক্ষতি হয়। কিন্তু ছোটখাটো বন্যাকে আয়ত্তাধীন করিয়া কাজে লাগাইতে অনেক দেশের লোক সমর্থ হইয়াছে। বাঁধ বাঁধিয়া, খাল কাটিয়া উহার ধ্বংস-শক্তিতে বাধা দিয়া কেবল হিতকরী শক্তিটির সাহায্যে উপকারলাভ করিতে তাঁহারা পারিয়াছেন। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতেছেন যে, বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবের বন্যা আসিয়াছে, আসিতেছে। নদীগর্ভে দাঁড়াইয়া উত্তরীয়ের প্রাচীর উত্তোলন করিয়া, কিম্বা ব্যাকরণ অলঙ্কার শাস্ত্রের বাঁধ বাঁধিয়া এই বন্যা আটকাইতে যাওয়া সুবুদ্ধির কাজ কি না, সহজেই বুঝা যায়। যতটা সম্ভব, বন্যার জলকে সুপথে, সুক্ষেত্রে চালাইয়া কাজে লাগান ভাল। প্রতিভাশালী যাঁহারা, তাঁহারা এই কাজ করিতেছেন।

* প্রবাসী (আশ্বিন, ১৩২৩) পত্রিকার সৌজন্যে

'ফুল ফোটানোই আমার ধর্ম। তরবারি হয়তো আমার হাতের বোঝা, কিন্তু তাই বলে তাকে ফেলেও দিইনি। ফুল আমার সুন্দরের জন্য, আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে—সেই অসুরের জন্য।'

—কাজী নজরুল ইসলাম

ডঃ কোটনিস

মানিক মুখোপাধ্যায়

তিরিশের দশকে এদেশের মানুষ যখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশাত্মবোধে উদ্বেল, সেই সময়েই চীনের জনসাধারণ জাপ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করে চলেছিল। তাঁদের সেই সংগ্রামে ভারতের জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাহায্য বহন করে এদেশ থেকে এক মেডিক্যাল মিশন ১৯৩৮ সালে চীনদেশে গিয়েছিল। দেশাত্মবোধের প্রেরণায় সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের জনসাধারণের পাশে দাঁড়াবার জন্য যাঁরা এই মিশনের সদস্য হয়েছিলেন, ডঃ দ্বারকানাথ কোটনিস ছিলেন তাঁদের অন্যতম। চীনের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে সে দেশেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু সেই সংগ্রাম তাঁর চিন্তায় এক নতুন উন্মেষ ঘটিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত চরিত্র কি, তার শাসনশোষণের নিগড় থেকে গণমুক্তি আসতে পারে কোন পথে—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ডঃ কোটনিসের চেতনায় এক উত্তরণ ঘটে যায়। ভারত ও চীন এই দুই দেশের জনসাধারণের মুক্তি আন্দোলনের সামনে সেদিন এই প্রশ্নটিই ছিল প্রধান। আর তার বিচারে, ডঃ কোটনিসের চেতনায় যে উত্তরণ ঘটেছিল তার তাৎপর্য গভীর।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সম্পর্কে প্রথম সচেতন হয়ে ওঠেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশাত্মবোধের প্রেরণায় দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণে নিষ্পেষিত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তিসংগ্রামের সংগে একাত্মতা বোধ করতে শুরু করেন। তাই জাপ সাম্রাজ্যবাদ চীন আক্রমণ করলে এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া

দেখা দিয়েছিল। চীনের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম দেশবাসীর মনে গভীর সহানুভূতির সৃষ্টি করলো। স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগে এই সংগ্রামের এক যোগসূত্র তাঁরা অনুভব করলেন। ভারতব্যাপী 'চীনদিবস' প্রথম পালিত হলো সাইত্রিশ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর। জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে এবং চীনের সংগ্রামের প্রতি নৈতিক ও সক্রিয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৯ই জানুয়ারী (১৯৩৮) দ্বিতীয়বার 'চীনদিবস' পালন করা হলো। দেশব্যাপী আন্দোলনের এই পর্বে, ২৬শে নভেম্বর ১৯৩৭, চীনের বিপ্লবী জনগণের মুক্তিফৌজ অষ্টম রুট বাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ জেনারেল চু-তে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি জওহরলাল নেহেরুকে এক চিঠি লিখেছিলেন—চীনের জনগণের সংগ্রামে ভারতের জনসাধারণের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতার আবেদন জানিয়ে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন: "We know that we are fighting not only the battle of the Chinese nation and the Chinese people, but we are fighting the battle of the people of all Asia, and that we are a part of the world army for the liberation of oppressed nations and oppressed classes. If the Japanese were successful in subjecting China, none of the peoples of Asia could gain their liberation for many years and perhaps decades. Our struggle is your struggle." অর্থাৎ, 'আমাদের এই যুদ্ধ যে চীনের জনগণ বা সমগ্র জাতির যুদ্ধ মাত্র নয় সে বিষয়ে আমরা সচেতন। সমস্ত এশিয়ার জনগণের হয়ে আমরা এই যুদ্ধে নিয়ত। বিশ্বের সকল নিপীড়িত জাতি ও শ্রেণীগুলির মুক্তিসংগ্রামের যে বিশ্বজোড়া বাহিনী, আমরা তারই অংশ। জাপ সাম্রাজ্যবাদ চীনকে অধীনে আনতে সক্ষম হলে এশিয়ার দেশে দেশে জনগণ, আগামী বহু বছর, হয়ত বহু দশকের মধ্যেও মুক্তি অর্জন করতে পারবে না। আমাদের এই সংগ্রাম আপনাদেরই সংগ্রাম।'

সাহায্যের এই আবেদন এসে পৌঁছেছিল এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে। দীর্ঘকাল ধরেই এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে দুটি ধারা চলেছে। একটি ছিল আপোসমুখী—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সংগে আপসে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছে। আরেকটি আপসহীন—পেটিবুর্জোয়া বিপ্লব-বাদের আদর্শ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করতে চেয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস সেদিন বিশেষ কোন রাজনৈতিক দল ছিল না, সেটি ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী ও মতাবলম্বী দল ও ব্যক্তির একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সাধারণ মঞ্চ। কংগ্রেসে আপসমুখী ধারার নেতৃত্বে ছিলেন গান্ধীজী, আর আপসহীন ধারার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। দুই ধারার সংঘাতের মধ্য দিয়ে একটি প্রশ্ন সেদিন জনসাধারণের সামনে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল—এদেশের স্বাধীনতা আসবে কোন পথে। আর এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও আন্দোলনের কর্মসূচীর প্রশ্নটি ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল—কংগ্রেস বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে চূড়ান্ত সংঘর্ষে নামবে, না গান্ধীজীর নেতৃত্বে আপসমুখী আন্দোলনের পথেই চলবে।

জনসাধারণের সংগ্রামী মনোভাবের দাবীতে সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হলেন আটত্রিশ সালে। নেতৃত্ব গ্রহণ করে জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আপসহীন মানসিকতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মধারা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করলেন "ভারতের ভাগ্য অন্যান্য দেশের নরনারীর ভাগ্যের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। সুদূর প্রাচ্য হইতে শুরু করিয়া পাশ্চাত্য পর্যন্ত—চীন, স্পেন ও আবিসিনিয়ায় যে সংগ্রাম চলিয়াছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম যে সেই বিশ্বসংগ্রামেরই অংশ, কংগ্রেস তাহা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছে।" শুধু নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপণমাত্র নয়, চীনের সংগ্রামে সক্রিয় সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করলেন। অধ্যাপক তান য়ুন-শান এই সময় চীনে গেলেন। তাঁর মাধ্যমে চীনের জনগণের প্রতি ভারতের অকৃত্রিম

সহানুভূতি ও সমর্থন জানালেন সুভাষচন্দ্র। স্থির হয়েছিল, চীনে একটি মেডিক্যাল মিশন ও অ্যাম্বুল্যান্স বাহিনী পাঠানো হবে। এই উদ্দেশ্যে চীন সাহায্য তহবিলে অর্থ সাহায্যের জন্য দেশবাসীর কাছে তিনি আবেদন জানালেন। ১২ই জুন তৃতীয়বার 'চীনদিবস' পালিত হলো। পরে, চীনের কন্সাল জেনারেলের সংগে মেডিক্যাল মিশন সম্পর্কে আলোচনা করে আবার ৭, ৮ ও ৯ই জুলাই 'চীন অর্থসংগ্রহ দিবস' হিসাবে পালনের জন্য তিনি দেশবাসীর কাছে আবেদন করলেন। সুভাষচন্দ্রের এই আবেদনে দেশে অভূতপূর্ব সাড়া জাগলো। স্বেচ্ছাসেবকেরা রাস্তায় রাস্তায় ছোট ছোট চীন-পতাকা বিক্রী করে অর্থসংগ্রহ করলেন। জাপানী পণ্যদ্রব্য বয়কট আন্দোলনও প্রবল হয়ে উঠলো। চীনের শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা তাই সি-তাও এই সময় কলকাতায় এসেছিলেন। ১২ই আগস্ট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের পাঠ চক্রের উদ্যোগে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে বলেছিলেন, চীনের প্রয়োজনে ভারত যথার্থ কোন সাহায্য করতে পারছেনা। 'মেডিক্যাল ইউনিট' চীনের জনগণের প্রতি ভারতের জনগণের আন্তরিক সহানুভূতির নিদর্শন মাত্র।

মেডিক্যাল মিশনের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন ডঃ মদনমোহন অটল। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে রিপাবলিকান সরকারের পক্ষে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য সদস্য হিসাবে মনোনীত হলেন নাগপুরের ডঃ চোলকার, বোম্বাই-এর ডঃ কোটনিস, কলকাতার ডঃ রণেন্দ্রনাথ সেন ও ডঃ দেবেশ মুখোপাধ্যায়। পাশপোর্ট নামঞ্জুর হওয়ায় ডঃ সেনের যাত্রা শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে গেল। তাঁর জায়গায় মনোনীত হলেন ডঃ বিজয়কুমার বসু। ৩১শে আগস্ট বোম্বাই-এর জিন্না হলে এক বিরাট জনসভায় চীনগামী মেডিক্যাল মিশনকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হলো। সুভাষচন্দ্র উপস্থিত থাকতে পারেন নি, তাই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন সরোজিনী নাইডু। পরের দিন, ১লা সেপ্টেম্বর, রাজপুতানা জাহাজে চিকিৎসার সাহায্য

সম্ভার নিয়ে মিশন রওনা হলো। হংকং হয়ে ১৭ই সেপ্টেম্বর তাঁরা ক্যান্টনে পৌঁছুলেন। সেখানে সে দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ তাঁদের বিপুল সম্বর্ধনা জানালেন।

চীনে তখন জাপ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চলেছে। এই আক্রমণের আগে থেকেই মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে সে দেশের জনগণ চিয়াং কাই-শেক পরিচালিত কুয়োমিনটাং সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম করে চলেছিলেন। প্রধানতঃ কৃষকদের নিয়ে তাঁদের গণমুক্তি ফৌজ গড়ে উঠেছিল এবং ঐতিহাসিক লং মার্চের পরিণতিতে দেশের উত্তরে তাঁরা এক বিশাল মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জাপ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের মুখোমুখী হয়ে জনগণের বিপ্লবী স্বার্থের প্রয়োজনে মাও সে-তুং পরিচালিত চীনের সাম্যবাদী দল কুয়োমিনটাংকে বাধ্য করেছিল দেশের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এক যুক্ত মোর্চা গঠন করে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে। যুক্ত মোর্চার অধীনে মুক্তি ফৌজের নতুন নামকরণ হলো অষ্টম রুট বাহিনী, যার প্রধান সেনাধ্যক্ষ রইলেন চু-তে।

মেডিক্যাল মিশনের কাজ শুরু হলো চাংশায়। বহুদেশ থেকে স্বেচ্ছাসেবীরা এসে পৌঁছেছিলেন। ভারতীয় মিশনের নামকরণ হলো ১৫নং নিরাময় (ভারতীয়) ইউনিট। চাংশা থেকে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে আরো এগিয়ে চললেন। হ্যাংকাও পৌঁছে বিখ্যাত অষ্টম রুট বাহিনীর সংস্পর্শে তাঁরা প্রথম এলেন। এখানেই চৌ এন-লাই-এর সংগে পরিচয় হলো। সাম্যবাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা সদস্যদের ছিল না, কিন্তু মুক্তি-ফৌজের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামী ভূমিকায় আকৃষ্ট হয়ে সদস্যরা সকলেই ঐ সেনাদলের সংগে কাজ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আচরণ ও কর্মনিষ্ঠার গুণে নিজেদেরও তাঁরা সর্বত্র জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। চুং কিঙ থাকবার সময়ে দেশ থেকে খবর এলো কোটনিসের পিতা অর্থনৈতিক সংকটের তাড়নায় আত্মহত্যা করেছেন। সহকর্মীরা বিচলিত হয়ে তাঁকে

দেশে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু কোটনিস বিচলিত হন নি। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশাত্মবোধের প্রেরণায় স্বদেশবাসীর পক্ষ থেকে যে দায়িত্বভার গ্রহণ করে চীনের জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তার থেকে তিনি ফিরে যেতে চাইলেন না।

অবশেষে ১৯৩৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তাঁরা আকাঙ্ক্ষিত ইয়েনানে এসে পৌঁছলেন। এখানে ন' মাসের অবস্থান তাঁদের চীনবাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় কাল। চীনের জনগণের যে মহান নেতার কথা তাঁরা এতদিন শুনে এসেছেন, সেই মাও সে-তুঙের সংগে এখানেই তাঁদের পরিচয় ঘটলো। তাঁর নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন চলছিল তার সংস্পর্শে তাঁরা এলেন। ভারতীয় ইউনিটকে ইয়েনানে একটি নতুন হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হলো। ২৪শে মে মাও সে-তুঙ লিখলেন জওহরলালকে:

"The Indian Medical Unit has begun their work here and has been very warmly welcomed by all members of the 8th Route Army and their spirit of sharing such common hardships with us has made a profound impression on all who came in touch with them." অর্থাৎ, 'ভারতীয় মেডিক্যাল ইউনিট এখানে তাঁদের কাজ শুরু করেছেন: অষ্টম রুট বাহিনীর সকলেই তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে। সকলের সঙ্গে কষ্ট ভাগ করে নেবার তাঁদের যে মানসিকতা, তা যারাই তাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের সকলের ওপরই গভীর ছাপ ফেলেছে'। ইয়েনানে আসার কিছুদিন পর ডঃ চোলকার এবং ডঃ মুখোপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। শেনসি থেকে জেনারেল চু-তে ভারতীয় ইউনিটের সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। কোটনিস এবং বসু সেনাবাহিনীর সংগে যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ শুরু করলেন। পরে বসু ফিরে গেলেন ইয়েনানে, কোটনিস সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'বেথুন ইনটারন্যাশনাল পীস হসপিটাল অ্যাণ্ড মেডিক্যাল স্কুলে' শিক্ষক

হিসাবে যোগ দিলেন। স্বদেশপ্রেমী কোটনিস ক্রমশঃই সাম্যবাদের প্রতি গভীরতরভাবে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। তার পরিণতিতে ১৯৪২ সালে তিনি চীনের সাম্যবাদী দলের সদস্য হবার যোগ্যতা অর্জন করেন। এই সময়েই বেথুন স্কুলের নার্সিং-এর শিক্ষিকা কুও চিং-লানের সংগে তাঁর বিয়ে হলো। তাঁদের একমাত্র পুত্র সন্তানের নাম তাঁরা রেখেছিলেন 'ইনহুয়া', অর্থাৎ 'ভারত-চীন'। কঠোর পরিশ্রমে কোটনিসের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু দায়িত্ব পালন থেকে সরে আসেন নি। অবশেষে সহকর্মীদের পাশে থেকে বিয়াল্লিশের ৯ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতবর্ষের একজন স্বদেশপ্রেমিক তরুণ ডাক্তার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে চীনের জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, যুদ্ধক্লিষ্ট জনসাধারণের সেবা করতে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সেই বিদেশের মাটিতে তিনি শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। ডঃ কোটনিসের এই হলো জীবনকথা। কিন্তু তাঁর জীবনের পরিচয় শুধু আত্মত্যাগের কাহিনীতে বিধৃত নয়। এক গভীর উত্তরণের তাৎপর্যেই সে জীবনের উজ্জ্বল পরিচয়। চীনের সাম্যবাদী দলের সংগে পরিচিত হয়ে, তার নেতৃত্বের সংস্পর্শে এসে, ডঃ কোটনিস তাঁর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকায় রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর উপলব্ধি ঘটেছিল, আজকের দিনে যথার্থ সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা সর্বহারা বিপ্লবের পরিপন্থী নয়, বরং সর্বহারা বিপ্লবের পথেই সেই ভূমিকা যথাযথ পালন করা সম্ভব—যে শিক্ষা আমরা পাই এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক কমরেড্ শিবদাস ঘোষের কাছ থেকে। তিনি বর্তমান অবস্থায় লেনিনবাদের ব্যাখ্যা করে দেখান যে: "সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের বর্তমান যুগে, অর্থাৎ যে যুগে এসে পুঁজিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল রূপ পরিগ্রহ করেছে, সেই যুগে বুর্জোয়াদের পক্ষে আর পুরানো যুগের বুর্জোয়াদের মত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্ত কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়…এমনকি ঔপনিবেশিক দেশগুলিতেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী

স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোর মধ্যে যে বুর্জোয়ারা রয়েছে—তারাও আজ আর অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়াদের মতন বিপ্লবী নয়।...শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব যদি এই বিপ্লবগুলোর উপর কায়েম করা যায়, তবেই একমাত্র সেগুলিকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে।" চীনে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন মাও সে-তুঙ।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই নতুন দৃষ্টিকোণ অর্জন করে ডঃ কোটনিস সাম্যবাদী আন্দোলনের সংগে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন, চীনের সাম্যবাদী দলের সদস্য হয়েছিলেন। মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে সে দেশের সাম্যবাদীদলের পরিচালনায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের যে ধারা কোটনিস লক্ষ্য করেছিলেন, পরিণতিতে তা যে শুধু সাম্রাজ্যবাদেরই অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছে তা নয়, সর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষও সেদিন চীনের মতই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের স্তরে ছিল। ভারতবর্ষে সেদিন একটি সত্যিকারের সাম্যবাদী দল গড়ে না ওঠার ফলে এদেশের আন্দোলনের সামনে একটি যথার্থ সাম্যবাদী দলের নেতৃত্ব সেদিন অনুপস্থিত ছিল, ফলে আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে। পরিণতিতে এদেশে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনের অবসান হলো, কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হলো। এদেশের জনসাধারণ পুঁজিবাদী শোষণের শৃংখলে আবদ্ধ হলো। তাই যথার্থ গণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা আজো অপূরিত থেকে গেছে, ভারতের জনসাধারণকে আজো সেই গণমুক্তির সংগ্রাম করে চলতে হচ্ছে।

সেদিন এদেশে যে ঐতিহাসিক সম্ভাবনা ছিল, তারই অঙ্কুর বহন করে বিদেশের মাটিতে সাম্যবাদী নেতৃত্বের সংস্পর্শে এসে ডাক্তার কোটনিস সাম্যবাদী কোটনিসে পরিণত হয়েছিলেন। এই পরিণতি-লাভের পথে যে আন্তর্জাতিকতাবোধের দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন, তার

উল্লেখ করে তাঁর মৃত্যুর পর বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা মাও সে-তুঙ বলেছিলেন, 'আমাদের সেনাদল এক সুযোগ্য সহযোগীকে হারালো, জাতি হারালো এক বন্ধুকে। আন্তর্জাতিকতা-বোধের যে প্রেরণা ডঃ কোটনিসের মধ্যে কাজ করেছে, তাকে আমরা কখনই ভুলতে পারি না।'

'নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনী,
জাগো রে জোয়ান! ঘুমায়ো না ভুয়ো শান্তির বাণী শুনি —
অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই,
দানব দৈত্য তবু মরে নাই,
সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুনি
জাগো রে জোয়ান! বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি।'

—কাজী নজরুল ইসলাম

ত্রিপুরীর প্রান্তরে

এলা রায়

এই সেই তীর্থভূমি।

আমি জব্বলপুরে থাকি। শহর থেকে জায়গাটার দূরত্ব খুব বেশি নয়। তাই সময় পেলে মাঝে মাঝেই আমি ছুটে আসি ঐতিহাসিক এই ত্রিপুরীর প্রান্তরে। তারপর অজ্ঞাতেই কখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনের সেই বেদনা-মধুর ছবিটা।

১৯৩৯ সালের ৫ই মার্চ। আজ থেকে উনচল্লিশ বছর আগের কথা। সেদিন এর নাম ছিল—'বিষ্ণুদত্ত নগর'।

তোরণে তোরণে জব্বলপুর সুসজ্জিত। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ দিনের পর দিন কষ্ট সহ্য করে রেল, ঘোড়ার বা গরুর গাড়ীতে, এমন কি পায়ে হেঁটেও এসে হাজির হচ্ছে এই মাঠে। দেখতে দেখতে মাঠে তিল ধারনেরও ঠাঁই রইল না। গাছের ডালে ডালে মানুষ—পাহাড়ের খাঁজে—মাথায় মানুষ—রাস্তার দুধারে মানুষের কালো কালো মাথা ছাড়া আর কিছুই দেখার উপায় নেই। কি অসীম ধৈর্য্য আর ব্যগ্রতা নিয়ে লক্ষাধিক মানুষের এই প্রতীক্ষা।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র বোস—সারা ভারতবর্ষে এই একটি মাত্র মানুষই তো আছেন, যিনি পারেন শিরদাঁড়া সোজা রেখে গান্ধীর সামনে দাঁড়াতে। যাঁর বিজয় গান্ধীজীর মুখ দিয়ে বলতে বাধ্য করে—"......পট্টভীর পরাজয় আমার পরাজয়। ......হাজার হলেও সুভাষ বোস তো দেশের শত্রু নন......"

সেই সুভাষ—গান্ধী যাঁকে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন, জওহরলালের মতো যাঁকে পোষ মানিয়ে খাঁচায় পুরতে অপারগ হন, যে মানুষ ভারতবাসীকে রক্তের মূল্যে স্বাধীনতা এনে দিতে চান—সেই সুভাষ আসবেন জব্বলপুরে—কংগ্রেসের সভাপতি রূপে ভাষণ দিতে।

১৯৩৯ সালের ৫ই মার্চ! শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে। কিন্তু একি! সুভাষ কই?...তারা যে বড় আশা নিয়ে এসেছে! সুভাষকে দেখবে—সুভাষের বজ্রকণ্ঠের দৃপ্ত ঘোষণায় উজ্জীবিত করে দেবে নিজেদের শপথ মন্ত্র। কিন্তু শোভাযাত্রার পুরোভাগে তো তিনি নেই—রয়েছে তাঁর ফটো।

সুভাষ তখন ১০৫° ডিগ্রি জ্বর নিয়ে উত্থানশক্তি রহিত। শোভাযাত্রার পুরোধা হওয়ার শারীরিক শক্তি নিঃশেষিত। কিন্তু সুভাষ কি পারেন তার প্রিয় স্বদেশবাসীর সাগ্রহ প্রতীক্ষাকে বিফল করতে? তাই মেডিক্যাল বোর্ডের রায়কেও অগ্রাহ্য করে সুভাষ স্থির প্রতিজ্ঞ—

ত্রিপুরী কংগ্রেসে তিনি যাবেনই। অগত্যা এ্যাম্বুলেন্স তৈরী হল—সুভাষের ৭০ বৎসরের বৃদ্ধা মা—প্রভাবতী দেবী ছেলেকে ১০৫° ডিগ্রি জ্বর গায়ে উত্থানশক্তি রহিত অবস্থায় একলা ছেড়ে দেবেন কেমন করে? ছেলের মুখের দিকে শঙ্কাতুর দৃষ্টি রেখে উঠে বসলেন তিনিও। পরিচর্য্যার জন্য সঙ্গে এলেন ভ্রাতুষ্পুত্রী ইলা বোস এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুনীল বোস। আর এলেন অগ্রজ সুহৃদ শরৎচন্দ্র বোস।

বাহান্ন হাতীর সুসজ্জিত শোভাযাত্রা নিয়ে সুভাষকে অভ্যর্থনা জানালেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দ দাস। ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে সুভাষ স্ট্রেচারে করে আনীত হলেন সভামঞ্চে। জনতার আনন্দের সীমা নেই। তাদের প্রিয় নেতার ভাষণ শোনার জন্য তারা উদগ্রীব—কিন্তু সুভাষের পক্ষে তখন ভাষণ দেওয়া অসম্ভব ছিল। তাই তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করে শোনালেন অগ্রজ মেজদা শরৎচন্দ্র বোস। বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হল সাবধান বাণী,—"... ...বৃটিশ সরকারের কাছে মুষ্টিভিক্ষা নয়। তাকে দিতে হবে চরম পত্র (**National Demand**)। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার উত্তর না এলে সমগ্র ভারতব্যাপী শুরু করতে হবে প্রচণ্ড সংগ্রাম...ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা আমি দেখেছি। আজ না হয় কাল ইংরেজ ঘর সামলাতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। আর সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই আঘাতে আঘাতে পর্যুদস্ত করতে হবে তাকে। জয় আমাদের হবেই......।"

[স্মারিকা : জব্বলপুর কর্পোরেশন]

এই সেই ত্রিপুরী কংগ্রেসের বিশাল চত্বর। বোধ হয় এখনও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় সুভাষচন্দ্রের ভাষণের সেই গমগমে প্রতিধ্বনি। এখনও গাছের পাতায় পাতায় যেন শোনা যায় ত্রিপুরী কংগ্রেস সম্বন্ধে গান্ধীজীর লজ্জাকর অনাহার কাহিনী। সুভাষচন্দ্রের বারংবার অনুরোধ সত্বেও গান্ধীজী রাজকোটের হরিজন সমস্যা ছেড়ে অসুস্থ সুভাষের পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন নি। অথচ কংগ্রেসের বদান্যতায় সেই অনুপস্থিত গান্ধীরই স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "গান্ধীস্মারক" এবং তাঁর অনুগত ভক্ত জওহরলালের প্রতিকৃতি। গান্ধীভক্ত কংগ্রেস

কর্মীরা সুভাষের "ঔদ্ধত্য" মেনে নেবেন কেমন করে? ওয়ার্কিং কমিটি থেকে তাই তারা সরে দাঁড়ালেন একে একে।

কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যায়ে ত্রিপুরী কংগ্রেসের অবদান কি?...ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—দেশের আপামর তারুণ্যের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা নিয়ে সুভাষ এগিয়ে আসেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময় সুভাষের অসুস্থতা নিয়ে রাজাজী, বল্লভভাই প্যাটেল এবং গোবিন্দ বল্লভ পন্থ অমানুষিক ব্যঙ্গ করতেও লজ্জা বোধ করেন নি। তাঁদের মতে সুভাষের অসুস্থতা **"Political fever"** এবং তাই তিনি এখন **"leaking boat"**

ত্রিপুরী কংগ্রেস ভারতবর্ষের তারুণ্যকে দিয়েছে নতুন নেতৃত্ব। জব্বলপুরকে দিয়েছে ঐতিহাসিক সম্মান। শহরের প্রাণকেন্দ্র বড় ফোয়ারার অনতিদূরে স্থাপিত হল কামানিয়া ফটক। তৎকালীন মিউনিসিপ্যাল প্রেসিডেন্ট এবং নেতাজীর একান্ত সুহৃদ ডঃ ডিসিল্বার এবং তাঁর কর্মঠ কর্মীদের তৎপরতায় তৈরী হল ত্রিপুরী কংগ্রেসের এই স্মারক ফটক। জব্বলপুর কর্পোরেশনের পরবর্তী মেয়র ডঃ সত্যচরণ বরাটের উদ্যোগে শ্রীনাথকিতলাইয়াতে স্থাপিত হ'ল সুভাষ চন্দ্রের শ্বেতমর্মরের আবক্ষ মূর্তি।

আজও কামানিয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নজর আপনা থেকেই বারেকের জন্য গেঁথে যায় ফটকের তোরণদ্বারে। চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে, এই পথ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সেদিনের সেই বিশাল শোভাযাত্রা, যার পুরোভাগে সুভাষচন্দ্রের ফুলে ফুলে ঢাকা ফটো মাথায় করে এগিয়ে চলেছে জব্বলপুরের জনসাধারণ। বাহান্ন হাতীর শোভাযাত্রার সে জৌলুস মানসচক্ষে এখনও যেন ভেসে ওঠে ইতিহাসের ধূসর বিবর্ণ পাতা ভেদ করে।

'দেশবাসীর পক্ষ হইতে লোক চক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইব। তারপর মাথার উপর যদি ভগবান থাকেন, পৃথিবীতে যদি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে আমার হৃদয়ের কথা দেশবাসী একদিন না একদিন বুঝিবেই।'

—সুভাষচন্দ্র

বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা

রঞ্জনা অধিকারী

শঙ্খের শব্দ না ? হাজার হাজার শঙ্খের শব্দ। অসংখ্য শাঁখের আওয়াজ সমুদ্র গর্জনের মত সারা শহরটার চারপাশ ঘিরে এগিয়ে আসছে যেন।

এই ভর দুপুরে ভূমিকম্প শুরু হোল নাকি ? তাই শাঁখের আওয়াজ দিয়ে গৃহবধূরা বিপদসংকেত ছড়িয়ে দিচ্ছে দিক হতে দিগন্তে।

ভূমিকম্প নয়—তার প্রমাণ তো আমি নিজেই। দোতলার বারান্দায় স্থির নিশ্চল হয়ে বসে আছি। শরীরটা দুলছে না, বাড়িটা টলছে না। সামনেই চৌরাস্তা। গাড়ী চলছে—লোকজনের শঙ্কিত আনাগোনা নেই। নেই ভয়ার্ত চীৎকার। আমি যা দেখছিলাম এতক্ষণ, দেখছিলাম রাস্তার অপরপ্রান্তে গান্ধীবুড়ি মাতঙ্গিনী হাজরার শ্বেতপাথরে গড়া আবক্ষ শুভ্র মূর্তি।

এই সেই প্রাচীন শহর তমলুক। অতীতের কত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেছে এর বুকে। পুরান শহরটা দেখব বলে আজ দু'দিন হল এসেছি এখানে। উঠেছি দিদির বাড়ীতে। শহরের যা কিছু দেখার, দেখা হয়ে গেছে সব। এখন শুধু অবসর কাটানো। শীতের মিষ্টি রোদটুকু উপভোগ করছিলুম বারান্দায় বসে। সহসা নজরে পড়ল মাতঙ্গিনী হাজরার শ্বেত শুভ্র মূর্তি। বীরাঙ্গনার তেজদীপ্ত মূর্তির

দিকে তাকিয়ে ছিলাম অবাক বিস্ময়ে। মানসপটে ভেসে উঠল তমলুক শহরের সেই রক্তঝরা দিনটি। ১৯৪২-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর।

এই শাঁখের আওয়াজ কেন? প্রাচীন শহরের প্রেতাত্মারা কি জেগে উঠেছে? দিগ্‌বিজয়ে চলেছেন কি কোন এক মহারাজ? শোনা যাচ্ছে হাজার হাজার সৈন্যের রণহুঙ্কার। নগরীর প্রতিটি গৃহে গৃহে কুলবধূরা বাজাচ্ছে মঙ্গলশঙ্খ।

শাঁখের আওয়াজ আরও কাছে এসে পড়ল যেন। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের গর্জনের মত হাজার মানুষের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শহরকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে।

আমি কি জেগে আছি—ঘুমিয়ে পড়িনি তো? যা দেখছি, যা শুনছি—সবই কি আমার মনের কল্পনা, না গভীর ঘুমের স্বপ্ন।

নিজের মনকে যেন নিজেই বিশ্বাস করতে চাইছি না। অদ্ভুত অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটে চলেছে একটির পর একটি। আমি সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, অত্যন্ত স্পষ্ট দেখছি, মাতঙ্গিনী হাজরার পাথরে গড়া মূর্তি জ্বলন্ত মোমবাতির মত গলতে শুরু করেছে। আহা, অমন সুন্দর শ্বেত শুভ্র পাথরের মূর্তি গলে গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর......আর আমার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে প্রকাশিত হল তেজস্বিনী মাতঙ্গিনী হাজরার জীবন্ত মূর্তি।

৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা। শুভ্রবসনা, তেজস্বিনী, এক হাতে তার বিজয়শঙ্খ, অন্য হাতে তিনরঙা জাতীয় পতাকা। নয়নে রুদ্ররোষ, কণ্ঠে সমুদ্রগর্জন।

সহসা গান্ধীবুড়ির বজ্রকণ্ঠ গর্জে উঠল,...করঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ডু অর ডাই! ইংরেজ ভারত ছাড়! বন্দে মাতরম্।

আর! আর আমার বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠল, মাতঙ্গিনী হাজরার পেছনে হাজার হাজার বিদ্রোহী নরনারীর মিছিল। শুধু মানুষ আর মানুষ। মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে কাতারে কাতারে মানুষ জড় হয়েছে তমলুক শহরের উত্তর দিকে। সবার মনে একটি মাত্র সঙ্কল্প...কুইট ইণ্ডিয়া...ইংরেজ ভারত ছাড়...

…ডু আর ডাই…… করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! আমার মানসপটে একটির পর একটি ঘটনার দ্রুত পটপরিবর্তন শুরু হল।

১৯৪২, পূর্ব নির্দিষ্টমত ৭ই আগস্ট তারিখে কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হল বম্বেতে। গান্ধীজীর ভারতছাড় প্রস্তাব গৃহীত হল ৮ই আগস্ট রাত দশটায়। গৃহীত হল দুটি মাত্র ছোট্ট শব্দ। "কুইট ইণ্ডিয়া" "ডু অর ডাই"।

ইংরেজ ভারত ছাড়! সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হল ঐতিহাসিক আগস্ট আন্দোলন।

নিমিষে উত্তাল হয়ে উঠল গোটা ভারতবর্ষ। বিদ্রোহ দমনে চতুর ইংরেজ সরকার আগে থেকেই প্রস্তুত।

৯ই আগস্ট ভোরে গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সবাই গ্রেপ্তার হলেন। খ্যাতনামা সব নেতাকেই জেলে পুরলেন ইংরেজ সরকার। কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হল সারা ভারতবর্ষে।

সারা ভারতবর্ষ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। শুরু হল আঘাতের বদলে আঘাত। মারের বদলে মার।

বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ল গোটা ভারতে। শহরে…গঞ্জে …হাটে…বাজারে—পাড়ায় পাড়ায়—মানুষের ঘরে ঘরে…বিদ্রোহের মশাল জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। অগ্নিগর্ভ মেদিনীপুরে দারুণ শব্দে বিদ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটল। বিক্ষোভের লেলিহানশিখায় সারা আকাশ লালে লাল।

'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'……গর্জন করে উঠল হাজার হাজার মানুষ দুরন্ত ক্রোধে। কণ্ঠে শত শত বজ্রের হুঙ্কার। চোখে রুদ্ররোষ।

২৭শে আগস্ট মেদিনীপুরের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ মিলিত হলেন তমলুক শহরের এক গোপন সভাতে।

সভায় উপস্থিত হলেন,—সর্বাধিনায়ক সতীশ সামন্ত, অজয় মুখার্জী, সুশীল ধাড়া, বরদা কুইতি এবং আরও কয়েকজন প্রথম সারির নেতা।

শুরু হয়ে গেল সংগ্রাম। প্রথমেই মেদিনীপুরকে বিচ্ছিন্ন করে

ফেলা হল বহির্জগৎ থেকে। রাতের অন্ধকারে তমলুক, পাঁশকুড়া, মহিষাদল শহরের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেওয়া হল বড় বড় গাছ ফেলে। পুল ভেঙে দেওয়া হল বত্রিশটি। রাস্তার মাঝখানে বড় বড় গর্ত করে রাখা হল। কেটে ফেলা হল টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের তার। উপড়ে ফেলা হল শত শত টেলিগ্রাফ পোষ্ট। ডুবিয়ে দেওয়া হল কাঁসাই আর হুগলী নদীর খেয়া নৌকাগুলো।

সারা শহরে চাপা অস্থিরতা। দারুণ একটা বিস্ফোরণ যেন এখুনি ঘটবে। বিস্ফোরণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এ যেন মৃত্যুহীন নিঃশব্দ প্রতীক্ষা।

......ভাঙনের গান গাও...... ভাঙো ভাঙো..... সংগ্রাম আসন্ন। থানা, আদালত, ডাকঘর, ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস, সব ধ্বংস কর। অচল কর ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থা। ধ্বংস কর, মার দাও মারের বদলে।......কুইট ইণ্ডিয়া : ইংরেজ ভারত ছাড়।

টনক নড়ল শাসক দলের। সাজ সাজ রবে মুখর হয়ে উঠল শাসক সম্প্রদায়। রণসাজে সাজল পুলিশ। প্রস্তুত গোলা বারুদ— আগ্নেয়াস্ত্র। প্রস্তুত সেনাবাহিনী। ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত ইংরেজ আর গুর্খা সৈন্যদল।

২৯শে সেপ্টেম্বর বিকেল চারটে। শোনা গেল দূরাগত লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্রুদ্ধ রণ-হুঙ্কার। ইংরেজ ভারত ছাড়......।

দেখতে দেখতে হাজার হাজার মানুষের চারটি বিরাট মিছিল তমলুক শহরকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল।

শাসক দলের পণ, একটি প্রাণীকেও শহরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। শহরের সবকটি রাজপথ অবরোধ করে চোখের নিমেষে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল পুলিশ আর মিলিটারী।

বিক্ষুব্ধ অগণিত নরনারীর এক বিশাল মিছিল তমলুক শহরের পশ্চিম দিকে এসে দাঁড়াল। ওদের লক্ষ্য স্থানীয় থানা।

বজ্রকণ্ঠে একজন ঘোষণা করল :

......ভাইসব, কোন বাধাই আমরা মানব না। আক্রমণ কর

থানা। লুট কর গোলাগুলি, রাইফেল। ভাঙ……ভেঙে চুরমার কর ব্রিটিশরাজের উদ্ধত শির।

সশব্দে গর্জে উঠল ইংরেজ আর গুর্খা সৈন্যের রাইফেল। গুলি বর্ষণ শুরু হল ঝাঁকে ঝাঁকে। নিরস্ত্র মানুষগুলির মধ্যে কয়েকজন লুটিয়ে পড়ল গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহে। মৃত্যুবরণ করল পাঁচজন, আহত হল আরও পাঁচজন। গুলিবিদ্ধ রামচন্দ্র বেরার চোখে মৃত্যুর হাতছানি। দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হাতে তিনরঙা জাতীয় পতাকা। রক্তাক্ত দেহে মৃত্যুঞ্জয়ী দধীচির শক্তি। প্রাণপণ শক্তিতে গড়াতে গড়াতে কোনক্রমে পৌঁছোলেন থানার দরজায়। তারপর দারুণ উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন …'আমরা থানা দখল করেছি…—জয় আমাদের হাতের মুঠোয়…… আমরা থানা দখল করেছি।' তারপর মাত্র কয়েকমুহূর্ত। এক ঝলক রক্ত গড়িয়ে পড়ল হাঁ করা মুখের একপাশ দিয়ে। চোখের দৃষ্টি স্থির। নিশ্চল দেহ। মৃত্যু… মৃত্যু…শান্তি…শান্তি….!

ততক্ষণে ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ নরনারীর ক্রুদ্ধ মিছিল এসে থমকে দাঁড়িয়েছে তমলুক শহরের উত্তর দিকে। সবার সামনে মাতঙ্গিনী হাজরা। শুভ্রবসনা। তেজস্বিনী, এক হাতে তাঁর বিজয়শঙ্খ, অন্য হাতে তিনরঙা জাতীয় পতাকা। নয়নে রুদ্ররোষ, কণ্ঠে সমুদ্র গর্জন।

বজ্রকণ্ঠে ক্রুদ্ধ গর্জন ধ্বনিত হল মাতঙ্গিনী হাজরার কণ্ঠে।… করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে…ইংরেজ ভারত ছাড়…বন্দে মাতরম্।

হাজার হাজার কণ্ঠ উল্লাসে ফেটে পড়ল। আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি উঠল…বন্দে মাতরম্…ইংরেজ ভারত ছাড়…।

ঐ বিশাল জনসমুদ্রের শোভাযাত্রার গতিপথ আটকে দাঁড়িয়েছে শাসকদলের সৈন্যসামন্ত। হাতের রাইফেল উঁচিয়ে ধরা।

মাতঙ্গিনী হাজরার কণ্ঠ আবার গর্জে উঠল।…ভাই বোনেরা…. আমাদের যাত্রাপথে বাধা দিচ্ছে ইংরেজ শাসকের মাইনে করা সৈন্য আর পুলিশ দল। ওদের হাতে রয়েছে গুলি ভরা বন্দুক আর

রাইফেল। ঐ বন্দুক আর রাইফেল দিয়ে ওরা আমাদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে তমলুক শহরের মাটি রাঙিয়ে দিতে চায়। আমাদের সামনে আমরা কি দেখছি? মৃত্যু···মৃত্যু···। আমরা পরাধীন। পরাধীন দেশে মরার স্বাধীনতাটুকুও নেই। ইংরেজ শাসনে আমরা মরে বেঁচে আছি। এ চলবে না—আমরা চলতে দেব না। এবার শুরু হোক আমাদের বাঁচার পালা। আজ আমরা মরে বাঁচব। বাঁচার মন্ত্র দিয়ে যাব আমাদের বংশধরদের। ওরা বাঁচার মত বাঁচবে। স্বাধীন ভারতে বুক ভরে টেনে নেবে বাঁচার নিঃশ্বাস। ভাইবোনেরা —এস আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি। ভাঙনের গান গাও—ভাঙো। আমাদের যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

হাজার হাজার কণ্ঠে সমুদ্র গর্জন····করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে···ইংরেজ ভারত ছাড়····।

ধৈর্য্যের সীমা বুঝি শেষ হল শাসকদলের। এগিয়ে এলেন পুলিশ অফিসার অনিল ভট্টাচার্য।

—আর এক পা এগুবে না। একজনকেও এগুতে দেওয়া হবে না! তাহলে গুলি করা হবে।

—গুলি···। হাসলেন গান্ধীবুড়ি মাতঙ্গিনী হাজরা।—গুলি করবে? বেশ···তবে তোমাদের বন্দুকে যতগুলো গুলি আছে তা দিয়ে আমার বুকের সবকটি পাঁজরের হাড় গুঁড়ো করে দিলেও আমি এগিয়ে যাবই। তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর।

অবধারিত নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও এগিয়ে গেলেন গান্ধীবুড়ি মাতঙ্গিনী হাজরা। তার এক হাতে বিজয়শঙ্খ, অন্য হাতে জাতীয় পতাকা।

····গুড়ুম···গুড়ুম···দ্রাম···দ্রাম।

অগ্নি উদগিরণ করল পুলিশের রাইফেল।

অব্যর্থ গুলি এসে লাগল মাতঙ্গিনীর হাতে। হাতের শঙ্খ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। অপর হাতে মাটি থেকে শঙ্খটি তুলে নিয়ে আবার চলা শুরু করলেন মাতঙ্গিনী হাজরা।

…ইংরেজ ভারত ছাড়…বন্দে মাতরম্…

জাতীয় পতাকা সুউচ্চে তুলে ধরে এগিয়ে চললেন তিনি।

….গুড়ুম…গুড়ুম… দ্রাম…দ্রাম….।

গুলির পর গুলি এসে বিদ্ধ করল মাতঙ্গিনীর সর্বশরীর। সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীবুড়ির প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। জাতীয় পতাকাটি কিন্তু মৃত্যুর পরও তার দৃঢ়মুষ্ঠিতে ধরা রয়েছে।

পিছনে জনসমুদ্র উত্তাল।

…করেঙ্গে ইয়ে…মরেঙ্গে…ইংরেজ ভারত ছাড়।

পুলিশ আর গুর্খা সৈন্যরা বেপরোয়া গুলি চালাচ্ছে। দ্রাম্… দ্রাম্…গুড়ুম… গুড়ুম।

বেশ কয়েকজন লুটিয়ে পড়ল রক্তাক্ত দেহে…মা-মাটির-কোলে।

লুটিয়ে পড়া দেহগুলোর দিকে ছুটে চলেছে ওরা কারা? ওরা বিদ্যুৎ বাহিনীর ছেলেরা আর কয়েকজন ভগ্নী শিবিরের সদস্যা। ভগ্নী শিবিরের মেয়েদের মাঝে একজনকে আমি চিনতে পারলুম! আরে! আমি এদের মধ্যে এলুম কি করে? কিন্তু অতশত ভাববার সময় তখন কোথায়? গুলিবিদ্ধ যন্ত্রণা-কাতর মানুষগুলির সাহায্যে এগিয়ে চললুম আমরা।

…দ্রাম্…দ্রাম্… গুড়ুম…গুড়ুম….।

এক ঝাঁক তপ্তগুলি তীব্রবেগে ছুটে এল আমাদের দিকে। বুকের মধ্যে একটা তীব্র অগ্নিদহন অনুভব করলাম। যন্ত্রণাকাতর দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটি মাত্র শব্দ… করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে…

আমার দিদি—আমার দিদি—আমার দেহটাকে জড়িয়ে ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। আর বলছে,—ওঠ ওঠ, কি ঘুম রে বাবা! স্বপ্ন দেখছিস বোধ হয়? ভয় পেয়েছিস? বোকা মেয়ে কোথাকার…।

স্বপ্নই বোধ হয়! কোথাও কিছু নেই তো। ধুয়ে মুছে মিলিয়ে গেছে যেন সব। আমি শুধু তাকিয়ে আছি মাতঙ্গিনী হাজরার শ্বেত পাথরে গড়া শ্বেত শুভ্র মূর্তির দিকে।

আর ভাবছি,—আমরা, মানে আজকের দিনের মেয়েরা, প্রয়োজন হলে মাতঙ্গিনী হাজরার মত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারব কি? পারব কি অমন নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও এগিয়ে যেতে?

'চির-অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চশির!
বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি, ভেঙেছে কারা-প্রাচীর!'

—কাজী নজরুল ইসলাম

১৯৩৯-৪২ সাল

কাশীকান্ত মৈত্র

বর্তমান যুগের তরুণ সম্প্রদায়ের ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস ভাল করে পাঠ করা দরকার। দেশকে জানা দরকার। স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনানী-সৈনিক-শহীদদের জানা দরকার। জানা দরকার গান্ধীবাদীদের বিভিন্ন সময়ের ভূমিকার কথা। বামপন্থীর মুখোশ পরে যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধীতা করেছিলেন, তাঁদের জানা দরকার।

সমাজ বিপ্লবের কথা যাঁরা ভাবেন—নতুন দিনের স্বপ্ন যাঁরা দেখেন, তাঁদের রাজনৈতিক সংগ্রামের সাফল্য তো নির্ভর করবে প্রচলিত

সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক শক্তির সঠিক মূল্যায়ণ ও বিশ্লেষণে অবজেকটিভ কন্‌ডিশনস্‌, সমাজ ও জাতির ভাবগত মানসিক পরিস্থিতি, সাবজেকটিভ সিচ্যুয়েশন ও সর্বোপরি বলিষ্ঠ-নিস্পৃহ বিচক্ষণ নির্লোভ আদর্শবাদী নেতৃত্ব,—লিডারশিপ। সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপ্লবকে সাফল্য-মণ্ডিত করতে হলে চাই সুস্পষ্ট আদর্শ, সমাজতন্ত্রের বা আদর্শের ব্যাখ্যা, উপায় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা ও নির্দেশ, কেন না আইডিয়লজি ও স্ট্রাটেজীর মধ্যে চাই সম্পূর্ণ বনিবনা, বোঝাপড়া, কোনরকম বৈপরীত্য থাকলে চলবে না।

সর্বোপরি চাই দেশের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন, এই সব শক্তির সমন্বয় না ঘটলে বিপ্লব সফল হয় না। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে এর সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে।

১৯৩৯ সালে ত্রিপুরীতে এবং ১৯৪০ সালে রামগড়ের আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে সঠিক পথনির্দেশ দিলেন বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র। সেদিনের স্বার্থপর সঙ্কীর্ণতাবাদী নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দলগুলি কর্ণপাত করেনি বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের সাবধানী হুঁশিয়ারীতে। ভারতের অভ্যন্তরে শুরু হল সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী "ভারত ছাড়" আন্দোলন—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বাধ্য করতে হবে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু 'সমাজতান্ত্রিক' 'প্রগতিশীল' নেহেরুজী (ভারতের একজন কমিউনিস্ট নেতা তো তাঁর স্মরণে **'Gentle colosus'**-বই-ই লিখে ফেললেন, অবশ্য নেহেরুজী দেখে যেতে পারলেন না—এই যা!) ও তাঁর ভাবধারায় বিশ্বাসী নেতারা সেই লড়াইয়ের দামামা বাজাবার প্রাক মুহূর্তে ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে—এখন কি আমাদের "ভারত ছাড়" আন্দোলনের ডাক দেওয়া উচিত? ইংরেজ বড্ড বিপন্ন এবং বিব্রত! এই সময় লড়াই-এর ডাক দেওয়ার অর্থই হল নাকি ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গকে মদৎ জোগান। নেহেরুজী যে সর্বাগ্রে ফ্যাসিবিরোধী!

আসলে সুভাষচন্দ্রের ভূত ঘাড়ে চেপেছিল দক্ষিণপন্থী নেতাদের, তাই নেহেরুজী ওদের—অর্থাৎ শত্রু পক্ষকে বিব্রত না করার পক্ষপাতী

ছিলেন। আর সুভাষচন্দ্র তখন ভারতের বাইরে থেকে বলে চলেছেন: "আঘাত হানো সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির ওপর—বিদেশী ডাকাতের দল দেশ জননীর বুকে চেপে বসে তার রক্ত শোষণ করছে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম জোরদার কর, সেটাই হল প্রকৃত বামপন্থা। বিশ্বযুদ্ধে বিব্রত ইংলণ্ডের পূর্ণ সুযোগ ভারতের দেশভক্তদের নিতে হবে, ওদের অসুবিধা আমাদের সুযোগ।" সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, পরাধীনতার যুগে বামপন্থার অর্থই হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধীতা।

অবশ্য নেহেরুজী ও আজাদের বক্তব্য সংখ্যাধিক্যের ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। ভারতের কমিউনিস্টরা (তখন অবিভক্তদল) নেহেরুজীকে ও আজাদকে সবচেয়ে প্রগতিশীল বলে প্রচার করেন এবং তাঁরা যাঁদের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বলে ঘোষণা করেন, সেই সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল-আচার্য কৃপালনী প্রমুখেরা আগস্ট বিপ্লবে সেদিনের জাতীয় কংগ্রেসকে সংগ্রামী ভূমিকা নেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন।

নেহেরুজী তখন ভারতের কমিউনিস্ট শিবিরের সবচেয়ে বড় ভারতীয় বামপন্থী নেতা,—সবচেয়ে বড় "ফ্যাসী-বিরোধী" জননেতা। কেন না তিনি সুভাষ-বিরোধীতায় একজন প্রথম সারির জেনারেল ছিলেন। ভারতের সেই রক্তঝরা দিনগুলিতে ভারতের সর্বহারা বিপ্লববাদী-মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট দলের মনোভাব সেই সময়কার সেই, দলের সরকারী দু' একটি বিবৃতি থেকেই উপলব্ধি করা যাবে।

১৯৪২ সালের বৈপ্লবিক 'করেঙ্গে-ইয়ে-মরেঙ্গে' সংগ্রামে তদানীন্তন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি. সি. যোশী ১৩শে আগস্টের (১৯৪২) "পিপলস্ ওয়ার"-এ (জনযুদ্ধ) এক আবেদন প্রসঙ্গে লেখেন:

ধ্বংস কার্য প্রসঙ্গে

...গভর্নমেন্টের কাজে উত্তেজিত হইয়া আমাদের দেশপ্রেমিকরা ভারতের স্বাধীনতার নামে জাতির দেশরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকরী

উপকরণগুলি নষ্ট করিতে উদ্যত।....ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা লইয়া হেলাফেলা করা, ভারতীয় যানবাহন ব্যবস্থা অচল করার অর্থ ফ্যাসিস্ট শত্রুর সাহায্য করা, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা নয়।

উহার অর্থ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে "ভারতের স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু ভারতের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা বসিয়া থাকিতে পারে না"—মৌলানা আজাদের এই ওজস্বিনা ভাষণের প্রত্যেকটি কথা ভুলিয়া যাওয়া।...

সমস্ত কংগ্রেসসেবী দেশপ্রেমিকদের কাছে আমাদের আবেদন এই : ধ্বংসকার্য হইতে বিরত হও, উহাতে ভারতের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হইবে এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে ফ্যাসিজমেরই লাভ হইবে, সমস্ত দল ও সংগঠনকে একত্র করিবার কাজে আত্মনিয়োগ কর···ইহাই তোমাদের দেশপ্রেমিক কর্তব্য, কারণ তোমরাই দেশের প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মী।

বিবৃতি প্রদানকারী নেতার নামটা উহ্য থাকলে মনে হবে স্বভাবতই কোন বৃটিশ স্বরাষ্ট্র সচিবের আবেদন যেন। হঠাৎ ইংরেজ প্রভুদের প্রেমে গদ গদ হয়ে গান্ধীজীর চাইতেও বেশী উগ্র অহিংসবাদী হয়ে গেলেন সেদিনের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ব-বিপ্লবীরা।

কবে কোন্ দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লব সংগঠিত ও সফল হয়েছে পারস্যের গালিচা-মখমল-বিছানো মাঠে ময়দানে? সিল্কের দস্তানা হাতে, চুণট-করা কোঁচা-লোটান ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবী-জরীর কাজ করা নাগরা চটি পরে—মুহুর্মুহু তার ওপর পদচারণা করে বড় বড় বক্তৃতার তুফান ছুটিয়ে?

সাম্রাজ্যবাদীদের লুটের মাল,—তল্পি-সঞ্চিত পুঁজি রক্ষার জন্য দু'শ বছরের ইংরেজ শাসিত-শোষিত পরাধীন ভারতবাসীর "আত্মরক্ষা" বা "দেশরক্ষা ব্যবস্থার" প্রাধান্যতত্ত্ব আবিষ্কার করা হল, কেন না জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত সোভিয়েট রাশিয়ার "জাতীয় স্বার্থ" যে জড়িত ছিল। পি. সি. যোশী ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট কংগ্রেস

নেতাদের গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টা পরই ভারতের কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে প্রসঙ্গত বলেন :

"...কংগ্রেসসেবী সহকর্মীদের কাছে আমরা নিম্নলিখিত কথার মর্ম অনুধাবন করিতে ও দেশপ্রেমিক কর্তব্য স্থির করিতে আবেদন জানাইতেছি :

• (১) কংগ্রেস অহিংস গণ-আন্দোলনের আহ্বান জানায় নাই। নির্বাচিত একমাত্র নেতা কোন নির্দেশ দিবার পূর্বেই গ্রেফ্তার হন।

(২) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি নেতা গ্রেফ্তার হইলে আইন অমান্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই।

(৩) কংগ্রেস বা মহাত্মাজী কেহই বিশৃঙ্খলা বা নিরর্থক হিংসার জন্য আবেদন জানান নাই। এই কাজগুলি কংগ্রেস ও জাতীয়তা-বিরোধী।"

[কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস—পূরণচন্দ্র যোশী ; পৃষ্ঠা ৩৮, প্রকাশক ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১২, বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা]

স্বাধীনতা সংগ্রাম বা গণ-বিপ্লবের ক্ষেত্রে হঠাৎ এরকম সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী? এই ধরণের চিন্তাধারা কি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে আদৌ সঙ্গতি পূর্ণ? রণক্ষেত্রে জেনারেল বন্দী হয়ে গেলে—বা আহত হলে সেনাবাহিনী কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, সামরিক নিয়মকানুনের কেতাব খুলে প্রেরণা নেবে? বিপ্লব হবে—কোন রকম বিশৃঙ্খলা হবে না—এ কি রকম কথা! রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবে বুঝি তাই হয়েছিল? হিংসাত্মক কাজের প্রতি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রতি এত ঘোর অরুচির কারণ কি? বিশেষ করে মার্কস নিজেই যখন বলেছিলেন—বিপ্লব করতে গেলে রক্তপাত ঘটে থাকে—এই হিংসা বা ভায়োলেন্স প্রগতির ধাই মা—"মিডওয়াইভ অফ প্রগ্রেস"-এরই বা কারণ কি! রাশিয়ার স্বার্থে প্রয়োজনমত অনেক শিক্ষা ভুলতে হয়, অনেক ঢোক গিলে কথা বলতে হয়।

আবার গান্ধীজী ১৯৪৩ সালের জানুয়ারীতে তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লিন্‌লিথগোকে এক চিঠিতে লেখেন :

"গত ৯ই আগস্টের পর যে-সব ব্যাপার ঘটিয়াছে আমি নিশ্চয়ই তাহার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আমি কি ভারত সরকারকেই উহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করি নাই?...আপনি হয়ত নাও জানিতে পারেন যে, কংগ্রেস-কর্মীদের যে-কোন হিংসাত্মক কাজের আমি খোলাখুলি ও দ্বিধাহীন সমালোচনা করিয়াছি।"

মৌলানা আজাদও সমস্ত রকমের হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করেন।

কমিউনিস্ট পার্টি সেদিনের কংগ্রেস নেতাদের এই সব বিভ্রান্তিকর দ্ব্যর্থবোধক বিবৃতি ও উক্তি গুলি ইস্তাহার করে ছাপিয়ে বিলি করেছেন, নিজেদের দলীয় প্রচার পুস্তিকায় প্রকাশ করেছেন। উদ্দেশ্য—জনতাকে স্বাধীনতাসংগ্রাম-বিমুখ করে তোলা। এই গণমুক্তি সংগ্রামের পেছনে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের সমর্থন যে নেই—সেই তত্ত্ব প্রচার করা হল কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে—এই সব বিবৃতিগুলির নানা ব্যাখ্যা দিয়ে।

আগেই বলেছি, সুভাষচন্দ্রের বহির্ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের সংবাদে নেহেরুজী ও সেদিনের বিপ্লবী মার্কসবাদীরা ভীত ত্রস্ত ছিলেন। নেহেরুজীর দু'একটি উক্তি তুলে ধরা যাক।

"বহু বৎসর পূর্বেই সুভাষ বসুর সংস্রব আমরা ত্যাগ করিয়াছি। আমাদের ব্যবধান ক্রমেই বিস্তৃত হইয়াছে এবং আজ আমরা পরস্পর হইতে বহু দূরে। বেদনার সহিত আমাকে একথা অনুভব করিতে হইতেছে, যে-পথ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সে পথ একেবারেই ভুল।... তাঁহার নীতি কার্যে পরিণত হবার উপক্রম হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহার বিরোধীতা করিব। কারণ "বিদেশ হইতে যে-কোন শক্তি আসুক না কেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে জাপানের হাতের পুতুল হইয়াই আসিবে। সম্মুখ যুদ্ধ করিবে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী [ইংরেজের সৈন্যবাহিনী] আর আমরা গরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি গ্রহণ করিব"। [১২ই এপ্রিল, ১৯৪২]

দেশবাসী নিশ্চয়ই আজও ভুলে যাননি ১৯৬২ সালে চৈনিক আক্রমণের সময় তিনি শেরোয়ানীর বুক পকেটে লাল গোলাপফুল

গুঁজে, হাতে ছড়ি নিয়ে কি অপূর্ব দেশরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন—এবং কি নেফা রণাঙ্গণে, কি সেলা উপত্যকায়, কি বমডিঙ্গা তেজপুরে গেরিলা যুদ্ধের কত আয়োজনই না করেছিলেন।

১৯৪২ সালের বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা সমাজতন্ত্রী জয়-প্রকাশনারায়ণ ও কংগ্রেস সোসালিস্টদের সুভাষ-সমর্থনের বিরোধীতা করে সেদিন কমিউনিস্ট দলের সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী যা বলেছিলেন—তা তুলে ধরা যাক একবার। জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর "স্বাধীনতা সৈনিকদের প্রতি" পত্রে বলেছিলেন :

"নেহেরু কারামুক্তির পর হয়ত সুন্দর সুন্দর বিবৃতি দিবেন এবং মার্কিন সংবাদদাতারা হয়ত তাহা সোৎসাহে লুফিয়া লইবেন। কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গীর মাধুর্য ও সৌন্দর্য থাকিলেও কোন মূল্যই থাকিবে না। মহৎ কথায় পূর্ণ বিবৃতি দান করিয়া এবং প্রধান জাতিগুলির প্রতিনিধিদের মুগ্ধ করিয়া জওহরলাল যাহা করিতে পারিবেন, তাহার চেয়ে কারাগারে থাকিয়া তিনি চার্চিল রুজভেল্ট গোষ্ঠীকে অনেক বেশী বেকায়দায় ফেলিতে পারেন…অচল অবস্থাই আমাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুতি"। [অক্টোবর ১৯৪৩ দ্বিতীয় পত্র]।

জয়প্রকাশ আরো বলেছিলেন : "রুশ-জার্মাণ চুক্তি কিংবা জাপ-চীন সন্ধি, বৃটিশ বাহিনীর গুরুতর পরাজয় এবং ভারতের মাটিতেই যুদ্ধের বিস্তার প্রভৃতির ন্যায় আন্তর্জাতিক অবস্থায় বিরাট কোন পরিবর্তন না ঘটিলে আমাদের পক্ষে বড় একটা কিছু করা সম্ভব নয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি এবং একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠা বোধ করি না।"

জয়প্রকাশের এই সব বিবৃতি, চিঠি এবং সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন সেদিনের কমিউনিস্টদের গাত্রদাহ সৃষ্টি করেছিল।

সেদিনের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এক পুস্তিকায় এই সব কাজের তীব্র সমালোচনা করে লিখলেন :

"সোজা কথায় তাহাদের (কংগ্রস সোস্তলিস্টদের) নীতি হল

এই: ধ্বংসাত্মক আন্দোলন চালাইয়া যাও, সুভাষ বসুর নির্দেশ পাইবা মাত্র বিপ্লব করিবার জন্য প্রস্তুত হও, বসুর বাহিনীই আমাদের হইয়া কাজ সমাধা করিয়া দিবে। এবং অতি চতুরতার সহিত সুভাষ বসুর প্রভু তোজোকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখা হইয়াছে। নীতিহীন সুবিধাবাদের জন্য সুভাষ বসু কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন—কংগ্রেস-ভক্তরা একথা জানেন। সেই সুভাষ বসুকে দেশপ্রেমিকের ছদ্মবেশ পরাইয়া পুনরায় অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসার জন্য জয়প্রকাশ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন।"

সেদিন সুভাষ চন্দ্রের সমালোচকদের উদ্দেশ্যে জয়প্রকাশ বলেছিলেন:

"সুভাষ বসুকে বিভীষণ বলিয়া নিন্দা করা খুবই সহজ, কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ তাঁহাকে নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক এবং জাতীয় সংগ্রামের অগ্রণী যোদ্ধা বলিয়াই জানে, তাঁহার মত লোক দেশকে বিক্রয় করিবে, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না।"

জয়প্রকাশের এই মন্তব্যে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। যিনি দেশের জন্য সবস্ব দিলেন, সেই মহাবিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে নাকি জয়প্রকাশ "দেশপ্রেমিকের ছদ্মবেশ" পরিয়েছিলেন—তাঁকে মুক্তিপথের অগ্রদূত বলে ঘোষণা করায়। আর যাঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে গোটা দেশকে বিক্রি করতে উদ্যত হয়েছিলেন—শ্রমিক শ্রেণীকে বর্ধিত বেতন ও ভাতার লোভ দেখিয়ে সংগ্রাম বিমুখী করে রেখে মনপ্রাণ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যন্ত্রকে চালু রাখার কাজে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তাঁরাই নাকি স্বাধীন ভারতে শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থার ভ্যানগার্ড!

'আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে,
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে'—

—রবীন্দ্রনাথ

নৌ-বিদ্রোহ

মণিলাল

আগুন······আগুন।

অগ্নিগর্ভ ভারতের দিক হতে দিগন্তে শুরু হল অগ্ন্যুদ্গার! বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ল গোটা ভারতে। শহরে···গঞ্জে··· হাটে বাজারে···পাড়ায় পাড়ায়···মানুষের ঘরে ঘরে বিদ্রোহের মশাল জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

আর সেই জ্বলন্ত অগ্নির লেলিহান শিখায় সারা ভারতের আকাশ লালে লাল।

আকাশের রক্তিমাভায় মূর্ত হল, উদ্ভাসিত হল ভারতের নব জাগরণের প্রাণপুরুষ—নেতাজী সুভাষ। সূর্যপ্রতিম, তেজদীপ্ত, ভাস্বর···জ্বলন্ত যৌবনের জীবন্ত প্রতীক সুভাষ।

১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ ফৌজের যাত্রা শুরু হয়েছিল রেঙ্গুন থেকে। ১৯শে মার্চ ভারতভূমিতে পদার্পণ। ১৪ই এপ্রিল ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা উঠল ময়রাং-এ। তারপরই চারিদিক থেকে ইম্ফলের ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ঘেরাও।

দুর্ভাগ্য, এত করেও তিনমাস পরে সেই আজাদ হিন্দ বাহিনীকে ফিরে যেতে হল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে। বন্দী হল হাজার হাজার আজাদী সৈনিক ও অফিসার বিজয়ী বাহিনীর হাতে।

তা'বলে আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ব্যর্থ হল না। দেখতে দেখতে একদিন গোটা ভারত ফেটে পড়ল লালকেল্লায় তাদের বিচারের কাহিনী শুনে।

'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে'—কিশোর কবি সুকান্তের এই কবিতার প্রতিটি অক্ষর যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল সেই দিনগুলিতে।

১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র করে শুরু হল একটির পর একটি বিদ্রোহ। ভারতবর্ষে এত বিদ্রোহ কোন দিনও দেখা যায়নি এর আগে।

শুধু বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ। দিকে দিকে বিদ্রোহ। সেনা বিদ্রোহ, পুলিশ বিদ্রোহ, রয়েল এয়ার ফোর্স বাহিনীর বিদ্রোহ, ডাক ও তার বিভাগের বিদ্রোহ, নৌ বিদ্রোহ ইত্যাদি রকমারি বিদ্রোহই সেদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল ভারতের মাটিতে।

লক্ষ্য কিন্তু একটাই।......করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে...ডু অর ডাই! ইংরেজ ভারত ছাড়......জয় হিন্দ.......।

ঐতিহাসিক নৌবিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বম্বেতে। তারপর বিদ্রোহের আগুন এক এক করে ছড়িয়ে পড়ল—করাচী, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তম, কলকাতা—ভারতের সবকটি নৌবন্দরে।

কিন্তু কেন এইসব বিদ্রোহ হঠাৎ প্রচণ্ডবেগে বিস্ফারিত হল? এই অসন্তোষের অন্তরালে কিসের প্রভাব, কার প্রভাব অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত হয়েছিল? নিঃসন্দেহে বলা চলে না কি নেতাজী এবং তাঁর আই. এন. এ-র প্রভাব?

ব্রিটিশ মুখপাত্রের এই একই অভিমত। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী, ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্সেরও ঐ একই বক্তব্য ছিল।

নৌ-বিদ্রোহীদের দাবী-দাওয়ার মধ্যে দুটি দাবী ছিল খুবই উল্লেখ-যোগ্য। সমস্ত আজাদী বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে, এবং ইন্দোচীনের (ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া, লাওস প্রভৃতি) স্বাধীনতা হরণের উদ্দেশ্যে ফরাসীদের সাহায্য করার জন্যে যে সব ভারতীয় সৈন্য পাঠানো হয়েছে, তাদের সবাইকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

নৌ-বিদ্রোহের গোড়াতেই গ্রেপ্তার হলেন বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক রেডিও অপারেটর বলাই দত্ত। অপরাধ—নৌ শিক্ষাসংস্থা 'তলোয়ার'-এর দেওয়ালে দেওয়ালে 'জয়হিন্দ' কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট করে নিজের হাতে লিখেছিলেন বলে।

মুহূর্তে সেই খবর বেতারের সাহায্যে ছড়িয়ে দেওয়া হল প্রতিটি যুদ্ধ জাহাজে।···বলাই দত্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন। সংগ্রাম আসন্ন। প্রস্তুত হও সবাই।

বিদ্রোহী নৌ সৈনিকের সবাই তরুণ। বয়েস কুড়ি বাইশের বেশি নয়। রাজনৈতিক ধারণা খুব একটা স্পষ্ট নয় ওদের। কিন্তু আছে মনবল, আছে দেশপ্রেম, আছে বিদ্রোহের পতাকা স্বগর্বে এগিয়ে নিয়ে যাবার অফুরন্ত শক্তি। মুসলিম তরুণ এম. এস. খানকে করা হল সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি। সহ-সভাপতি মদন সিং।

প্রতিটি যুদ্ধজাহাজ থেকে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে তার জায়গায় তোলা হল কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা। রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভির নাম পালটে নতুন নাম করণ হল—ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল নেভি। হেড-কোয়ার্টার্স করা হল সর্বাধুনিক ফ্ল্যাগশিপ নর্মদাতে।

মোট চল্লিশ হাজার বিদ্রোহী নৌ-সেনা। সবাই এক জাতি এক প্রাণ। এক কথা—এক জবাব। কামানের জবাব কামানের মুখেই দেব। মৃত্যুর বদলা মৃত্যু, গুলির বদলা গুলি।

নৌ-সৈন্যেরা সত্যই তাদের জবানে অটল ছিল। একটুও পিছু হটেনি। করাচী, বম্বে সর্বত্রই ওরা কামানের মুখেই কামানের জবাব দিয়েছিল। প্রাণ যেমন দিয়েছে, নিয়েছেও তেমনি।

নৌ-বিদ্রোহের কাহিনী বলতে গিয়ে বলাই দত্ত বলেছেন,—

"ডক-ইয়ার্ডে অথবা ক্যাসেল ব্যারাকে প্রবেশ করার জন্য ব্রিটিশ টমীদের সব রকম প্রচেষ্টাই প্রতিহত করা হল। যে সব জায়গা থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, জাহাজ থেকে সে সব জায়গায়, বিশেষ করে ওয়ার্লিকান কামানের গোলা ছোঁড়া হল। বেলা আড়াইটা অবধি বিক্ষিপ্তভাবে ছোট আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলী গোলা চলছিল—মাঝে মাঝে গ্রেনেড বোমাও ছোঁড়া হচ্ছিল।

সেইদিনই নৌ-বাহিনীর সর্বোচ্চ অফিসারের গলা শোনা গেল অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে। "সরকারের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা

হবে বিদ্রোহ দমনে। তাতে সমস্ত নৌ বহর ধ্বংস করতে হলেও দ্বিধা করা হবে না।”

নৌ-বাহিনীর বড় কর্তার বাণী শুনে বিদ্রোহীরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। মাত্র দশটা জাহাজ বড় কর্তার অধীনে রয়েছে—আর আটাত্তরটা যুদ্ধ জাহাজ বিদ্রোহীদের দখলে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে উচ্চ হাসির কলরোল উঠল জাহাজে জাহাজে।

সাজাও কামান। কামানের গোলার আঘাতে আঘাতে উড়িয়ে দাও…গুঁড়িয়ে দাও ঐ দশটা জাহাজকে। ডুবিয়ে দাও সাগর জলের অতল তলে।

কিন্তু বিপদ এল অন্য পথে। নতুন চাল দিলেন ব্রিটিশরাজ। বিদ্রোহীদের জাহাজগুলোকে দূর থেকে অবরোধ কর। কোন মতে যেন খাবার জল আর খাদ্য পৌঁছতে না পারে বিদ্রোহীদের জাহাজে।

চিন্তায় পড়লেন নৌ-বিদ্রোহীরা। সত্যিই তো! জাহাজে পানীয় জল নেই…নেই যথেষ্ট পরিমাণে খাবার দাবার। এই রকম অবস্থায় কতদিন লড়াই চালানো সম্ভব?

নৌ-বিদ্রোহীদের সহায় বোধহয় স্বয়ং ভগবান। বিদ্রোহীদের অন্যতম নায়ক বলাই দত্ত এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যা লিখেছেন, তাঁর ‘নৌ-বিদ্রোহ’ গ্রন্থ থেকে তারই কিছুটা তুলে দেওয়া হল এখানে।

“বম্বে শহরে গুজব রটে গেল, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আমাদের অভুক্ত রাখার মতলব করেছে। জনসাধারণ ছুটে এল আমাদের বিপদ থেকে মুক্ত করতে। সর্বস্তরের লোক এসে জড় হল সমুদ্রতীরে, কারো হাতে খাবারের প্যাকেট, কারও হাতে খাবার জল ভরা পাত্র।

রেঁস্তরার মালিকরা জনগণকে অনুরোধ করতে লাগল, যত খুশি খাবার তুলে নিয়ে অবরুদ্ধ বিদ্রোহীদের দিয়ে আসতে। রাস্তার ভিক্ষুকরা ক্ষুদে ক্ষুদে প্যাকেট নিয়ে পোতাশ্রয়ের সামনের দিকে এগিয়ে আসছে দেখতে পাওয়া গেল—সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য।

সমস্ত এলাকায় সশস্ত্র ভারতীয় সৈন্যেরা টহল দিয়ে ঘুরছিল। ব্রিটিশ সৈন্যেরা তৈরী হয়েছিল একটু তফাতে। হাজার হাজার

বম্বের নাগরিক খাবারের প্যাকেট সঙ্গে এনে সমুদ্রকূল অবরোধ করে ফেলল। কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে ভারতীয় সৈন্যেরা ঐ সব খাবারের প্যাকেট জাহাজ থেকে পাঠানো ছোট নৌকোয় তুলে দিতে সাহায্য করছিল। ব্রিটিশ সৈন্যেরা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে "তলোয়ার"-এর প্রাচীরের ওপর দিয়ে টপকে আসা এত খাবারের পার্শেল পেলাম যে, আমাদের ১,৫০০ সৈনিকের কয়েকদিন খাবার পক্ষে যথেষ্ট।"

সারা বম্বে মহানগরীতে তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে বিদ্রোহের আগুন। লড়াই শুধু জাহাজেই নয়,...লড়াই শুরু হয়ে গেছে সাধারণ মানুষের মাঝে। লড়াই চলছে পাড়ায় পাড়ায়...পথে ঘাটে, অলিতে-গলিতে, প্রশস্ত রাজপথে...এক কথায় সর্বত্র। একদিকে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনী,...অন্যদিকে নিরস্ত্র জনসাধারণ। সম্বল··খাঁটি দেশী অস্ত্র...পাথরের টুকরো—লোহার রড্ আর পাকা বাঁশের লাঠি।

এই অসম যুদ্ধের কাহিনী বলতে গিয়ে বলাই দত্ত লিখেছেন,—"ভারতীয় সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল। মেসিনগান এবং ট্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে টমীদের ব্যাটেলিয়ানগুলি রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। জনসাধারণের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। তারা রাস্তা খুঁড়ে যেমন তেমন ভাবে ব্যারিকেড তৈরী করে পিছন থেকে পাথর ছুঁড়ছিল।...জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বম্বের খেটে খাওয়া লোকগুলি সবাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। একটি দোকানও লুঠ করেনি, একটি ঘরও জ্বালান হয়নি। তারা কামানের গোলার সম্মুখীন হয়েছিল পাথর নিয়ে—তারা গুলীর আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল। এই মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা কখনও প্রকাশ করা হয়নি। মৃত ও আহতের সংখ্যা ছিল চারশত থেকে আটশতের মধ্যে। বম্বেতে এর আগে একদিনে এত লোক প্রাণবিসর্জন দেয়নি।"

অবস্থা খারাপ দেখে বম্বে শহরের ভার মিলিটারির হাতে নিলেন সাদার্ণ কম্যাণ্ডের জি. ও. সি.।

'ভয় নেই, রয়েল নেভির যুদ্ধ জাহাজগুলো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বম্বের দিকে'। খবর পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী।

ওদিকে করাচী বন্দরও চুপ করে বসে নেই। হিন্দুস্থান জাহাজ থেকে নৌবিদ্রোহীরা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে চলেছে করাচী শহরের উপর।

শহরে অবস্থিত গোর্খা বাহিনী পাল্টা গোলাবর্ষণ করতে রাজী হল না। ফলে তাদের সরিয়ে এবার আনা হল ব্রিটিশ বাহিনীকে।

শঙ্কিত হয়ে উঠল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরাজ। নৌ-বিদ্রোহ যে এমন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে এ তাদের কল্পনার অতীত।

ঘুম নেই সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি এম. এস. খানের চোখে। তিনি আর তাঁর তরুণ সঙ্গীরা ভারতীয় নেতাদের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। নেতাদের কাছে তাদের আবেদন....আসুন, আপনারা আমাদের নেতৃত্ব দিন। আমাদের সমর্থন করুন।

নেতাদের কাছ থেকে কোনরকম সাড়া পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল শুধু উপদেশ আর উপদেশ।

সর্দার প্যাটেল সেই একই উপদেশ দিলেন। প্যাটেল বললেন—'তোমরা সবাই ফিরে গিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আত্মসমর্পণ কর। তোমাদের দাবী-দাওয়া এবং যাতে তোমাদের সাজা না হয়; সেটা আমরা দেখব'।

কলকাতা থেকে একই ধরণের বার্তা পাঠালেন মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ আলী জিন্না।

নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে বম্বেতে হরতাল ডাকা হল। কিন্তু হরতাল বানচাল হয়ে গেল নেতাদের বিরোধীতায়।

শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্বেও আত্মসমর্পণের নির্দেশ মেনে নিতে হল।

নৌ-বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৮ই ফেব্রুয়ারী। শেষ হল ২২শে ফেব্রুয়ারী। জনগণের উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি দিলেন সংগ্রাম পরিষদ :

"কেন্দ্রীয় নৌ ধর্মঘট কমিটি ভারতের জনগণকে—বিশেষ করে বম্বের জনগণকে জানাতে চান যে, ধর্মঘট কমিটি ধর্মঘট তুলে নেবার

সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করার পরেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি (প্যাটেল) তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কোন প্রকারেই কোন ধর্মঘটীকে পরে যাতে শাস্তি পেতে না হয়, কংগ্রেস তা দেখবে, তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। কংগ্রেস তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। মিঃ জিন্নার সহানুভূতিপূর্ণ বিবৃতির পরে মুসলিম লীগের সমর্থনের নিশ্চয়তার ওপরে নির্ভর করেও কমিটি স্থির করেছে ধর্মঘট উঠিয়ে নিতে'।

এর পরের কাহিনী বিদ্রোহীদের অন্যতম অংশীদার ফণীভূষণ ভট্টাচার্যের লেখা…"নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা" গ্রন্থ থেকে তুলে দেওয়া হল :

'বেতার-সঙ্কেতে সমস্ত সেণ্টারে সংবাদ দেওয়া হলো যুদ্ধ বন্ধ করতে। স্ট্রাইক কমিটির ওপরে সকলের আস্থা ছিল। তাঁরা যখন বললেন, তখন আর দ্বিধা না করে সকলেই যুদ্ধ থামালো।

জাতীয় নেতারা দায়িত্ব নিয়েছেন। বিদ্রোহীরা ত পূর্বেই তাঁদের আহ্বান করেছিল দখলিকৃত সমস্ত নৌ-বহরের দায়িত্ব নিতে। যে কারণেই হোক, প্রথমে তাঁরা আসেননি। এখন এসে যখন দায়িত্ব নিয়েছেন, তখন আর তাদের (বিদ্রোহীদের) আনন্দ ধরে না।

সবাই তখন আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে। মিষ্টি এনে বিতরণের ব্যবস্থা হচ্ছে। সকলে কোলাকুলি করছে। অনেককে দেখা গেল, স্ট্রাইক কমিটির সভাপতি মিঃ এম. এস. খানকে কাঁধে তুলে নিয়ে আনন্দে নৃত্য করছে। চতুর্দিকে আনন্দের হিল্লোল বইছে। আজ যে আনন্দের বাঁধ ভেঙেছে।

…বিকেল চারটে নাগাদ দেখা গেল, ছোট ছোট কতকগুলো যুদ্ধ জাহাজ গোরা সৈন্য বোঝাই করে আস্তে আস্তে বিদ্রোহী জাহাজগুলোকে ঘিরে ফেলতে লাগল। ঐ জাহাজগুলোতেও শান্তির পতাকা উড্ডীন ছিল।

…প্রথমে ভুল করে সকলে মনে করল. দরে যে-সব আমাদের

সমসাথী বিদ্রোহী জাহাজ ছিল, তারাই এবারে শান্তির আনন্দে যোগ দেবার জন্তে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। তীরের দিকের সকলেই তাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছিল।

হ্যাঁ, তারা বিপ্লবীদের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করেছে ঠিকই, তবে ঐ সাদর সম্ভাষণ গ্রহণকারী জাহাজগুলো প্রীতি-সম্ভাষণ জানালো কামানের গোলা আর বড় বড় ম্যাসকেট্রির অজস্র গুলীর দ্বারা।

সব্বাই হতবাক, একি! নেতাদের কথার মূল্য কোথায়,···আশ্চর্য, এই বিপদের সময় কোন নেতাই এলেন না!···

মরিয়া হয়ে বিদ্রোহীরা আপ্রাণ চেষ্টা করলো তাদের পূর্ব মোহকে কাটাতে। আবার তারা গেল কামান বন্দুকের কাছে। আবার ধরলো দূরে সরানো অস্ত্রগুলো—ভাঙা হাট জোড়া লাগাতে। কিন্তু ইতি-মধ্যেই হঠাৎ আক্রমণে বিদ্রোহীদের দেড়শ' জন মারা গেলেন।

মিঃ মদন সিংহ ঝড়ের বেগে 'খাইবার' জাহাজের বেতারযন্ত্রের কাছে ছুটে গিয়ে আবার যুদ্ধের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন—পেছন দিয়ে অতর্কিতে কাপুরুষ ব্রিটিশরা আমাদের আক্রমণ করেছে। ওদের ক্ষমা নেই। শান্তির পতাকা এখন গড়াগড়ি যাচ্ছে। প্রতিটি গোরা সৈন্যকে খতম করার সঙ্কল্প নাও। ডু অর ডাই।

তারপর তিনি একদিকে দৃঢ়হস্তে 'খাইবার'-এর দূর পাল্লার বড় কামানের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে চার্জ দিয়ে ঘন ঘন কামান দাগাতে থাকেন,—থ্রি ডিগ্রেস অব রেঞ্জ ওয়ান জিরো টু অট্-অট্-অট্ থ্রি রেড-শ্যালভো···, আবার মাইক্রোফোনে—লাউড স্পীকারে দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে উদাত্তকণ্ঠে আবেদন রাখেন:

'হে আমার প্রিয় দেশবাসীগণ, আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে তোমরা চিনে রাখো। ওঁরা বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছুই নয়। ওঁদের তোমরা চিনে রাখো—চিনে রাখো—চিনে রাখো'।

অবশেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন বিদ্রোহীরা। তার পরের ঘটনা বলাই দত্তের কাহিনী থেকে তুলে দেওয়া হল···।

'কেউ কখনো জানতেও পারেনি কত হাজার জনকে কারারুদ্ধ

করা হয়েছিল, কি ধরণের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের। এমন কি রেটিংরাও জানতে পারেনি একে অন্যের ভাগ্যে কি ঘটেছিল। আমার হিসাব মতে, দু হাজারেরও বেশি রেটিংকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জাহাজ ও ব্যারাক থেকে—কয়েকমাস ধরে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। পাঁচশতের মত লোককে কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। সাধারণ কয়েদীর মত তারা ভোগ করেছিল কারাবাস। এমন কি রাজনৈতিক কয়েদীর মর্যাদা থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। সমস্ত ন্যায়সঙ্গত পাওনা থেকে বঞ্চিত করে জেল থেকে তাদের যার-যার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা নিমজ্জিত হল বিস্মৃতির অতলে।'

কংগ্রেস বা লীগ কেউ তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। সেদিন হতভাগ্য নৌ-বিদ্রোহীদের এতটুকু সমবেদনাও জানাননি কোন সর্বভারতীয় নেতা।

'মরিয়ার মুখে ওঠে যদি মার মার
রুধিবে কে? হিম্মৎ আছে কার?
আগুনেই জন্ম যার, সেই জানে তার জ্বালা
তাইত দেখায় সে' আগুনের খেলা।'

—প্রবাল বসু

বন্দেমাতরম কাল হল শেষ

[মহাত্মা গান্ধীর ঘোষণা]

'India could only be partitioned over my dead-body alone. So long I am alive, I will never agree to the partition of India'

দেশ বিভাগ যদি হয়তো আমার মৃতদেহের উপর দিয়েই হবে। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ কিছুতেই দেশ-বিভাগে সম্মতি দেবো না।

ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার ঘোষণা

'As from the fifteenth day of August, nineteen hundred and forty seven, two Independent Dominions shall be set up in India, to be known respectively as India and Pakistan.

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে ভারতবর্ষে দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন গঠিত হবে এবং তাদের নাম হবে ভারত ও পাকিস্থান।

'তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে'।

—রবীন্দ্রনাথ

ইতিহাসের চোখে

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বিপ্লববাদ যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-নীতির প্রভাবে ও কংগ্রেস-দলের প্রাধান্য ও প্রচারের ফলে এ সত্যটি অনেকেই প্রকাশ্যে স্বীকার কর্তে কুণ্ঠিত হতেন। কিন্তু যা সত্য, তা কেউ কোন দিন চেপে রাখতে পারেনা। তাই কংগ্রেস নায়কেরা মুখে যা'ই বলুন, তাঁদের অন্তরে যে তাঁরা এ কথা বিশ্বাস করেন তার প্রমাণ আছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মহাজাতি সদনে বহুবার বহু বিপ্লবীর স্মৃতি তর্পণ-সভায় এবং তাঁদের আলেখ্য-উন্মোচনে পৌরহিত্য করেছেন। কলিকাতার পৌরসভায় কংগ্রেস সদস্যদের সংখ্যা বেশী হলেও শহরের অনেক রাস্তা এখন বিপ্লবী-শহীদদের নামে পরিচিত। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী (লালবাহাদুর শাস্ত্রীজি) নেতাজীর মূর্তি উন্মোচন করেছেন।

কিন্তু এই বিপ্লবীদের কাহিনী এখনও যথাযথভাবে লিখিত হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই এ বিষয়ে আমি বাংলা দেশের শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আমি নিজে আমার ছাত্র ও বন্ধুগণের সাহায্যে বিনা পারিশ্রমিকেই বাংলা দেশের বিপ্লববাদের ইতিহাস লিখতে প্রস্তুত আছি—তবে আনুষঙ্গিক কিছু খরচ লাগবে বিপ্লবীদের কাছ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করতে। আমি একটি পরিকল্পনা দিয়েছিলাম—তাতে তিন বছরে দশ হাজার টাকা ব্যয়ে এটা সম্পন্ন হবে।

সে চিঠির কোন জবাব পাই নাই! ভূতপূর্ব বিপ্লবী দুই একজন

মন্ত্রী এ বিষয়ে খুব উৎসাহ ও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। আমি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে লিখেছিলাম এবং সংবাদ পত্রেও এ মত ব্যক্ত করেছিলাম যে, বিপ্লববাদের ইতিহাস লিখতে হলে তাঁদের নায়কদের মধ্যে যাঁরা এখনও জীবিত আছেন, তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আর তাদের মধ্যে অনেকেই বার্দ্ধক্য, কারাবাসের ক্লেশ, শরীরের প্রতি অবহেলা ও পুলিশের নানাবিধ অত্যাচার ইত্যাদি কারণে আর বেশীদিন বেঁচে থাকবেন এমন আশা করা যায় না। সুতরাং অবিলম্বে তাঁদের কাহিনী সংগ্রহ না করলে হয়ত তা' চিরদিনের মতই লোপ পাবে।

অবশেষে ১৯৫২ সালে যখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী 'স্বাধীনতার ইতিহাস' লেখার জন্য একটি সম্পাদক-মণ্ডলী নিযুক্ত করে আমাকে তার ডিরেক্টর পদে নিয়োগ করেন, তখনও আমি বিপ্লববাদের ইতিহাস লেখার জন্য জীবিত বিপ্লবী নায়কদের কাহিনী সংগ্রহ করার প্রস্তাব করি। কিন্তু কোন একটি বিশিষ্ট দলের নায়ক ছাড়া আর কারোও কাহিনী সংগ্রহ করা হয় না। এর কারণস্বরূপ বলা হয়েছিল যে, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কাহিনী সংগ্রহ করলে তাতে গোলযোগ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে! আমি এর উত্তরে বলেছিলাম, এইরূপ বিভিন্ন কাহিনী একত্র করলেই তা থেকে বিপ্লবের প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। কিন্তু এ যুক্তি গ্রাহ্য হয় নাই।

যারা দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে, পিতা মাতা ও পরিবারবর্গের মায়া কাটিয়ে অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা পেয়ে এবং মৃত্যু বরণ করে দেশের মুক্তিপথ তৈরী করতে সাহায্য করছিলেন, তাদের অনেককেই দেশ পুরস্কার বা সম্মান দিতে পারে নাই। কিন্তু যদি তাঁদের অবিনশ্বর কীর্তির কাহিনীটুকুও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আমরা রেখে যেতে না পারি, তবে তারা আমাদের কখনই ক্ষমা করবেনা। এবং আমরাও অকৃতজ্ঞতা ও কর্তব্য হানির কলঙ্ক চিরদিন বহন করব।

আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি সত্য, কিন্তু তার পুরো ফল ভোগ করতে পারিনি,—এখনও সাধারণ লোকের দুঃখ দুর্দশার বিশেষ কিছু লাঘব

হয়নি, বরং বেড়েছে! স্বাধীনতার যে 'রূপ' বিপ্লবীদেরকে আত্ম-বলিদানে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আজ পর্যন্ত সেই রূপ আমরা দেখতে পাইনি। ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে আমরা কেবল একটা ধাপ উঠেছি। এই স্বাধীনতা বজায় রাখা, এবং তা থেকে আশানুরূপ ফল লাভ করা—এই দুটি মহৎ কাজ এখনও বাকি, এবং আরও অনেক ধাপ পার হতে হবে। তার জন্য যে সাধনা ও আত্মত্যাগের দরকার তা মুক্তিলাভের সাধনা ও আত্মত্যাগ থেকে কম নয়।

আমাদের দেশের যুবকগণ যদি এ কথা স্মরণ রাখে এবং বিপ্লবী শহীদগণের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়, তবেই এই ফল লাভ করা সম্ভব হবে। অবশ্য এখানকার নূতন পরিস্থিতিতে নূতন উপায় ও নূতন পথে চলতে হবে। কিন্তু পথ আলাদা হলেও ত্যাগের ও সাধনার আদর্শ একই থাকবে! শহীদদের যে সকল গুণ ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পূর্বে বলেছি, সেই সব গুণ অর্জন করতে হবে। তাঁরা হলে যাঁরা সর্বস্ব ত্যাগের দ্বারা দেশকে স্বাধীন করেছেন, তাদের ঋণ আমরা কখনো শোধ করতে পারবো না। জীবন পণ করে তারা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, সেই স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ না করতে পারলে তাঁদের ক্ষুব্ধ অতৃপ্ত আত্মা আমাদের অভিশাপ দেবে।

* লেখকের অনুমতিক্রমে বিপ্লবী নায়ক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়ের 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থের ভূমিকালিপি থেকে সংগৃহীত।

বিদেশীর চোখে

স্যার হেনরি কটন

'Babus from Bengal, strenuous and able, who rule and control public opinion from Peshwar to Chittagong.'

[বাঙালীরা তাদের একাগ্র সাধনায় চট্টগ্রাম থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিল]

লর্ড কারমাইকেল

'এ বিপ্লব আন্দোলন অনায়াসেই থামানো যেতো, যদি বাঙলার ইনটেলেকচুয়েল জায়ান্টরা এর পেছনে না থাকতেন'।

লর্ড রোনাল্ডশে

'রামমোহন, মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, টেগোর, বঙ্কিম— 'These intellectual stalwarts are behind this movement. How to stop it'!

ষ্টিফেন্‌সন

'বাঙালীর শক্তি কোথায় আমরা জানি। রাইফেল-পিস্তলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়, কিন্তু বাঙালীর ভাবপ্রবণ আদর্শবাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা চলে না। ওদের রক্তকণায় রয়েছে বিদ্রোহ—ওদের সুপার-ইনটেলেকচুয়েলরা এক একটি 'রিবেল'।

স্যার চার্লস টেগার্ট

'The grandest of revolutionaries I have ever met is the Bengal Brand. In sheer excellence of

character they surpass their counterparts in any other country.'

[আমি এ পর্যন্ত যত বিপ্লবীর সংস্পর্শে এসেছি, তাদের মধ্যে বাঙলার বিপ্লবীরাই সবচাইতে ভাব-সুন্দর। চরিত্রবলে পৃথিবীর যে কোন দেশের বিপ্লবীদের মধ্যে তাঁরা শ্রেষ্ঠ।]

মিঃ ব্লাণ্ট

'People talk about political assassination as defeating its own end, but that is nonsense. It is just the shock needed to convince selfish rulers that selfishness has its limits of imprudence. It is like that other fiction that England never yields to threats. My experience is that when England has her face well slapped, She apologises, not before.' [My Diaries]

[অনেকের মতে—রাজনৈতিক হত্যা বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়। এটা নির্বোধ উক্তি। এ শুধু ততটুকুই আঘাত, যা স্বার্থপর শাসকদের ধৃষ্টতা সীমিত করার জন্য প্রয়োজন। কেউ কেউ বলে—ইংল্যাণ্ড নাকি ভীতি প্রদর্শনের কাছে নতি স্বীকার করে না। আমার ধারণা—ইংল্যাণ্ডের গালে কষে চড় দিতে পারলে তবেই সে ক্ষমা চায়—তার আগে নয়।]

রেজিন্যাণ্ড কুপল্যাণ্ড

'The revolutionaries of extreme left, specially in Bengal, were still ready to take their orders from Mr. Subhas Chandra Bose, even if they came by Radio from Berlin.' [Indian Politics]

[বামপন্থী বিপ্লবীরা—বিশেষ করে বাঙলা দেশের চরমপন্থী বিপ্লবীরা বার্লিন থেকে প্রেরিত সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত ছিল]

উইনষ্টন চার্চিল

[যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী]

'Only a small extremist section in Bengal led by men such as Subhas Bose, were directly subversive and hoped for an axis victory.' [Second world war]

[কেবলমাত্র সুভাষচন্দ্রের অনুগামী বাঙলা দেশের কিছু সংখ্যক সুপরিচালিত নাশকতাবাদীই যুদ্ধে এক্সিস শক্তির (জার্মানী-ইতালী-জাপান) জয় কামনা করতো]

ডঃ বা-ম

[যুদ্ধকালীন বর্মার প্রধানমন্ত্রী]

'অতীত আর বর্তমানকে আমি যেন একই সঙ্গে দেখতে পেলাম। আমার মনে হল, দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষে যে ঐকান্তিক বিপ্লব সাধনা চলছে, সুভাষচন্দ্র যেন তারই মূর্ত প্রতীক।....বিশাল সেই সভা, সেখানে তিনি বক্তৃতা দিলেন, আহ্বান জানালেন—"চলো দিল্লী"। আশ্চর্য সেই ধ্বনি, উপস্থিত মানুষদের কানে তা যেন প্রায় মার্চ করে এগিয়ে চলবার নির্দেশের মত শোনাল, ওই একটি ধ্বনিতেই সুভাষচন্দ্র সকলের হৃদয় জয় করে নিলেন। তাঁর নির্দেশ, এ সংগ্রামে সবাইকে যোগ দিতে হবে। কার্যত তাই হল, সিঙ্গাপুরের গোটা ভারতীয় সমাজ তাঁর নির্দেশে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ এক আশ্চর্য ঘটনা'। [Break Through in Burma]

অধ্যাপক চিয়াং হাই ডিঙ

[সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়]

'Netaji was no collaborator or supporter of the Japanese ; as a brilliant revolutionary he only made

use of the Japanese in an attempt to achieve India's freedom! The facts that are undeniable are (i) Netaji's movement hastened India's ultimate freedom from the British yoke; (ii) India's emancipation paved the way for the freedom of other Asian nations including, of course, Malay and Singapore. Therefore, events connected with Netaji and his movement should be sacred to one and all Asians.'
[A.B. Patrika : 11-8-69]

[নেতাজী জাপ সমর্থক ছিলেন না। প্রতিভাসম্পন্ন বিপ্লবী হিসেবে তিনি শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যই জাপানী শক্তির সদ্ব্যবহার করেছেন। একথা স্বীকার করতেই হবে— (ক) নেতাজীর প্রচেষ্টার ফলে ভারতবর্ষের চূড়ান্ত মুক্তি ত্বরান্বিত হয়েছে (খ) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অন্যান্য এশীয় জাতিগুলির, বিশেষ করে মালয় ও সিঙ্গাপুরের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে; তাই নেতাজী ও তাঁর আন্দোলন প্রতিটি এশিয়াবাসীর কাছে মহাপবিত্র।]

পিবুল সংগ্রাম

[যুদ্ধকালীন থাই-প্রধানমন্ত্রী]

'বুদ্ধের পাশে বসবার মত একটি মাত্র লোকই আমি দেখেছি তিনি হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু'। [শুকার বোবস: লিউপোল্ড ফিসার]

হিউ টয়

[প্রখ্যাত ব্রিটিশ ভাষ্যকার]

'For most, the personality of the man was overwhelming, there was a genius of enthusiasm, of inspiration. Men found that when they were with him only the cause mattered, they saw only through his eyes, though the thoughts he gave them, could

deny him nothing. His place in Indian History cannot be denied. He gave much to his country.'

[এমন একটা অসাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা, অসামান্য প্রাণশক্তি তাঁর (সুভাষের) মধ্যে ছিল যে, যারা একবার তাঁর সংস্পর্শে যেতো, তারাই তাঁর ব্যক্তিত্বে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তো। তাঁর সান্নিধ্যে থাকলে আদর্শই যেন তখন সবার কাছে ধ্যান-জ্ঞান ও তপস্যা হয়ে দাঁড়াতো। তাঁর দৃষ্টিই যেন সবার দৃষ্টি। তাঁর চিন্তাই যেন সবার চিন্তা। তাঁকে অদেয় কিছু নেই। ভারতের ইতিহাসে তাঁর স্থান অনস্বীকার্য। নিজের দেশকে তিনি অনেক কিছু দিয়ে গেছেন।]

মাইকেল এডোয়ার্ডস

[প্রখ্যাত ব্রিটিশ ভাষ্যকার]

'Bose, the only one with a clear-cut view of the world, was far away in Europe nurturing his plans to liberate India from outside British had not feared Gandhi, the reducer of violence, they no longer feared Nehru, who was rapidly assuming the lineaments of civilized statesmanship. The British however, still feared subhas Bose.

India owes more to him than to any other man.' [The Last years of British India]

[বোস ছিলেন একমাত্র লোক, যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পরিচ্ছন্ন। সুদূর ইয়োরোপে বসে তিনি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার পরিকল্পনা করে যাচ্ছিলেন। ব্রিটিশরা গান্ধীকে ভয় পেতো না, কারণ,— হিংসাত্মক কার্যকলাপকে প্রশমিত করাই ছিল তাঁর মূলনীতি। ব্রিটিশ নেহরুকেও ভয় করতো না। তিনি ছিলেন অতি শিক্ষিত রাষ্ট্রনায়ক। ব্রিটিশ ভয় করতো সুভাষ বসুকে। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে অন্য যে কারো চাইতে অনেক বেশি ঋণী।]

আলেকজান্দার ওয়র্থ

[জার্মানী]

'এমন একদিন আসবে, যেদিন নেতাজী সংগ্রামীনায়ক গ্যারিবল্ডির মতই ইতালীতে সম্মানিত হবেন, যিনি গত শতাব্দীতে অষ্ট্রিয়ার হাত থেকে নিজের দেশকে স্বাধীন করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। কম্যুনিষ্ট চীনে সান-ইয়াত সেনের মতই বিরাট বলে প্রতিপন্ন হবেন, যিনি জাপান থেকে চেষ্টা করে চীনকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন রাজবংশের অনাচার থেকে। আজ হোক, বা কাল হোক, ডি ভ্যালেরার মতই তিনি স্বীকৃতি পাবেন, যিনি আয়ারল্যাণ্ডকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন ব্রিটিশের হাত থেকে। ইয়োরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে তাঁকে তুলনা করা হবে, ম্যাসারিকের সঙ্গে, যিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন ব্রিটেন থেকে। [**Netaji in Germany**]

* সংকলন—শৈলেশ দে।

'চরম সত্য, পরম সত্য—এই অর্থহীন নিষ্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহামূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এতবড় যাদুমন্ত্র আর নেই।'

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পথের দাবী)

মুক্তিপথের অগ্রদূত

পার্থসারথি বসু

রাজনীতিতে ভুলের কোন মার্জনা নেই। তার জন্য মাশুল গুনতে হয়। গোটা জাতিকে মূল্য দিতে হয়। যুগ যুগ ধরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

সেদিন ভারত ভাগ্যবিধাতাগণ সুভাষচন্দ্রের প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার করেছিলেন, তারজন্য আজো কি মাশুল দিতে হচ্ছেনা গোটা জাতিকে?

সুভাষচন্দ্র বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কুচক্রীদের চক্রান্তে মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ করা হল, কিন্তু তাতে সমস্যার কোন সমাধান হয়েছে কি? তাহলে আজো লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল নরনারী এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায় কেন একটু আশ্রয়ের জন্য? কেন দুর্নীতি, অন্যায় আর অবিচারে পচে গলে বিষাক্ত হয়ে গেছে গোটা দেশটা? কোথাও পথ খুঁজে না পেয়ে কেন আজ তরুণ সমাজ বিভ্রান্ত, দিশেহারা? কে এর জন্য দায়ী? কার কাছে জবাব চাইবো আমরা?

সেদিন সুভাষচন্দ্রের সবচাইতে বড় সমর্থক ছিল বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলি। তারা জানতো যে, তাদের মনের কথা উপলব্ধি করার মত লোক কংগ্রেসে একজনই মাত্র আছেন, তিনি হলেন সুভাষচন্দ্র। তাই সুভাষচন্দ্রের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বিপ্লবীবৃন্দকেই আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই তাঁর পাশে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবের সাথে সুভাষচন্দ্রের জীবন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। সশস্ত্র বিপ্লব এবং সুভাষচন্দ্র যেন একটি অখণ্ড সত্ত্বা, পৃথক ভাবে কল্পনা করাও যায় না। স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রাম করে যে গৌরবময় ইতিহাস রচনা করেছিলেন,—সুভাষচন্দ্রের সংগঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনী তারই বৃহৎ সংস্করণ।

বিপ্লবীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেছিল যৌবনের শুরুতেই। এ সম্বন্ধে পুলিশের গোপন নথিপত্রে কি লেখা রয়েছে দেখা যাক।

"...In 1924 the terrorist members of the swarajya party supported the candidature of Mr. Subhas Chandra Bose as Chief Executive officer of the Corporation and it is noteworthy that after his appointment to that post many jobs in the Corporation were given to terrorists"

আরও এক জায়গায় পুলিশ রিপোর্ট বলছে,

"At this time there was an agreement between Subhas Bose and the terrorists that the latter should run the Bengal Provincial Congress Committee under his guidance."

সুভাষচন্দ্রের সাথে বিপ্লবীদের আঁতাতের কথা সেদিন পুলিশকে জানিয়ে দিতে কিছু সংখ্যক দুষ্ট কংগ্রেসী নেতা বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। পুলিশ রিপোর্টের পাতা ওল্টালে তাই প্রমাণ করে:

"Early in 1925 a prominent member of the Congress party admitted during an interview with a high Government official that he knew personally of the existence in Bengal of a terrorist movement that the members of which were hand in globe with the Swarajist."

ত্রিপুরী কংগ্রেসে ইংরেজকে চরমপত্র দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "The time has come for us to raise the issue of Swaraj and submit our national demand to the British Government in the form of ultimatum."

সেদিন তাঁর এই আহ্বানে গান্ধীবাদী কংগ্রেসীরা সায় না দিলেও

বাংলার বিপ্লবীরা কিন্তু প্রতিটি ব্যাপারে সমর্থন করেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে। সুভাষচন্দ্র বিতাড়িত হলেন কংগ্রেস থেকে। ঠিক করলেন, বিদেশে যাবেন দেশকে স্বাধীন করতে—অন্য দেশের সাহায্য নিতে। ইংরেজের শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে দেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়ন করতে হবে। বাইরে যাওয়ার সব আয়োজন করলেন বিপ্লবীরাই।

এরপর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস আর কারও অজানা নেই। সুভাষচন্দ্রকে পৃথিবী জানলো নেতাজীরূপে। দেশ স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অবদান অস্বীকার করা আজ আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তা বৃটিশের কাছ থেকে আপসে ক্ষমতা হস্তান্তর মাত্র। ব্রিটিশ ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল তখনই—যখন দেখল নেতাজীর বৈপ্লবিক আদর্শ এবং মহান আত্মত্যাগ ভারতীয় সেনাদের মধ্যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে তাদের যুগযুগ সঞ্চিত রাজানুগত্যবোধকে ছেঁড়া জুতোর মত ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। যে ভারতীয় সেনারা ছিল ভারত শাসনে ব্রিটিশের একমাত্র ভরসা, তারাই নেতাজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। সুতরাং সময় থাকতে সরে যাওয়াই মঙ্গল। ঐতিহাসিক মাইকেল এডোয়ার্ডসের মতে :—

"The Government of India had hoped, by prosecuting members of the I. N. A. to reinforce the moral of the Indian army. It succeded only in creating……unease, in making the soldiers feel slightly ashamed that they themselves had supported the British. If Subhas and his men had been on the right side, all Indian army must have been on the wrong side: It slowly dawned upon the Goverment of India that backbone of British rule, the Indian army, might now no longer

be trustworthy. The ghost of Subhas Bose, like Hamlet's father, walked the battlements of the Red-Fort, and his suddenly amplified figure over-owed the conferences that were to lead to independence."

রাষ্ট্রীয়ক্ষমতা আমরা পেলাম দেশকে ভাগ করে—ইংরেজের কুচক্রের চালে পা দিয়ে—ক্ষমতাভোগের উগ্র বাসনা চরিতার্থে। কিন্তু যাঁর ভয়ে ব্রিটেন আজ ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হল, তাঁর জীবন সংগ্রামের প্রকৃত মূল্যায়ন জাতি কি আজও করতে পেরেছে ?

স্বাধীনতার বহুবর্ষপূর্বে দেশের নেতাদের সতর্ক করে জনসাধারণের কাছে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "we can no longer live in an isolated corner of the world. When India is free, she will have to fight her modern enemies with modern methods, both in the economic and political spheres. The days of the Bullock-Cart are gone and gone for ever. Free India must prepare herself for only eventuality as long as the whole world does not accept .whole-heartedly the policy of disarmament."

পরাধীন ভারতবর্ষে মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে সুভাষচন্দ্র যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাতে স্পষ্টই দেখতে পাই, ভারতীয় যুবসমাজকে তিনি ক্ষাত্রতেজে বলীয়ান হয়েই দেশকে স্বাধীন করবার এবং স্বাধীন ভারতবর্ষকে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন—যতদিন পর্যন্ত না অন্যান্য দেশ নিরস্ত্রীকরণ নীতি সম্পূর্ণ পালন করছে।

সুভাষচন্দ্রের সাবধান বাণীকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্র নীতি এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শান্তির নামাবলী পরিয়ে—ঘুম পাড়ানী গান গেয়ে—আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের সাথে

কাঁধে হাত রেখে—পায়রা ঘুঘু উড়িয়ে—বিদেশী রাষ্ট্রদূতাবাসগুলিতে মদের আড্ডাখানা বসিয়ে—চারিদিকে শান্তির কীর্তন করে—দেশকে নির্বীর্য করে রাখবার এক সুচতুর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে আমাদের স্বাধীন ভারতের কর্ণধাররা আজ দেশের যে হাল করেছেন, তা ক্ষমাহীন অযোগ্যতায় চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

ইতিহাস বড় নির্মম ও ক্ষমাহীন। ইতিহাস তাকেই বলে, যার হাত থেকে পালানো যায় না। তাইতো কংগ্রেসেরই অন্যতম প্রধান নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মুখ থেকে শুনতে পাই :

'History would never forgive us if we agreed to partition. The verdict would then be that India was divided as much by the Muslim League as by Congress.'

সুভাষচন্দ্রকে মুছে ফেলতে চাইলেই কি ইতিহাসের এই কলঙ্কময় অধ্যায়কে মুছে ফেলা যাবে কোনদিন ?

'সেদিন নিশীথ বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা,
প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে, সেই দুরন্ত লাগি
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথে জাগি'।

—কাজী নজরুল ইসলাম

গান্ধীজীর লক্ষ্য

অন্নদাশঙ্কর রায়

সব দেশেই একদল লোক কর্তৃত্ব করে, আর এক দল করে সমালোচনা। কর্তারা যদি সমালোচকের সঙ্গে বনিয়ে চলে তো গোলমাল বাধে না। কিন্তু অনেক সময় উভয় দলের পেছনে থাকে বিপরীত স্বার্থ। স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের বনিবনা অত সহজ নয়। সেইজন্যে সমালোচকরা ধীরে ধীরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। উভয় পক্ষই বাহুবলের আশ্রয় নেয়। যে পক্ষ জেতে, সে পক্ষ কর্তা হয়। বিদ্রোহীরা কর্তা হলে অপর পক্ষ করে সমালোচনা, এবং সুযোগ বুঝে পাল্টা বিদ্রোহ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশীরা উভয় পক্ষে বা এক পক্ষে যোগ দেয়। ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে ওঠে। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ অঙ্কে বিদ্রোহের রূপ হয় বৈপ্লবিক। পাল্টা বিদ্রোহের রূপ হয় প্রতিবৈপ্লবিক। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ফলে জটিল আকার ধারণ করে। ক্রমশঃ পরিণত হয় গৃহযুদ্ধে, পরিশেষে আন্তর্জাতিক যুদ্ধে।

আমাদেরই জীবনকালে এরকম ঘটতে দেখা গেল রুশ দেশে। রুশদেশের প্রতিবিপ্লবীরা সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, সব দেশ বিপ্লবের ভয়ে প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে আর এক বার ঝাঁপিয়ে পড়বে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধে প্রতিবিপ্লব ফ্রান্সের বেলা সফল হয়েছিল, রাশিয়ার বেলা যদি সফল হয় তো বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে।

বিপ্লব যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্য একশো বছর আগে চিন্তা করে গেছেন মার্কস্। ফরাসী বিপ্লব কেন ব্যর্থ হলো তা নিয়ে তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছিল। ভেবে চিন্তে তিনি এই ধার্য করলেন যে, বিপ্লবের পরে প্রতিবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, প্রতিবিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয়ে বিপ্লবে নামতে হবে, যারা প্রতিবিপ্লবের জন্যে অপ্রস্তুত হয়ে বিপ্লবে নামে, তারা আখেরে পরাজিত হয়।

মার্কস্ তাঁর শিষ্যদের মন্ত্র দেন দুইভাবে প্রস্তুত হতে। তিনি স্বয়ং একখানি শাস্ত্র রচনা করলেন, সে শাস্ত্র বেদের মতো অভ্রান্ত। একদল ব্রাহ্মণও সৃষ্টি করলেন, এঁরা কমিউনিস্ট। এঁদের যজমান হচ্ছে কারখানার মজদুর শ্রেণী। যজমানদের সংঘবদ্ধ করা ও বেদ ব্রাহ্মণে বিশ্বাসবান করা হলো প্রথম কাজ। ইতিহাসের সঙ্কটক্ষণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আত্মসাৎ-করা হলো দ্বিতীয় কাজ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলতে বোঝায় পুলিশ ও মিলিটারী। পুলিশ ও মিলিটারী হাতে এলে আর সব আপনি আসে। কারখানার সংখ্যা বাড়িয়ে মজদুর সংখ্যা বহুগুণ বাড়ানো যায়।

রুশদেশে এখন কোটি কোটি মজদুর, কোটি কোটি সৈনিক। এদের সংঘবদ্ধ করেছে কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টিকে ঠিক রেখেছে কার্ল মার্কসের শাস্ত্র, লেনিনের ভাষ্য, স্টালিনের টীকা। সব অভ্রান্ত। দুনিয়ার সব দেশেই এখন এঁদের অনুচর আছে। সব দেশের কারখানার মজদুর এঁদের পক্ষপাতী। ভাবী যুদ্ধে যেসব দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, সে সব দেশের মজদুর অশান্ত হবে। ভাবী যুদ্ধে রাশিয়াকে হারানো জার্মানী বা জাপানকে হারানোর মতো সহজ হবে না। রুশ বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের মতো নাটকীয় ঘটনা নয়। এর পেছনে একশো বছর ধরে প্ল্যান করে প্রস্তুত হওয়া চলেছে। তা সত্ত্বেও যদি রাশিয়া হারে তো বুঝতে হবে পরমাণুশক্তির কাছে হেরে গেছে। পরমাণুশক্তির কাছে হেরে গেছে।

গান্ধীর মাহাত্ম্য এইখানে যে পরমাণুশক্তি তাঁকে হারাতে পারবে না, পরম হিংসা তাঁকে হারাতে পারবে না। পৃথিবীতে হয়তো আনবিক বোমার চেয়েও মারাত্মক অস্ত্র উদ্ভাবিত হবে, কিন্তু যত মারাত্মকই হোক না কেন, কোনো অস্ত্রই তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না। তাঁকে হারাতে পারত তাঁর নিজেরই কাম, ক্রোধ, লোভ, কিন্তু এসব রিপুকে তিনি জয় করেছেন, জয় করেছেন যাবতীয় দুর্বলতা, স্বার্থচিন্তা, অন্যায় চিন্তা। তাঁর নিজের বল বলে কিছু নেই, সুতরাং ভয় বলে কিছু নেই। সমগ্র দেশ যখন ভয়ে আড়ষ্ট, তিনি তখন

অকুতোভয়। তিনি যেমন অন্যায় করবেন না, তেমনি অন্যায় সইবেন না।

এই অসহিষ্ণুতা থেকে এসেছে অসহযোগ। অসহযোগকে অহিংস করেছে মানবপ্রেম। অসহযোগ ও অহিংসা দুটোই কেমন নেতিবাচক শোনায় বলে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ছিল, ক্ষোভ ছিল আমারও। কিন্তু এ দুটি নেতিবাচক শব্দের মূলে কাজ করেছে ইতিবাচক প্রেরণা, সত্যাগ্রহ। গান্ধীজী সত্যের আগ্রহে অসহিষ্ণু হয়ে অসহযোগী হয়েছেন, অহিংস রয়েছেন সত্যের আগ্রহে। একটি সত্য ন্যায়বোধ, আরো একটি সত্য মানবপ্রেম। এই যুগ্ম সত্যকে এক কথায় বলা যেতে পারে সকলের মধ্যে আপনাকে দেখা, আপনার মধ্যে সকলকে দেখা, অভেদ জ্ঞান। এমন মানুষের কোনো শত্রু থাকতে পারে না, দৃশ্যত যে শত্রু, সেও তাঁর আপনার লোক। একদিন তিনি তাকে প্রেমের দ্বারা জয় করবেনই।

যীশু যেমন শত্রুকে মিত্রের মতো ভালোবাসতে বলেছেন, গান্ধীও তেমনি বলছেন। দু' হাজার বছর পরে এই একজনকে দেখা গেল—যিনি যীশুর মতো শত্রু প্রেমিক, যুধিষ্ঠিরের মতো সত্যবাদী, উপনিষদের ঋষিদের মতো সকলের মধ্যে আত্মদর্শী, আত্মার মধ্যে সর্বদর্শী। জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা তাঁর জীবনের অঙ্গীভূত হয়েছে।

গান্ধীজীর সত্যের পরীক্ষা কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে নিবদ্ধ নয়, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রসারিত। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রেই সে পরীক্ষা সব চেয়ে তাৎপর্যবান। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও অবিবেচনা থেকে আসে বিদ্রোহ ও পাল্টা বিদ্রোহ, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব, গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। যত অশান্তির উৎপত্তি হয় রাজনৈতিক আস্তাকুঁড়ে। সুতরাং রাজনৈতিক আস্তাকুঁড় সাফ করাও মহাধার্মিকের কাজ।

এ কাজ করতে গিয়েই যীশুর প্রাণ গেল, মহম্মদের প্রাণ যেতে বসেছিল। কিন্তু এ কাজ করবার যোগ্যতা সব মহাপুরুষের নেই। অনধিকার চর্চা করতে গিয়ে বহু মহাপুরুষ অপদস্থ হয়েছেন।

গান্ধীজীর রাজনৈতিক যোগ্যতা সম্বন্ধে আজ কারো সন্দেহ নেই,

একদিন সন্দেহ ছিল। ঠিক সরাজনৈঙ্কট মুহূর্তে তিনি যে ভাবে পলিসি নির্দেশ করেছেন, কোনো পেশাদার রাজনীতিবিদ তেমনটি পারতেন না। তিনি যদি কেবলমাত্র পলিটিসিয়ানও হতেন, তা হলেও নিছক পলিসির বিচারে অগ্রগণ্য হতেন। জাতীয় সংগ্রামের সেনাপতি হিসাবেও যদি তাঁকে বিচার করা হয়, তাহলেও দেখা যাবে তাঁর পরিচালনা নির্ভুল।

ইতিহাস তাঁকে প্রধানত বিচার করবে পরমাণুশক্তির চেয়ে আরো বড় শক্তির আবিষ্কারক-তথা প্রয়োগকর্তা রূপে। এমন শক্তির সন্ধান তিনি পেয়েছেন—যার পাল্টা নেই, সুতরাং পাল্টা বিদ্রোহ এ দেশে ঘটবে না, প্রতিবিপ্লবের পথ বন্ধ।

বিপ্লবী ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত ওয়াটারলুতে হেরে গেল, বিপ্লবী রাশিয়া যদিও স্টালিনগ্রাডে জিতে গেল, তবু শেষ পর্যন্ত আনবিক যুদ্ধে জয়ী হয় কিনা অনিশ্চিত। কিন্তু গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে অনায়াসেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, যতই বিলম্ব হবে, ততই কার্যসিদ্ধি হবে। কারণ, তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষের অন্তঃপরিবর্তন। অন্তঃ-পরিবর্তনের লক্ষণ আমরা দিকে দিকে প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু এখনো দিনের আলোর মত প্রত্যক্ষ নয়। এমনকি, ভোরের আলোর মতো পরিস্ফুটও নয়।

কিন্তু রাত শেষ হয়ে আসছে। কেউ জোর করে বলতে পারবে না আরো ক'ছর লাগবে অন্তঃপরিবর্তন জাজ্বল্যমান হতে। আরো ক'বার সত্যাগ্রহ করতে হবে। এ তো বারো ঘণ্টার রাত নয়, দুশ বছরের রাত। দুশো বছরের বেশীও বলতে পারি, কেননা গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ কেবল ব্রিটিশ রাজার বিরুদ্ধে নয়, স্বদেশী স্বার্থপরদের বিরুদ্ধেও। স্বদেশী স্বার্থান্বেষীরা হাজার বছর আগেও ছিল। দেশের সাধারণ লোক হাজার হাজার বছর ধরে সুদ মুনাফা ও খাজনা জুগিয়ে আসছে, তাদের রক্তে পুষ্ট হয়ে আসছে উপরের দিকের উপস্বত্বভুক শ্রেণী।

গান্ধীজী যদি এই শ্রেণীর রাজত্বকে স্বরাজ বলে ভুল করতেন,

তাহলে খদ্দরের বদলে মিলের কাপড়ের গুনগান করতেন। ইংরেজ চলে গেলে এই শ্রেণীর স্বরাজ হবে, এটা তিনি চান না বলেই তো কলকারখানা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে, শহরে বেশী লোক থাকবে না, উপস্বত্বভুক্দের সঙ্গে সংগ্রাম করার আগেই তারা সন্ধি করবে। ভূমি রাষ্ট্রের বকলমে প্রসার হবে, উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম উৎপাদকের হবে, উপস্বত্বভোজারা প্রথমদিকে ন্যাসী হবে, অবশেষে উৎপাদক হবে। টলস্টয়, থোরো ও রাস্কিন গান্ধীজীর গুরু। গান্ধীবাদের বারো আনাই এই তিনজনের মতবাদ। এঁরা না হলে গান্ধীজী হতেন না। গান্ধীজীকে বিশুদ্ধ ভারতীয় সাধক বলে ভাবা ভুল। তিনি একটি বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সাধনার ভারতীয় সাধক। কোয়েকাররাও সে সাধনায় তাঁর পূর্বগামী। ইংলাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর যৌবন কেটেছে। সেই সূত্রে তাঁর মতবাদ গড়ে উঠেছে। খাঁটি ভারতীয়রা তাঁকে কোনোদিন বুঝবে না।

* লেখকের 'স্থান কাল পাত্র' গ্রন্থ থেকে [illegible]

রচনাকাল—১৩৪৬ সাল।

'যাহারা মারে এবং মরে, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা কাহাকেও মারে না, অথচ মরিতে প্রস্তুত, তাহারাই পৃথিবীর ভূষণ'।

—মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীবাদ কি সচল ?

অধ্যাপক দিলীপ ঘোষরায়

জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির উৎস এক এবং অভিন্ন। অন্তরের একই স্রোতপ্রবাহ থেকে উৎসারিত হয়েছে হিংসা ও অহিংসা। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী থেকে হানাহানি, দ্বন্দ্ব, অসত্য ও হিংসাকে চিরতরে নাশ করে জীবনবীণায় সত্য সুন্দর ও প্রেমের ছন্দ তুলে ধরার জন্যই আবির্ভূত হয়েছিলেন গান্ধী। তাই তো কবিগুরু তাঁকে বরণ করলেন 'মহাত্মা' নামে। হিন্দুরা প্রণাম করল 'অবতার' ভেবে। ভোগ কোলাহলে মত্ত পাশ্চাত্যবাসী জানলো ভগবান যীশুর পরে অশান্তির দাবানল থেকে মানবের এমন মুক্তিদাতা আর আসেন নি! বেদ উপনিষদের ভারতাত্মার মহান বাণী রাজনীতির ক্লেদাক্ত পঙ্কিল পিচ্ছিল যাত্রা পথে আপন চরিত্রের রূপ, রস, গন্ধে গান্ধীর পূর্বে কেউ কখন সফল করতে প্রয়াসী হন নি ! সত্যের এই আলো, অহিংসার পূজারী চলে গেছেন ধূলার ধরণী ছেড়ে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, দিল্লী থেকে নিউইয়র্ক—সমস্ত জগদ্বাসী হলো আলো হারা। রেখে গেলেন শোক ও বেদনার চিরন্তন অন্ধকার। তাই তো ধ্বনিত হলো পণ্ডিত নেহেরুর কণ্ঠে :

"The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere···The best prayer we can offer him and his memory is to dedicate ourselves to truth and to the cause for which this great countryman of our lived and for which he died."

চিরস্মরণীয় হয়ে রইল গান্ধীর নাম। যুদ্ধ মুখর পৃথিবীর ইতিহাসে শান্তি ও অহিংসার পূজারী মহাত্মাজীর কীর্তি হয়ে থাকবে অমর! বহু প্রত্যাশা নিয়ে মনীষী রমা রলাঁ ভারতের এই মানব বেদীদের কাছে রাখলেন শাশ্বত আবেদন :

"O Tagore! O Gandhi! Rivers of India, who like the Indus and the Ganges, clasp within your double embrace the orient and occident—The latter a tragedy of heroic action, the former a vast dream of light—both streaming forth from the home of God, on this world filled by the plough-shares of Hate and Violence, scatter His seeds!"

ভারতে বৃটিশ শাসন অবসানের দীর্ঘদিন পরে মহাত্মাজীর কর্মময় জীবন ও গান্ধীবাদের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তি জীবনে তিনি সত্য ও অহিংসাকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনায়, চূড়ান্ত পর্যায়ে দেশ বিভাগ ও বৃটিশের ভারত ত্যাগ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে জাতির জনকের ভূমিকা পর্যায়ক্রমে আলোচনা সাপেক্ষ।

গান্ধী ছিলেন মুখ্যত ধর্মপরায়ণ। হিন্দুধর্ম, খৃষ্টধর্ম ও তলস্তয় বাদের মধ্যে তিনি সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। উনিশ ও বিশ শতকের পৃথিবীতে যখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা চলছে, গান্ধীজী তখন মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে আবির্ভূত হলেন। গান্ধী তাঁর আত্মচরিতের শেষ অধ্যায়ে লিখেছেন:

"To see the universal and all pervading spirit of Truth face to face one must be able to love the meanest of creation as oneself...That is why my devotion to Truth has drawn me into the field of politics; and I can say without the slightest hesitation, and yet in all humility, that those who say that religion has nothing to do with politics do not know what religion means."

ব্যক্তিজীবনের ন্যায় সত্য, ধর্মাচরণ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও অহিংসাকে

রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'সত্যাগ্রহের' সহিত সমন্বয় সাধনে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। গান্ধীর বহু বৎসর পূর্বে সম্রাট আকবর 'দীন-ইলাহি' ধর্মের প্রবর্তন করে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলা তথা ভারতের নব জাগরণের যুগে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ন্যায়, শিক্ষা, মানবধর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে ভাবজগতে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এই পূর্বসূরীরা যখন ধর্মান্ধতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারকে সামাজিক স্তর থেকে সমূলে বিনাশের জন্য আহ্বান জানান, গান্ধী তখন কোটি কোটি ভারতবাসীর নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, সামাজিক কুসংস্কার এবং বিশৃঙ্খলার আমূল সংস্কারে ব্রতী না হয়ে রাজনৈতিক নাটামঞ্চে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটালেন।

গান্ধীর ব্যক্তিজীবনের ধর্মপরায়ণতা ধনী জমিদারগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবাসীর মধ্যে যে অতুলনীয় মাদকতার সৃষ্টি করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। জন্ম হলো গান্ধীবাদের। বুদ্ধদেবের 'অহিংসা পরম ধর্ম' নতুন করে আত্মপ্রকাশ করলো সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে। সত্যাগ্রহের রাজনৈতিক কর্মসূচী হলো (ক) শান্তিপূর্ণ অসহযোগ, (খ) বিলাতী পণ্য বর্জন, (গ) আইন অমান্য আন্দোলন,(ঘ) বিদেশী শাসককে কর প্রদানে অস্বীকৃতি এবং (ঙ) অনশন ধর্মঘট। গান্ধীর স্পর্শে এই আপাতমধুর যাদুমন্ত্রগুলো একদিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে ভারতবাসীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীশোষণের পথকে দিয়েছে প্রশস্ত করে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনকে গান্ধীজী উগ্রপন্থী, সন্ত্রাসবাদী এবং দেশের শত্রু আখ্যা দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে এদের অবদানকে ছোট করে দেখিয়েছেন। গান্ধী রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হবার প্রায় চল্লিশ বছর পূর্ব থেকেই বাংলা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য স্থানে বিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। পৃথিবীর সব দেশে সহিংস আন্দোলনকে দেশপ্রেম বলেই আখ্যাত করা হয়েছে।

"Violence is the recognised way in England of gaining political reforms. There would be no Home Rule Bill if landlords had not been shot—no Reform Bill of 1832 without riot and bloodshed." [Mrs. Annie Besant.]

যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত দাসত্বের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে বৈপ্লবিক চেতনার স্পর্শ দিতে পেরেছিল একমাত্র বিপ্লবীরা। বিদেশী শাসকের অবিরাম বিরক্তি উৎপাদন করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে মাঝে মাঝে বিপন্ন করা বিপ্লবীদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। বারীন ঘোষ সত্যই বলেছেন:

"We did not mean or expect to liberate our country by killing a few English men. We wanted to show people how to dare and die."

প্রকৃত পক্ষে একদিকে বিপ্লবীদের অদম্য চেতনা, অপর দিকে তিলক, দেশবন্ধু, সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিন পাল প্রমুখের চেষ্টায় তৈরি কংগ্রেসের বুনিয়াদ হাতে না পেলে গান্ধীর এতটুকু অবদানও সম্ভব হতো না। একজন ইংরেজ হত্যা করায় লয়েড জর্জ, এমনকি বিশ্বের সেরা রাজনীতিবিদদের অন্যতম চার্চিল পর্যন্ত মদনলাল ধিংড়ার দেশপ্রেমিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। W. S. Blunt-এর ভাষায় —"**When Modanlal Dhingra shot dead Sir curzon wyllie in 1909, Loyd George expressed highest admiration of his patriotism and Churchill shared the view**···**My experience is that when England has her face well slapped, she apologises, not before." (My Diaries, part III P. 288)**

কিন্তু এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করার মত মহানুভবতা মহাত্মাজী দেখাতে পারেন নি। কানাইলাল ঘোষ 'শরৎচন্দ্র' সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে গান্ধীর দেশপ্রেমিকতার নতুন একটি দিক তুলে ধরেছেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তখন বি. পি. সি. সি'র প্রেসিডেন্ট। শ্যামসুন্দরবাবু

চরকা কাটছিলেন। কথায় কথায় গান্ধীজী শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন : **"But why don't you believe that the attainment of Swaraj will we helped by spinning?"**

শরৎচন্দ্র হেসে বলেন : **"I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers and not by spiders."**

একই দিনে দেশবন্ধুর বাড়ীতে আলোচনা হচ্ছিল। অন্যান্যদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন। সন্ত্রাসবাদীদের প্রসঙ্গ গান্ধীজীই তুললেন। শরৎচন্দ্র এবার প্রশ্ন করলেন—"আপনার মতে তা হ'লে অহিংসাই একমাত্র অস্ত্র?"

উত্তেজিত হয়ে জোর গলায় গান্ধী বললেন : "সে বিষয়ে দ্বিমত আমার নেই।...সশস্ত্র বিপ্লবে যারা বিশ্বাসী, তারা ভ্রান্ত—আর যারা সন্ত্রাসবাদী, তারা দেশের শত্রু।"

সেদিন বাংলাদেশের এই কথাসাহিত্যিক যে বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছিলেন, রাষ্ট্রীয় পদকপ্রার্থী রাজানুগত অনেক লেখকই আজ তা দেখাতে পারেন না। শরৎচন্দ্র বলেন—"জানেন, জীবনে বাঁধন ছিঁড়তে হলে বিপ্লবের প্রয়োজন—নইলে মুক্তি সহজে আসেনা। আপনার বক্তব্যের পিছনে হয়ত যুক্তি আছে, কিন্তু তাদের শত্রু বলে অপবাদ দেবেন না—সে অধিকার আপনার নেই।"

গান্ধীজীর কথায় এরকম উত্তর কেউ দিতে পারেন—এ ধারণা কারোর ছিল না। স্বয়ং গান্ধীজীরও না। গান্ধীজী আরো কঠিন হলেন! "...যা গর্হিত তার নিন্দা করতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করিনে। যারা দেশের অগ্রগতি রোধ করে, তাদের শত্রু ছাড়া অন্য কিছু কি ভাবা সম্ভব কোন দিন?" [উৎস : ঐ পৃঃ ২৪১-৪২]

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন : "অগ্রগতি রোধ বলতে আপনি কি বোঝেন? শত্রু শব্দের অর্থই বা কি?...মতবিরোধই যদি শত্রুতা বোঝায়, তা হ'লে যদি কেউ আপনাকেও শত্রু বলে আখ্যা দেয়, আপনার ব্যক্তিগত আপত্তি থাকা উচিত নয় কি!...বিপ্লবী অর্থে এই সন্ত্রাসবাদী (এনার্কিষ্ট) দলকে...আমি...শ্রদ্ধা করি—কারণ তারাও

দেশকে ভালবাসে। ভালবাসে বলেই ত' জীবনের সব চেয়ে যা কিছু প্রিয়, সবই উৎসর্গ করে দেয় বুলেটের সামনে !....এই যে এঁদের ত্যাগ, এই যে এঁদের আদর্শ—এটা হয়ত আপনার মতে ভ্রান্ত হতে পারে—কিন্তু দেশের শত্রু এঁরা হ'ল কেমন করে ?" [উৎস : ঐ পৃঃ ২৪৩]

যাহোক, মহাত্মাজী সেদিন শরৎচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। নিজের কথা তুলে নিতে বাধ্য হলেন। দেশবন্ধু আর নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে শরৎচন্দ্রের হাত দুটো চেপে ধরে আস্তে আস্তে বললেন: "সত্যই আজ কাজের মত একটা কাজ করলেন বটে শরৎবাবু! বাংলা দেশের ইজ্জত বাঁচিয়ে দিলেন আপনি।" এ ঘটনা থেকে গান্ধী-মানসের ওপর যে নতুন আলোক সম্পাত ঘটেছে—আশা করি সে বিষয়ে কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন নেই।

গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনের শুভ উদ্বোধন দক্ষিণ-আফ্রিকায়। বর্ণ-বৈষম্য দূর করবার জন্য গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু এতে কি সমস্যার সমাধান হয়েছে? সত্যাগ্রহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে 'যুরোপীয় রেলওয়ে কর্মীরা' ধর্মঘট ঘোষণা করে গান্ধীকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করেন। গান্ধীজী এই অনুরোধে সাড়া না দিয়ে তৎক্ষণাৎ ধর্মঘট বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। কারণ সরকারকে বিব্রত করতে তিনি চান নি।

"As they had no desire to harass the Government by exploitinig difficulties unrelated to the struggle"— [Mahatma Gandhi by Polak, Brailsford and Lawrence. P-90

তারপর এলো বুয়োর ও জুলু যুদ্ধ। গান্ধীজী তো যুদ্ধের বিরোধিতা করেন নি। দক্ষিণ আফ্রিকাতে তিনি তলস্তয়ের আদর্শে ফার্ম স্থাপন করলেন। গান্ধীজী আত্মচরিতে লিখেছেন—"নিজের জন্য প্রত্যেক মানুষেরই (শ্রম) মজুরী করা উচিত, শরীরকে খাটাইয়া খাটাইয়া ক্লিষ্ট করা উচিত, ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম। এই কথাটিকে

তলস্তয় নিজের করিয়া লইয়াছিলেন। আমি এই কথা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাই।" নিজের মতবাদ ও কর্তব্যের প্রতি গান্ধীর ঐকান্তিকতার তুলনা হয় না! তবে তলস্তয়ের সাহিত্য-সৃষ্টি তাঁকে অমর করেছে। তিনি জমিদারীপ্রথা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী ছিলেন। চার্চ ও রাষ্ট্রের ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে তিনি করেন আপোষহীন সংগ্রাম। গান্ধীজী শুধু ধর্মগুরু তলস্তয়কেই চিনেছিলেন।

গান্ধী কিভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহীদের আসল দাবি-গুলোকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেন এবং শুধুমাত্র **India Relief Bill**-এর প্রভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের সুবিধা করে দেন তা ১৯০৬ সালের ৩০শে জুন **Smutts** সাহেবকে লিখিত পত্রাংশ থেকে সহজেই প্রমাণিত হয়ঃ

"As you are aware, some of my countrymen have wished me to go further. They are dissatisfied that the Trade Licence Laws of different Provinces, the Transvaal Gold Law, the Transvaal Township Act and the Transvaal Laws 3 of 1885 have not been altered so as to give them full rights of residence, trade and ownership of land. Some of them are dissatisfied that full Inter-Provincial migration is not permitted...They have asked me that all above matters might be included in the Satyagraha struggle. I have been unable to comply with their wishes." [Ibid P. 93]

দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনে তিনি যে রকম ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন তার ফলস্বরূপ আজও সেখানকার কোণঠাসা নীতি (**Aparthied**) অবাধে চলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃতিত্বের জন্য ১৯১৫ সালে ভারতের বৃটিশ সরকার গান্ধীকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়। **"For his services in South Africa, Lord Hardinge, the Viceroy conferred on this rebel and**

jail-bird the Kaisar-i-Hind gold medal." [Ibid P. 96]

এই স্বর্ণপদক গান্ধীজী গ্রহণ করেছিলেন সানন্দে।

এবার এলো প্রথম মহাযুদ্ধের পালা। গান্ধীজী বৃটিশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করলেন। তাঁরই ভাষায়—তিনি ছিলেন বৃটিশ সরকারের 'সমান অংশীদার'—'প্রজাশ্রেণীর' অন্তর্ভুক্ত হতে তিনি চান নি। ভারতের বিপ্লবী শক্তিকে খর্ব করবার জন্য তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। তিনি তাঁর জীবনের মহান অভিজ্ঞতা থেকে বাণী দান করলেন: "প্রতিপক্ষের আঘাত যতই তীব্র হউক না কেন, তাহার জবাবে জনসাধারণের কিছুতেই বলপ্রয়োগ করা উচিত নয়।" [C. F. Andrews: views of Mahatma Gandhi 1929—P. 285]

অথচ অহিংসার পূজারী গান্ধীই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধমুখর শক্তিগুলোকে সহযোগিতা করবার জন্য দেশবাসীকে জানান কণ্ঠকণ্ঠে আহ্বান! কারণ, তাঁর মতে ভারতে বৃটিশ শাসন ভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু অসহনীয় নয় (not intolerable)। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন বৃটিশকে সহানুভূতির সংগে সাহায্য করলে ভারতীয়দের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। গান্ধী বললেন:

"If we would improve our status through the help and co-operation of the British, it was our duty to win their help by standing by them in their hour of need." [Polak, Brailsford, lawrence—P. 97]

যুদ্ধে যোগদানের গুরুত্বকে গান্ধী অস্ত্রচালনা শিক্ষা করার সুবর্ণ সুযোগ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।...'If we want the Arms Act to be repealed, if we want to learn the use of arms here is a golden opportunity." (Ibid, P. 125) জুলুদের সংগে দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ এবং প্রথম মহাযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে গান্ধী কি শুধুমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক

অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন? এমনকি গান্ধীভক্ত বিদেশী লেখক ব্রেইলসফোর্ডও বলতে বাধ্য হয়েছেন:

"This was not a farsighted calculation; nor did Gandhi in any of these three cases pay much attention to the merits of the British case." স্বাধীনতা প্রিয় ইংরেজরাও আশ্চর্য হলেন: **"How was it possible for a man avowed to ahimsa to further violence by enlisting combatant troops?"**

এ ছাড়া লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের তিনি "সাম্রাজ্য রক্ষা সম্বন্ধে" "তাহাদের কর্তব্য পালনে" ব্রতী হতে উপদেশ দেন। [**R. P. Dutt: India Today**]

১৯১৯ সালের অমৃতসর কংগ্রেস প্রথম গান্ধী কংগ্রেস। এই সম্মেলনের কিছু পূর্বেই জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। "পাঞ্জাব সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল।...যে দুই চারিজন ব্যক্তি সেই নরক হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহারা এত ভীত বিহ্বল যে কোন ঘটনারই পরিষ্কার বিবরণ দিতে পারিল না।" (নেহরু আত্মচরিত,-P. 46) **"Aircrafts were used both to drop bombs and to fire on groups of peasants."**

এই পাশবিক ও নারকীয় বীভৎসতার পর পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জনতা 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধ্বনি দিয়ে বহু প্রত্যাশা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী কি করলেন? গান্ধী "মণ্টেগু চেমস ফোর্ড সংস্কার" আইনের পক্ষে প্রস্তাব রাখলেন। যদিও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিরোধিতায় উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়নি, তবুও গান্ধী দেশবন্ধুর প্রস্তাবের যে সংশোধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাতে গান্ধীবাদের মর্যাদা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। "তাঁর কথা হলো পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার যথাসম্ভব শীঘ্র পেতে হবে, তবে, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড ভারত

সংস্কার আইনকেও যথাসম্ভব কার্যে প্রয়োগ করতে হবে।····মণ্টেগু সাহেব যে ভারত সংস্কার আইন পাশ করিয়েছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদও জানাতে হবে।" [বিংশ শতাব্দী পৃঃ ৫৮২, ১৩৬৭।]

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি ত্যাগ করায় সমগ্র পৃথিবীতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করে কয়েকজন যে প্রস্তাব করেছিলেন, সভাপতি কি সেই প্রস্তাব উত্থাপন করতে দিয়েছিলেন? বলাবাহুল্য কবিগুরুর 'মহাত্মা' তখন এই কংগ্রেসে উপস্থিত থেকে শুধু যে কংগ্রেসের গৌরবকে অলঙ্কৃত করেছিলেন তা নয়, 'সত্য ধর্ম অহিংসা মণ্ডিত' গান্ধীবাদের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পাঞ্জাবে ও গুজরাটে ভারতীয়রা বৃটিশদের যে ভাবে আক্রমণ করেছে, তার নিন্দাসূচক প্রস্তাবটি জাতির জনকের কাছ থেকেই এসেছিল। অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও এ ধরনের একটি আশ্চর্যজনক প্রস্তাবও পাশ হয়ে গেল। [ডক্টর পট্টভি সীতারামাইয়া, 'কংগ্রেসের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড।]

"১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরে গান্ধী পরিচালিত 'সত্যাগ্রহ কমিটি' সকল দেশ প্রেমিককে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য ইংরেজ সরকারের সহিত তাদের মহান নায়কের (গান্ধীর) সহযোগিতার মহৎ আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দেয়"

[J. Beacham : British Imperialism in India, P. 175.]

বৃটিশ সরকারকে এভাবে সাড়াদায়ক সহযোগিতা (**responsive co-operation**) করবার জন্য ইংরেজ লেখকরা যথার্থই বলছেন : **"In the last days of 1919, he was still a loyalist, still a disciple of his master Gokhale."** [Polak, Brailsford, Lawrence, P. 130]।

এ ছাড়া ১৯২১ ও ১৯২২ সালের কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন স্বয়ং গান্ধীজীই। এবার এলো অসহযোগ

আন্দোলন। গান্ধীজী আমেরিকার পতাকাতলে দাস-প্রথা বিরোধী THOREAU এবং আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতা SINN FEIN-এর মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে অসহযোগের প্রবর্তন করলেন। সরকারী খেতাব বর্জন, সরকারী অনুষ্ঠানে যোগদান না করা, ধীরে ধীরে সরকারী স্কুল কলেজ থেকে ছাত্র প্রত্যাহার করে জাতীয় শিক্ষায়তন গড়ে তোলা, বৃটিশের বিচার ব্যবস্থা বয়কট, মেসোপটেমিয়ায় সৈন্যদল পাঠাতে অস্বীকৃতি, মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন থেকে প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার এবং বিলাতী পণ্য বর্জন প্রভৃতি বিষয়গুলো অসহযোগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বলাবাহুল্য আন্দোলনের বীজমন্ত্র ছিল অহিংসা। গান্ধীজীর ভাষায়:

"When a person claims to be non-violent, he is expected not to be angry with one who has injured him. He will not wish him harm, he will wish him well; he will cause him no physical hurt. Thus non-violence is complete innocence,"

[Quoted by Dr. R. C. Majumder, India's Struggle for freedom, P. 54.]

তা হলে গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্রের সারমর্ম হচ্ছে অহিংস বিরোধী পক্ষের শুভ কামনা করা। আঘাতকারীর অনিষ্ট কামনা করলে সম্পূর্ণ নির্দোষ অহিংসাকারী হওয়া সম্ভব নয়।

গান্ধীজী কোন্ প্রতিপক্ষের শুভ কামনা করেছিলেন? এত মহান বাণী রামকৃষ্ণদেবও দিতে সাহস করেন নি। গান্ধীর মত প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোনো শিক্ষাই তাঁর ছিল না। ধর্মতত্ত্ব ছাড়া আর কোথাও প্রবেশ করতে যিনি চাননি, সেই রামকৃষ্ণও বলেছেন— 'অপরে প্রহার করতে এলে তুই অন্তত ফোঁস ফোঁস করবি'। এই রূপকের ধর্মীয় বক্তব্যের ওপর জোর না দিয়ে সহজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আরোপ করতে অনুরোধ করছি পাঠককে। তাই ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে তিলকপন্থী খাপার্দে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন:

"It seeks to direct the energies of congress into directions of attaining soul-force and moral excellence, and loses sight of the political aspects of affairs." "He criticised him for a tendency" to "autocracy and personnel rule." [Polak, Brailsford, Lawrence. P. 138]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি, ১৯১৮ সালে গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার চেষ্টা করেন। মুসলমানগণ এক সংগে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। প্রথম দিকে হিন্দু মুসলমান ঐক্য স্থাপনের জন্য গান্ধীর আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন :

"His anxiety for Hindu-Muslim unity deserves all praise, but it was a sentimental approach to the problem and was not based on the realistic appreciation of the situation."

অসহযোগের ঢেউ অনেক পূর্বেই ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার ঘরে ঘরে। দেশবন্ধু বললেন, "আমি দেহে লৌহ শৃঙ্খল ভার এবং মনিবন্ধে হাতকড়ির স্পর্শ অনুভব করিতেছি।...সমস্ত ভারতবর্ষই বৃহৎ কারাগার।"

গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মনৈপুণ্যের জন্য পাওয়া 'কাইজার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদকটি ত্যাগ করেই ক্ষান্ত হলেন না, ১৯২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী সরকারকে একটি চরম পত্র দিয়ে বসলেন। দিকে দিকে জ্বলে উঠলো আগুন। সারা ভারত জুড়ে প্রায় ত্রিশ হাজার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হলো। ৫ঠা ফেব্রুয়ারী উত্তর প্রদেশের চৌরি চৌরায় নির্যাতিত গ্রামবাসীরা উত্তেজিত হয়ে কয়েকজন পুলিশকে জীবন্ত দগ্ধ করে। অহিংস আন্দোলনে সহিংসতার এতটুকু স্পর্শ পাওয়া মাত্রই গান্ধীজী বরদৌলিতে আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। নেতাজী বলেছেন: "The Dictator's decree was obeyed at the

time but there was a regular revolt in the congress camp."

গান্ধীজী সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। হঠাৎ আন্দোলন স্থগিত রাখার ফল হলো ভয়াবহ। হিন্দু মুসলমানের যে মিলন এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব হয়েছিল তা ধুলিসাৎ হয়ে গেল। পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বাস চিরতরে নষ্ট হলো। আন্দোলন বন্ধ করার জন্য গান্ধী পাঁচ দিনের অনশন ও করলেন। বলা বাহুল্য জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে মহাত্মাজীকে এত বিহ্বল হতে দেখা যায় নি। গান্ধীর এই ভূমিকায় দেশবন্ধু কতটা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন'তা নেতাজীর The Indian struggle এর Anti-climax অধ্যায়ে ভালভাবেই প্রকাশিত হয়েছে :

"I was with the Deshabandhu and I could see that he was beside himself with anger and sorrow at the way Mahatma Gandhi was repeatedly bungling." [Part II, P. 108]

দুঃখে ও ক্রোধে লালা লাজপত রায় গান্ধীকে সত্তর পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ পত্র পাঠালেন জেল থেকে। সকলে বিচলিত হলেও আন্দোলনের পতাকাবাহক মহামানব রইলেন অবিচল। এমন কি স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য স্বাভাবিক সৌজন্যবোধটুকুও হারালেন। প্রত্যেকের আবেদন-নিবেদনকে প্রত্যাহার করলেন। পোলক-ব্রেইলসফোর্ড ও লরেন্স-এর বই থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি না দিয়ে পারছি না।

From behind the bars of their prisons, Motilal Nehru and Lajpat Rai sent long letters of remonstrance to the Mahatma, which he dismissed with the tactless comment that as prisoners they were "Civilly dead" and were not entitled to express an opinion……Even Jawharlal Nehru admits that

"Gandhi's action brought about a certain demoralization." [Mahatma Gandhi, P. 153]

যিনি সত্য ও ন্যায়নীতি ছাড়া জীবনে কিছুই জানতেন না, তাঁর এই ভূমিকার কথা যুক্তির সংগে বিবেচ্য বিষয়। ঐতিহাসিক ডক্টর মজুমদার বলছেন, "Gandhi, the politician, hopelessly blundered. He sounded the order of retreat just when the public enthusiasm had reached the heating point." [India's struggle for Freedom. P. 58]

১৯২৪ সালে গান্ধীজীর সভাপতিত্বে বেলগাঁও কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের মহান্ বিপ্লবী নেতা লেনিনের মৃত্যুতে একটি শোক প্রস্তাব করার চেষ্টা করা হলে তিনি তা উত্থাপন করতে দেন নি। লেনিন উপদ্রবে বিশ্বাসী ছিলেন—এই ছিল তাঁর যুক্তি। ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। গান্ধী মাদ্রাজে উপস্থিত থেকেও উক্ত অধিবেশনে যোগ দেন নি। Young India-তে একটি প্রবন্ধ লিখে স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসীদের কড়া ধমক দিলেন :

"The Congress stultifies it self by repeating year after year resolutions of this character, when it knows that it is not capable of carrying them into effect." [Polak, Brailsford, Lawrence—P. 167]

বিদেশী শাসকদের মর্যাদা রক্ষার জন্য গান্ধীর ভাবনার অন্ত ছিল না। নেতাজীর এই লাইনটিতে তা পরিষ্কার ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে : "There was considerable excitement over a clause in the resolution moved by the Mahatma, which congratulated the Viceroy on his providencial escape when his train was bombed." [The Indian Struggle Vol II, P. 243]

১৯২৮—২৯ সালে এমন শ্রমিক অসন্তোষ ছিল, আন্দোলন সুরু করলে তার প্রকৃতি ভিন্নতর ও ব্যাপকতর হতে পারতো।

অথচ উপরোক্ত প্রস্তাব ও বাপুজীর সম্মানার্থে পাশ হয়ে গেছে। নেতাজী তাঁর বইটিতে আর একটি বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সবচেয়ে হাস্যস্পদ ব্যাপার যে, জনসাধারণের সেবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নেতারা শুধু মাঝে মাঝে বাস্তববুদ্ধি হারাবার ভান করেন তা নয়, সাধারণ জ্ঞানের পরিচয়টুকুও দিতে পারেন না। ওয়ার্কিং কমিটির আগামী বছরের নির্বাচনের সময়ে গান্ধীজী নিজেই পনের জনের নাম পেশ করলেন। এবং শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থীদের বাদ দিলেন। তিনি প্রকাশ্যেই বললেন,—কংগ্রেস হবে এক মন ও একই মতাদর্শের সংগঠন। ক্যাবিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার জন্য গান্ধী জয়ী হলেন। বাইরে জনমত ঠাণ্ডা করবার মত অস্ত্র তাঁর ছিলো। কারণে অকারণে কংগ্রেস ছেড়ে দেবার ভয় দেখাতেন বা আমরণ অনশন করতেন।

"....Whenever any opposition raised outside his cabinet, he could always coerce the public by threatening to retire from the Congress or to fast unto death." [The Indian Struggle, Subhas Chandra Bose. P. 245]

এর পরে কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজীর চেষ্টা পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

১৯৩০ সাল থেকে আবার চলল আইন অমান্য আন্দোলন—ডাণ্ডি অভিযান—লবণ আন্দোলন। এসব আন্দোলন জনগণের মধ্যে অপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল সত্য। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের প্রশ্নে হঠাৎ আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। ১৯৩০সালের ২রা মার্চ গান্ধী বড়লাটকে লিখলেন: "আমার উদ্দেশ্য...ক্রমবর্ধমান সহিংস সংগ্রামকারীদের সংগঠিত সহিংস শক্তির বিরুদ্ধে আমার আন্তরিক শক্তিকে (অহিংসাকে) পরিচালিত করা।" সেদিন জওহরলাল নেহরু জাতির কণ্ঠস্বরকে যথার্থই প্রতিধ্বনিত করেছিলেন:

"I felt annoyed with him for choosing a side issue for the final sacrifice···After so much sacrifice and brave endeavour was our movement to tail off into something insignificant? I felt angry with him at his religious and sentimental approach to a political question, and his frequent references to God in connection with it" [Nehru on Gandhi, P. 72; Towards Freedom, 236—9]

এই বছরেই পেশোয়ারের জনগণের বিদ্রোহদমন করবার জন্য ঠাকুর চন্দ্রমা সিং গাড়োয়ালকে পাঠানো হয়। সৈন্যগণ জনসাধারণের ওপর গুলি করতে অস্বীকার করে জনতার হাতে রাইফেল তুলে দিলো। স্বয়ং গান্ধীজী বৃটিশ সরকারের বিরোধিতা করায় এদের শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। অপরাধীদের দীর্ঘ কারাদণ্ডে এতটুকু প্রতিবাদও করলেন না। গান্ধী ক্রমশ গণ-আইন অমান্য থেকে "প্রতিনিধিত্বমূলক" আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হলেন।

১৯৩৭ সালে জিন্না হিন্দু-মুসলমানের কোয়ালিশন সরকার গড়তে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন। মুসলিম লীগ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কোয়ালিশন সরকার গঠন করবেন না বলে জানিয়ে দেন। গান্ধীজী কি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন? নির্বাচনের পর কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হক বাংলাদেশে কংগ্রেসের সংগে কোয়ালিশ মন্ত্রিসভা গঠনের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। প্রথমে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্নে মতপার্থক্য থাকলেও পরে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলো, অথচ কংগ্রেস হাইকমাণ্ড বাংলা কংগ্রেসকে হক সাহেবের সংগে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা করতে অনুমতি দেন নি। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্রের সংগে মহাত্মাজী ও অন্যান্যদের গুরুতর মতপার্থক্য ঘটেছিল। যে নলিনী রঞ্জন সরকারকে দলবিরোধী কার্যের জন্য বিশ বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করা হয়, তিনিই প্রখ্যাত পুঁজিপতি জি. ডি. বিড়লাকে

সংগে নিয়ে কোয়ালিশন সম্পর্কে গান্ধীজীর সংগে আলোচনা করেছিলেন। [Hindusthan Standard-এর বিশেষ সংবাদদাতা, নেপাল মজুমদার, "ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ" পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫]। কারো কারো ধারণা, মহাত্মাজীর কোয়ালিশন বিরোধী সিদ্ধান্তের উপর উপরোক্তদের অদৃশ্য প্রভাব ছিল।

জিন্নার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও মহাত্মাজী আলোচনার দ্বার রুদ্ধ করে দেন। পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের আর কোনো রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ রইলো না। তাই গান্ধীর চরমপন্থা (অনমনীয়তা) এমন সঙ্কেত বহন করে নিয়ে এলো, যাতে পাকিস্তানের জন্ম অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো।

গান্ধী তাঁর সমর্থক গোষ্ঠীদের নিয়ে ১৯৩১ সালে লর্ড আরউইনের সংগে চুক্তি করতে সমর্থ হন, যার ফলে তিনি গোল টেবিল বৈঠকের একমাত্র প্রতিনিধি হতে পেরেছিলেন। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী সংকট (Tripuri crisis) উপস্থিত হলো। গান্ধীবাদী সনাতন পন্থী ও সুভাষবাদী মধ্যপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলো। নেতাজী সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া প্রায় সংগে সংগেই বিজয়ীকে অভিনন্দন জানান। অথচ ১৯৩৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী গান্ধীজী বরদৌলি থেকে তাঁর ঐতিহাসিক বিবৃতিটি প্রচার করেন :

"আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, গোড়া হইতে আমি তাঁহার (সুভাষ চন্দ্রের) পুনর্নির্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম। মৌলানা সাহেব তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিবার পর আমার চেষ্টাতেই ডঃ পট্টভি নির্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই। অতএব এই পরাজয় তাঁহার অপেক্ষা আমারই অধিক।....কংগ্রেসের খাতার মধ্যে বহু সংখ্যক ভুয়া সদস্যের নাম রহিয়াছে ....এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, এই সকল ভুয়া ভোটারের ভোটে নির্বাচিত বহু সদস্যই পরীক্ষার ফলে অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন।...হাজার হোক, সুভাষ বাবুতো আর

দেশের শত্রু নন।...তাঁহার কার্যক্রম এবং নীতিকেই তিনি সর্বাপেক্ষা প্রগতিমূলক মনে করেন।..."

[আনন্দবাজার পত্রিকা ১।২।৩৯, নেপাল মজুমদার কর্তৃক উদ্ধৃত, ঐ, ৫ম খণ্ড, ২৩৫ পৃ।]

এই দুঃখ, ক্রোধ ও খেদোক্তি মহাত্মাজীর মনোভাবের নতুন একটি প্রশস্তিকা মাত্র। **"Of all the participants only Gandhi had a clear and consistent objective to oust Bose. This he did in the end." [Breacher, Quoted by Tole kemp—university of Hull, England, Science and Society, 1964]**

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে গেল। ১৯৪০ সালে ২৯শে জুন বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সংগে গান্ধীর সাক্ষাৎ হল। গান্ধী হরিজন কাগজে লিখলেন—অবিলম্বে স্বাধীনতা চাই, যারা সশস্ত্র সংগ্রাম চায় তারা বহিষ্কৃত হবে, তাছাড়া ভাইস্ রয়ের কাউন্সিল বর্ধিত করবার প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে হবে। পুনরায় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য হবার সুবর্ণ সুযোগ হারানো যায় না। তাই ১৯৪০ সালের ৭ই জুলাই প্রস্তাব পাশ হলো দিল্লীতে—

"The working committee declare that if these measures are adopted, it will enable the congress to throw in its full weight in the efforts for the effectve organization of the country." [Polak, Brailsford, Lawrence, P. 233].

ভাইসরয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় আবার আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। আসলে গান্ধী বৃটিশ সরকারের অসুবিধাকে নিজের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে চান নি। অর্থাৎ, সরকারের বিরক্তি উৎপাদন করলে তা অহিংসার পরিপন্থী হবে। **"He was not out to cause embarassment to the Government"**

(উৎস, ঐ পৃঃ 237)। নিজের দেশবাসীকে হিংসা থেকে নিবৃত্ত করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের হিংসায় পরোক্ষভাবে সমর্থন জানাতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন—"**Of course it would be different if we had resorted to armed rebellion. Then the saying that "Their difficulty becomes our opportunity would apply"** [উৎস : ঐ, পৃঃ 238]

প্রকৃতপক্ষে আলোচনা, আপোষ ও অন্যায়কারীদের সংগে সন্ধি করে কোন প্রকারে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই ছিল গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই চুক্তি ও সন্ধির ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবার জন্যই জনতার আন্দোলনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। গান্ধীজীর আন্দোলন পরিচালনায় পূর্ণ ঐকান্তিকতা থাকা সত্বেও কেন তিনি বারবার ব্যর্থতার বরমাল্য লাভ করেছেন তা দেশবন্ধুর উক্তিতে সুন্দর ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে :

"The Mahatma opens campaign in brilliant fashion, he works it up with unerring skill, he moves from success to success till reaches the zenith of his campaign,—but after that he loses his nerve and begin to falter." [Quoted by Dr. R. C. Majumder, India's struggle for Freedom, P. 59]

পর্যায়ক্রমে গান্ধীর প্রত্যেকটি আন্দোলন ব্যর্থতার ফলে কি গান্ধীবাদের ভ্রান্ততা ও অসারতাই প্রমাণিত হয় না ?

একটু গভীর ভাবে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই ব্যর্থতার মূলে ছিল পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ। তাছাড়া ধর্মান্ধতা তাঁকে অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারের দিকে নিয়ে যায়। নিজেকে তিনি ভগবানের দূত বলে প্রচার করতে পেরেছিলেন। রাজনীতি, ইতিহাস ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলো অলৌকিকতা নিরপেক্ষ। অলৌকিকতা, ভেল্কিবাজি বা ধর্মান্ধতার স্থান রাজনীতিতে থাকা উচিত নয়। গান্ধীর

অসামান্য অলৌকিক ক্ষমতার কথা ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই ব্যক্ত করেছেন :

"Gandhi was always capable of working himself up to a Messianic zeal, as an instrument of God; and in such cases Messianic zeal is known to be harnessed to a desire to work as miracles." [India's Struggle for Feedom, P. 49]

কোনোরকম যুক্তি এবং প্রতিভা না থাকলেও গান্ধীর ঐশ্বরিক ক্ষমতার জন্য ডক্টর সীতারামাইয়া গর্ববোধ করেছেন : "He saw things as if by a flash and framed his conduct by impulse. To the righteous man, these two are the supreme guides of life, not reason nor intellect." [History of Congress I, P.378]

তবে কি গান্ধীজীর কোনো ক্ষমতাই ছিল না? গান্ধীজী তাঁর সাদাসিধা বেশভূষা ও ব্যক্তিজীবনে ধর্মাচরণের মাধ্যমে হাজার হাজার ভারতবাসীর মন জয় করে করেছিলেন। তা ছাড়া তাঁর অপরিসীম ব্যক্তিত্বে বড় বড় নেতারাও আকৃষ্ট হয়েছিলেন—একথা স্বীকার করতেই হবে। "It is the credit of Gandhi — perhaps unique in the World's history that he could exploit the spirit of devotion and complete self-surrender, usually reserved for a spiritual guru, for political purposes." [India's struggle for Freedom, P. 56]

গান্ধীজী যে নিজের মতবাদ সম্বন্ধে নিজেই পরিষ্কার ছিলেন না এবং তাঁর ভবিষ্যৎ লক্ষ্য বলেও যে কিছু ছিল না—এ কথা পণ্ডিত নেহরুও স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছে জহরলাল আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

["In spite of the closest association with him (Gandhi) for many years, I am not clear in my

own mind about his objective. I doubt if he is clear himself. One step is enongh for me, he says ; and he does not try to peep into future or to have a clearly conceived end before him."...Personality is an indefinable thing, a strange force that has power over the souls of men, and he possesses this in an ample measure...[Nehrn on Gandhi, P. 64, 90-91, Toward Feedom, 186-7]

এই ব্যক্তিত্ব—যার কোনো সার্থক ও বাস্তব সংজ্ঞা নেহরু দিতে পারেন নি—তাই দেশের পক্ষে হয়েছিল কাল। কারণ "হিংস্র আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করবার অসার্থক প্রয়াস হ'ল ব্যক্তিত্ব"।

গান্ধীজী কি প্রকৃতই দরিদ্রপরায়ণ ছিলেন ? ব্যক্তিজীবনে ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর সমস্ত শক্তির উৎস ছিল ধনী শিল্পপতি ও জমিদার গোষ্ঠী। গান্ধীর মহাত্মায়ানাও রক্ষা করতে হতো এদেরই।

"It was his money milking of the rich evoked Mrs. Naidu's famous Quip, "It costs a lot of money to keep Gandbi poor." One Textile millionaire, G. D. Birla supported the ashram with its hospital and dairy, after 1935 at a cost approximately $17,000 a year" [L. Fisheer, Gandhi : His life and Message for the world : Mentored, Newyork, 1960]

অথচ এই বিড়লা ট্রাষ্টিতে শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অসহনীয়। আড়াইশ' মানুষ ব্যবহার করতো একটি মাত্র পায়খানা। মাত্র একটি নলকূপ থেকে সকলের তৃষ্ণা মিটতো। সাধারণ শ্রমিক বস্তিতে অন্ততঃ ইটের মেঝে বা কাচা নর্দমাটুকু ছিল। অথচ বিড়লার মিলে যে সব 'হরিজন'রা কাজ করতো, তাদের বস্তিতে এমন ঘরও ছিল, যার মধ্যে পঁচিশজন লোককে থাকতে হতো। ৯´ × ১২´ ঘরগুলোতে

(কোয়ার্টার) এত লোক এক সংগে বসতেই পারতো না, ঘুমোবার প্রশ্ন তো ওঠেই না।

বাইরের জগতে আপন মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য অবশ্য বিড়লাজী অনেক মন্দির ও ধর্মশালা বানিয়েছিলেন বা দান ধ্যান করেছিলেন। তাই **Margaret Bourke White** বলেছিলেন—**"During my stay in India I never ceased to wonder why Gandhi; who symbolised the simple life for millions, should live at the home of India's richest textile magnet" [Half way to freedom P. 31]**

গান্ধীজী সাদাসিধা জীবন যাপনে বিশ্বাসী ছিলেন। তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া ভ্রমণ করতেন না। মহাত্মাজী, তাঁর আশ্রম এবং তাঁর ছাগলটির জন্যও বেশ কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী দরকার হতো। একবার সিমলা ভ্রমণের জন্য সমস্ত তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেনটিই গান্ধীর জন্য নেওয়া হয়েছিল। (ঐ P-88) গান্ধীজীর দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা ছিল, বিড়লাজী কা'কেও ঠকান না। একে (blind-eye) 'অন্ধ দৃষ্টি' বলবেন, না সমস্ত টাটা বিড়লাদের সম্পদ রক্ষা করা, বা সামন্তযুগীয় ব্যবস্থাকে অটুট রাখার প্রচেষ্টা আখ্যা দেবেন ?

"The anti-machine references made at prayers always intrigued me, especially since these were delivered through a modern microphone and when the talk was finished Gandhi would step off the prayer podium into Mr. Birla's milk white Packard car to be whirled back to the untouchable colony."

[Half way to freedom, P. 88]

তাই যুক্তপ্রদেশের জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি দলের সংগে সাক্ষাৎকারের সময় গান্ধী যথার্থই বলেছিলেন : "যুক্তি সংগত কারণ ব্যতীত ভূস্বামীদের সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়ার দলে আমি নই। আমার উদ্দেশ্য হইল তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া তোমাদিগকে স্বমতে আনয়ন করা.

যাহাতে তোমরা তোমাদের প্রজাবৃন্দের অছি স্বরূপ সম্পত্তির রক্ষা কর এবং প্রধানতঃ তাহাদের কল্যাণের জন্যই উহা ব্যয় কর।...যদি কেহ অন্যায় রূপে তোমাদিগকে সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে, তাহা হইলে তোমরা দেখিবে, আমি তোমাদের হইয়া সংগ্রাম করিব। পাশ্চাত্যের সমাজতন্ত্রবাদ অথবা কমিউনিজম এমন কতকগুলি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা আমাদের মূল বিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।...আমাদের সমাজতন্ত্রবাদ বা কমিউনিজম অহিংসার উপর এবং ধনী ও শ্রমিক, জমিদার ও প্রজার সামঞ্জস্যে পূর্ণ সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।" [নেহরু আত্মচরিত, ১৩৫৫, পৃঃ ৫৭৪]

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সজীব রাখার জন্য গান্ধী যে কত উদগ্রীব ছিলেন তা ১৯২২ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সিদ্ধান্ত থেকে সহজেই অনুমেয়ঃ "তাহাদের (জমিদারদের) বৈধ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনো ইচ্ছাই কংগ্রেস আন্দোলনের নাই।" কৃষকগণ কর্তৃক জমিদারদের খাজনা বন্ধ করা কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরোধী এবং দেশের মৌলিক স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে গান্ধী কানপুরে প্রকাশ্যেই বলেছিলেন—"...তিনি কখনও তালুকদারী ও জমিদারীপ্রথা বিলোপের পক্ষপাতী নহেন এবং যাহারা মনে ভাবে উহা বিলুপ্ত করাই উচিত, তাহারা নিজেদের মনোভাবই বুঝিতে পারে না।" [নেহরু আত্মচরিত—পৃঃ ৫৭৫]

মহাত্মাজীর ধর্ম যে প্রায়ই কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার ওপরে উঠতে পারেনি তাও সর্বজনবিদিত। ১৯৩৪ সালে বিহারে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়ে গেল। কংগ্রেসী নেতারা ভূমিকম্পের ফলে দুর্গতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্ব খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় লিখলেনঃ "বিহারের বর্ণহিন্দুদের অস্পৃশ্যতার পাপই হ'ল বিহারের ধ্বংসলীলার মূলকারণ, সে পাপের শাস্তিরূপেই বিধাতার নিকট থেকে এই ধ্বংসের কঠোর দণ্ড নেমে এসেছে।"

ভূমিকম্পের এ ধরণের অবৈজ্ঞানিক ও উদ্ভট ব্যাখ্যা অনেকেই গ্রহণ

করতে পারেন নি। বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে জানালেন : "প্রাকৃত জড় ঘটনা সমূহের একটি বিশেষ সমবায়ই হইল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অনিবার্য এবং একমাত্র কারণ। বিশ্ববিধান সমূহ অলঙ্ঘ্য ; এই বিধানগুলির কাজে ঈশ্বর নিজেও কোনদিন হস্তক্ষেপ করেন নি।" "...এই অযুক্তিই হইল সকল অন্ধশক্তির মূল আকর—যাহা আমাদিগকে জোরপূর্বক স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানের পথ হইতে দূরে সরাইয়া লইতে পারে।" ভগবানের এত নিকটে যিনি যেতে পেরেছেন সেই মহাত্মাজী আবার লিখলেন—"আমরা ভগবানের সব বিধানের কথা জানিনা।...আমার জীবনের ক্ষুদ্রতম ঘটনাটিতেও তিনি আমাকে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।... তাঁহার করুণাময়ী ইচ্ছার উপরই আমার প্রত্যেকটি শ্বাস নির্ভর করিতেছে।" মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন !

প্রবন্ধের প্রারম্ভে গান্ধীজীবনীকার রলাঁর মহাত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করেছি। চরকা, বয়কট আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সংগে গান্ধীর মতপার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে রলাঁ লিখলেন : **"Gandhi is a mediaval universalist, with all veneration to the Mahatma, I am with Tagore."**

[Mahatma Gandhi : P, 98.]

গান্ধীজীর প্রতি এই শ্রদ্ধাটুকুও রলাঁ কি বেশি দিন রাখতে পেরেছিলেন ? এর জন্য মহাত্মাজীর দায়িত্বকে অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। ফ্রান্সের বার্থাল ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো দু'জন গ্রাম্য কৃষকও অহিংসা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই দু'জন কৃষক ভাই প্রথম মহাযুদ্ধে (যে যুদ্ধে গান্ধী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন) যোগ দিয়েও মানুষ মারতে চাননি। ১৯২৮ সালে অত্যন্ত আনন্দের সংগে রলাঁ গান্ধীকে এই ঘটনার কথা জানালেন। কিন্তু গান্ধীর নির্দেশে মীরাবেন লিখলেন : "বাপুজী মনে করেন না যে, এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মন সত্যিকারের অহিংসা হবার মত পবিত্র, কেন না যুদ্ধে যোগ দিতে তাদের আপত্তির প্রধান কারণ ছিল তাদের পৈত্রিক জমির প্রতি আকর্ষণ।"

১৯২৯ সালের ২১শে জানুয়ারী রঁলা মর্মাহত হয়ে উত্তর দিলেন : "বার্থাল ভ্রাতৃদ্বয় সম্বন্ধে আপনারা যা লিখেছেন, তা পড়ে আমি খুব দুঃখিত হলাম। এই সরল, অশিক্ষিত কৃষক দুইটি, যাদের কোনো গুরু নেই, যারা ধর্মের খবর রাখেনা, যারা পুরাতন বাইবেলে বিশ্বাস করেও একমাত্র স্বভাবজাত বিবেকের আলোকের দ্বারা চালিত হয়েছে —এই রকম দুইটি সাধারণ মহৎ ব্যক্তি যদি অহিংসা মন্ত্রের গুরুর ধর্মীয় চাহিদা পুরণ না করতে পারে, তা হলে গান্ধীর মহৎ আদর্শ কোন দিন যে মানুষের সমাজে প্রবেশ করবে ও ফলপ্রসূ হবে, তার কোনো আশা করা যায় না। গান্ধীর এই পবিত্র জেদ তাঁকে তাঁর আশ্রমের দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখবে।...১৯১৪ সালের যুদ্ধে গান্ধীর মনোভাব ও বৃটিশ সম্রাজ্যবাদের যুদ্ধে সহযোগিতার সংগে তাঁর অহিংসা নীতির সামঞ্জস্য বিধান তাঁর পাশ্চাত্য অনুগামীদের মনে যথেষ্ট সংশয়ের সৃষ্টি করেছে।" [Inde, P 190]

গান্ধীজী প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদানের কারণগুলো জানিয়ে রমা রলাঁকে চিঠি দিলেন। সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণে উপকৃত হয়ে প্রজা হিসাবে তাদের সহযোগিতা করা ও সহানুভূতি পাওয়া, ভারতের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা পাওয়া— এই ছিল গান্ধীর প্রধান যুক্তি।

১৯২৯ সালের ৭ই মার্চ রলাঁ আবার গান্ধীকে লিখলেন : আপনার মত একজন ব্যক্তি, যাঁর প্রচণ্ড ~ স ও বিশ্বাসের জোর, যিনি সর্বক্ষেত্রে মানুষ হত্যা ও জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ আপোষহীন ভাবে নিন্দা করেন, তিনিই তাতে অংশ গ্রহণ করলেন এবং তাতে বাধা না দিয়ে সে পথ স্বেচ্ছায় বেছে নিলেন,...যদি কেবলমাত্র ফলাফল দ্বারাই বিচার করা হয়, তা হ'লে আপনার এই অত্যন্ত রাজভক্তিমূলক সুবিধাবাদ কোনো কাজেই লাগেনি। পক্ষান্তরে যদি বা তা সত্যই সফল হত ও আপনারা স্বাধীনতা পেতেন—হে বন্ধু, আপনাকে একটা কঠিন বাক্য ব্যবহার করতে আমাকে অনুমতি দিন, সাম্রাজ্যবাদের জন্য কোটি কোটি মানুষের রক্তাক্ত আত্মাহুতির ফলে, এই মূল্যে যদি আপনাদের স্বাধীনতা লাভ হ'ত : তা হ'লে তা হ'ত ভগবানের নিকট

বিষম অপরাধ (it would have been a crime before God) এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতের ললাট সেই রক্তের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকত ; আর সেই রক্ত ভগবানের সমক্ষে ভারতকে অভিশাপ দিত।"...[Inde, P. 193-94]। পাঠকের সুবিবেচনার জন্য মহাত্মাজীর সংগে রলাঁর পত্রালাপের পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের সম্পর্ককে তুলে ধরলাম।

১৯৩১ সালে গান্ধীজী মুসোলিনির আমন্ত্রণে ইতালিতে গেলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের ফ্যাসিবাদ বিরোধী উক্তিগুলো গান্ধী ভালভাবেই জানতেন। রলাঁ বললেন—'আপনার সেখানে যাওয়াটাই হবে মুসোলিনির পক্ষে একটা নৈতিক বিজয়'।

গান্ধীর ইতালি ভ্রমণ নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, এর রাজনৈতিক গুরুত্ব ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্যকে অবহেলা করা যায় না। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব যার কাছে হিংসা ও সন্ত্রাসের রাজত্ব, তিনিই ইতালি ঘুরে এসে (১৯৩১, ২০শে ডিসেম্বর) রলাঁকে লিখলেন :

তাঁর (মুসোলিনির) অনেক সংস্কারের কাজে আমি সমর্থন করি। আমার মনে হ'ল, তিনি কৃষকদের জন্য অনেক কিছু করেছেন।... যেহেতু পাশ্চাত্যে পশুবলই (হিংসাই) হ'ল সমাজের ভিত্তিমূল, মুসোলিনির সংস্কারগুলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করার যোগ্য। আমি মনে করি গরীবদের প্রতি তাঁর দরদ, বৃহৎ শহরীকরণের (super urbanization) প্রতি তাঁর বিরোধিতা, শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা—এগুলি আমাদের বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ যোগ্য...আমার যেখানে মৌলিক সন্দেহ থেকে যাচ্ছে তা হচ্ছে যে, এই সংস্কারগুলি বাধ্যতামূলকভাবে করা হয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজেও তো এই একই পন্থায় এই কাজগুলি হচ্ছে। আমাকে যা আকর্ষণ করেছে তা হচ্ছে মুসোলিনির কঠোরতার পশ্চাতে রয়েছে একটা সততা ও তাঁর দেশবাসীদের প্রতি উদ্দীপ্ত প্রেম। আমার আরও মনে হয় যে ইতালির জনসাধারণ মুসোলিনির লৌহ শাসনকে পছন্দ করে।" [Inde, P. 306]

যে গান্ধীজী বিপ্লবীদের বলেছেন 'ভ্রান্ত', সন্ত্রাসবাদীদের আখ্যা দিয়েছেন 'দেশের শত্রু" যুগপ্রবর্তক রামমোহনকে বলেছেন 'বামন' নিজের মতবাদের সংগে বিরোধী সুভাষচন্দ্রকে করেছেন বিতাড়িত এবং লেনিনকে নাম দিয়েছেন 'উপদ্রবকারী'—সেই মহাত্মাজীর কণ্ঠে মুসোলিনির প্রশস্তি-শ্রবণ কারো ভাল লাগার কথা নয়।

বৃটিশের ভারত ত্যাগ ও 'স্বাধীনতা' অর্জনের কথায় আসা যাক। গান্ধীজীর সাধনা ছিল অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা। হিন্দু-মুসলমানের মিলনই ছিল তাঁর একমাত্র স্বপ্ন। তবে তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় যথার্থ নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন কিনা তা' বিচার্য বিষয়।

১৯৪১ সালে গান্ধী বৃটিশকে ভারত ছাড়বার এবং সাম্রাজ্যবাদী জাপানকে তাঁর অহিংসা ও অসহযোগের মাধ্যমে প্রতিরোধ করার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন এল। মাউন্টব্যাটেনের সংগে প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনটি ছিল গান্ধীর মৌন দিবস। তিনি ক্যাবিনেট মিশনকে জানালেন—জিন্নার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। একজন জাতীয় নেতা হিসেবে যে রকম দৃঢ় প্রত্যয়ের সংগে অখণ্ড ভারতের দাবিকে পেশ করা উচিত ছিল তা' গান্ধী কখনই করতে পারেননি। এতদিন কংগ্রেসকে (ভ্রান্ত) নেতৃত্ব দিয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জাতির-জনকের বানপ্রস্থ গমনকে কোনো প্রকারেই সমর্থন করা যায় না। গান্ধী স্পষ্টই বলেছিলেন :

"দেশ খণ্ডনের জন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট দায়ী নন। দেশ খণ্ডনে ভাইসরয়ের কোনো হাত নেই। বরং সত্য কথা হ'ল, দেশ খণ্ডনের বিরুদ্ধে স্বয়ং কংগ্রেসের মনে যতটা আপত্তি আছে, ভাইসরয়ের মনেও ততখানি আপত্তি আছে। কিন্তু আমরা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই যদি এ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থায় সম্মত হতে না পারি, তবে ভাইসরয় আর কি করতে পারেন? [৭ঠা জুন, ১৯৪৭, ভারতে মাউন্টব্যাটেন, পৃঃ ৭৮]. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অত্যন্ত

দুঃখের সংগেই বলেছেন যে, প্যাটেল নেহরু ও অন্যান্যদের কাছে গান্ধী আত্মসমর্পণ করেন। কারণ তাঁর কোনো বলিষ্ঠ মত ছিল না।

"He was still not openly in favour of partition but he no longer spoke so vehemently against it."

[P. 187, India wins Freedom]

গান্ধীর সমস্ত আশাই নিরাশায় পরিণত হয়েছে। বৃটিশের কাছ থেকে যেটুকু ক্ষমতাও ভারতবাসী পেয়েছে, তার পশ্চাতে জিন্নার প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী সংগ্রাম অহিংস সত্যাগ্রহের চাইতে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে। ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেছেন :

"Gandhi had evidently hoped against hope to work a miracle by his non-violence. But Jinnah's 'Direct Action' proved more effective weapon for achieving independence than 'satyagraha'. Violence triumphed over non-violence" [India's struggle for Freedom, P. 52]

দেশবিভাগের সংগে সংগেই গান্ধীবাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা প্রমাণিত হলো। "গান্ধী বললেন, দেশ খণ্ডনকে দেশের একটা অকল্যাণ ও ক্ষতি বলেই তিনি মনে করেন।" [ভারতে মাউন্ট ব্যাটেন, পৃঃ ১২৫]

গান্ধীজী ও তাঁর সহযোগীদের মানসিক কাঠামো বৃটেনের শ্রমিক সরকার ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতের ক্রমবর্ধমান পুঁজিপতি শ্রেণীকে তাঁরা ব্যবসায়ের স্বার্থে একমাত্র প্রতিযোগী জেনে একটু ভয়ের চোখে দেখেছেন। তা ছাড়া সে সময় শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে তেমন কোনো রাজনৈতিক চেতনাবোধও জাগেনি।

"They understand a Gandhi more than a Stalin; a Nehru more than a Joshi···They know Birlas and Tatas more than workers' council or kishan Sabhas which would in any event press for India's

secession from the British Political system." [Dr. D N. Sen, Revolution by consent ? P. 176]

সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভারত আক্রমণে বৃটিশ সরকার যথেষ্ট ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়েছিল সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আজাদ হিন্দ বন্দীমুক্তির আন্দোলন দমন করার ক্ষমতাও সরকারের ছিল না। ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহ, বিমান বাহিনীর ধর্মঘট, বিহারের পুলিশ ধর্মঘট প্রভৃতির গুরুত্বও ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। অন্যদিকে ইউরোপ ও এশিয়ায় অবিরাম যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই পরোক্ষে হিটলার এবং জাপানীরাও ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

"The battle for India's freedom was being fought against Britain, though indirecly, by Hitler in Europe and Japan in Asia."

সুতরাং একমাত্র অহিংসার মাধ্যমে ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতা আসেনি। পৃথিবীর কোথাও কি গান্ধীবাদের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনে সাফল্যলাভ করা সম্ভব? পরিশেষে ডক্টর মজুমদারের সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছি: "There is no evidence that satyagraha or self-suffering of Gandhi's followers had anything to do with it. Thus according to the accepted interpretation Satyagraha it could not have any effect on the British decision to grant independence to India." [India's struggle for Freedom, P.54]

গান্ধী অর্থনীতি সম্বন্ধে বেশি কিছু জানবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটেনি। মোটামুটিভাবে তাঁর চরকা—খাদি আন্দোলন, স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি এবং বৃহদায়তন শিল্প ব্যবস্থার পরিবর্তে কুটির শিল্প প্রবর্তনের কথা উল্লেখযোগ্য। কোনো দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে চরকার কোনো মাহাত্ম খুঁজে পাওয়া একান্তই কষ্টকর। কবিগুরু বলেছেন: "ছেলে ভোলানো ছড়ায় বাংলা দেশে শিশুদেরই

লোভ দেখানো হয় যে, হাঁত ঘুরালে ঘোড়া পাবার আশা আছে। কিন্তু কেবল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত চালানোর দ্বারা মনের নিশ্চলতার অভাব পূর্ণ হয়ে দৈন্য দূর হবে, স্বরাজ মিলবে, এমন কথা বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের বলা চলে না…যে কারণ ভিতরে থাকায় রামমোহন রায়ের মতো অত বড় মনস্বীকেও মহাত্মা বামন বলতে কুণ্ঠিত হননি—অথচ আমি সেই রামমোহনকে আধুনিক যুগের মহত্তম লোক বলেই জানি—সেই আভ্যন্তরিক মনঃপ্রকৃতি গত কারণই মহাত্মাজীর কার্যবিধিতে এমন রূপ ধারণ করেছে, যাকে আমার স্বধর্ম আপন বলে গ্রহণ করতে পারছে না।"

অবসর সময়ে বেহালা বাজানো যায় কিন্তু চরকায় সূতো কেটে চিত্তবিনোদন করা যায় না। সস্তা অনুপ্রেরণা ছাড়া এটা দেশকে কিছুই দিতে পারেনি। চরকা আন্দোলন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন: "apart from sentiment it has played no significant part in the sruggle for India's political or economic independence It now survives only as a relic of Gandhi cult and it is no use killing a dead horse"

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষি ব্যবস্থা ও ক্ষুদ্রায়তন কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে গান্ধীজী যে ভাবে এর প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন—তা একটু আশ্চর্য ধরণের। তাঁর মতে গ্রামগুলোকে কৃষি ও কুটির শিল্পের ওপর ভিত্তি করে স্বয় সম্পূর্ণতা লাভ করতে হবে। গ্রামে যা উৎপাদিত হবে তা গ্রামের লোকরাই ভোগ করবেন। গ্রামবাসী গ্রামেই কর্মসংস্থান পাবেন। অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সম্বন্ধে যাঁর সামান্য ধারণা আছে—তিনি এই ব্যবস্থাকে কোনো প্রকারেই স্বীকার করে নিতে পারেন না।

"গান্ধীজী পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, কলকব্জা মাত্রেরই তিনি বিরোধী নহেন, তবে তিনি সম্ভবত বিবেচনা করেন যে বর্তমান ভারতে উহার প্রয়োজন নাই।" [নেহরু আত্মচরিত, পৃঃ ৫৬৪]।

সুতরাং একথা বলা যায় যে সামন্ততান্ত্রিক শিল্প-বিপ্লব-পূর্ব যুগে ভারতকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা তিনি শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই চালিয়েছেন তা নয়—অর্থনৈতিক জীবনেও সেই উদ্যমকে অব্যাহত রেখেছিলেন। নেহরু আত্মচরিতে লিখেছেন: "গান্ধীজীর প্রিয় খাদি—চরকা ও তাঁত পণ্যোৎপাদন ব্যক্তিগত উদ্যমের উগ্র প্রচেষ্টা; অতএব ইহা পুনরায় প্রাক যন্ত্রযুগে ফিরিয়া যাওয়া।" [পৃঃ ৫৬০]

সে সময় ভারতের মহাজন গোষ্ঠী যে কত জঘন্য ছিল তা সর্বজনবিদিত। গান্ধীভক্ত ব্রেইলস্‌ফোর্ড তাঁর "প্রপার্টি অব পিস?" বইতে বলেছেন: "সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার মধ্যে ভারতীয় মহাজন ও জমিদারদের মত অর্থগৃধ্নু পরগাছা আর কোথাও নেই।" আসলে গান্ধী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। বহির্জগতের সংগে সম্পর্কচ্ছিন্ন সঙ্কীর্ণ স্বয়ং সম্পূর্ণতার কথা কেউ কি কখন চিন্তা করতে পারেন? সম্ভবত বুর্জোয়া মানবতাবাদের এমন পরাকাষ্ঠা পৃথিবীতে কেউ দেখাতে পারেন নি। জমিদারেরা চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খেতে খেতে যখন ক্লান্ত হয়ে যাবেন, তখন 'হরিজন' ও দরিদ্রদের ডেকে ছিটে-ফোঁটা দান করবেন।

নেহরু তাঁর আত্মচরিতে একথা উল্লেখ না করে পারেন নি: "সময় সময় তিনি নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলেন, কিন্তু তিনি যে অর্থে ঐ শব্দটি ব্যবহার করেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব, তাহার সহিত সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে যাহা বুঝায়, সেই অর্থনৈতিক সমাজ বিন্যাসের কোনো সম্পর্ক নাই।...যাহার অর্থ একপ্রকার ভ্রান্ত মানবতাবাদ" [পৃঃ ৫৫১, ১৩৫৫ সং]

এখানেও গান্ধী তাঁর তথাকথিত ধর্মকে টেনে এনেছেন। জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নত হোক তা তিনি চাননি। তিনি ছিলেন **Plain living, high thinking**-এ বিশ্বাসী। "তিনি জনসাধারণের জীবন যাত্রার ব্যবস্থা সাদা সিধা একটা নির্দিষ্ট হারের উর্ধে উঠুক ইহা পছন্দ করেন না, কেন না বেশি প্রাচুর্য ঘটিলে বিলাসিতা ও পাপ বৃদ্ধি পাইবে" [নেহরু আত্মচরিত, পৃঃ ৫৫২]

গান্ধীজী ভাবতেন, শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূলে আছে ওদের নৈতিক চরিত্রের দুর্বলতা। বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক তাত্বিক বা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অন্য কেউ এরকম মন্তব্য করতে পারতেন বলে আমার মনে হয় না। পৃথিবীর বড় বড় মহাত্মাদের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে কিছু মন্তব্য করার স্পর্ধা আমার নেই। গান্ধীজী কিন্তু একটি চিঠির উত্তরে স্পষ্টতই বলেছেন : "শেষ কথা এই, যদি খনির মালিকেরা অন্যায়কারী হইয়াও জয়লাভ করে, তাহার কারণ মজুরদের সন্তান-সন্ততিদের সংখ্যা অধিক বলিয়া নহে, তাহার কারণ মজুরেরা এ পর্যন্ত সংযম শিক্ষা করে নাই।…যদি ধনীদের অপেক্ষা খনির মজুরদের চরিত্র ভাল না হয়, তাহা হইলে জগতের সহানুভূতি দাবি করিবার তাহাদের কি অধিকার আছে? [নেহরু আত্মচরিত, পৃঃ ৫১২]

যে কোন দেশই অর্থনৈতিক উন্নতির সংগে সংগে জীবন-যাত্রার মান, কৃষি ও শিল্প দ্রব্যের সুষম উৎপাদন বৃদ্ধি ও সমবণ্টন প্রথার কার্যকারিতার উপর নির্ভরশীল। সব উন্নতির মূলে রয়েছে শিক্ষাবিস্তার। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কবিগুরু রাশিয়ার অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করে বলেছিলেন—শ্রীনিকেতনে তিনি যা করতে চেয়েছিলেন সমগ্র রাশিয়াকে কেন্দ্র করে (১৯৩০) তাই চলছে। এমনকি পাশ্চাত্য-দেশগুলোর শিল্পোন্নতি ও শিক্ষা ব্যবস্থায় আকৃষ্ট হয়ে আমাদের দেশের কেরাণী তৈরি করার কারখানা এই বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দিতে বলেছিলেন বিবেকানন্দ। একজন বিশ্ববন্দিত কবি এবং আর একজন দার্শনিক সন্ন্যাসীরও যে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, গান্ধীজী কি সে টুকুরও পরিচয় দিয়েছিলেন?

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও গান্ধীর কি পরাজয় ঘটেনি? যে দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মাজীর অহিংসা মন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল, আজ সেখানকার অবস্থা কি? ভেরউড সরকার শার্পভিলে শান্তিপূ জনতাকে নারকীয় হত্যার কাহিনী পৃথিবীর পদদলিত শোষিত মানুষগুলো কোনদিন ভুলবে না। এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিকে পর্তুগীজ

দস্যুদের অত্যাচার, রোডেশিয়ায় দেশপ্রেমিক কৃষ্ণকায়দের হত্যার করুণ কাহিনী শুধু যে অহিংস আন্দোলনের প্রহসন নাট্যাভিনয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার বরমাল্য তা নয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘের তথাকথিত মানবিক অধিকার বিলের ফাঁকা আওয়াজের প্রতি চিরন্তন বিদ্রূপ ও পরিহাসের সার্থক অভিব্যক্তি। এরকম হাজার হাজার 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' ঘটে চলেছে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের হাতে। প্রায় দু'শো বছরের স্বাধীনতার পরেও আমেরিকায় নিগ্রোদের রাখা হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে। শত শত মার্টিন লুথার কিং এলেও কি এ সমস্যার সমাধান হবে? কারণ—"The race question is her Achillies' heel, her Maginot line."

বিপ্লবের ফল ভয়াবহ ও অহিংস সত্যাগ্রহের পরিণতি সুখ ও শান্তিদায়ক, এরকম যুক্তি অবাস্তব ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ভিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের ওপর দাঁড়ানো পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রত্যক্ষ করে বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "সোস্যালিজম, এনার্কিজম, নিহিলিজম এবং এই জাতীয় অন্যান্য মতবাদগুলি আসন্ন সমাজবিপ্লবের অগ্রদূত।" "শূদ্রের আধিপত্য অবশ্যম্ভাবী, কেউ একে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।" "They must have it, none can resist it"—(Works-Vol VI, P. 81) অথবা ১৮৯৬ খৃঃ তিনি Sister Christine-কে বলেছিলেন: "The next upheaval that is to usher in another era, will come from Russia or from China. I can not see cleary which, but it will be either the one or the other (রমা রলাঁ)।

বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ ভাববাদী দর্শনের দ্বারা যতই প্রভাবিত হোক না, তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও দূর দৃষ্টির অপরিসীম গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিপ্লব হলেই কোনো দেশের রাতারাতি উন্নতির কথা চিন্তা করা যায় না। লেনিনের নেতৃত্বে শুধু কি গোপন ষড়যন্ত্রই হয়েছিল? প্রকাশ্য দিবালোকে বুর্জোয়াশক্তির মোকাবিলা করে শত-সহস্র সর্বহারা শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে রাশিয়ার

মাটি। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার্তে সর্বত্রই বিষাক্ত ভয়াবহতা বিরাজ করছে—এরকম প্রচার আজ নিছক ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার বহু পূর্বেই নেহেরু উপলব্ধি করেছিলেন :···

"There is no middle road between Fascism and communism. One has to choose between the two and I choose the communist ideal." [The Indian Struggle, Vol II. P, 430]

নেহরু তাঁর চিন্তাধারার কতটা প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন তা এখানে বিচার্য বিষয় নয়। তবে নেহরুর মত বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতাও (তাঁর নিজের ভাষাতেই) এই বাস্তব ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করতে পারেন নি। সম্রাট আকবরের আমলে দেশে শ্রীবৃদ্ধি ছিল। মহামতি অশোকের রাজত্বে অহিংসার উপর ভিত্তি করে 'রামরাজত্বে'র সৃষ্টি হয়। হর্ষবর্ধন অমিত ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও সর্বস্বদান করে রাজর্ষি হয়েছিলেন। কিন্তু এদের এত দান, এত সেবা সত্বেও শোষক ও শোষিতের সম্পর্কের কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই বলে কি আমরা সমাজতন্ত্র ফেলে ফিরে যাবো অতীতের রাজতন্ত্রে ?

রুশ বিপ্লবের বিশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র রাশিয়া থেকে নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা আমূলে উৎপাটিত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতে এখনও প্রায় শতকরা আশিজন নিরক্ষর। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বা প্রযুক্তি বিজ্ঞানে রাশিয়া বা চীনের অবদানকে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক অর্থনীতিবিদ ও লেখকরাও অস্বীকার করতে পারেন নি। [Doble : Soviet Economic Development, অথবা Leontief : Socialism in China.]

'সবার উপরে মানুষ সত্য'। মালিকও মানুষ, শ্রমিকও মানুষ। আবার তিনিই পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, আত্মীয় ও বন্ধু। কিন্তু গান্ধীজীর ভগবান তো কাউকে জন্মগত মালিক ও জন্মগত শ্রমিক করে পৃথিবীতে পাঠান নি ? মানুষের মন, মাথা ও হাত থেকে এমন সব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা দিয়ে কখনো হয় শোষণ—কখনো শোষণের অবসান-মুক্তি। কখনো যুদ্ধ, কখনো শান্তি। মজুরকে শুধু মজুর

হিসেবে না দেখে—দেখতে হবে সামাজিক সম্পদ ও জাতীয় আয়ের একজন সমান অংশীদার রূপে।

গান্ধীজী অশিক্ষিত, দরিদ্র, অস্পৃশ্যদের 'হরিজন' রূপে দেখে তাঁদের মানবতার অপমানই করেছেন। কারণ ওদেরকে সামাজিক আয় ও সম্পদের সমান অংশীদার করতে তিনি রাজি ছিলেন না। ধনীদের সেবা ও দানের ওপর নির্ভরশীল হতে শিখিয়েছিলেন ওদের। ধনতন্ত্র পতিতাদের মুক্তি দিতে পারে নি। বরং তথাকথিত সভ্যতার নামে উলঙ্গ, নগ্ন বিট্‌ল আর হিপি আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছে। মানুষকে নিয়ে চলেছে পাশবিকতার দিকে। তরুণদের শুভবুদ্ধি ও যৌক্তিকতার বিকাশ ঘটলে তাঁরা তাঁদের জন্মগত অধিকারের কথা জেনে ফেলবে যে! আর সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের মুখোস খুলে যাবে যে তাঁদের সামনে। অথচ গান্ধীর ধ্যান ধারণা ছিল প্রাক্‌ধনতান্ত্রিক।

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে মানবজাতির কল্যাণ হয়েছে। সে জন্য সকল মানুষই বিজ্ঞানীদের নিকট চিরঋণী। কিন্তু শিল্প ও বিজ্ঞানের কল্যাণকে সকল মানুষই সমান ভাবে ভোগ করতে পারে না। সেখানেও আছে মানুষের তৈরী ধনী জমিদার, শিক্ষিত মানুষ ও অশিক্ষিত-কৃষক-দরিদ্র-অস্পৃশ্য 'হরিজনে'র ব্যবধান। আকাশের সূর্য ও চন্দ্রের আলো, পৃথিবীর বাতাস, ফুলের গন্ধ, পাখির গান— এ তো শুধু ধনীদের একচেটিয়া সম্পদ নয়। তেমনি ক্ষেতের সোনালী ফসল, কারখানার শিল্পদ্রব্য, বিজ্ঞানের আশ্চর্য দান—এককথায় সামাজিক আয় ও সম্পদে সকলের সমান অধিকার।

গান্ধীজী সত্যই বলেছিলেন: "আমার জীবনই আমার বাণী"। হে অনাগত, ভাবী কালের তরুণ বন্ধুরা, মহাত্মাজীর জীবন ও বাণী বিবর্তনের কষ্টিপাথরে—বিজ্ঞানের কালজয়ী পদ্ধতি দিয়ে তোমরা বিচার করো। আর চিন্তাশীল পাঠকের সুবিবেচনার জন্য রেখে যাচ্ছি চিরন্তন প্রশ্ন—গান্ধীবাদ কি সচল ?

জয় হিন্দ!

করেন। নামে আশ্রম হোলেও এটি সাধুদের বা কঠোর ব্রহ্মচারীদের একটি আস্তানা আদৌ ছিল না। এটি ছিল মাষ্টারদা'র ও তাঁর অতি প্রিয় দু'একটি বিপ্লবী যুবকের এবং দু'একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাসস্থান। অবশ্য নামের জন্যই গোয়েন্দা পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি ঐ বাড়ীর প্রতি ছিল। মাষ্টারদা কখনই ঐ বাড়ীতে কোন নতুন যুবকের সাথে দেখা করতেন না বা ঐ বাড়ীতে কোন বে-আইনী অথবা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেন না। অসহযোগ আন্দোলন-সম্পর্কিত দলের সকল কাজ মাষ্টারদা এই বাড়ীতেই করতেন। তাই এই বাড়ীটি ছিল কংগ্রেসের অপর একটি ক্ষুদ্র কর্মকেন্দ্র। এই 'সাম্যাশ্রম" থেকেই ১৯১৩ সালের শেষভাগে মাষ্টারদা আত্মগোপন করে শহরের বাইরে চলে যান এবং "সুলুকবাহার" নামে একটি বাড়ীতে আশ্রয় নেন। "সাম্যাশ্রমযুগ" শেষ হয়ে যায়।

গান্ধীজী ১৯২১ সালে যখন অহিংস আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখন বাংলার বিপ্লবী নেতৃত্বের কাছে আবেদন করেছিলেন, বিপ্লবী কর্মসূচী যেন অন্ততঃ এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়। তিনি অহিংস পন্থার উপযোগিতা পরীক্ষা করে দেখতে চান। তিনি দেশবাসীকে আশা দিয়েছিলেন, সামান্য দু'টি শর্ত পূরণ করলে এক বছরের মধ্যেই "স্বরাজ" আসবে। অবশ্য "স্বরাজ' মানে কি, তা তিনি কখনই বলেননি। বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব গান্ধীজীর অনুরোধ মেনে নিয়েছিলেন এবং নিজেদের কর্মসূচী স্থগিত রেখে সর্বান্তঃকরণে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তার ও তরঙ্গ দেখে সেই সময়ে অনেকেই ভেবেছিলেন, বছর শেষ হওয়ার আগেই হয়ত কিছু একটা হবে। ৩১শে ডিসেম্বর পার হয়ে গেল, গান্ধীজীর শর্তও পূরণ হল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে উত্তরোত্তর কঠোর দমন-পীড়ন ছাড়া আর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না।

বাংলার বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে কোথাও কিন্তু অতটুকু হতাশা আসেনি, কারণ তারা বিশ্বাসই করতেন না অহিংস পন্থায় সাম্রাজ্য-

বাদের মনোভাবে পরিবর্তন আনা সম্ভব। তাই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের কোথাও কোথাও বিপ্লবী কর্মসূচী অনুযায়ী কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হোল।

চট্টগ্রামে মাষ্টারদা'র নেতৃত্বাধীন দলের মধ্যেও দাবী উঠল, এখনই কিছু করতে হবে। তখন ঐ দলে অনন্তলাল সিংহ ছিল একজন তরুণ বিপ্লবী কর্মী, উৎসাহ উদ্যোগে ভরপুর, খুবই সাহসী। দাবীটি এসেছিল প্রধানতঃ তার কাছ থেকেই। মাষ্টারদা যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে কথাটি ভেবে দেখলেন, সমগ্র পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করলেন এবং পরে সম্মতি দিলেন।

পরিকল্পনা হোল, অবিলম্বে অস্ত্রসংগ্রহ করতে হবে এবং তার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা হবে বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আসাম-বেঙ্গল রেল কোম্পানীর টাকা কেড়ে নিয়েই। অনন্তসিংহের নেতৃত্বে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগে একদিন দুপুরবেলা অল্প কয়েকটি যুবক রেল কোম্পানীর কয়েক সহস্র টাকা কেড়ে নেয়। কেউই বাধা দিতে পারেনি।

পুলিশ সন্দেহ করেছিল, ঐ অসম সাহসিক কাজ হয়ত সূর্য সেনের দলের কর্মীরাই করেছে। বিপদ আশঙ্কা করে দলের নেতৃস্থানীয় সকলেই আত্মগোপন করে শহর ছেড়ে চলে যান এবং শহরের বাইরে একটি গ্রামে গিয়ে বাস করতে থাকেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই বাড়ীটির প্রতি পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং একদিন একদল সশস্ত্র পুলিশ ঐ বাড়ীটি ঘিরে ফেলে।

বাইরে যাওয়ার সব পথ অবরুদ্ধ দেখে মাষ্টারদা'র নেতৃত্বে ঐ ক্ষুদ্র দলটি অপরিসীম সাহসে পুলিশদলকে আক্রমণ করে এবং অবরোধ ভেদ করে অনুসরণকারী পুলিশের সাথে গুলি বিনিময় করতে করতে কয়েকমাইল দূরের "নাগরখানা" পাহাড় অঞ্চলে চলে যায়। অবিলম্বে শহর থেকে অগণিত সশস্ত্র পুলিশ এসে সমগ্র পাহাড় অঞ্চলটি ঘিরে ফেলে এবং সারাদিনই পুলিশের সাথে বিপ্লবীদের খণ্ডযুদ্ধ হয়। অবশেষে শারীরিক সামর্থ্য সম্পূর্ণরূপে

নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর অনন্যোপায় হয়ে মাষ্টারদা এবং অম্বিকা চক্রবর্তী বিষ পান করেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারের পর লাঞ্ছিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়; কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, ঐ বিষের ক্রিয়ায় তাঁদের মৃত্যু হয়নি। অচৈতন্য অবস্থায় পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

কিছুদিন পরে অনন্ত সিংহকেও পুলিশ কলিকাতায় গ্রেপ্তার করে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিচারে তাঁদের কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তাঁরা সকলেই মুক্তি পান।

ইতিমধ্যে যে গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার কলিকাতায় অনন্ত সিংহকে গ্রেপ্তার করেছিল, সে একদিন শহরের মধ্যেই নিহত হয়।

অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হওয়ার পরই বাংলাদেশে কোথাও কোথাও বিপ্লবী কর্মপন্থা অনুযায়ী কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হয়। পুলিশ গোয়েন্দাদের উপর কোথাও কোথাও আক্রমণ হয়, অর্থ-সংগ্রহের জন্যও চেষ্টা হয় এবং বোমা তৈরীর প্রচেষ্টাও পুলিশের নজরে আসে। সন্ত্রস্ত সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন এই ক্রমবর্ধমান আন্দোলন দমন করবার জন্য এক বিশেষ আইন প্রণয়ন করে। ঐ আইনের বলে ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে বাংলা দেশের বিপ্লবী দলের বহু নেতা ও কর্মীকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হয়। চট্টগ্রামেও ঐ সময়ে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু সকলেই খুব আশ্চর্য হয়ে যান, যখন তারা জানতে পারেন যে পুলিশ মাষ্টারদা'কে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। অনেকের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত করে মাষ্টারদা অতি কৌশলে পুলিশের বেষ্টনী অতিক্রম করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছিলেন।

তারপর মাষ্টারদা প্রায় আড়াই বছর আত্মগোপন করে বাংলাদেশ ও আসামের বিভিন্ন জেলা এবং যুক্ত প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় পার্টি সংগঠন গ'ড়ে তোলার কাজে ঘুরে বেড়ান। এই সময়ে কয়েকবার তিনি কলিকাতায় পুলিশের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিবারেই তিনি অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের

সাহায্যে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন।

অবশেষে ১৯২৬ সালের শেষভাগে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে মেদিনীপুর জেলে বন্দী করে রাখেন। কিন্তু তিনি কারাগারের ভিতর থেকে বাইরের গুপ্ত আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ করবেন—এই ভয়ে বাংলা সরকার তাঁকে কিছুদিনের মধ্যেই বোম্বাই প্রদেশের সুদূর রত্নগিরি জেলে পাঠিয়ে দেন। ১৯২৮ সালের শেষভাগে তিনি মুক্তিপান।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের পরিস্থিতিতে প্রভূত পরিবর্তন এসেছিল। রাজনৈতিক গগনে ঘনঘটার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠল। জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ আরও তীব্র হয়ে দেখা দিল, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা গভীরতর হ'ল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশব্যাপী সংগ্রাম প্রারম্ভের আকাঙ্ক্ষায় সমগ্র দেশ অধীর উন্মুখ হয়ে উঠল।

১৯২৮ সালের শেষভাগে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন ছিল সেই কালে অতীব গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান বিক্ষুব্ধ মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য স্থির করবার বিষয় ছিল ঐ অধিবেশনে।

কলিকাতা অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য ছিল মতিলাল নেহেরু কমিটির রিপোর্ট। ঐ কমিটির রিপোর্টে "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন"ই Dominion status ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য বলে গ্রহণের সুপারিশ ছিল।

সুভাষচন্দ্র বসু ঐ কমিটির একজন সদস্য ছিলেন এবং ঐ রিপোর্ট গ্রহণ করে স্বাক্ষরও করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী বিবেচনায় তিনি স্থির করেন, ঐ রিপোর্টের বিরোধিতা করা উচিত এবং ভারতের জাতীয় লক্ষ্য পূর্ণ-স্বাধীনতা বলেই ঘোষণা করা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর এই সঠিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে নেহেরু রিপোর্টের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং পূর্ণ

স্বাধীনতাই জাতির একমাত্র লক্ষ্য বলে প্রস্তাব গ্রহণের জন্য আবেদন করেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও ঐ কমিটির একজন সদস্য ছিলেন এবং ঐ রিপোর্ট সম্পূর্ণ অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু কলিকাতা অধিবেশনে নেহেরু রিপোর্টের প্রতি সুভাষচন্দ্রের প্রচণ্ড বিরোধিতার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা থেকে উদ্ভূত একটি অতি অস্বোয়াস্তি এবং বিব্রতকর পরিস্থিতি পরিহার করবার জন্যই তিনি এইরূপ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও শেষ অবধি নিরপেক্ষ থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করেছিলেন।

বাংলাদেশের বিপ্লবী নেতৃত্ব মনে করেছিলেন, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে যদি নেহেরু রিপোর্ট গৃহীত হয়, অর্থাৎ "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনই" জাতীয় লক্ষ্য বলে স্বীকৃতি পায়, তাহলে বাংলার জনগণের অগৌরব ও লজ্জার কারণ হবে, বাংলার অত্যুজ্জ্বল ঐতিহ্য মলিন হবে, বাংলার ইতিহাস কলঙ্কিত হবে। তাই সমগ্র বিপ্লবী নেতৃত্ব সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন যাতে কলিকাতা অধিবেশনে নেহেরু রিপোর্ট কিছুতেই অনুমোদন না পায়, পরিপূর্ণরূপে বর্জিত হয় এবং তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় সুভাষচন্দ্র প্রভাবান্বিত হয়ে শেষ পর্যন্ত পূর্ব অভিমত পরিবর্তন করেন এবং গান্ধীজীর বিরাগভাজন হওয়া সত্ত্বেও অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী পেশ করেন।

মাষ্টারদা চট্টগ্রাম থেকে এই অধিবেশনে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন; তিনি ও নেহেরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে এবং সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবের সমর্থনে যাতে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক প্রতিনিধির অভিমত ব্যক্ত হয় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। পরাজয়ের আশঙ্কা করে কংগ্রেস নেতৃত্ব শেষ সময়ে যে কৌশল ও পন্থা গ্রহণ করেন, তা তাঁদের পক্ষে গৌরবের ও সম্মানের হয়নি।

প্রচণ্ড শীতের মধ্যে মধ্যরাত্রির পর ১৩০০ ও ৮০০ ভোটের

ব্যবধানে নেহেরু রিপোর্ট অত্যন্ত ক্ষোভ ও লজ্জার মধ্যে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত হয়ে যায়। অবশ্য বিক্ষোভের গভীরতা ও পরিমাণ উপলব্ধি করে সর্বোচ্চ কংগ্রেস নেতৃত্ব শেষকালে নেহেরু রিপোর্টের কার্যকাল মাত্র এক বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন।

এই কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে বাংলার সকল বিপ্লবী দলকে, বিশেষ করে প্রধান দুইটি দল অনুশীলন ও যুগান্তর দলকে, ঐক্যবদ্ধ করবার প্রচেষ্টা হয়।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলাদেশে এই দুইটি বিপ্লবী দল বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর শুধু যে সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলন এবং কর্ম-প্রচেষ্টা দুর্বল হয়ে যায় তাই নয়, এই সমধর্মী, সমপন্থী এক সমলক্ষ্যের অনুসরণকারী দু'টি দলের মধ্যে গভীর ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং উভয়ের মধ্যে দুঃখজনক বৈরীভাব দেখা দেয়।

অবশ্য কোন কোন সময়ে যখন সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের প্রচণ্ড আক্রমণে উভয় দলই গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তখন সাময়িক ভাবে উভয়দলের কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে উঠেছে, কিন্তু সেই সম্প্রীতি ও সহযোগিতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি; পরবর্তী সময়েই আবার প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে পূর্বের সন্দেহ, বিতৃষ্ণা ও বিরূপ মনোভাব।

সময় তখন ১৯২৯ সাল। সমগ্র দেশব্যাপী প্রচণ্ড জন-বিক্ষোভ। সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ব্যাপকতম জনসাধারণের বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা আরও গভীরতা লাভ করেছে। জনগণের সংগ্রামশীল মনোভাব আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। সাইমন কমিশন গঠন করে সাম্রাজ্যবাদ ভারতের মর্যাদায় চরম আঘাত দিয়েছে। এই কমিশনের বিরুদ্ধে বৈধ প্রতিবাদ জানাবার জন্য সাম্রাজ্যবাদ দেশবরেণ্য নেতা লালা লাজপত রায়কে হত্যা করেছে। ভারতের ব্যাপকতম জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভের জন্য নির্দেশের প্রত্যাশায় আরও অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষমান। চতুর্দিকে প্রস্তুতির সমারোহ।

সমস্ত লক্ষণ থেকে এই কথাই ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, ব্যাপকতম জনসাধারণের মনের যথার্থ আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্য আশু প্রয়োজন ভারতীয় জনসাধারণ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য চেষ্টা করা, সাম্রাজ্যবাদী শাসন অবসানের জন্য বাস্তব প্রচেষ্টা আরম্ভ করা এবং স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বতোভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা। কিন্তু জাতীর প্রত্যাশা পূরণের জন্য কংগ্রেস নেতৃত্ব এই পথে অগ্রসর হয়ে যাবেন এরূপ প্রত্যাশার আদৌ কোন ভিত্তি ছিল না, এবং ঐ সময়কার পরিস্থিতিতে উদ্ধত এবং অনিচ্ছুক সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে অহিংসা পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া অসম্ভব।

আর তাছাড়া অহিংস পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই হোক, বা জাতীয় মুক্তিই হোক—কোন কিছুই ছিনিয়ে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না; সম্ভাবনা কেবল মাত্র দান ও গ্রহণের। সেই সময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ,—তার দম্ভ ও অহঙ্কার সীমাহীন। তাই ভারত সম্পর্কে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কল্পনায় শুধু অসম্ভবই ছিল না, অদ্ভুত ও অবাস্তব ছিল। সুতরাং যথার্থ জাতীয় মুক্তি অর্জনের একমাত্র সম্ভাব্য পন্থা ছিল প্রচণ্ড সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করা; সংগ্রামে দুর্বল ও কোণঠাসা করে সাম্রাজ্যবাদকে ক্ষমতা পরিত্যাগে বাধ্য করা।

একমাত্র দেশের ব্যাপকতম জনগণের অত্যুগ্র আগ্রহ ও ইচ্ছা-প্রসূত চাপের ফলেই জাতীয় নেতৃত্ব এই পথে অগ্রসর হয়ে যাবেন অথবা বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের ন্যায় জনসংগ্রাম সমগ্র দেশে উত্তাল অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে—এরূপ আশা করাই তখন স্বাভাবিক ছিল।

অবশ্য চট্টগ্রামের মত সমগ্র দেশের ক্ষুদ্র এক অংশে ক্ষমতা দখল করলেও ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে যাবে না অথবা চট্টগ্রামে পরাজিত হলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষ পরিত্যাগে বাধ্য হবে না, একথা সূর্যসেন এবং তার সহকর্মীরা সকলেই খুব স্পষ্ট বুঝতেন এবং জানতেন।

এ বিষয়ে তাঁদের কারও মনে কখনও এতটুকু মোহ বা বিভ্রান্তি ছিল না। তবুও তাঁরা বিশ্বাস করতেন, দেশের ব্যাপকতম জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যদি চট্টগ্রামে একটি আদর্শ স্থাপন করা সম্ভব হয়, তাহ'লে সেই সাফল্যই দেশের কোটী কোটী মানুষকে একটি অর্জনীয় লক্ষ্য বলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও দুর্ধর্ষ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে।

অতীতের চিরাচরিত পন্থার অন্ধ অনুসরণ করে শাসকদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, ব্যক্তিগত হত্যা নয়: প্রয়োজন শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমবেত আক্রমণ, শাসন ব্যবস্থার অবসান। এই লক্ষ্য নিয়েই চট্টগ্রামে মাষ্টারদা'র নেতৃত্বে প্রস্তুতি আরম্ভ হ'ল অতি গোপনে। তার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন নির্ধারিত হল বিপ্লবী সংগঠনকে অতি সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, সংগঠনকে সুবিস্তৃত করা এবং সংগঠন থেকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের এমনভাবে সুকৌশলে দূরে সরিয়ে দেওয়া, যেন তাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ না জাগে।

বিপ্লবী সংগঠনকে যথোচিতভাবে পুষ্ট করবার জন্য গড়ে উঠল মাষ্টারদা'র বিশ্বস্ত শিষ্য অনন্ত সিংহের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে সহরে এবং সমগ্র জেলায় অগণিত ব্যায়ামের ক্লাব বা আখড়া। এই সমস্ত ক্লাব থেকে পরবর্তী সময়ে বহু সুস্থ সবল ও কর্মঠ যুবক বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দিয়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করেছে।

অনুরূপভাবে মাষ্টারদা'র অন্য দু'জন বিশ্বস্ত শিষ্য গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে যুব ও ছাত্র সংগঠন। এই দুই সংগঠন থেকেও পরবর্তীকালে অনেক যুব ও ছাত্র বিপ্লবী দলে যোগ দেয়। এইসব গণ-সংগঠন ছাড়াও গড়ে তোলা হয় সম্পূর্ণ সামরিক কায়দায় প্রকাশ্যে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল এবং অতি গোপনে একটি সামরিক বাহিনী। এই বাহিনীকে যথাসম্ভব সকলপ্রকার সামরিক রণ-কৌশল অতি গোপনে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়।

কংগ্রেসের ন্যায় একটি জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের উপর

কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারলে জেলার সমগ্র জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা সহজ হবে এবং প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে ক্রমশঃ বিপ্লবী কর্মপন্থা ও সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ও আকৃষ্ট করে তোলা যাবে, এই বিশ্বাসে কংগ্রেস সংগঠনও বিপ্লবীদলের কর্তৃত্বে আনা হয় এবং সূর্য সেন জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন।

যুবসমাজকে প্রভাবান্বিত ও আকর্ষণ করার জন্য এবং প্রধানতঃ সরকার ও গোয়েন্দা পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার জন্য জেলার বিভিন্ন স্থানে দলের ব্যায়ামকুশলী যুবকেরা বিভিন্ন ব্যায়াম-কৌশল ও শারীরিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করতেন। ঐ সব প্রদর্শনীতে ব্যায়ামবীরেরা খুবই প্রশংসা অর্জন করতেন এবং গোয়েন্দা পুলিশও মনে করত সূর্য সেনের দলের এই ই ছিল লক্ষ্য।

১৯২৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে মাষ্টারদা'র উদ্যোগে চট্টগ্রামে একটি রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়; উদ্দেশ্য ছিল— জনগণের কাছে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মী বলে পরিচিতি দেওয়া এবং তাদের কাছে একটি সংগ্রামশীল রাজনৈতিক কর্মসূচী পেশ করা। সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা লতিকা বসু প্রমুখ বহু প্রখ্যাত জননেতা ও নেত্রী এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, ফলে সম্মেলন অভূতপূর্বভাবে সফল হয় এবং প্রতিদিন সভায় বহু জনসমাগম হয়।

মাষ্টারদা'র নেতৃত্বাধীন একটি দলের উদ্যোগে এই রাজনৈতিক সাফল্যে চিরাচরিত কংগ্রেস-নেতৃত্ব শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং তাঁদের পরোক্ষ প্ররোচনায় কিছু বিভ্রান্ত যুবক ঐ সম্মেলন আক্রমণে পণ্ড করবার চেষ্টা করে। কিন্তু মাষ্টারদা ও তাঁর সহকর্মীদের সুদৃঢ় ও সুকৌশল পরিচালনার ফলে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মূল রাজনৈতিক সম্মেলন, যুব সম্মেলন, ছাত্র সম্মেলন, ও নারী সম্মেলন সবগুলিই অতি সাফল্যের সাথে পরিসমাপ্তি লাভ করে। সূর্য সেন

পরিচালিত বিপ্লবীদলের নেতৃবৃন্দ সমগ্র চট্টগ্রাম জেলায় যথেষ্ট পরিচিতি এবং কিছু পরিমাণে জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিল কলেজের বৃত্তি পাওয়া বিজ্ঞানের ছাত্র। ঐ বছরের শেষভাগে বোমা বিস্ফোরণের "ক্যাপ" তৈরী করবার সময় অকস্মাৎ তার হাতে বিস্ফোরণ হয় এবং রামকৃষ্ণ গুরুতর ভাবে আহত হয়। তাকে অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে অপসারিত করা হয় ও তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

অল্প কয়েকদিন পরেই রামকৃষ্ণের গোপন বাসগৃহের প্রতি পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং একদিন প্রত্যূষে পুলিশ ঐ বাড়ীতে হানা দেয়। কিন্তু পুলিশ আসবার কয়েকঘণ্টা পূর্বেই রামকৃষ্ণকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়।

এইভাবে লুকোচুরি খেলার ন্যায় বিপ্লবীদের সাথে পুলিশের কয়েকবার প্রতিযোগিতা হয় এবং প্রত্যেকবারেই পুলিশ পরাজিত হয়েছে। অবশেষে মাষ্টারদা'র নির্দেশে রামকৃষ্ণকে গ্রামাঞ্চলের একটি গোপন নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ স্থানে কয়েকমাসের মধ্যেই রামকৃষ্ণ সম্পূর্ণভাবে নীরোগ ও সুস্থ হয়ে ওঠে।

এই সময়ে জেলা কংগ্রেসের একটি নির্বাচনী সভায় সূর্য সেনের মনোনীত সকল প্রার্থীই প্রচুর সমর্থনে জয়লাভ করেন। পরাজিতেরা ছিলেন অন্য রাজনৈতিক দলের নেতা ও আগের দিনের কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ। তাঁরা এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন দাঙ্গা বাধিয়ে, প্রতিযোগীদের আহত করে, মাষ্টারদা'র দলের বালক স্বেচ্ছাসেবক সুখেন্দু দত্তকে মারাত্মকভাবে ছুরিকাঘাত করে এবং অন্যায়ভাবে সভা ভেঙ্গে দিয়ে।

মাষ্টারদা'কে তাঁরা মাথায় আঘাত দিয়ে আহত করেন; মাষ্টারদা'র কপাল থেকে প্রচুর রক্তপাত হ'তে থাকে। মাষ্টারদা'র শরীরে রক্ত দেখে তরুণ বিপ্লবী নেতারা সকলেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং তখনিই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হন। অবশ্যই এর

পরিণতিতে সারা শহরে একটি বড় রকমের দাঙ্গাহাঙ্গামা বেঁধে যেতো এবং সরকারও এই অবাঞ্ছিত ঘটনার পূর্ণ সুযোগ নিতে দ্বিধা করত না। বিপ্লবী নেতৃত্বের অনেকেই গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হ'য়ে যেতেন।

মাষ্টারদা মুহূর্তেই পরিস্থিতি এবং পরিণতি উপলব্ধি করলেন এবং অতিকষ্টে সকলের সম্মুখে এসে স্বল্প কথায় এবং তীব্র তিরস্কারে তরুণ নেতৃবৃন্দের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনলেন। সত্যিই তো, যারা কোন-না-কোন সময়ে, কোন-না-কোন কারণে বিপ্লবী দলের বিরোধিতা করে, তারা সকলেই বিপ্লবী লক্ষ্যের প্রধান শত্রু নয়। বরং যে কোন কারণেই হোক, প্রধান শত্রুকে যে সব বিপ্লবীরা এক মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টির অন্তরালে যেতে দেয়, তারাই বিভ্রান্ত কর্মী। মাষ্টারদা'র সময়োচিত হস্তক্ষেপে সেদিন যথার্থই একটি অসন্তোষ-জনক এবং অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারেনি।

১৯৩০ সালের মার্চ মাস। প্রস্তুতির কাজ প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে। এমন সময়ে একটি অতি গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটে। জেলা কংগ্রেস অফিস ছিল শহরের কেন্দ্রস্থলে আন্দর খাঁর দীঘির পাড়ে। এই কংগ্রেস অফিসেই মাষ্টারদা থাকতেন।

একদিন অন্য কোন নিরাপদ বাড়ী না পাওয়ার ফলে এবং অত্যন্ত জরুরী বিবেচিত হওয়ায় এই কংগ্রেস অফিসেই বিস্ফোরক তৈরীর ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিপ্রহরের পরে অফিসে লোক সমাগম খুব কম হয়, সেই কারণেই দুপুরের পরেই অফিসে এক নিভৃতকক্ষে এই কাজ আরম্ভ হয়।

তারকেশ্বর দস্তিদার ছিল বিজ্ঞানের ছাত্র। তার উপরেই ছিল এই কাজের প্রধান দায়িত্ব এবং নির্মলদা (সেন) তাকে সাহায্য করেছিলেন। অবশ্যই ওই বাড়ীর কাছে এবং দূরে বহু স্থানে নিজেদের প্রহরার ব্যবস্থা ছিল।

হঠাৎ এক সময়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং তারকেশ্বর অত্যন্ত গুরুতরভাবে আহত হয়। ধোঁয়ায় সমগ্র গৃহটির চারিদিক সম্পূর্ণ-

ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং ঘরের বাঁশের বেড়ায় আগুন ধরে যায়। মাষ্টারদা বাইরের দিকের অফিসঘরে বসেছিলেন, বিস্ফোরণের পর ভিতরে এসে ঐ বীভৎস এবং বিপদজনক অবস্থা দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন এবং পরমুহূর্তেই আগুন নিভিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করে ধরাধরি করে তারকেশ্বরকে আরও পিছনের এক নিরাপদ কোণে সরিয়ে ফেললেন। দশ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত ঘরটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে একেবারে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে তারকেশ্বরকে অপসারিত করবার জন্য যথাস্থানে খবর পাঠিয়ে দিলেন। আর দশমিনিটের মধ্যেই তারকেশ্বরকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হল। মাষ্টারদা'র উপস্থিত বুদ্ধির জন্য এরূপ একটি বড় রকম দুর্ঘটনার বিষয় পুলিশ শেষ অবধি কিছুই জানতে পারেনি।

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে কংগ্রেসের সর্ব্বোচ্চ নেতৃত্ব স্থির করেন দেশের প্রত্যেক স্থানেই আইন অমান্য আন্দোলন করা হবে। বিভিন্ন পন্থায় সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিশেষ আইন অমান্য করবার জন্য বিভিন্ন জেলার কংগ্রেস নেতৃত্ব কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। চট্টগ্রামেও নিষ্ঠাবান্ কংগ্রেস সদস্যরা নিরন্তর অনুরোধ ও দাবী জানাতে লাগলেন আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবার জন্য।

তখন বিদ্রোহের প্রস্তুতি প্রায় সমাপ্তির যুগে। ঐ অবস্থায় আইন অমান্য করে কারাবরণ করা বিপ্লবীদের পক্ষে অসম্ভব। তাই মাষ্টারদা'র নির্দেশে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব একটি প্রস্তাব নেন এবং ইস্তাহার মারফৎ ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় যে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব আগামী ১৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় নিষিদ্ধ পুস্তক প্রকাশ্যে পাঠ করে চট্টগ্রাম জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করবেন।

ঐ ইস্তাহারে কয়েকজন বিপ্লবী নেতার নামও ছিল, যাঁরা ঐ দিন আইন অমান্য করে কারাবরণ করবেন। পুলিশের হাতে ঐ ইস্তাহার পড়বার পর মাষ্টারদা'র দল সম্পর্কে তাদের মনে যে সন্দেহ ছিল তা দূর হয়ে গেল, এবং তারা স্বভাবতঃই খুব আনন্দিত হয়ে

ভেবে রেখেছিল, এবার অনেককে দীর্ঘদিনের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু তাদের আশা পূরণ হয়নি।

প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়ে গেল। এপ্রিল মাসের ১৮ই তারিখে রাত্রির প্রথমভাগে মাষ্টারদা'র সর্বোচ্চ নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবী বাহিনী সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতার কেন্দ্র সমূহে যুগপৎ আক্রমণ করে। জেলা পুলিশের কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার, স্থানীয় সামরিক কেন্দ্রের অস্ত্রাগার, টেলিগ্রাফ ভবন, টেলিফোন কেন্দ্র বিপ্লবীরা অল্প আয়াসেই দখল করে নেয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রেল ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত করে ফেলা হয়। ফলে চট্টগ্রাম বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী চেষ্টা হয়েছিল শহরের ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে জেলার সর্বোচ্চ শাসকদের বন্দী করে ফেলা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পরিকল্পনা আদৌ কার্যকর হয়নি। সেদিন যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যু দিন বলে খ্রীষ্টান অফিসারদের কেউই আমোদ-আহ্লাদের জন্য ঐ দিন ক্লাবে যায় নি।

জেলা পুলিশের অস্ত্রাগারেই বিদ্রোহী বাহিনী সাময়িকভাবে নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করে এবং চতুর্দিকের জয় সুনিশ্চিত হওয়ার পরই বিদ্রোহী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সূর্যসেন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান এবং তার নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বিপ্লবী জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভারতীয় জনগণের প্রচেষ্টায় অচিরে সমগ্র ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হবে।

কয়েকজন ইংরাজ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে একটি "মেশিনগান" এনে পুলিশ অস্ত্রাগারের উপর গুলি নিক্ষেপ করে। ঐ গুলিবর্ষণে বিদ্রোহীদের কেউই আহত হয়নি, পরন্তু বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড আক্রমণে ইংরেজরা অবিলম্বে পলায়ন করে চলে যায়।

স্থির হয়, পরদিন প্রভাতের জন্য অপেক্ষা না করে রাত্রিতেই বিদ্রোহী বাহিনীর শহরের কেন্দ্রে প্রবেশ করা প্রয়োজন। কিন্তু

দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনার জন্য সমগ্র বিদ্রোহী বাহিনী শহরে প্রবেশ না করে নিকটবর্তী পাহাড়ে চলে যায়।

চারদিন পরে ২২শে তারিখ পূর্বাহ্নে সাম্রাজ্যবাদীদের একটি বিরাট সামরিক বাহিনী শহরে প্রবেশ করে এবং অপরাহ্নে জালালাবাদের পাহাড়ে বিদ্রোহীদের ঘাঁটি আক্রমণ করে। প্রচণ্ড সংগ্রামের পর সাম্রাজ্যবাদী ফৌজ পরাজিত হয়ে শহরের কেন্দ্রে পলায়ন করে ফিরে যায়।

জালালাবাদ যুদ্ধের সময় মাষ্টারদা অভাবনীয় সাহস ও সামরিক বিবেচনা-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। রাইফেল হাতে নিয়ে অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণের সাথে সাথে তিনি নজর রেখেছেন পাহাড়ের চূড়ার কোন অংশ অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং সেই অনুযায়ী যুদ্ধ চলাকালেই এক অংশ থেকে অন্য অংশে অতি সতর্কতার সাথে বিদ্রোহী সৈনাদের সরিয়ে উপরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেছেন।

তাছাড়াও শত্রুর "মেসিনগানের" প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের মধ্যেও তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে কখনও গড়িয়ে গড়িয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ের উপরে চূড়ানো বিদ্রোহী সৈন্যদের গুলি সরবরাহ করেছেন, কারও কারও বিকল রাইফেল পরিষ্কার করে পুনরায় কার্যকর করে দিয়েছেন, কখনও কখনও আহত যুবকদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অন্তরালে অপসারণ করেছেন বিদ্রোহী বাহিনীর সকলেই আশ্চর্য হয়ে ভেবেছে, শত্রুর ঐ গুলিবর্ষণের মধ্যেও মাষ্টারদা'র শরীরে একটি গুলীও কেমন করে আঘাত করল না।

২২শে এপ্রিল সন্ধ্যায় অন্ধকার নামার সাথে সাথে জালালাবাদ ও সমগ্র অঞ্চল সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যায়। মাষ্টারদা সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং আশু ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও সেই সাথে নিজেদের ও শত্রুর শক্তির যথাসম্ভব মূল্যায়ন করে স্থির করলেন শত্রুর সাথে সম্মুখ সংঘর্ষ পরিহার করে অন্য পন্থায় সংগ্রাম পরিচালনা করা প্রয়োজন। চট্টগ্রামের গ্রাম অঞ্চল শত্রুর পক্ষে অপেক্ষাকৃত দুর্ভেদ্য;

সুতরাং এই গ্রাম অঞ্চল থেকেই বার বার আক্রমণ ও আঘাত করে শত্রুকে দুর্বল ও অতিষ্ঠ করে তুলতে হবে, শত্রুর নিরাপত্তা বিনষ্ট করতে হবে, শত্রুর পক্ষে চট্টগ্রাম অসহনীয় করে তুলতে হবে।

রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে মাষ্টারদা'র নির্দেশ ও পরিচালনায় সমগ্র বিদ্রোহী বাহিনী জালালাবাদ পাহাড় থেকে অবতরণ করে অন্ধকারের মধ্যেই চট্টগ্রামের বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

মাষ্টারদা নতুন সিদ্ধান্ত করলেন—শত্রু অত্যন্ত শক্তিশালী, সুতরাং সংগ্রাম হবে দীর্ঘস্থায়ী। সতত নিরবচ্ছিন্ন এবং যথাসম্ভব শক্তিশালী আঘাতে আঘাতে এই শত্রুকে দুর্বল করতে হবে। এবং যেহেতু প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আসা সম্ভব নয়, তখন অবশ্যই "গেরিলা" পন্থায় সংগ্রাম পরিচালনা করা অপরিহার্য।

আরম্ভ হ'ল মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়—নতুন পদ্ধতিতে, "গেরিলা" পন্থায়।

২৮শে এপ্রিল সহরের মধ্যেই সশস্ত্র পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয় অমরেন্দ্র নন্দীর। অমরেন্দ্রকে মাষ্টারদা জালালাবাদ যুদ্ধের পূর্বেই পাহাড় থেকে শহরে পাঠিয়েছিলেন অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও অন্যান্য বিচ্ছিন্ন নেতাদের সাথে সংযোগ করবার জন্য, তাঁদের সংবাদ নেবার জন্য এবং সহরের পরিস্থিতি জেনে নেবার জন্য।

অমরেন্দ্র নিরাপদে সহরে এসে নেতাদের সংবাদ নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু পায়নি। সহরের সমস্ত সম্ভাব্য স্থানে ঘুরে ঘুরে খোঁজ করেও ব্যর্থ হয়েছে। সহরের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদ সংবাদ নিয়ে অমরেন্দ্র পুনরায় পাহাড়ে ফিরে যায়, কিন্তু পূর্বের পাহাড়ে গিয়ে আর বিপ্লবী বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি।

অনন্যোপায় হয়ে অমরেন্দ্রকে আবার সহরেই ফিরে আসতে হয়। সহরে এসে একদিন অমরেন্দ্র ছিলও, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরদিন পুলিশ তার অবস্থিতি জানতে পারে। সমূহ বিপদ আশঙ্কা করে অমরেন্দ্র আশ্রয় স্থল পরিত্যাগ করে। পুলিশের দল তার

পশ্চাদ্ধাবন করলে অমরেন্দ্র রাস্তার নীচে একটি পুলের তলায় প্রবেশ করে। পুলিশ তাকে ঘিরে ফেলে আত্মসমর্পণ করতে বলে, কিন্তু অস্ত্রত্যাগে অস্বীকার করে অমরেন্দ্র পুলিশের প্রতি গুলী নিক্ষেপ করে। অল্প কিছুক্ষণ এই অসম সংঘর্ষের পর অমরেন্দ্র প্রাণ বিসর্জন করে।

২২শে এপ্রিল রাত্রিতে ফেণী রেলষ্টেশনে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তকে একদল পুলিশ ঘিরে ফেলে। কিন্তু গুলীবর্ষণ করে তাঁরা সকলেই পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে যান।

৬ই মে রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, স্বদেশ রায়, দেবু গুপ্ত, ফণী নন্দী ও সুবোধ চৌধুরী সশস্ত্র হয়ে গোপনে সহরে আসে নদীপাড়ের কয়েকটি ইউরোপিয়ান কোয়ার্টার অতর্কিত আক্রমণ করে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে।

গ্রাম পরিত্যাগ করবার পূর্বেই মাষ্টারদা এই দলটিকে গুরুতর বিপদ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সকলে নিরাপদে এবং গোপনে সহরের কেন্দ্রে উঠেছিল, কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাবার কিছু পূর্বেই পুলিশ তাদের দেখতে পায় এবং ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করে।

বিদ্রোহী দলটি সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে যায় এবং বহু কষ্টে নদী পার হয়ে ওপারে চলে যায়। বহু সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ ও কর্ণেল স্মিথের নেতৃত্বে একদল ফৌজ লঞ্চে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। অবশেষে কালারপোল নামক একটি স্থানে বিদ্রোহী যুবকদের সাথে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের এক সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষের সময় সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক বিদ্রোহীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘোষণা করে—আত্মসমর্পণ করলে তাদের কারও প্রাণ নেওয়া হবে না। কিন্তু শত্রুর ঐ প্রস্তাব ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যাত হয়। ঐ সংঘর্ষে উপরিউক্ত যুবকদের মধ্যে প্রথম চারজন বীরের মৃত্যু বরণ করে।

শ্রীমতী সুহাসিনী গাঙ্গুলী ও শশধর আচার্যের আশ্রয়ে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের গৃহে গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত আত্মগোপন করেছিলেন, ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রে একদল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী সেই বাড়ীটি ঘিরে ফেলে। ঐ সময়ে বিদ্রোহীদের সাথে পুলিশের যে খণ্ড যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে জীবন ঘোষাল নিহত হন এবং অন্যেরা গ্রেপ্তার হন।

ঐ বছর ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলার পুলিশ-প্রধান ক্রেগ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কঠোর করবার জন্য চট্টগ্রামে যায়। পরদিন সন্ধ্যায়ই তার চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করার কথা। মাষ্টারদা এই সংবাদ জানতে পারেন এবং তাঁরই নির্দেশে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালী চক্রবর্তী গোপনে গ্রাম থেকে শহরে আসে এবং ক্রেগকে অনুসরণ করে পরদিন প্রত্যুষে চাঁদপুর ষ্টেশনে ক্রেগকে আক্রমণ করে। ভুলক্রমে ক্রেগের দেহরক্ষী নিহত হয়। পরবর্তী বিচারে রামকৃষ্ণের প্রাণদণ্ড হয়

এই ডিসেম্বর মাসেই যে সব গ্রামে বিদ্রোহী যুবকেরা আত্মগোপন করে ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন, শশাঙ্ক নামে একজন অত্যুৎসাহী গোয়েন্দা সেই সব গ্রামে গিয়ে কাজ আরম্ভ করে। বে-পরোয়া শশাঙ্কের দৌরাত্ম্যে গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। একদিন সন্ধ্যায় তারকেশ্বর দস্তিদার ও বীরেন দে শশাঙ্ককে গ্রামের একটি পথের উপর আক্রমণ করে ও মৃত মনে করে ফেলে রেখে যায়। শশাঙ্ক কিন্তু শেষ অবধি বেঁচে যায়।

এপ্রিল মাসে বিদ্রোহ করবার অপরাধে ৩১ জনের বিরুদ্ধে জুলাই মাসে এক বিশেষ আদালতে বিচার আরম্ভ হয়। বিচারাধীন বন্দীদের মুক্ত করে নেবার জন্য মাষ্টারদা এক অসমসাহসিক পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।

পরিকল্পনা ছিল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সাহায্যে জেলের প্রাচীর ধ্বংস করে বন্দীদের মুক্ত করে গ্রামের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া। মাষ্টারদা'র ব্যবস্থায় কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র, বহু পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য

এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নানা জিনিষ নিরাপদে চট্টগ্রাম জেলের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু একটি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার ফলে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয় এবং সমগ্র জেলখানা খুঁড়ে সরকার ঐ সব জিনিষ আবিষ্কার করে ফেলে। বন্দী মুক্তির পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

এই পরিকল্পনার সাথে সাথে মাষ্টারদা অপর একটি বড় দুঃসাহসিক পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছিলেন। এই পরিকল্পনা ছিল আদালত ভবন বিস্ফোরণে ধ্বংস করা এবং কাছারী পাহাড়ের উপর আদালত-ভবনে যাওয়ার রাস্তায় কয়েকটি স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিস্ফোরণ ঘটানো।

মাষ্টারদা'র ব্যবস্থায় এবং তত্ত্বাবধানে বহু পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে কয়েকটি বড় বড় "ল্যাণ্ড-মাইন" তৈরী হয় এবং পূর্ব নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে সান্ধ্য আইনে বলবৎ নির্জনতার সুযোগে মাটির তলায় বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এবারও দুর্ভাগ্যবশতঃ শেষ "মাইনটি" মাটির তলায় বসাবার সময় পুলিশের নজরে পড়ে যায়। অনুসন্ধানে ক্রমশঃ সব কয়টি মাইনই পুলিশ আবিষ্কার করে ফেলে। এইভাবে এই বিরাট পরিকল্পনাটিও ব্যর্থ হয়ে যায়।

দু'টি বড় পরিকল্পনা শেষ পর্যায়ে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পরও মাষ্টারদা হতাশ বা নিরুৎসাহ হননি। কর্মীদের মনে বিপ্লবী-উদ্দীপনা জাগাবার জন্য এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় আঘাত দেবার জন্য মাষ্টারদা নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালের আগষ্ট মাসে জেলার অত্যাচারী গোয়েন্দা-প্রধান খান বাহাদুর আসানুল্লা একটি খেলার মাঠে বহু সহস্র দর্শকের চোখের সামনে বালক হরিপদ ভট্টাচার্যের গুলীতে নিহত হয়। সেইদিন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে চট্টগ্রামের প্রায় সকলেই হরিপদকে আশীর্বাদ করেছেন।

ঐ বছরের অক্টোবর মাসের শেষভাগে ঢাকা সহরের একটি জনাকীর্ণ বড় রাস্তায় ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডুর্নো চট্টগ্রামের বিদ্রোহী বালক সরোজ গুহের গুলীতে গুরুতররূপে আহত হয়।

সরোজের সন্ধান কেউই পায়নি, সরোজ নিরাপদে চট্টগ্রামে ফিরে যায়।

সমগ্র চট্টগ্রাম জেলায় তখন কার্যতঃ সামরিক শাসন চলছে, পুলিশ ও ফৌজকে অবাধ ও অপ্রতিহত অধিকার দেওয়া হয়েছে জনসাধারণের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করবার। আসানুল্লা নিহত হওয়ার পর চট্টগ্রামের সর্বোচ্চ ইংরেজ অফিসারেরা জেলার সর্বত্র যে বর্বর এবং অমানুষিক নির্যাতন আরম্ভ করে তা সাম্রাজ্যবাদী কুশাসনের অতীত ইতিহাসকেও ম্লান করে দিয়েছিল। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ-প্রধান ও অন্যান্য ইংরেজ অফিসারেরা নিজেরাই প্রকাশ্যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ করবার জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং প্ররোচনা দেয়।

শুধু এই নয়, নিজেরাই স্বহস্তে বহু হিন্দু দোকান, খবরের কাগজের অফিস এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান লণ্ডভণ্ড করে ও অগ্নি-সংযোগ করে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ঐ সব বীভৎস ঘটনার বিষয় ইংলণ্ডের জনগণকে জানাবার জন্য স্বয়ং ঐ দেশে যান। যতীন্দ্রমোহনের কাছে ঐসব ঘটনার বিবরণ শুনে ইংলণ্ডেও সাম্রাজ্য-বাদী শাসনের বিরুদ্ধে ধিক্কার প্রকাশ করা হয়।

১৯৩২ সালের জুন মাস। মাষ্টারদা ও নির্মলদা ধলঘাট গ্রামে শ্রীসাবিত্রীদেবীর বাড়ীতে আত্মগোপন করে আছেন।

একদিন প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার মাষ্টারদা'র সাথে দেখা করতে ঐ বাড়ীতে যান। সেইদিন সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন ক্যামেরণের নেতৃত্বে একদল ফৌজ ঐ বাড়ী ঘিরে ফেলে। বাড়ীটি ছিল দোতলা, ক্যামেরণ রিভলবার হাতে উপরে উঠতে চেষ্টা করে। নির্মলদা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ক্যামেরণকে গুলী করে। একটি গুলীতেই ক্যামেরণ প্রাণ হারিয়ে নীচে পড়ে যায়। এই গুলীর আওয়াজে গুর্খা সৈন্যেরা সতর্ক হয়ে ওঠে এবং দোতলা লক্ষ্য করে চারদিক থেকে গুলীবর্ষণ করতে আরম্ভ করে।

মাষ্টারদা মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং প্রীতিলতা ও ভোলা সেনকে সাথে নিয়ে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে ফৌজের অবরোধ ভেদ করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। বাড়ীর প্রাঙ্গণে গুলী লেগে ভোলার মৃত্যু হয় এবং দোতলার উপর অকস্মাৎ নির্মলদা'র বুকে একটি গুলি লেগে তিনিও প্রাণ হারান।

চট্টগ্রাম সহরের উপকণ্ঠে পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব ঐ সময়ে জেলার সামরিক ও বে-সামরিক ইংরেজ ও ফিরিঙ্গি সাহেবদের বিলাসের স্থান। জেলার বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের উপর নির্যাতন করবার সব পরিকল্পনাই ঐ ক্লাবে প্রস্তুত হ'ত। চট্টগ্রামের আপামর জনসাধারণের মনে ঐ ক্লাব সম্পর্কে অত্যন্ত ভয় এবং গভীর ঘৃণা ছিল।

১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বিপ্লবী যুবক শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিপ্লবী যুবকদের একটি দলকে পাঠানো হয় ঐ ক্লাবটিকে ধ্বংস করবার জন্য। কিন্তু নির্ধারিত দিনে তারা ঐ অতীব সুরক্ষিত ক্লাবের সন্নিকটে গিয়েও ক্লাব গৃহটি আক্রমণ করতে পারেনি। সকলেই অত্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। মাষ্টারদা'র নির্দেশ পালনে অকৃতকার্য হয়ে গভীর মনোবেদনায় শৈলেশ্বর আত্মহত্যা করে।

কুশলী যুবক শৈলেশ্বরের মৃত্যুতে মাষ্টারদা খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। ঐ মাসেরই ২৪শে তারিখে প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের নেতৃত্বে আর একটি ক্ষুদ্র বিপ্লবীদল সাফল্যের সাথে ঐ ক্লাবে প্রবেশ করে এবং পানোৎসবে মত্ত ইংরেজ অফিসারদের চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে। পরিকল্পনা পূরণ করে যুবকেরা সকলেই নিরাপদে গ্রামে ফিরে যায়। কেবলমাত্র প্রীতিলতাই ফিরে যায় নি। পূর্বনির্ধারিত কার্যক্রম অনুযায়ী প্রীতিলতা ঐ ক্লাবগৃহের অদূরে বিষপান করে আত্মহত্যা করে। প্রীতিলতার কাছে একটি বিবৃতি পাওয়া যায়। ঐ বিবৃতিতে দেশের

নারীদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য একটি উদাত্ত আহ্বান ছিল।

পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাসের ১৬ই তারিখে গৈরলাগ্রামের শ্রীমতী ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ীতে ফৌজের একটি দল মাষ্টারদা'কে অকস্মাৎ গ্রেপ্তার করে ফেলে।

ঐদিন সন্ধ্যাবেলাতেই মাষ্টারদা'র মনে ঘোর সন্দেহ জাগে, ঐ গৃহ আর আদৌ নিরাপদ নয়। তিনি নিজে প্রস্তুত হয়ে সঙ্গী যুবকদের নির্দেশ দেন অবিলম্বে ঐ গৃহ পরিত্যাগ করবার জন্য। কিন্তু ফৌজ ইতিমধ্যেই ঐ গৃহ ঘিরে ফেলেছিল। গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন, একে একে সকলেই ফৌজের অবরোধ অতিক্রম করে চলে যায়। কিন্তু মাষ্টারদা ও তাঁর সাথী ব্রজেন সেন যাওয়ার সময় অতর্কিতে একজন সেপাইকে স্পর্শ করে ফেলেন। গুর্খা সৈন্যটি সঙ্গে সঙ্গেই মাষ্টারদা'কে জড়িয়ে ধরে মাটিতে ফেলে দেয় এবং অপর একজন গুর্খা সেপাই ব্রজেন সেনকে ধরে ফেলে। মাষ্টারদা'র গ্রেপ্তারের পরেই সঠিকভাবে জানা যায়, ক্ষীরোদপ্রভার নিকটতম প্রতিবেশী নেত্র সেন মাষ্টারদা'র কথা জানতে পারে এবং পুরস্কারের আশায় পুলিশকে সংবাদ দেয়।

এই ঘটনার তিন মাস পরে গহিরা গ্রামের একটি গৃহে হানা দিয়ে ফৌজ ও পুলিশের একটি দল তারকেশ্বর দস্তিদার ও শ্রীমতি কল্পনা দত্তকে গ্রেপ্তার করে। এই সময়ে বিপ্লবীদের সাথে পুলিশ ও ফৌজের গুলি বিনিময় হয় এবং পুলিশের গুলিতে গৃহকর্তা ও অপর একজন নিহত হন।

একটি বিশেষ আদালতে মাষ্টারদা, তারকেশ্বর ও কল্পনার বিচার হয়। সাম্রাজ্যবাদী সরকার ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত চট্টগ্রাম ও অন্যান্য বহু স্থানের প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলন ও ঘটনার জন্য মাষ্টারদা'ই দায়ী বলে অভিযোগ করে। ঐ ট্রাইবুন্যাল বিচারের প্রহসন করে মাষ্টারদা ও তারকেশ্বরকে হত্যা করবার নির্দেশ দেয় ও কল্পনাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী মাষ্টারদা'কে হত্যা করবার দিন স্থির করে।

তার পাঁচদিন পূর্বের ঘটনা। চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থলে পল্টনের মাঠ। ৭ই জানুয়ারী সেই মাঠে ক্রিকেট খেলা। ভারতের অধিবাসীদের ঐ মাঠের সন্নিকটে যাওয়ার উপায় ছিল না, শত শত সশস্ত্র পুলিশ ও ফৌজের অতি সতর্ক বেষ্টনীর মধ্যে ঐ খেলার মাঠ সুরক্ষিত।

সহরের প্রায় সব সাহেব ঐ মাঠে সমবেত। খেলা চলছে, অকস্মাৎ চারটি বিপ্লবী যুবক দর্শক গ্যালারীর নিকটে এসে সাহেব দর্শকদের উপর বোমা বর্ষণ আরম্ভ করে।

মুহূর্তের মধ্যেই সকলে হতচকিত হয়ে যায় এবং নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ও হট্টগোল দেখা দেয়। পর মুহূর্তেই ফৌজী সিপাহীর গুলিতে বিপ্লবী তরুণ হরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও হিমাংশু চক্রবর্তী নিহত হয় এবং কৃষ্ণ চৌধুরী ও নিত্যগোপাল সেন ধৃত হয়।

ট্রাইবুন্যালের বিচারে ধৃত বিপ্লবী যুবকদ্বয়ের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

১১ই জানুয়ারীর তিনদিন পূর্বের ঘটনা। মাষ্টারদাকে গ্রেপ্তারে সাহায্যের জন্য বহু সহস্র টাকা পুরস্কারের সরকারী প্রতিশ্রুতি পেয়েছে বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেন। সন্ধ্যার পর উৎফুল্ল মনে খেতে বসেছে নেত্র সেন নিজের বাড়ীর রান্নাঘরের বারান্দায়। তার স্ত্রী তাকে পরিবেশন করছে। এক সময়ে রান্নাঘরের ভিতরে কি একটা আনতে গিয়ে পর মুহূর্তেই ফিরে এসে মহিলা দেখেন, নেত্র সেনের ছিন্ন মস্তক তার থালার উপর এবং দেহ এক পাশে, কোথাও কেউ নেই। বাইরের গভীর অন্ধকারে কেবল ঝিল্লীর অবিশ্রান্ত গুঞ্জন।

১১ই জানুয়ারী রাত্রিকালে চট্টগ্রাম জেলে মাষ্টারদা ও তারকেশ্বরকে সাম্রাজ্যবাদীরা হত্যা করে। সন্ধ্যাকালেই তাঁরা জানতে পেরেছিলেন যে, সেই সন্ধ্যাই তাঁদের জীবনের শেষ সন্ধ্যা।

তাই সন্ধ্যার পরই মাষ্টারদা জেলের অন্যান্য প্রাঙ্গণে আবদ্ধ রাজবন্দীদের সম্বোধন করে তাঁর শেষ বক্তব্য জানিয়ে যান।

সকলের প্রতি তাঁর অন্তিম নির্দেশ ও বাণী ছিল—কিছুতেই মনোবল হারিও না, ব্যাপকতম ঐক্য গড়ে তোল এবং তাকে আরও সুদৃঢ় কর, পিছনে দৃষ্টি দিও না, এগিয়ে চল, জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

সূর্য সেনকে হত্যা করবার দৃশ্য উপভোগ করবার জন্য জেলার সকল বড় বড় সাহেবই রাত্রি দ্বিপ্রহরে জেলখানায় উপস্থিত ছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের ঠিক পরেই ঘুমন্ত সূর্য সেনকে জাগিয়ে বলা হল, তাঁর শেষ মুহূর্ত উপস্থিত।

মাষ্টারদা উচ্চকণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" বলে চিৎকার করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সাহেবরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অদূরে প্রাঙ্গণের বন্দীরা দ্বিতীয়বার শুধু শুনতে পেলেন একটি মাত্র শব্দ 'বন্দে'—তারপর আর কিছুই শোনা যায়নি। জেলপ্রহরীর কাছে জানা গেছে, সাহেবরা মাষ্টারদা ও তারকেশ্বরকে আঘাতে আঘাতে নিহত করে তাঁদের প্রাণহীন দেহ দুটিকে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে দেয়।

সূর্যসেন জাতীয় মুক্তির জন্য স্বেচ্ছায় প্রাণ দিয়েছেন। সূর্য সেনের মৃত্যু নেই। তিনি দেশপ্রেমিক সকল ভারতবাসীর অন্তরে প্রদীপ্ত ভাস্বরে চির অক্ষয় হয়ে রয়েছেন।

মাষ্টারদা ছিলেন যুগ-প্রতিনিধি। তিনি শৃঙ্খলিত পরাধীন ভারতের বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকের ব্যাপকতম জনগণের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক। তিনি একান্ত মনে চেয়েছিলেন ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, জনগণের যথার্থ মুক্তি।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবাসংগ্রাম কার্যতঃ ব্যক্তিগত বিক্রম ও বীরত্ব এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ ও হত্যার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পার হয়ে অগ্রসর হয়ে যেতে পারেনি। মাষ্টারদা'র নেতৃত্বেই চট্টগ্রামে ১৯৩০ সালে সর্বপ্রথম ওই যুগের বিপ্লবী আন্দোলন সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে সংগঠিত অভ্যুত্থানের রূপ

নেয়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম এক নতুন ঐতিহাসিক স্তরে উন্নীত হয়।

মাষ্টারদা'র নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টা সেই দিনই ভারতের স্বাধীনতা এনে দিতে পারেনি বা ক্ষুদ্র চট্টগ্রামকে স্থায়ীভাবে মুক্ত করতে পারেনি। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ভারতের জনগণকে এবং বিশেষ করে ভারতের যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এক নতুন আত্মপ্রত্যয়ে, অনুপ্রাণিত করেছিল মৃত্যুভয়হীন দেশপ্রেমে, শিখিয়েছিল মাতৃভূমির মুক্তির জন্য মরণকে তুচ্ছ উপেক্ষায় অবজ্ঞা করতে।

মানুষ হিসাবে মাষ্টারদা ছিলেন একজন আদর্শ ব্যক্তি। স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, সহানুভূতি, বিবেচনা প্রভৃতি মানবিক গুণসমূহের কোন অভাব তাঁর মধ্যে ছিল না।

রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। কখনই তিনি নিজের সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ তাঁর সহকর্মী বা অনুবর্তীদের উপর চাপিয়ে দিতেন না। সব চাইতে বড় কথা, অপরের বিরুদ্ধ মতের প্রতি তিনি কখনও অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নি। প্রতিটি মতের ক্ষেত্রেই তিনি অপরিসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে আলোচনা করেছেন এবং অলঙ্ঘনীয় যুক্তির শক্তিতে বিরোধী মনোভাব জয় করেছেন।

তাঁর অনমনীয় বিশ্বাস ছিল, জোর করে কোন মত বা নির্দেশ চাপিয়ে দিলে কখনই আন্তরিক অনুপূরণ বা অনুবর্তিতা পাওয়া যায় না। তাঁর এই সব অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জোরেই তিনি পরিপূর্ণভাবে তাঁর প্রত্যেকটি সহকর্মী ও অনুবর্তীর হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন; পরিপূর্ণভাবে তাঁদের প্রত্যেকের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছিলেন। তাঁর সহকর্মী ও অনুবর্তীদের মধ্যে এমন কেউই বা একজনও ছিলনা, যে মাষ্টারদা'র নির্দেশ বা ইচ্ছা বা ইঙ্গিতে প্রাণ দিতে দ্বিধা করত। ঐ সব অসাধারণ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল তাঁর অপ্রতিহত নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ সমূহ।

কিন্তু মাষ্টারদা'র যে সব অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল, বাইরে থেকে অন্য কারও চোখে তা' ধরা পড়ত না। তাঁর অসাধারণত্ব ফুটে উঠত অসাধারণ পরিস্থিতিতে, সঙ্কটের মুহূর্তে। প্রথমদিকে তাঁর নিকটতম সকলেই আশ্চর্য হয়ে ভাবত, ঐ অতি সাধারণ, নির্বিরোধ স্বল্পভাষী, মধুর স্বভাবের, অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ এবং কোমল প্রকৃতির মানুষ, তিনি সময়ে সময়ে এত দৃঢ়, এত অনমনীয়, এত কঠোর হওয়ার শক্তি কোথা থেকে এবং কেমন করে পান? এই একান্ত নিজস্ব ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই সূর্য সেনকে পরিণত করেছে অনন্যতম ব্যক্তিতে এবং খ্যাত করেছে বিপ্লবী মহানায়ক পরিচিতিতে।

ভারতের জনগণের যথার্থ মুক্তির যে সংগ্রাম মাষ্টারদা'র নেতৃত্বে সেদিন সূচিত হয়েছিল, আজও তা সমাপ্তির বহু দূরেই রয়ে গেছে।

বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থার সৌজন্যে মুদ্রিত।

'বন্ধু তোমার ছাড়ো উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত'।

—কবি সুকান্ত

জালালাবাদ

লোকনাথ বল

[চট্টগ্রামের প্রখ্যাত ব্যায়ামবিদ ও ছাত্রনেতা। ইনিই সেদিন জালালাবাদ যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদার নির্দেশে। বর্তমানে পরলোকগত]

বাইশে এপ্রিল প্রাতে দীর্ঘ পথ পার হবার পর জালালাবাদ পাহাড়ে উঠে আশ্রয় নিয়েছি। ১৮ই এপ্রিল (১৯৩০) অস্ত্রাগার

দখল করার পর চট্টগ্রাম আমাদের আয়ত্তে আসে। তারপর বিভিন্ন পাহাড়ে আমরা দিন কাটাই। এই ক'দিন আহার জোটেনি। পাহাড়ের ঘোলা জল এবং বুনো কাঁচা আম ছিল আমাদের পানীয় ও আহার।

২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ওঠার সময়ে অনেক গ্রামবাসী আমাদের দেখেছিল। কাজেই আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, পুলিশ এবার আমাদের খুঁজে পাবে। দুর্যোগের জন্য মনের দিক থেকে তাই আমরা তৈয়ের ছিলাম। অবশ্য তিনদিন ধরে অভুক্ত অবস্থায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা হয়েছে। দেহের দিক থেকে আমরা ক্লান্ত।

বেলা অনুমান পাঁচটা। হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের রক্ষীরা বিপদ-ধ্বনি বাজিয়েছেন। সবাই পাহাড়ের চূড়ায় জড় হলাম। দেখলাম, একদল সৈন্যবাহিনী সঙ্গীন উঁচিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে।

আমরা মরিয়া হয়ে রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়ালাম। সৈন্য বাহিনী আমাদের নিশানার মধ্যে আসতেই গুলি বর্ষণের নির্দেশ দেওয়া হল।

আমাদের গুলি বর্ষণ শুরু হতেই সৈন্যরা পিছু হটতে লাগল। কিছুটা দূরে তারা পেল একটি পাহাড়ী খাল। সেখানে তখন জল ছিলনা বললেই চলে। সেই খালে ঢুকে তারা পাল্টা জবাব দিতে শুরু করল।

প্রায় পনের মিনিট যুদ্ধ চলার পর আমরা হঠাৎ লুইস্‌গানের গুলি বর্ষণের আওয়াজ শুনলাম। গুলি বর্ষণ তীব্রতর হয়ে উঠল।

আমার পাশে আমার ছোটভাই হরিগোপাল (টেগরা) আহত হয়ে ঢলে পড়লেন। বলে গেলেন 'দাদা, আমি চললাম, তোমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করো।'

দেখতে দেখতে ত্রিপুরা সেনগুপ্ত, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, প্রভাস বল, মধুদত্ত, নির্মল লালা, অর্ধেন্দু দস্তিদার, জিতেন দাশগুপ্ত,

পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক দত্ত, মতি কানুনগো আহত হয়ে ধুলোয় গড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের রক্তে লাল হয়ে উঠল জালালাবাদের মাটি।

তখন অনুমান সাতটা। হঠাৎ সৈন্য বাহিনীর দিক থেকে তিনবার হুইসেল বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুলিবর্ষণের আওয়াজ থেমে গেল। আমরা 'লাইইং ডাউন পজিশন' থেকে লাফিয়ে উঠে দেখলাম সৈন্যবাহিনী পলায়ন করছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গুলিবর্ষণ পুনরায় শুরু হল। আমাদের বন্দেমাতরম ও ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিকদিগন্ত কাঁপিয়ে তুলল। উঃ! সে কি বিজয়োল্লাস!

তিন দিনের অভুক্ত, পরিশ্রমে ক্লান্ত, তৃষ্ণায় কাতর [illegible] জন অল্পবয়স্ক বিপ্লবী (তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন পনের ষোল বছরের কিশোর) দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এবং মৃত্যু-নেশায় মত্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন একদিকে— আর অন্যদিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, রণবিদ্যায় পারদর্শী, বহু যুদ্ধ বিজয়ী ব্রিটিশের সৈন্য বাহিনী। তাই সে মুহূর্তের জয়লাভ বিপ্লবীদের ইতিহাসে এক গৌরবের কথা নয়

* [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সবারে করি আহ্বান

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

[আত্মবিসর্জনের পরে প্রীতিলতার শবদেহ তল্লাসী করে তাঁর স্বহস্তে লিখিত একটি বিবৃতি পাওয়া যায়। বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থার সৌজন্যে ভূপেন্দ্র-কিশোর রক্ষিত রায়ের 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব' গ্রন্থ থেকে বিবৃতিটির বাংলা অনুবাদ এখানে প্রকাশ করা হল।]

আমি জানিয়ে যাচ্ছি যে, আমি 'ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার সৈনিক। এ বাহিনীর আদর্শ হল অত্যাচারী, শোষক ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কবল থেকে দেশ জননীকে মুক্ত করে একটি 'ফেডারেটেড্ ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিক্ স্থাপন করা।...

আমরা 'স্বাধীনতা'র যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। আজকের এ্যাকসন্ (পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ) ঐ চলমান স্বাধীনতা যুদ্ধেরই একটি অংশ মাত্র। ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে, আমাদের সমাজ দেহকে নিরক্ত করেছে, কোটী কোটী নরনারীর জীবন নিয়ে ছিনি মিনি খেলেছে। আমাদের রাজনৈতিক, আর্থিক, মানসিক, দৈহিক, নৈতিক—সর্ববিধ দৈন্যের মূলে ইংরেজ শাসন। ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতার শত্রু, আমাদের চরম বৈরী। তাই ইংরেজ, হোক সে বা তারা রাজ পুরুষ বা সাধারণ নর-নারী, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হবে। মানুষের জীবন নেওয়া কোন আনন্দের বস্তু নয়, কিন্তু মুক্তি যুদ্ধের অন্তরায় যে কেহ হলে তাকে যে কোন উপায়ে স্তব্ধ করা অবশ্য কর্তব্য।

আজকের এই সশস্ত্র অভিযানে অংশ গ্রহণ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় নেতা মাষ্টারদার আদেশ আমার জীবনে লব্ধ এক গৌরবময় সম্পদ। কারণ, যে বাঞ্ছিত কর্মের জন্য এত কাল আমি অপেক্ষা করেছিলাম, তা পালন করার সুযোগ আমি পেলাম। আমি কার্যভার সম্পূর্ণ দায়িত্ববোধে গ্রহণ করেছি। অবশ্য ঐ পুরুষ শ্রেষ্ঠ যখন আমাকে এ অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য নিযুক্ত করলেন, তখন আমি সংশয় প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু নেতার প্রত্যয় ও আদেশের সুরে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, আমাকেই ও কাজ করতে হবে, ভগবান আমার সহায় থাকবেন। আমি শিশুকাল থেকেই ভগবৎ বিশ্বাসী। আমি আমার নেতার কণ্ঠে ভগবানের বাণী শুনেছিলাম।......

আজকের যুগে দেশের মেয়েরা স্থির প্রতিজ্ঞ যে, তাঁরা আর পিছিয়ে থাকবেন না। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাইদের পাশে এসে তাঁরাও দাঁড়াবেন, স্বহস্তে কাজ করে যাবেন, হোক সে কাজ যতই কঠিন বা বিপজ্জনক। আমি তাই সাগ্রহে কামনা করি যে, আমার বোনেরা আর তাঁদেরকে দুর্বল মনে করবেন না। তাঁরা হাজারে হাজারে ছুটে আসবেন বিপ্লব আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে, ছুটে আসবেন দুঃখ-কষ্ট-দুর্যোগ ও ভয়ঙ্করকে বরণ করার আনন্দে।...

১৯৩০ সালে পড়বার উদ্দেশ্যে কলকাতা ... এসেছিলাম।... আমার কোন বিপ্লবী ভাইয়ের নির্দেশে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করার জন্য তৈয়ের হলাম। মৃত্যুপথযাত্রী রামকৃষ্ণ। দেশকে ভালবাসার অপরাধে ব্রিটিশ কানুনের শৃঙ্খলে বন্দী রামকৃষ্ণ ফাঁসির আগ্রহে অপেক্ষমান। আমি 'কাজিন সিস্টার' সেজে কোন ক্রমে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি আদায় করলাম। প্রত্যেকদিন যেতাম হাসি-খুশি সপ্রতিভ বীরকে দেখার জন্যে। তাঁর ফাঁসি-মঞ্চে আরোহণের পূর্বে আমি অন্ততঃ চল্লিশটি ইণ্টারভিউ নিয়েছিলাম। তাঁর সমাহিত রূপ, অপকট আলাপ-আলোচনা, মৃত্যুর তপস্যায় প্রশান্ত আত্মসমর্পণ, দ্বন্দ্বহীন

ভগবৎ ভক্তি, শিশু সুলভ সারল্য, প্রেমস্নিগ্ধ হৃদয়াবেগ, গভীর জ্ঞান, নিবিড় আত্মানুভূতি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল; দুঃসাহসিকতার পথে চলবার সামর্থ্য আমার দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। রামকৃষ্ণদার ফাঁসির পর সক্রিয়ভাবে বৈপ্লবিক কোন এ্যাক্‌শনে যাবার আগ্রহ আমার প্রচণ্ড হয়ে ওঠে।......

*　　*　　*　　*　　*

১৯৩২ সালে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে চট্টগ্রাম চলে এসেছিলাম। দুর্জয় ইচ্ছা মাষ্টারদার সঙ্গে পরিচিত হবার। হলও তাই। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি দাঁড়ালাম এসে দুটি অপূর্ব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের কাছে। তাঁরাই পরিচালনা করছেন প্রসিদ্ধ চট্টগ্রাম বিপ্লবী সংস্থাকে। তাঁরা হলেন মাষ্টারদা ও নির্মলদা (নির্মল সেন)।

নির্মলদার সঙ্গে অল্পক্ষণের পরিচয়েই বুঝলাম যে, ঐ মানুষটির মধ্যে মহানুভবতা ও সৌন্দর্যে-ভরা একটি হৃদয় আছে; সে হৃদয়ে বিপ্লবের একনিষ্ঠ নীতি এবং ভগবৎ বিশ্বাস নিখুঁতরূপে সন্নিবদ্ধ। আমি সত্যি পরম ভাগ্যবতী, কারণ, আমি অমন একটি বৃহৎ পুরুষের সংস্পর্শে এসেছিলাম, যিনি সবার অজ্ঞাতে এই পৃথিবী ত্যাগ করে চলে গেলেন, যিনি জানতে দিলেন না তাঁর দেশবাসীকে যে, তিনি ছিলেন কত পরিশুদ্ধ ও অনন্য সাধারণ এক মহান মানব....।

নির্মলদার মৃত্যু আমাকে আঘাত দিল, আমাকে আরো দুঃসাহসিনী করে দিল। ...কিছুদিনের মধ্যে বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরুল। জানলাম—'ডিষ্টিংশন' নিয়ে পাশ করেছি। আমি অবিলম্বে বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞে আমার আত্মা ও সর্বহৃদয় নিবেদিত করলাম। স্নেহক্ষরা গৃহের বন্ধন পশ্চাতে পড়ে রইল।

শিশুকাল থেকেই আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ হল ভগবানের প্রতি গভীর বিশ্বাস, তাঁর প্রতি অবিচল ভক্তি। সারা জীবন এ সম্পদ আমি সযত্নে বক্ষে ধারণ করে এসেছি। এবং আজ তাঁর

পাদমূলে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করার জন্য চূড়ান্তভাবে যখন প্রস্তুত হয়ে এসেছি, তখন এই চির-বাঞ্ছিত লগ্নে আমার বক্ষের সেই সম্পদ যেন আরো অমূল্য, আরো মধুর, আরো জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে।

আমি জানি, আমার বিপ্লব-দর্শন আমার ভগবৎ জিজ্ঞাসার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হতে না পারলে আমি কোন দিনই 'বিপ্লবিনী' হতে পারতাম না।

বিধাতার কাছে আমার প্রার্থনা নিবেদন করে আমি আমার আজকের মহান কর্তব্য পালন করতে ব্রতী হলাম। আমি আরও কামনা করি ভগবানের কাছে যে, তিনি যেন সকল গ্লানি ও অশুচিতা থেকে আমাকে মুক্ত করে তাঁর পদপ্রান্তের অর্ঘ্য হবার যোগ্যতা দান করেন।

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।'

—কাজী নজরুল ইসলাম

প্রীতিলতা ওয়াদ্দার

[যুগান্তর দলের বিশিষ্ট সভ্যা। প্রথমে ধরা পড়েন ডালহৌ..
বোমার মামলায়। পরে দীর্ঘদিন বন্দী ছিলেন বিনা বিচারে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ
'রক্তের অক্ষরে' ও 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী'।]

অস্কার ওয়াইল্ড বর্ণিত 'সুখী রাজকুমার' জীবিতকালে জানতে পারেননি দুঃখ কাকে বলে। মৃত্যুর পরে যখন তাঁর মূর্তিকে সোনা. পাতে মুড়ে, ইন্দ্রনীল পাথরের চোখ বসিয়ে লাল চুনি-বসা.. তলোয়ার হাতে দিয়ে সহরের এক উঁচু স্তম্ভের উপর স্থাপন করা হল, তখন তিনি সেখান থেকে জগতের দুঃখ-দৈন্য দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দুঃখে অভিভূত সেই রাজকুমার পীড়িত মানবের দুঃখ দূর করতে নিজের লাল চুনি ও ইন্দ্রনীল পাথর এবং দেহের সমস্ত সোনার পাত একে একে উজাড় করে বিলিয়ে দিলেন এবং তাঁর মানবদরদী হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ক যাওয়া সেই হৃদয়কে দেবদূত এসে তুলে নিয়ে গেলে. জীবনের অমূল্য সম্পদের নিদর্শন রূপে

পরাধীন ভারতেও পরম আদরের সন্তানেরা শৃঙ্খলি- দুঃখ-বেদনা দূর করতে নিজেদের মায়াময় স্নেহময় সংসার. হাতে চূর্ণ করে দিয়ে নিজেরা অম..' করেই নিঃশেষ হয়ে ... ছিলেন। তাঁদের জন্য স্বর্গ রচিত হোক ইতিহাসের অক্ষয় ..তায়। ত্যাগের পরাকাষ্ঠায় সেই সব শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমরা যেন ভু.